নাট্যসাহিত্যের আলোচনা

নাটকবিচার

: প্রথম খণ্ড :

ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
পি. আর. এস.
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

ছয় বয়সে পিতৃহীন

হয় বয়সে মাতৃহীন—শিশুকে

অধিক স্নেহে যিনি লালন পালন করেছিলেন ;

বিত থাকতেও যাঁকে মা ব'লে ডেকেছি—আমার সেই মায়ের-

-মা।

ঠাইমা

৺ক্ষীরোদা সুন্দরী

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার

[প্রথম খণ্ড]

গ্রন্থকারের নিবেদন

ট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার গ্রন্থমালায় প্রথম ও দ্বিতীয় ; পুথি-ঘর কর্তৃক এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড জিজ্ঞাসা কর্তৃক প্রথম ''্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মুদ্রণের সমস্ত সংখ্যা কালক্রমে বিক্রীত হয়ে হওয়ায় খণ্ডগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং নাকারণে নতুন সংস্করণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে॰ি।

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম ·॰ কারী নাট্যকার ও নাট্যসমালোচনা-রসিক শ্রীযুক্ত সুনীল দত্ত ॰াশয় নাটক-বিচার গ্রন্থমালার চটি খণ্ড পুনঃ প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু আমি তাকে এই হি জানাই যে শ্রীশ বাবু সম্মতি না দিলে আমার পক্ষে অনুমতি দেওয়া ব হবে না। শ্রীশ বাবুকে আমি সুনীল বাবুর প্রস্তাব জানাতেই তিনি সানন্দে ়তি দেন এবং লেখকের প্রথম রচনার উপরে মমতা-দুর্বলতা স্বাভাবিক— বোধ হয় তা' উপলব্ধি করেই দেন। শ্রীশ বাবুর সম্মতি পাওয়ার পরে আমি জাতীয় সাহিত্য পরিষদকে নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছি এবং দিয়েছি এই শর্তেই যে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত সমস্ত নাটকের সমালোচনা খণ্ডে খণ্ডে একের পর এক প্রকাশ করবেন এবং ঐ প্রকাশে কোনরূপ বিরতি বা দীর্ঘ বিলম্ব ঘটবে না। এই শর্তেই জাতীয় সাহিত্য পরিষদ আমার নাটক বিচার গ্রন্থমালা প্রকাশ করছেন।

* জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থমালা সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাটি

পরিষ্কার করে বলা দরকার তা' এই যে **এই গ্রন্থগুলি পূর্ব-প্রকাশিত কোন খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ বা নতুন সংস্করণ নয়।** নামে এক হলেও এই খণ্ডগুলি এক হিসাবে নতুন সন্নিবেশ। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে—পাঁচখানি নাটকের সমালোচনা স্থান পেয়েছে এবং এই পাঁচখানি—"নীলদর্পন" (দীনবন্ধু), "প্রফুল্ল" ও "জনা" (গিরিশচন্দ্র) "মেবার-পতন" (দ্বিজেন্দ্রলাল) এবং "নরনারায়ণ" (ক্ষীরোদপ্রসাদ)। "জনা" নাটকের সমালোচনা এর আগে প্রকাশিত হয়নি; এই নতুন প্রথম খণ্ডের জন্যই লিখিত। আমার ইচ্ছা আছে—দশটি খণ্ডে এই গ্রন্থমালা সম্পূর্ণ করব এবং রামনারায়ণ থেকে অতি আধুনিক নাট্যকার পর্যন্ত, নাট্যকারদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিমূলক রচনার সমালোচনা করে, বাংলার নাট্যকারদের প্রতিভার এবং নাট্যসাহিত্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ মাঝ পথে থেমে না গেলে এবং আমার সংকল্প টলে না গেলে, আশা করি, অল্পদিনের মধ্যেই দশ খণ্ড নাটকবিচার-গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারবো।

এই অবকাশে নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থমালার পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা পাঠকদের সামনে রাখতে চাই। যে গ্রন্থখানি আমাকে এই পরিকল্পনা গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল সেই বিখ্যাত গ্রন্থখানির নাম সেক্সপীয়ারীয়ান ট্র্যাজেডি। মনীষী সমালোচক এ. সি. ব্রাডলে রচিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করার পরে আমার 'মতো' বানের মনে এই জাতীয় সমালোচনা গ্রন্থ লেখার সাধ জেগেছিল—নাট্যতত্ত্বের আলোচনা সহযোগে নাটক বিচার করার ইচ্ছা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কি বাংলা নাটকের ইতিহাসেও নাটকের সমালোচনা চিন্তার সম্পন্ন তথা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অবকাশ পায় না। ইতিহাস-লেখকরা স্থানা-ভাবেই আলোচনাকে যথেষ্ট বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারেন না।" নাট্যসমালোচক ব্রাডলে হ্যামলেট সমালোচনার জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, কিন্তু কোন ইতিহাস লেখকের পক্ষে একমাত্র হ্যামলেটের জন্য

এতখানি স্থান ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই একই কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক বা বাংলা নাটকের ইতিহাস লেখক কোন একখানি নাটকের জন্য পাঁচ ছয় ফর্মা ব্যয় বরাদ্দ করতে পারেননি এবং পারেননি বলেই তাঁদের নাটক-সমালোচনা তত্ত্বভিত্তিক পরিপাটি সমালোচনায় পরিণত হয়নি। এই তত্ত্বভিত্তিক পরিপাটি সমালোচনায় অভাব দূর করবার জন্যই, আমি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম এবং তারই ফল—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থমালা। এই নামের মধ্যেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। "নাট্যসাহিত্যের আলোচনা" অংশ দ্বারা সূচিত হচ্ছে এই যে, এই গ্রন্থে নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং "নাটকবিচার" অংশ সূচিত করছে এই যে আলোচনা দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের মানদণ্ডে নাটকের গুণাগুণ বিচার করা হয়েছে। মোট কথা এই যে, এই গ্রন্থগুলিতে একাধারে, নাট্যতত্ত্ব ও নাটক সমালোচনা-সূত্র এবং বিশেষ নাটকে সেই সূত্রের প্রয়োগ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই হিসাবে গ্রন্থগুলি বাংলা নাট্য সমালোচনায় একটি নতুন পর্যায়। কথাটি যে মিথ্যা নয়, দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বিখ্যাত অধ্যাপক-সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই বুঝতে পারা যাবে। তিনি লিখেছিলেন—

—"সাধারণতঃ নাট্যসাহিত্য বিষয়ে যে কয়েকটি সমালোচনা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেক লেখক বা নাটক সম্বন্ধে কিছুসাধারণ, ভাসা-ভাসা রকমের উক্তিতেই সীমাবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে যুক্তিশৃঙ্খলার রীতিটি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারম্পর্য সূত্রটি সব সময় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে না। সাধন কুমার এইরূপ অর্দ্ধস্ফুট সাধারণ মন্তব্যে সন্তুষ্ট নহেন! তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীদের প্রত্যেকটি যুক্তি যাচাই করিয়া লইয়াছেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পিছনে যে স্বতঃ স্বীকৃতি স্পষ্ট উল্লিখিত না হইয়াও লেখকের যুক্তিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন।......শ্লথশিথিল পূর্বসংস্কার প্রচলিত মতবাদের নির্বিচার অনুসরণ মধ্যপথে চিন্তাবিরতির উপভোগ্য আরাম তাঁহার তীক্ষ্ণ খোঁচায় বিব্রত হইয়া অর্দ্ধসুষুপ্তির আবেশ

হইতে রূঢ়ভাবে জাগরিত হইয়াছে—রসস্বাদনের বদ্ধ জলাশয়ে তরঙ্গ সঞ্চার হইয়াছে।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিলেম এবং বাংলা নাটক সমালোচনার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ দাবী আমি করব না যে আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত চিরকাল অভ্রান্ত এবং অকাট্য হয়ে থাকবে। তবে একটা দাবী করলে নিশ্চয়ই অন্যায় স্পর্ধা প্রকাশ করা হবে না যে বাংলা নাটক সমালোচেনাকে নাট্যতত্ত্বের পটভূমিকায় স্থাপন করার চেষ্টা এর আগে লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যায়নি এবং নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থমালা প্রথম এই চেষ্টা করেছে—আর সেই চেষ্টার ফলেই বাংলা নাটকের পঠন-পাঠনের মান ইংরেজি-নাটকের পঠন-পাঠনের সমপর্যায়ে পৌঁচেছে। এই কারণেও এই গ্রন্থমালার পুনঃপ্রকাশ আমার কাছে, আশা করি নাটকের অধ্যাপকদের কাছে এবং নাট্য রসিকদের কাছেও, বহুকাম্য।

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ আমার কামনা পূরণ করতে এগিয়ে এসে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থমালা যাঁরা আগে প্রকাশ করেছেন এবং যিনি নতুন পরিকল্পনায় এখন প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'ক্ষীরোদা স্মরণ'
৪৯ নং শরৎ বসু রোড
সুভাষনগর
কলিকাতা—২৮

নিবেদন
ইতি
সাধনকুমার ভট্টাচার্য

॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥

* প্রফুল্ল
* জনা

নীলদর্পণ

স্রষ্টাকে না জানিলে সৃষ্টির 'কি ও কেন'র ইতিহাস জানা যায় না এবং স্রষ্টাকে জানিতে হইলে স্রষ্টার পরিবেশ—(race, milieu and moment) অবশ্যই জানা দরকার,—এ-সকল কথা লইয়া আজ আর তেমন বিসংবাদ নাই, মনস্বী কবি টি. এস. এলিয়ট মহাশয় পর্য্যন্ত অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন "The great poet in writing himself, writes his own time," অর্থাৎ, বড় কবিমাত্রেই আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার নিজের যুগকেই প্রকাশ করেন। এই সূত্রটিতে যে শুধু বড় কবিরাই বাঁধা তাহা নহে, আমার মনে হয়—শিল্পী যত ছোটই হউন আর যত বড়ই হউন, সৃষ্টি করিতে গিয়া নিজের যুগকেই—অর্থাৎ নিজের যুগের কোন-না-কোন প্রবণতাকেই—বিশেষতঃ কোন-না-কোন ভাব ও রূপকেই, প্রকাশ করিয়া থাকেন ; আর ভাব ও রূপকে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজেকেই—অর্থাৎ ব্যক্তি-মানসের **অনুভব-শক্তিকে, কল্পনা-শক্তিকে** এবং **ভাবনা-শক্তিকেই** প্রকাশ করেন। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—শুধু জগৎ সৃষ্টিতেই নহে, শিল্প-সৃষ্টিতেও সত্য। তবে ছোট ও বড় প্রতিভার পার্থক্য এখানেই যে বড়রা যে-পরিমাণে সমগ্র ইতিহাসকে আপনার মধ্যে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারেন, যে-পরিমাণে ভাব ও রূপকে বোধে ও বোধিতে গ্রহণ করিতে তথা প্রকাশ করিতে পারেন, ছোটরা তাহা পারেন না। এক কবির সহিত অন্য কবির পার্থক্য,—**ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের** ভাষা ধার করিয়া বলা যাক্—more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness-এর পার্থক্য, "a greater knowledge of human nature"-এর পার্থক্য এবং "a more comprehensive soul"-এর পার্থক্য। এই অধিকতর সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা ও ক্রান্তদর্শিতা

লইয়া শিল্পীরা সমাজের দশজনের একজন রূপেই জীবন যাপন করেন এবং নিজের পরিবেশের সহিত নানাভাবে অভিযোজন করিতে চেষ্টা করেন। শক্তির তারতম্যের জন্য অভিযোজনের রূপে ও সাফল্যে পার্থক্য দেখা দেয়। কারণ, সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত নিজেকেই সৃষ্টি······আত্মসংস্কৃতি। **কবি এলিয়টের** মন্তব্যটি—"What every poet starts from is his own emotions" (Shakespeare and the Stoicism of Senecca—প্রবন্ধে) এই কথাটিকেই অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। বাস্তবিক, যে কবি-চিত্তে সহৃদয়তার—তন্ময়ীভবনযোগ্যতার মাত্রা কম, সেই কবির পক্ষে তীব্র ও সূক্ষ্ম অনুভূতির রূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না, তেমনি যে কবির কল্পনা-শক্তির জোর কম, তাঁহার কাব্যে কল্পনা-দৈন্য অবশ্যম্ভাবী এবং যাঁহার ক্রান্তদর্শিতা ও মনস্বিতা যথেষ্ট মাত্রায় নাই, তাঁহার সৃষ্টিতে মনন-মহিমার অভাব অবশ্যই দেখা দেয়। এই হিসাবে প্রত্যেক সৃষ্টি, কবি-মানসের শক্তি-সম্ভাবনারই (Potentiality) ব্যক্ত রূপ—সামাজিক পরিবেশের ভাব ও রূপের মাধ্যমে কবির মানসিক শক্তির উপলব্ধি—স্বসংবিৎ-সাক্ষাৎকার; কবির আপন পরিবেশের সহিত শৈল্পিক (aesthetic) অভিযোজন।

অবশ্য, কবি-মানস এবং কবির পরিবেশ কোনটিই অলৌকিক বা অনৈতিহাসিক নহে। উভয়েই ইতিহাসের বিবর্ত-বিলাসেরই বিশেষ বিশেষ রূপ। বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের দেহ-মনে **ইতিহাসের** যে রূপ তাহারই নাম **'ব্যক্তি-মানস'**, আর বাহিরে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বা বিধি ব্যবস্থার মধ্যে ইতিহাসের যে রূপ, তাহারই নাম **"পরিবেশ"**। **এক ইতিহাসই ব্যক্তি-দেহে 'ব্যক্তি-মানস'-রূপে এবং প্রকৃতিতে ও সমাজ-দেহে 'পরিবেশ'-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।** অজৈব জগতের এবং জৈব জগতের বিবর্তন একই প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারা—এক ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত। **বিশ্বপ্রকৃতি, মনুষ্য-সমাজ, ব্যক্তি**—একই ইতিহাসের বিশেষ রূপ। স্থিতিশীল রূপে বিশ্বে গতির এক নিত্যপ্রবাহ চলিয়াছে। **মনীষী বের্গসঁ** মহাশয়ের

ভাষায় বলা যাক্—"Duration is the continuous progress of the past which gnaws into the future and which swells as it advances" এবং—"The past in its entirety is prolonged into the present and abides there actual and acting." সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। বিশ্বপ্রকৃতিতেই শুধু 'অতীত' 'বর্তমান' রূপে ব্যক্ত হইয়া 'ভবিষ্যৎ' সৃষ্টি করিতেছে না, মনুষ্য-সমাজে এবং ব্যক্তি-মানসেও এই নিত্য লীলা চলিয়াছে—'অতীত' 'বর্তমানে' পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে—'অকারণ-অবারণ' চলার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। তবে তাই বলিয়া উহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, একের সহিত অপরের ওতপ্রোত যোগ বর্তমান। বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্য-সমাজের আধার, মনুষ্য-সমাজ আবার ব্যক্তির আধার, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বুঝাপড়া করিতে করিতে মনুষ্য-সমাজের বিবর্তন, সমাজের জ্ঞান-প্রেমও কর্মের ক্রমবিকাশ; ব্যক্তি-মানস মনুষ্য-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং যে-সকল ব্যষ্টির সমবায়ে সমাজের সামষ্টিক সত্তা উহাদেরই অনেকের মধ্যে অন্যতম। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরে 'জন্য-জনক'-সম্পর্কে সম্পর্কিত। সমাজ যেমন ব্যক্তি-মানসের জনক, ব্যক্তিও তেমনি সমাজের অগ্রগতির নিমিত্ত কারণ বা জনক। অন্যভাবে বলা যায়—সমাজ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই নিজের সম্ভাবনাকে বা প্রবণতাকে ব্যক্ত করিতে করিতে অগ্রসর হয়। **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই অর্থেই সত্য যে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সমাজের প্রাক্তন সংস্কারের সহিত অতীত জ্ঞান, অনুভব-কর্মের সহিত প্রতিক্ষণের বর্তমানে'র অবিরাম বুঝাপড়া চলিয়াছে এবং তাহারই ফলে—ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান-প্রেম-কর্মের নূতন নূতন ধারণা-প্রেরণা সৃষ্টি হইতেছে।** ইতিহাসের ধারা ব্যক্তির ভিতরে ভিতরে অতীত জ্ঞান-প্রেম-কর্মের রূপে থাকিয়া এবং বাহিরে পরিবেশ-রূপে বিরাজ করিয়া, ব্যক্তির মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহারই নাম—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

এই কারণেই ব্যক্তি-মানসের পক্ষে সমাজ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নহে।

ব্যক্তির স্মৃতি—সমাজের স্মৃতি এবং পরিবেশজনিত প্রত্যয় দিয়া গঠিত, ব্যক্তির মনন—সমাজের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তথা তত্ত্ব ও তথ্যকে নৈয়ায়িক সঙ্গতির মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা, ব্যক্তির বিশেষ বাসনা-কামনা —সমাজের বাসনা-কামনারই অনুসরণ অথবা পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন। একথাটি অবশ্যই মনে রাখা দরকার—"Doubtless we think with only a small part of our past, but it is with our entire past...... that we desire, will and act." আমরা যে একটি সমগ্র অতীতের পরিণতি (end product)—প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ-মনের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ (জ্ঞান-অনুভব ও কর্মের বৈশিষ্ট্য), ব্যক্তি যে-সমাজের অন্তর্ভুক্ত সেই সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি এক অর্থে যেমন আধুনিক, অন্য অর্থে তেমনি প্রাচীনও বটে। ব্যক্তির অন্তরে বাহিরে ইতিহাস। ইতিহাসের দ্বারা সৃষ্ট হইতে হইতেই ব্যক্তি ইতিহাসের সহিত অভিযোজন করিতে করিতে চলে। শিল্প-সংস্কৃতি ব্যক্তি-মানসের এই অভিযোজনেরই বিশেষ রূপ। সুতরাং স্রষ্টাকে জানিতে হইলে প্রথমেই স্রষ্টার 'পরিবেশ'কে জানিয়া লওয়া দরকার।

এই কারণেই আমাদের প্রথম আলোচ্য—**দীনবন্ধুর পরিবেশটি**

দীনবন্ধুর পরিবেশ

দীনবন্ধুর পরিবেশ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,—১৮৩০ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাসটুকু; কিন্তু এই ইতিহাসটুকুর পশ্চাতে আছে দীনবন্ধু যে বাঙালী জাতির একজন ব্যক্তি, সেই জাতির বা সমাজের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস—জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাটি। বের্গসঁর কথাটি মনে রাখিতে হইবে—"The past in its entirety is prolonged into the present and abides there actual and acting"। যদিও সমগ্র অতীত ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই, তবু মোটামুটিভাবে বাঙালীর ইতিহাসের বিবর্ত্তন

ধারাটি নির্দ্দেশ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, দীনবন্ধুর মধ্যে বাংলার সমগ্র অতীত সংস্কার-রূপে আহৃত এবং দীনবন্ধুর ভাষা-ভাব-ভাবনা বাঙালীর ইতিহাসে বিশেষ যুগের সহিত যুক্ত। অতএব বাংলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই দীনবন্ধুর অন্তর ও বাহিরকে জানিতে হইবে।

বাংলার ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারি। এক—বৌদ্ধ-হিন্দু বা হিন্দুযুগ, দুই—মুসলমান যুগ (পাঠান+মোগল যুগ). তিন—ইংরেজ-যুগ। হিন্দু-যুগেই বাঙালী-সংস্কৃতি নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়—বাংলা ভাষা এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়। 'বৌদ্ধ-গান ও দোহা'র মধ্যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগের যে-নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতেই বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরটি প্রকাশিত। তারপর, সেনরাজগণের আমলে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হয়। বল্লাল সেন যে-সামাজিক কাঠামো তৈয়ারী করেন—তাহা আজও একেবারে লোপ পায় নাই। যে-বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-ধারায় পরবর্ত্তী বাঙলা আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইয়াছে, সেনরাজগণের আমলেই সে-ধারা উৎস হইতে বাহির হয়। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে এই ধারারই কলনাদিনী মূর্ত্তি দেখা যায়। (জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর অক্ষম অনুসরণ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কবির রচনায়।)

মুসলমান-আক্রমণে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া যায় এবং হিন্দু-সমাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। যদিও একদিনে সমগ্র দেশ মুসলমান অধিকারে যায় নাই, তবু মুসলমান-যুগের ব্যাপ্তি বলিতে সংক্ষেপে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত—এই ছয় শত বৎসর বুঝি। তিন শত বৎসর পাঠান-শাসন এবং তিন শত বৎসর মোগল-শাসন—মোট ছয় শত বৎসরের মুসলমান শাসনে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একভাবে থাকিলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আন্দোলন বন্ধ থাকেনি। এই যুগের ইতিহাস, একদিকে বিজয়ী জাতির দৃশ্য-অদৃশ্য চাপের সহিত বুঝাপড়া

করবার ইতিহাস, অন্যদিকে সমাজের আভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষার এবং জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার ও তথা আত্মপ্রকাশের চেষ্টার ইতিহাস।

ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দু-সমাজ মুসলমান-শাসনের সহিত বুঝাপড়া করিতে গিয়া ভিতরে ভিতরে অজ্ঞাতসারেই দেহ-মনে পরিবর্তিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ—নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু এবং উচ্চশ্রেণীর কেহ কেহ ভয়ে বা লোভের বশে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে—ফলে বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা কমিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ—মুসলমান-সরকারের অধীনে চাকরী করিয়া বহু হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন—। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলেই দেখা যায়—উজীর—গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খান), হোসেনের গৃহ-বৈদ্য=মুকুন্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী—কেশব ছত্রী, টাকশালের অধ্যক্ষ—অনুপ, সেনাধ্যক্ষ গৌর মল্লিক। ইহার ফলে একদিকে অবশ্যই গোঁড়াদের গোঁড়ামিতে ধাক্কা লাগিতে থাকে এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সমাজ শাসনের বিবিধ ব্যবস্থা কঠোর করিতে থাকেন কিন্তু অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে, বাস্তব অবস্থার চাপে সমাজের সহিষ্ণুতা না বাড়িয়া যায় না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে—(১৪৯৩-১৫১৯) বাঙলার সমাজ-জীবনে যেন একটা নবজীবনের জোয়ার আসে। গৌরচন্দ্রের আকর্ষণেই এই জোয়ার সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি খুবই লক্ষণীয়। হিন্দু-সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করিয়া সমাজকে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও যেন বলা দরকার এবং তাহা এই যে—শ্রীচৈতন্যই প্রথম উপলব্ধি করেন যে হিন্দু-সমাজকে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, প্রচলিত ধর্মের সংস্কার করা অপরিহার্য, ধর্মকে গণতন্ত্রায়িত না করিতে পারিলে হিন্দু-সমাজের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। চণ্ডাল ও দ্বিজকে এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন বুদ্ধের পরে —এই প্রথম। (চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ—এই আন্দোলনেরই ঘোষণা।)

হোসেন শাহের সময়ে বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্মের এক প্রবল বন্যা আসে। এই বন্যার পলিমাটিতেই বাংলা-সাহিত্যে, পদাবলী-সাহিত্যের এবং চরিত-সাহিত্যের সোনার ফসল ফলিয়া উঠে। অবশ্য তাহা বলিয়া বাংলার লৌকিক ধর্মের ধারাটি শুকাইয়া যায় না। ধর্মমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলের ধারা সমান্তরাল-ভাবেই বহে। হোসেন শাহের সমসাময়িক বাঙালী কবিদের মধ্যে—মালাধর বসু ও যশোরাজ খান ছাড়াও, বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্ত প্রভৃতিকে দেখা যায়। মোট কথা—এই সময়ে বাঙালী-জীবনে এবং বাংলা-সাহিত্যে একটা জোয়ার আসে। সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয়-সংস্কৃতির-বাহন বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতিতেও লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন আসে।। 'তদ্ভব-তৎসম দেশী' শব্দের পাশে আরবী-ফারসী শব্দের অধিকতর আমদানী হইতে থাকে [কারণ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন মুসলিম অনুশাসিত বলিয়াই, ব্যবহারিক জীবনে নানাদিকে আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন হয়], ভাষার সূক্ষ্ম ও পরিবর্ত্তনশীল হৃদয়-ভাব এবং জটিলতর দার্শনিক মনন প্রকাশের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলা-কাব্য-ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি এই সময়েই (ষোড়শ শতাব্দীতেই) অনেকটা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাংলার জন-সমষ্টিতে এবং ভাষায় মুসলমানের ছাপ পড়িলেও, হিন্দু-মুসলমান এক জাতি-দেহে লীন হয় না। জাতীয় অভিমানের কেন্দ্র-বৃন্তটি সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান জাতি-হিসাবে আসলে পৃথক থাকিয়া যায়। শক-হূণদল যে-ভাবে আর্য্য-সংস্কৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, পাঠান-মোগল সেভাবে মিশিতে পারে না, ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাস দিক পরিবর্ত্তন না করিলে দুই জাতির দ্বন্দ্ব কিভাবে সমাধানের পথে অগ্রসর হইত কে জানে! এই সমাধানের পথে বাধা আসে—পলাশী-প্রান্তরে ইংরেজ-বণিক শক্তির কাছে নবাব-বাহিনীর পরাজয়ে।

পলাশীতে যে-পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তাহার আরম্ভ হয়, বলা চলে, সপ্তদশ শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে মোগল শাসনের

ইতিহাস বটে, কিন্তু এই শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে তথা সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই শতাব্দীতেই আধুনিক বাংলার গোড়া পত্তন হয়—একথা বলিলে অন্যায় বলা হয় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—In one word, during the first century of Mugal rule (1575-1675) the outer world came to Bengal and Bengal went out of herself to the outer world, and the economic, social and cultural .changes that grew out of this mingling of peoples mark a most important and distinct stage in the evolution of modern Bengal.—(History of Bengal 11.)। বহির্বাণিজ্যের সূত্রে বাংলাদেশ দেশ-বিদেশের সহিত যুক্ত হয়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী নানা দেশীয় বণিকের আবির্ভাবের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সংস্থায় বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটে। এক কথায়, ইউরোপের চাহিদার টানে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে জোয়ার উপস্থিত হয়। আমরা দেখি—মুসলমান আমলের প্রথম দিকে বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্য, মুষ্টিমেয় চীনদেশীয়, মালয় দেশীয় আরবীয় এবং পর্তুগীজ বণিক-সম্প্রদায়ের (পর্তুগীজরা বৎসরে বা দুই বৎসরে একবার বাংলার মাল-পত্তর কিনিতে আসিত) মধ্য এবং উড়িষ্যা ও তেলেগু-প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে নানাদেশীয় বণিকের প্রতি-যোগিতায়, বাংলায় বানের জলের মত রৌপ্য প্রবেশ করিতে থাকে। প্রথম পর্বে চলে—সোরার (Salt petre) ব্যবসায়। ইউরোপীয় কামান-বন্দুকের খোরাক— বারুদের জন্য বিহারের লালগঞ্জের সোরা অবশ্যই চাই। বাংলার মধ্য দিয়া এই সোরা রপ্তানি হইতে থাকে। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় রেশম, কার্পাসবস্ত্র ও * নীলের চাহিদা। বাংলার বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বুঝাইতে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। (১৬৮০-১৬৮৩) মোট চার বৎসরে একমাত্র ইংরেজ কোম্পানী দুইলক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রৌপ্য আমদানী করে।

বাঙালীর জীবনধারায় বৈদেশিক প্রভাব

নীল ব্যবসায়

আরো পুরাতন ব্যবসায়ী ওলন্দাজরা নিশ্চয়ই পিছাইয়া থাকিবে না। তাহারাও বার্ষিক ৮০ লক্ষ টাকা বাংলার বাজারে ছড়াইয়া দেয়। **বার্ণিয়েরের** (১৬৬৩ খ্রীঃ) যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—বাংলায় শিল্প-কারখানার প্রথম পর্ব দেখা দিয়াছে—এবং কারখানার শ্রমিক-শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। বার্ণিয়ের লিখিয়াছেন—"The Dutch have sometimes seven or eight hundred natives employed in their silk factory at Kashimbazar, wherein like manner the English and other merchants employ a proportionate number......... I have been sometimes amazed at the vast quantity of Cotton goods which the Hollanders alone export." **ট্যাভার্ণিয়েরও** একই রূপ মন্তব্য করিয়াছেন। একদিকে রেশম-কার্পাসের কারখানা, অন্যদিকে নীল-কুঠি। ঐতিহাসিক সরকার অবস্থাটি বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—By their chain of agents at every mart, by their system of advances (dadan) to the workmen, by their setting up of workshops for Indian labourers in their factores (where they could work under European supervision) and by their bringing out from England dyers and 'twist' throwers who taught the indegenous artisans better methods—they raised Bengal industrial production to a higher level of quality, besides immensely increasing its quantity" এইভাবে বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের প্রচুর অর্থাগম ঘটে। অবশ্য টাকাটা উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের হাতেই পড়ে এবং বিলাস-ব্যসনের ভাগ্য তাঁহাদেরই একচেটিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—তাহার প্রস্তুতি এখান হইতেই আরম্ভ হয়।

বাংলার রেশম ও তুলা শিল্প

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ইংরেজ বণিক কোম্পানী সিরাজ-বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কার্যতঃ দেশের রাজা হইয়া বসে, তাহারা প্রথমে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার উপকূলে হরিহরপুরে এবং ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠি তথা পদস্থাপনা করিয়া ক্রমে হুগলীতে (১৬৪০), কাশিমবাজারে (১৬৫৭) এবং কলিকাতায় (১৬৯০) কুঠি বা বাণিজ্য দুর্গ গড়িয়া তুলে। ইহারা শুধু যে নাগরিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে, কালক্রমে ষড়যন্ত্র ঘাঁটি এবং সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

ইংরেজের পদক্ষেপ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আরো শিকড় মেলিয়া বসে এবং দেশের রাজনীতি অর্থনীতির উপর জোরালো প্রভাব বিস্তার করে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা (Surman Embassy) বাদশাহ ফারুকশিয়ারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের আদেশ আদায় করে, ফলে ইংরেজরা বাংলার বুকে আরো চাপিয়া বসিবার সুযোগ লাভ করে। কলিকাতা দেখিতে দেখিতে বৃহৎ একটি বাণিজ্যের কেন্দ্রে ও নগরে পরিণত হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জনসংখ্যা—১৫০০০, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা বাড়িয়া এক লক্ষ হয়। এক কথায় দেশীয় ও বিদেশী বণিকগোষ্ঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ প্রবল এবং অনুক্ষেপণীয় শক্তি হইয়া দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক অবস্থার ইহা এক পিঠ। অন্য পিঠে আছে **মুর্শিদকুলি খাঁর** ভূমি রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা—**"জমা কামেল তুমারী"** (১৭২২)। প্রথমতঃ—তিনি জায়গীর প্রথা রহিত করিয়া জায়গীরগুলি 'খালসা'য় পরিণত করেন এবং দ্বিতীয়তঃ—**ইজারা** প্রথা প্রবর্তন করেন (**মালজামিনি প্রথা**)।

বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় হিন্দু অধিকার

টোডরমল যে **'জবতি'** প্রথা প্রবর্তন করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থা চালু করেন, বাংলায় তাহা অপ্রচলিত বলিয়া, তিনি **'ইজারা'** প্রথা চালু করেন। প্রাচীন জমিদারগণ এই সকল ইজারাদারের অধীন হইয়া পড়েন এবং কালক্রমে ইহারাই রাজা-মহারাজা উপাধি ধারণ করিয়া জমিদার সাজিয়া বসেন।

আশ্চর্য্যের কথা হইলেও সত্য—মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার ভূমি-সম্পত্তি কার্য্যতঃ হিন্দু রাজা-মহারাজাদের হাতে তুলিয়া দেন। **ঐতিহাসিক সলিমুল্লার** কথা সত্য হইলে, ঐতিহাসিকের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতে হইবে—Murshid Quli Khan employed none but Bengali Hindus in the collection of revenues, because they were most easily compelled by punishment to discover their malpractices ..." ঐতিহাসিক সরকারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"He thus created a new landed aristocracy in Bengal whose position was confirmed and made hereditary by Lord Cornwallis। দেখা যাইতেছে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার ভূমি সম্পদ কার্য্যতঃ হিন্দু জমিদারগণের হস্তে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ইংরেজ বণিক ও দেশীয় বণিকগণের (জগৎশেঠ-উমিচাঁদ প্রভৃতি) হস্তে ন্যস্ত। নবাবের আসল শক্তি—জমিদারের ও বণিকের সম্পদের মধ্যে নিহিত থাকায়, জমিদার বণিকের অসহযোগে নবাবের পতন অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করে। ইংরেজ কার্য্যতঃ দেশের কর্ত্তা হইয়া উঠে। "ক্লাইভের গর্দ্দভ"—হইতে যে গবর্ণমেন্ট তাহাকে দিয়া শাসন-শোষণ চলে না। ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ-সিংহ দেশের বুকে বেশী করিয়া থাবা বসাইতে থাকে। ১৭৬৫ খ্রীঃ **দেওয়ানী** এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে **ফৌজদারী** বিচার কার্য্য হস্তগত করিয়া ইংরেজ বণিক কোম্পানী শাসন শোষণের অবাধ সুযোগ করিয়া লয়। এমনিভাবে ধীরে ধীরে দেশে কোম্পানী রাজত্ব কায়েম হয়—বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদের মেয়াদ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়—এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে—ভারতবর্ষে ইংলণ্ডরাজের সার্বভৌম অধিকার ঘোষিত হয়—অবশ্য আবার বিশ বছরের জন্য কোম্পানীর উপরই শাসনভার ন্যস্ত হয়।

পলাশীর পরবর্ত্তী অবস্থা

এই সনদে (১৮১৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং ইংলণ্ডরাজের যে-কোন প্রজা ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার

পায়—অর্থাৎ সকলেরই লুঠের অধিকার জন্মায়। ইহার পর, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ (১৮৩৫ খ্রীঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন), ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ (১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ) এবং ***১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন** দ্বারা ইংলণ্ডরাজ ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলেন এবং সুযোগ পাইয়া তদনুচর ইংরেজরা অবাধে শাসন ও শোষণ চালাইয়া যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মুসলমান শাসনের অবসানের পর ইংরেজ অধিকারের প্রতিষ্ঠাকে—"beginning...... of a glorious dawn (সরকার) বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এবং truly Renaissance wider and deeper······ বলিয়া উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করিয়াছেন। এ যে একটা যুগ-সন্ধি এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু সকলেরই পক্ষে যে ইহা রেনেসাঁস তাহা বলা যায় না। এ-বিষয়ে হিন্দু ঐতিহাসিক এবং মুসলমান ঐতিহাসিক একমত একথা বলা যায় কি? শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার প্রথমটি এই যে—দেশ "theocratic" (শারিয়তী শাসন?) হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মুক্তি হিন্দুর কাছে আদরণীয় হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের কাছে অশ্রদ্ধেয়; কারণ শারিয়তী শাসন মুসলমানের কাছে অসহ্য ও অপ্রীতিকর হইতে পারে না। মুসলমানের বিষদাঁত ভাঙিয়া যাওয়ায় হিন্দুর উল্লাস হইতে পারে, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। তবে অবশ্য যদি এই কথার উপর জোর দেওয়া হয় যে. পলাশী যুদ্ধের বিশ বছরের মধ্যে—[১৭৫৭—১৭৭৬ (ওয়ারেন হেষ্টিংস্)] জাতির দেহে নব জীবনের সাড়া জাগে—জাতির ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে আরম্ভ করে এবং ইংরেজের সংস্পর্শে Education, literature, society, religion man's handiwork and political life, all felt the revivifying touch of the new impetus from the west" তাহা হইলে বিশেষ আপত্তি করিবার কিছুই নাই। একথা মিথ্যা নহে যে ইংরেজী-শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবাসী ইউরোপের

ইংরেজ অধিকারের ফলাফল ও তৎপ্রতি ঐতিহাসিকের মনোভাব

জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্যের রাজ্যে ভ্রমণ করিবার ছাড়পত্র পায়, তথা **চিত্তোৎকর্ষ** লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ পায়। কিন্তু একথাও অতি সত্য যে ইংরেজের শাসন-শোষণের তলে মাথা পাতিয়া দিয়াই এই ছাড়পত্র পাইতে হয়। একদিকে ইংরেজের বাণিজ্য-দুর্গ বা রাজধানী কলিকাতায় **নাগরিক সভ্যতা**—বিশেষতঃ ইংরেজ-সভ্যতার ভাল-মন্দ উভয়ই সমাজ-দেহে সংক্রামিত হইতে থাকে অন্য-দিকে **ইংরেজের বাণিজ্যের বেড়াজাল সারা দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে।** আরো নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে, পঞ্চম বাহিনী পাদ্রীদের ধর্মান্তরিত-করণের স্থূল-সূক্ষ্ম, অভিযান, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া যীশু-মাহাত্ম্য প্রচার—পৌত্তলিক উপাসনার প্রতি কটুক্তি-বর্ষণ, ইউরোপীয় সংস্কৃতির মন্দের দিকটির—অর্থাৎ ম-কার সাধনার প্রশ্রয়—এমনি নানাবিধ প্রক্রিয়ায়, সমাজের সংহতি ও মেরুদণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে। বাবু ও "ইয়ং বেঙ্গল"-শ্রেণীর জন্ম এই প্রক্রিয়ারই ফল। আবার অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সকলকেই নীলচাষের ও ব্যবসায়ের অধিকার দিলে (১৭৭৯), শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ নীলের ব্যবসায়ে মাতিয়া উঠে। নীল কুঠিতে দেশ ছাইয়া যায়। প্রথমতঃ—দেশীয় জমিদার-জোতদারদের প্রলুব্ধ করিয়া জমিতে নীলের চাষ করানো হয়, আর কুঠিতে কুঠিতে রঞ্জন দ্রব্য নিষ্কাষিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা প্রজাদের জমিদারদের কবলে সঁপিয়া দেওয়া হইলে—প্রজারা 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর' অবস্থায় দিন কাটাইতে থাকে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের 'গভর্নর জেনারেল ইন্ কাউন্সিল'-এর সার্কুলারে যে যে অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতেই অবস্থাটা অনুমান করা যায়—অভিযোগ—(১) হিংসামূলক কার্য্যকলাপ (acts of violence), (২) অবৈধ গ্রেপ্তার ও কয়েদ রাখা—(illegal detention)।

নীলকর-অত্যাচার

কিন্তু সার্কুলারে কোন ফল হয় না। সাদা চামড়ার শত খুন মাপ। নীল-করদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলে। জমিদারদের মুখাপেক্ষী থাকিবার ধৈর্য্যটুকু

লোপ পাইয়া যায়। অনেকেই জমিদারি পত্তনি লইতে আরম্ভ করে (১৮৩৩ সনদের পরে)। বেড়াজালের সব ফাঁক বন্ধ। প্রজাদের ভিটে-মাটি, জাতি, সাহেবদের খেয়াল খুশীর ব্যাপারে পরিণত হয়। দেশীয় দুর্বৃত্তদের হাতে রাখিয়া নীলকর সাহেবরা চরম দৌরাত্ম্য ও মামলা করে। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটদের অনেকেই শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। মদ-মেম ও মুদ্রার বশে বিচার নামে যাহা করেন তাহাতে বিচারের লেশও থাকে না। সাদা-চোখে সবকিছুই সাদা দেখেন—সাহেব মাত্রই সাচ্চা, আর 'নেটিভ' মাত্রই মিথ্যাবাদী। 'সন্ত্রাসের রাজা' লাটসাহেব হ্যালিডের আমলে (১৮৫৪-৫৮) নীল-বাঁদরে সোনার বাংলা একেবারে ছারেখারে দিতেবসে। ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট (১৮৬০), 'স্যার এসলি ইডেনের মিনিটস অফ এভিডেন্স' গ্রান্টের বিবরণী প্রভৃতি নীলকরদের কুকীর্ত্তির ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে দেখা যায়—নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, ভিটেমাটি-ছাড়া-করা, কুটির-বদ্ধ কক্ষে কয়েদ রাখা, দাদন লইতে চাষীকে বাধ্য করা—চামড়া দিয়া মোড়া বেতের লাঠি দিয়া (শ্যামচাঁদ) বেদম প্রহার—সাহেবদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারাই মুখ ফুটিয়া দুই একটা প্রতিবাদের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য—"ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই তাহা দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্ব স্ব ন্যায্য অধিকার দাবি করিতে গিয়া বহু প্রজা ভিটে-মাটি সহ উচ্ছন্ন এবং তাহাদের সমর্থক বহু বদ্ধিষ্ণু গ্রামবাসী অকারণে কুঠিতে কয়েদ হইয়া বিপন্ন হয়। ··· স্থানীয় ইংরেজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষ এবং অন্যান্য কারণে কুঠিয়ালদেরই পক্ষ অবলম্বন করাতে ন্যায়বিচার হয় নাই। ফলে নীলকরদের পীড়ন অবাধে চলিতে থাকে।" *[নীলদর্পণ-নাটকে দীনবন্ধু নীলকরদের এই অত্যাচারের এবং দেশবাসীর নিরুপায় প্রতিরোধের রূপটি উপস্থাপিত করিয়াছেন।]

উল্লিখিত রাজ-অর্থনৈতিক পরিবেশটি সম্মুখে রাখিয়া এইবার আমরা

দীনবন্ধুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির বিশেষ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে পারি। তবে পরিচয় দেওয়ার আগে সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল। রাজনীতি-অর্থনীতিকে বলা হয়—সংস্কৃতির ভিত্তিতল (basis), এই ভিত্তির উপর সংস্কৃতির (নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শৈল্পিক) প্রাসাদ গড়িয়া উঠে, ভিত্তির পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে প্রাসাদ-কক্ষেও যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেই (এই কার্য্যকারণ-যোগটুকু) দেখা যায়। ইংরেজের হাতে দেশের রাজনৈতিক অধিকার চলিয়া যাওয়ায় দেশের অর্থনীতি যে পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু উহারই ফলে দেশের নৈতিক বিধি-নিষেধ, সামাজিক বিধি-বিধান, শিল্প সংস্কৃতি নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত হয় ইহাও কম প্রত্যক্ষ সত্য নহে। [দুঃখের বিষয়—অনেকে এ-বিষয়ে জাগিয়া ঘুমান এবং ঘুমাইবার ভাণ করিয়াই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন।] প্রথমতঃ—**সামাজিক অবস্থার** কথাই ধরা যাক্।

পলাশীতে সামরিক বিজয়ের পরে, ইংরেজ সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্য নানা ভাবে অভিযান চালাইতে থাকে। ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক চেতনার দিক দিয়া অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে,—নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা যাহাদের উপাসনায় স্থান পায় নাই তাহারা সভ্যতার অনেক নিম্নস্তরে আছে, যে-ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখায় তাহা ধর্মই নহে, শিল্পে-সাহিত্যেও ভারত ইউরোপের হাটুর কাছে পড়িয়া আছে—এই ধরনের প্রচারের মারফত রীতিমত মিশনারী অভিযান চলিতে থাকে। মুসলমান-আমলে সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণীর অনেকে যেমন মুসলমান ধর্ম—অর্থাৎ রাজধর্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে, তেমনি ইংরেজ-আমলেও ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। পাদ্রীবাহিনী ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু-সমাজের সংহতি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, হিন্দু-অভিযানের কেন্দ্রস্থলে আঘাত করিতে থাকে। * [**পাদ্রীরা চিরকালই পঞ্চম বাহিনীর**

কাজ করিয়া আসিয়াছে, আজও করিয়া চলিয়াছে। মিশনারী স্কুল-কলেজগুলিকে শিখণ্ডীর মত খাড়া করিয়া পাদ্রীরা ভারত-বিরোধী কার্য্য করিয়া যাইতেছে।]

হিন্দু-সমাজ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ হইয়া প্রতি-ক্রিয়া দেখায়। একদল—(রামমোহন) নিরাকার উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া, জাতি-ভেদ তুলিয়া দিয়া, সমাজকে ঢালিয়া সাজিতে চেষ্টা করেন—ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদল—(বিদ্যাসাগর) হিন্দু-সমাজের সংস্কার বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলেও প্রচলিত ধর্ম-মতে বিশ্বাস রাখিয়াই চলেন—অর্থাৎ হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই হিন্দু-সমাজের সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন; অন্যদল (গোঁড়া হিন্দুদল)—হিন্দু-সমাজের প্রত্যেকটি বিধানকেই পবিত্র বলিয়া মনে করেন এবং সু-কু'র বিচার বাদ দিয়া প্রাচীন ব্যবস্থাকেই আঁকড়াইয়া থাকেন। একদল অবশ্য কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে গিয়া—সু-কু দুইটিকেই বর্জ্জন করেন এবং জাতিগোত্রহীন **'সধবার একাদশী'র দল** গড়িয়া **ম-কার** সাধনায় জীবনপাত করেন। রামমোহন প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা হিন্দু-সমাজ হইতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইলেও, হিন্দু-সমাজে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলেও এবং ব্রাহ্ম-সমাজ খ্রীষ্টান-সমাজেরই ভারতীয় সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইলেও, পাদ্রীদের বাড়াভাতে ছাই পড়ে বলিয়া, পাদ্রীরা রামমোহনকে সুনজরে দেখে না। নিরাকার উপাসনা এবং জাতিভেদশূন্য সমাজ প্রবর্ত্তিত করিয়া রামমোহন খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ব্যবসাটাই মাটি করিয়া দেন। যাহা হউক—সমাজে, ব্রাহ্ম, সংস্কার-পন্থী প্রগতিশীল হিন্দু এবং গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ব্যাপক সুরাসক্তি, বেশ্যাসক্তি—প্রভৃতি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সাধারণ একটা প্রতিক্রিয়া সকলের মধ্যেই কম বেশী দেখা যায় কৌলিন্য-প্রথা, বহু বিবাহ-প্রথা (বৃদ্ধের-বিবাহ-বাতিক) প্রভৃতি প্রথার সংস্কার বিষয়েও অনেক পরিমাণে মতৈক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নারী-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রক্ষণশীলদল রীতিমত বিরুদ্ধ মনোভাব দেখায়—স্বেচ্ছাচার

বলিয়া উহাদের ধিক্কার দেয়। **সামাজিক পরিস্থিতি** আমরা মোটামুটি এই ভাবে সাজাইয়া রাখিতে পারি :— [রাজ-সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদ]

১। রাজ-অর্থনৈতিক—দিকের	(ক) নীলকর সাহেবদের অত্যাচার উৎপীড়ন—বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটদের নীলকর সাহেবদিগকে সমর্থন—বিচারের নামে অবিচার (খ) একদিকে জমিদারের চাপে, অন্যদিকে নীলকর সাহেবের অত্যাচারে প্রজার দুর্গতি (গ) সিপাহী-বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ-দমন (ঘ) (পরাধীনতার গ্লানি—অবমাননাবোধের উত্তেজনা) (ঙ) স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষ :
২। সামাজিক—[নৈতিক ও অন্যান্য]	(ক) কৌলীন্য-প্রথা (সতীদাহ) (খ) বহু বিবাহ প্রথা (গ) সুরাসক্তি— (ঘ) বেশ্যাসক্তি— (ঙ) ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন—পাদ্রীদের প্রচার (চ) বিধবা বিবাহ আন্দোলন (গোঁড়াদের গোঁড়ামি) (ছ) নারী-শিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতি

(খ) সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক পরিবেশ—(১৭৫৭-১৮৭৩)

'বৌদ্ধগান ও দোহা' হইতে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে—সাহিত্যের **বিষয়-রূপ-**

রসের বিবর্তনের মূলে, সমাজ-বিবর্তনের ধারাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া আছে। আমরা দেখি, বৌদ্ধ-যুগের সংস্কৃতি তথা সামাজিক আবেগের একটি দিক 'বৌদ্ধ-গান ও দোহা' শিল্পে রূপ পাইয়াছে—এবং যে-ভাবে অর্থাৎ যে ভাষায় রূপ পাইয়াছে—সে ভাষাটি বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ পর্য্যায়ের ভাষা—ভাষাটি তখনও অপভ্রংশের খোলস সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। এই সময় হিন্দু-সংস্কৃতির কি অবস্থা ছিল, তাহার কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, তবে একেবারেই যে ছিল না একথা বলার মত যুক্তিও নাই। যাহা হউক, ইহার পরে বাংলার ইতিহাসে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটে। "সংস্কৃত-ভারতে"র সহিত বাংলার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়—বাংলায় বৈষ্ণব-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। গীতগোবিন্দ, সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (পালাগান) ও পদাবলী-তে নানারূপ মঙ্গলকাব্যে, এই সময়ের—বাঙালী সংস্কৃতির ও সাহিত্যের তথা বাঙালী-জীবনের নূতন আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়—সংস্কৃতের সংস্পর্শে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার মুখে **তৎসম তদ্ভব শব্দের কথা** ফুটিতে থাকে, অন্যদিকে সংস্কৃত ছন্দের তাল-লয়ের সঙ্গে চলিতে গিয়া **ভাষার গতিতেও নূতন ছন্দ** দেখা দেয়। দেশী এবং সংস্কৃত ছন্দের ও গানের তাল-লয়ের গতি-বেগ, বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত হইয়া নূতন গতি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিলেই—এই বিষয়টি চোখে পড়িবে—দেখা যাইবে—সাধারণতঃ বিবরণের জন্য (prosaic poetry) পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত এবং আবেগের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ ভাব-প্রকাশের স্বাভাবিক গতির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, ভাবানুগ ছন্দ প্রয়োগ করার চেষ্টা হইয়াছে। দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রে আসিতে আসিতে বাংলা-কাব্যের ভাষা, নানা ভঙ্গিমায় আপন গতিচ্ছন্দকে প্রকাশ করিয়াছে। যাত্রা, পাঁচালী, 'হাফ-আখড়াই' প্রভৃতির প্রভাবটিও উপেক্ষা করিবার মত নহে। একথা অবশ্যই বলা যায় যে রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্ত্তন 'কবির-ছড়া'র মধ্যে ছন্দের যে সহজ স্বচ্ছন্দ গতি দেখা যায়—

উহাই পরবর্ত্তীযুগের ইংরেজী কাব্যের আদর্শের অনুপ্রেরণায়, **রোমান্টিক কাব্যের মুক্ত ধারায়** উৎসারিত হইয়াছে। মোট কথা—অষ্টাদশ, শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত, বাংলা কাব্যে একটা প্রশংসনীয় ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে—এবং "ঈশ্বরগুপ্ত" পর্য্যন্ত এই প্রাচীন ধারাই প্রবাহিত হয়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই—ব্যবহারিক প্রয়োজনেই—ইংরেজী-ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজন তথা চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাতাস অন্যদিকে বহিতে শুরু করে—নূতন বাংলা বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেই বাংলার গোড়াপত্তন হয়।

প্রথমতঃ দেখা যায় এই সময়েই **বাংলা গদ্য রচনার ও সাহিত্যের চাহিদা** সৃষ্টি হয়। একটা দেশকে ভালোভাবে শাসনাধীন রাখিতে গেলে দেশের নাড়ী-নক্ষত্র ভালোভাবে জানা চাই-ই-চাই; সুতরাং ইংরেজের পক্ষে একদল বাংলা-জানা সাহেব তৈয়ারী করার তাগিদ অবশ্যম্ভাবী (যেমন, অত্যাবশ্যক—সেবা-কার্য্যের জন্য, কাজ চালানো-গোছের ইংরেজীবিদ্যা-ওয়ালা দেশীয় লোক)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি এই বাংলা-জানা সাহেব গড়ার কারখানা, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তির মূলে এই কলেজটির যে দান তাহা অবশ্যই স্মরণীয়। তেমনি উল্লেখযোগ্য—**পঞ্চমবাহিনী পাদ্রীদের** (*শ্রীরামপুর মিশনারী) ধর্ম-প্রচারের অধ্যবসায় ও আয়োজনটুকু। মাতৃভাষায় প্রচার করিতে পারিলে খ্রীষ্ট সমাচারকে যে পরিমাণে মর্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব—অন্যোপায়ে সেভাবে সম্ভব নহে। এই কারণে দেশী বোল-চালের চাহিদা পাদ্রী বাহিনীর মধ্যেও অপরিহার্য্যরূপে দেখা দেয়। একদিকে পাদ্রী বাহিনীর প্রচার অভিযান চলে, অন্যদিকে চলে—পাদ্রী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা। এই দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদের ফলে আর যাহাই হউক বা না হউক, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বাংলা গদ্য রচনার ফসল জমিতে থাকে। এই বাদ-প্রতিবাদের প্রধান বাহন হয়—সংবাদপত্র। **একদিকে 'পাঠ্য পুস্তক', অন্যদিকে—'সংবাদপত্র'—প্রধানতঃ এই দুই 'মাধ্যম' আশ্রয় করিয়া বাংলা গদ্য আপন গতি-পথে অগ্রসর হয়।** এমনি ভাবেই তদানীন্তন সমাজের নানা চাহিদা (শৈল্পিক চাহিদাও অন্তর্ভুক্ত) অনুসারেই বাংলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় এই যে গদ্য-রীতিটি গোড়া হইতেই **'কথ্য'-রীতি** হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। **'লেখ্য'-রীতিতে** বাংলা পদ্যের ক্রিয়া রূপ, সংস্কৃত শব্দ, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী বাক্য-ন্যাসরীতি মিশিয়া একটা কৃত্রিম চালের সৃষ্টি হয়। ফলে কথ্য রীতির সহিত লেখ্য-রীতির একটি দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া উঠে। [*লেখ্য-কথ্যের ব্যবধান আজও দূর হয় নাই।]

এ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ডাঃ শ্রীসুশীল কুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভারতচন্দ্রের—"ভাষা ছিল সহজ ও স্বচ্ছ, অথচ সুমার্জিত ও গাঢবন্ধ। ইহার নিপুণ প্রকাশ ভঙ্গিতে যে শিক্ষিত রসবোধ ও বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য রহিয়াছে, তাহাতে ইহার বিশুদ্ধ স্বল্পাক্ষর রীতিকে বাংলা সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল রীতির প্রথম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে। * কিন্তু ভাষার এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, হইলে হয়ত পরবর্তী কালের ভাষা-সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর সমাধান হইত। কেবল রাষ্ট্রীয় গোলযোগ বা সামাজিক অব্যবস্থা ইহার কারণ নয়। যে ভাব-বিপ্লব তৎকালের শিক্ষিত মনোভাবকে পাশ্চাত্যাভিমুখী করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আসিল— **প্রথমে মিশনারী, পণ্ডিত ও মুনশীদের নূতন করিয়া ভাষাসৃষ্টির প্রয়াস এবং পরে ইংরেজী ভাব-প্রকাশের জন্য ইংরাজী ধরনের ভঙ্গী ও রীতির প্রয়োজন**।........ পরবর্তী ভাষার আদর্শে ভারতচন্দ্রের বাণীভঙ্গী টিকিতে পারিল না।" (দীনবন্ধু মিত্র)। একথা স্বীকার্য্য যে বাংলা গদ্যের "প্রস্তুতিকাল ছিল দীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দী—ইহাও অনেকাংশে সত্য যে "একদিকে ছিল নিতান্ত অসাধু সাধুভাষার জের, অন্যদিকে নিতান্ত অচল চলতি ভাষার প্রচার", কিন্তু যে বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার অথচ উপেক্ষিত তাহা এই যে বাংলা গদ্যের শব্দ যোজনায় সংস্কৃতের প্রাধান্য এবং বাক-রীতিতে ইংরেজীর ও সংস্কৃতের বাক্য বিন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয় হইলেও বিশেষ লক্ষণীয় বাংলা গদ্যের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের রীতিটি। বাংলা-গদ্যের ক্রিয়াপদ কেন কথ্য ভাষানুগামী না হইয়া গোড়া হইতেই কাব্য-ভাষার ক্রিয়া-অনুসারী হইয়াছে ইহাই বড়বিচার্য বিষয়। আমার মনে হয়—বাংলা কাব্য সাহিত্যের আদর্শটি সর্বজন পরিচিত বলিয়া, সেই আদর্শ

বাজয় রাখিয়াই বাংলায় একটি আদর্শ গদ্য-রীতি গড়িবার প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং "গদ্য সাহিত্যের ভাষা তখনও নিজস্ব ভঙ্গী ও রূপ লাভ করিতে পারে নাই"—একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য—বাংলা গদ্যে দুইটি রীতি পাশাপাশি চলে,—এক লেখ্য, দুই কথ্য। * [এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ, ইহার পরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে দীনবন্ধু প্রতিভাবলে লেখ্য-কথ্যের দ্বন্দ্ব কটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।] *

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধ (১৮০০-১৮৭২) বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য উভয়ের পক্ষেই প্রস্তুতি-পর্ব। বাংলা গদ্য—রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, প্যারীচাঁদ প্রভৃতির সাধনায় পরিপুষ্ট হইতে হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষায় পরিণত হয়। বাংলা-কাব্যে, ইংরেজী কাব্যের সংস্পর্শে নূতন ছন্দের—"অমিত্রাক্ষর" ছন্দের গতি ভঙ্গিমা দেখা দেয়, পয়ারের যতি-লয়ের বাঁধ ভাঙিয়া যায় তথা মুক্ত-ছন্দের সূত্রপাত হয়। মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভা, বাংলা কাব্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটাইয়া তাহার প্রাণ শক্তির সম্ভাবনাকে "মেঘনাদ বধ" মহা-কাব্যে যুক্ত করিয়া দেয়—এক কথায় যুগান্তর সৃষ্টি করে। **শ্রব্য কাব্যের চাহিদার পাশেই—দৃশ্য কাব্যের চাহিদার সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত হয়**। কিন্তু দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টির জন্য প্রধান প্রেরণা—অভিনয়-অনুষ্ঠান। ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এই সময়ে অনুরূপ অভিনয় অনুষ্ঠান করিবার জন্য বাঙালী সমাজে ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগে। "সখের নাট্যশালা"য় এই ইচ্ছার প্রথম অভিব্যক্তি এবং ১৮৭২ 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ (সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায়), ইচ্ছার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। মনে রাখা দরকার মধুসূদন-দীনবন্ধু সখের নাট্যশালার নাট্যকার এবং এমন সময়ে তাঁহাদের আবির্ভাব যখন বাংলা-সাহিত্যে ট্র্যাজেডির বা কমেডির কোন উচ্চ "আদর্শ" প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যখন ট্র্যাজেডি বলিতে সাধারণতঃ বিয়োগান্ত এবং কমেডি বলিতে হাস্যরসাত্মক বা মিলনান্তক নাটক বুঝাইত।

এইবার, উল্লিখিত পরিবেশের সহিত [রাজ-অর্থনৈতিক-সামাজিক—শৈল্পিক]

দীনবন্ধু কিভাবে অভিযোজন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্। প্রথমেই ১৮৫২ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত—এই ২০ বছরের নাটকের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া, **অভিযোজনের সাধারণ রূপটি** খুঁজিয়া দেখা যাইতে পারে।

১। তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জ্জুন (১৮৫২) [পৌরাণিক]

২। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত—কীর্ত্তিবিলাস (১৮৫২) [বৃদ্ধের বিবাহ-সমস্যা]
সপত্নীপুত্র-বিদ্বেষ

৩। রামনারায়ণ—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব (১৮৫৪) [কৌলীন্য-প্রথা]
* বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬) [পৌরাণিক]
* রত্নাবলী নাটক (১৮৫৮) [সংস্কৃত-নাটক]
* অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (১৮৬০) [সংস্কৃত-নাটক]
বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক (১৮৬৬) [বহুবিবাহ]
* মালতী-মাধব (১৮৬৭) [সংস্কৃত নাটক]
উভয় সঙ্কট (১৮৬৯)
চক্ষুদান (১৮৬৯)
* রুক্মিণীহরণ (১৮৭১) (পৌরাণিক)

৪। হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩) (মার্চেন্ট অফ ভেনিস অবলম্বনে)
কৌরব-বিয়োগ (১৮৫৮) (পৌরাণিক)
চারুমুখ চিত্তহরা (১৮৬৪) (রোমীয়-জুলিয়েট অবলম্বনে)

৫। নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৮৫৫) [সংস্কৃত-নাটক]

৬। উমেশ চন্দ্র মিত্র—বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬)

৭। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ নাটক (১৮৫৬)

৮। রাধামাধব মিত্র—বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬)

৯। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপলা চিত্ত চাপল্য (১৮৫৭)

বিধবা বিবাহ

১০। নারায়ণ চট্টরাজ—কলিকৌতুক নাটক (১৮৫৮)

১১। শ্রীশিমুএল পীর বক্স—বিধবা-বিরহ নাটক (১৮৫৯)

১২। ? শুভস্য শীঘ্রং (১৮৬২) বিধবা

১৩। হরিশ্চন্দ্র মিত্র—ম্যাও ধরবে কে? (১৮৬২) বিবাহ

১৪। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিধবা বিলাস নাটক (১৮৬৪)

১৫ বিপিন বিহারী দে—একাদশীর পারণ

১৬। মণিমোহন সরকার | মহাশ্বেতা— (১৮৫৯) (সংস্কৃত)
উষানিরুদ্ধ নাটক (১৮৬৩) (পৌরাণিক)

১৭। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর— মুক্তাবলী নাটিকা (১৮৫৮)
মালবিকাগ্নিমিত্র (১৮৬০)

১৮। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সুশীলা বীর সিংহ (সিম্বেলিন অবলম্বনে)
নাটক (১৮৬৩)

১৯ হরিশ্চন্দ্র মিত্র | —জানকী নাটক (১৮৬৬)
—জয়দ্রথবধ বৃত্তান্ত (১৮৬৪)
—আগমনী (১৮৭০)
—প্রহ্লাদ নাটক (১৮৭২)

* ক প্রসন্ন সিংহ— | বাবু নাটক (১৮৫৪)—(প্রহসন)
বিক্রমোর্বশী (১৮৫৬) (সংস্কৃত নাটক)
সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮) (পৌরাণিক)
মালতী মাধব নাটক (সংস্কৃত)

* মধুসূদন দত্ত— শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯)—(পৌরাণিক)
একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) (প্রহসন)
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) (প্রহসন)
পদ্মাবতী—(১৮৬০) (পৌরাণিক গল্প)
কৃষ্ণকুমারী নাটক—(১৮৬১)—(ঐতিহাসিক)
ট্র্যাজেডি
[মায়াকানন—১৮৭৪]

* **দীনবন্ধু মিত্র**—নীলদর্পণ নাটক (১৮৬০) [নীলকর অত্যাচার]
নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) [পাতিব্রত্য অবলম্বনে]
বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬) [বহুবিবাহ]
সধবার একাদশী (১৮৬৬) [ইয়ং বেঙ্গল প্রহসন]
লীলাবতী— (১৮৬৫) [কৌলীন্যপ্রথা বর্জন]
[রোমান্টিক নাটক]
জামাই বারিক—(১৮৭২) [ঘর জামাই]
কমলে কামিনী (১৮৭৩) [সপত্নী বিদ্বেষমূলক রোমান্টিক নাটক]

*উল্লিখিত তালিকাটি পর্য্যালোচনা করিলে মোটামুটি পাওয়া যায়—(ক) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, (খ) পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যায়ন, (গ) সামাজিক বিকৃতির ও সমস্যার উপস্থাপনা, (ঘ) ইংরেজী নাটকের মর্মানুকরণ—ইংরেজী ট্র্যাজেডির ও কমেডির আদর্শ—অর্থাৎ রূপ ও রস আমদানী করার চেষ্টা।

অভিযোজনে মধুসূদন ও দীনবন্ধু

মধুসূদন ও দীনবন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে অতি নিকট সমসাময়িক এবং উভয়েই বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই কারণেই নাট্যকার মধুসূদন এবং নাট্যকার দীনবন্ধুর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার একটা অবকাশ আছে এবং বলা বাহুল্য এই আলোচনা খুবই প্রত্যাশিত।

এই আলোচনা ধারাকে আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নে ভাগ করিয়া লইতে পারি—(ক) বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও রূপায়ণে অভিযোজনের কোন্ রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে ? (খ) রূপায়ণদক্ষতা—কাঁহার কতখানি—অর্থাৎ কাহিনীর বাঁধুনিতে, পরিস্থিতি কল্পনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে—(চরিত্রের হৃদয়াবেগ ; কল্পনা ও ভাবগৌরব), মাত্রা-বোধে এবং জীবন-ধারণায়, কে কতখানি শক্তির পরিচয়

দিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখা যাক্—বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও রূপায়ণে পরিবেশের সহিত অভিযোজন কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে—মধুসূদনের প্রথম নাটক **শর্মিষ্ঠা** রচিত হয়। এই নাটকে পরিবেশের যে দিকের চাহিদা মিটানো হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ রাজ-অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোন চাহিদা নহে। এই নাটক সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা প্রধানতঃ কাজ করিয়াছে তাহাকে আমরা এক কথায় বলিতে পারি—শৈল্পিক (aesthetic)-অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে ভাল নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্যই প্রধান প্রেরণা। এই নাটকের বিষয়বস্তু পরিকল্পনা এবং ভাবাদর্শ সবই পৌরাণিক (classical)।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে—মধুসূদন তিনখানি নাটক রচনা করেন। (১) **একেই কি বলে সভ্যতা**, (২) **বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ**, (৩) **পদ্মাবতী**। প্রথম দুইখানি প্রহসন—তৃতীয়টিতে—গ্রীক-পুরাণের একটি রোমান্টিক কাহিনীকে ভারতীয় পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে। ('**কাহিনী-রস**' সৃষ্টি এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।)

প্রহসন দুইখানিতে মধুসূদনের অভিযোজন সমাজ-সমস্যার অভিমুখী হইয়াছে। প্রথমটিতে—ইয়ং বেঙ্গলের বিকৃতি (সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি), দ্বিতীয়টিতে (রক্ষণশীল সমাজের) বকধার্মিকের ভণ্ডামি—(বৃদ্ধের নির্বিচার কাম-লালসা উপহসিত। *[এই বৎসরে দীনবন্ধুর '**নীলদর্পণ-নাটক**' প্রকাশিত।]

একেই কি বলে সভ্যতায় মুখ্যতঃ 'কলির রাজধানী' মহাপাপ নগর' কলিকাতার লেখাপড়া শেখা নববাবুদের সুরাপান ও বেশ্যাভজনা দ্বারা 'সুপরিষ্টিসনের সিকলি' কাটিয়া 'ফ্রি' হওয়ার বিকৃত চেষ্টা—উপহাসিত হইয়াছে গৌণতঃ অবশ্য মাতালের মুখে প্রচার করা হইয়াছে—"তোমাদের মেয়েদের **এজুকেট** কর তাদের স্বাধীনতা দেও **জাতভেদ** তফাৎ কর—আর **বিধবাদের বিবাহ** দেও, তা' হ'লে—এবং কেবল তা' হ'লেই আমাদের প্রিয় ভারত-ভূমি **ইংলণ্ড** প্রভৃতি দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, নচেৎ নয়।" 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন তথাকথিত "রিফরমার"দের বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। নায়ক নববাবু'কে 'সধবার একাদশী'র প্রথম সংস্করণ বলা চলে

তাহার স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি—"এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকিলিই বা কি ?" 'সধবার একাদশী' কথাটিরই ব্যাস বাক্য।

সমাজের এক কোটিতে **'নববাবু'** অন্য কোটিতে—আছেন **বুড়ো শালিক ভক্তপ্রসাদবাবু**। ভক্তপ্রসাদবাবু গোঁড়া সমাজের সমাজপতি—"বড় মানুষ—রাজা"—পল্লীসমাজের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কলিকাতায় যে **একাকার হওয়ার আন্দোলন** হইতেছে—'কায়স্থ-ব্রাহ্মণ কৈবর্ত্ত-সোনারবেনে কপালী তাঁতী জোলা তেলী কলু সকলেই নাকি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়া করে'—ইহা তাঁহার অসহ্য। হিন্দুয়ানীর মর্য্যাদা থাকিতেছে না দেখিয়া তিনি খুবই দুঃখিত—**হিন্দু হইয়া বাবুর্চি নেড়ের** ভাত খায়—একথা ভাবিতেই তাঁহার বমি আসে, **ইংরেজী শিক্ষাই** যত নষ্টের গোড়া—নাস্তিক্যের জন্মদাতা এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত! কিন্তু "ভক্তপ্রসাদের—

বাইরে ছিল সাধুর আকার
মনটা কিন্তু-ধর্ম্ম ধোয়া
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য
ভণ্ডামীতে চারিটি পোয়া।"

তাই হানিফের স্ত্রী ফতিমাকে হাত করিয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাঁহার বাধে না। মাথায় তাজ চড়াইয়া ফতিমাকে 'তুমি আমার চন্দো পুরুষ!'—বলিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে কোন সংস্কারেই আঘাত লাগে না।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে:—মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক **'কৃষ্ণকুমারী নাটক'** রচিত হয়। ইংরেজী ট্র্যাজেডির মত ট্র্যাজেডি-রসের নাটক রচনা তথা বাংলা সাহিত্যে আমদানী করা এখানে **মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণভাবে,** হিন্দুভারতের গৌরব স্মরণ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ—মুসলমান-শাসনাধিকৃত তথা **পরাধীন ভারতের** দুর্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে—রাজার মুখে আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে—"এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এদেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হ'লে আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই তো এ-বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন তা

বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্ট-বারি নদীতে প্রবেশ করে, তার সুস্বাদ নষ্ট করে, ও দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি! আমরা কি আর এ আপদ হ'তে কখনও অব্যাহতি পাবো? "(২য় অঙ্ক-১ম গর্ভাঙ্ক)"—এই আক্ষেপের মধ্যে তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের মনোভাব অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের মত ঘটনা বাংলার শিক্ষিত হিন্দুদের মনে কেন যে আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, তাহাও এই আক্ষেপ হইতে অনুমান করা যায়। অন্ততঃ মধুসূদনের মনোভাব যে—'দুষ্ট যবনদল'-বিরোধী এবং মুসলমান-শাসনাধিকার যে তাঁহার কাছে 'আপদ'—এইরূপ অনুমান অহেতুক নহে। মধুসূদনের হিন্দু সত্তাটি এখানে যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়া মধুসূদন মুসলমান-শাসিত হিন্দু-সমাজের ট্র্যাজেডিকেও পরোক্ষভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই রূপায়ণে নিশ্চয়ই স্বাধীনতাকামনাকে উদ্বোধিত ও সঞ্চারিত করার চেষ্টা প্রকাশ পায় নাই। কারণ-মধুসূদনের ব্যক্তি। মানস এজন্য প্রস্তুত ও প্রবণায়িত ছিল না। [* মায়া কানন একখানি রোমাণ্টিক (কল্প-ঐতিহাসিক) ট্র্যাজেডি এবং কাহিনী সর্ব্বস্ব নাটক।]

এইবার দীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্।

১৮৬০ খ্রীঃ—দীনবন্ধুর নাটক 'নীলদর্পণ'। এই নাটকের পরিস্থিতি—অর্থ নৈতিক, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের প্রতিক্রিয়া—বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় নাট্যকারের মনোভঙ্গী খুবই 'সিরিয়াস' ফলে—নাটকখানি রস-পরিণামের দিক দিয়া ট্র্যাজেডি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ট্র্যাজেডির মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা যেন প্রচলিত হয় নাই—এই ধারণা লইয়াই ট্র্যাজেডি-গোষ্ঠী কথাটি লেখা।

এক কথায়, দীনবন্ধুর বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনে, শৈল্পিক চাহিদার পূরণ অপেক্ষা সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাই স্পষ্ট। এই নাটকে দীনবন্ধু একজন যুযুধান

[আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় "কৃষ্ণকুমারী"—সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং নতুনভাবে আলোচনা করেছে। এই আলোচনা অবশ্য দ্রষ্টব্য।]

শিল্পী। [**মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে রাজ-অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন নাই।**]

১৮৬৩ খ্রীঃ— **নবীন তপস্বিনী** (কমেডি) **প্রত্যক্ষত** ইহাতে 'বিজয়-কামিনী'র প্রেম—বিশেষতঃ 'তপস্বিনী-অবলম্বনে শকুন্তলা-প্রতিষ্ঠিত "ভর্ত্তৃবিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ"—নীতি-তত্ত্বটি অর্থাৎ ভারতীয় সাধ্বী-স্ত্রীর ধর্মটি প্রকটিত করা হইয়াছে এবং **পরোক্ষত**—নাটকে তৎসাময়িক (১) 'বৃদ্ধের তরুণী-বিবাহ'-প্রথা ["ধনের লোভে কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে, পারবো না", (২) সপত্নী-বিদ্বেষ, (৩) শাশুড়ী-পুত্রবধূর বিবাদ, (৪) পুরুষের বহুবিবাহ স্ত্রৈণতা, (৫) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের আচরণ ও অজ্ঞ গুরুদেবের মূর্খতা, (৬) মোসাহেব নিন্দা, (৭) সমাজের হোঁদলকুৎকুৎদের লাম্পট্য ·· প্রভৃতি নানা বিষয় সমালোচিত ও ধিক্কৃত হইয়াছে।

১৮৬৬ খ্রীঃ—**বিয়েপাগলা বুড়ো** (প্রহসন)। নামেই প্রকাশ—বৃদ্ধের বিবাহ-বাতিক এখানে উপহাস্য করা হইয়াছে, কিন্তু এই বৃদ্ধ কেবল ষাট বছরের বৃদ্ধ নহে—(ক) রক্ষণশীল সমাজের 'মস্তক',—কলেজে পড়া তাঁহার কাছে জাত দেওয়া, বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলে তিনি 'মেচোহাটা' মুখখানি খুলিয়া দিয়া গালিগালাজ করেন—বাগান বেচিয়া তিনি দলাদলি করেন,—যাহাকে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখেন। এই "বিয়েপাগলা বুড়ো" উপলক্ষ্য হইলেও লক্ষ্য এখানে রক্ষণশীল সমাজের 'মস্তক" রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মত লোককে সমাজ হইতে বিদায় করা—"যথার্থ কথা বলতে কি রাজীব মুখুজ্জে না মলে দেশের নিস্তার নাই"—এই সত্যটি প্রচার করা—(খ) বিধবা বিবাহের পক্ষে জোরালো ওকালতি করা:—ইন্স্পেকটারের উক্তি—"আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার পোণের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন" এবং প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—রামমণি ও গৌরমণির কথোপকথন—(গৌরমণির

উক্তিগুলি) "আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্ছে...............ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসারধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায় ?"—"বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে অঙ্গ জ্বলে যায়......খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ দিদি **এসব পরমেশ্বর করেননি, মানুষে করেচে** তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হ'য়ে যেতো"—। "ছোট মেয়েটিই কি আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই বিধবা বিবাহ চলে গেলে কেউ বিয়ে করবে, কেউ করবে না.........* সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে......"—বিধবা বিবাহের পক্ষে এ-সকল সমর্থ প্রচার। (গ) রক্ষণশীল সমাজের রক্ষক—ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতদের ব্যবস্থা দেওয়া সম্পর্কে এক হাত নেওয়া—("টাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোর বের বস্তা তো তুশ্চ কথা")। সংক্ষেপে "বিয়েপাগলা বুড়ো" বৃদ্ধের বিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা, বিধবা বিবাহ রক্ষণশীল সমাজপতি প্রভৃতির সমালোচনা। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিক'টি "বিয়েপাগলা বুড়ো"র—মধ্যে নবরূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি—**"সধবার একাদশী"** প্রকাশিত হয়। নাটকখানি 'একেই কি বলে সভ্যতার' সু-পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—সুরাপান নিবারণী সভার (১৮৬১ রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক মেদিনীপুরে স্থাপিত, ১৮৬৪খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক কলকাতায় স্থাপিত) পটভূমিকায় ও প্রচারার্থে লেখা—এবং সুরাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির পরিণাম দেখানোই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে মাতালের মান...গণিকার গতি—'সধবার একাদশী'—ধনিকপুত্র অটল বিহারীর মত নববাবু ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ইয়ার-বন্ধু নিমচাঁদ—ভোলা প্রভৃতিকে সমাজের চোখের সামনে স্পষ্টাকারে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। মূর্খ ও ধনীর দুলাল অটল, মেধাবী—শিক্ষিত অথচ দরিদ্র নিমচাঁদ, ঘটিরাম ডেপুটি, রামমাণিক্য প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মদ্যপায়ীদের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ

নিমচাঁদের মত শিক্ষিত লোকের পরিণাম, মদ্যপানদোষের বিরুদ্ধে নির্বাক প্রচার। নিমচাঁদ যেমন সুরাপান-নিবারণী সভার ভণ্ড সদস্যদের তেমনি ভণ্ড ব্রাহ্মদেরও এক হাত লইয়াছে, তবে তাহার সমালোচনার উদ্দেশ্য সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া নহে, সভার দুর্বলতা দূর করা। নাটকে ব্রাহ্মপন্থীদের উচ্চ প্রশংসাও করা হইয়াছে—"তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি করবার সুযোগ কর। (জীবনচন্দ্রের উক্তি—১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) **সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু সমাজের নৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে ব্যাপৃত।**

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে—"লীলাবতী" প্রকাশিত। এই নাটক, কৌলীন্য-প্রথার পটভূমিতে **শিক্ষিতা কন্যার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ—সিরিয়াস কমেডি**'-রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে আছে কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে জোর প্রচার—"কুলীন-অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই···কৌলীন্য পরমেশ্বর দত্ত নহে। ধর্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।" অন্যদিকে আছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে প্রচুর প্রশংসা তথা প্রচার। আবার—(হেমচাঁদের মুখে)—শোনা যায়, মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আবেদন—"তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর—মাতৃভাষা বড় হলে দেশের দশের অনেক ভাল হবে। **বিধবার বিয়ে** হবে···**জাতিভেদ** উঠে যাবে, **বহুবিবাহ** বন্ধ হবে,—**কুলীনের মিছে মর্য্যাদা** থাকবে না।" অর্থাৎ, নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য—**প্রেমজ বিবাহের** প্রতিষ্ঠা দেখানো, গৌণ উদ্দেশ্য—কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের পক্ষে, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে প্রচার করা।

১৮৭২ খ্রীঃ—"জামাই বারিক।" কৌলীন্য প্রথা হইতে উৎপন্ন আর একটি প্রথা—'ধনীর বাড়ীতে জামাই পুষিয়ারাখা'র প্রথা লইয়া প্রহসনখানি রচিত।

১৮৭৩ খ্রীঃ—শেষ নাটক—'**কমলে-কামিনী নাটক**' (রোমান্টিক কমেডি) রচিত। এই নাটকের রোমান্টিক কাহিনীটি 'সপত্নী-বিদ্বেষ'-এর ভিত্তির (দ্বিতীয় রাণীর ঈর্ষার) উপর দাঁড়াইয়া আছে বটে কিন্তু নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সাহায্যে চমকপ্রদ **প্রেমকাহিনী রচনা করা** তথা তদানীন্তন বঙ্কিমী রোমাঞ্চ সাহিত্যের আবহাওয়ায় আপন শৈল্পিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এইবার আমরা দীনবন্ধুর অভিযোজন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পারি—বলিতে পারি যে দীনবন্ধু তাঁহার নাট্য-রচনায়—প্রধানতঃ পরিবেশের প্রত্যক্ষসমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুসূদনের অভিযোজন—(প্রহসন ছাড়া) যেখানে প্রধানতঃ শৈল্পিক, দীনবন্ধুর অভিযোজনে সেখানে প্রধানতঃ—সামাজিক—অর্থাৎ রাজ-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক। অভিযোজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যায় দীনবন্ধু—তখনকার **প্রত্যেকটি প্রগতি আন্দোলনের অকপট এবং নির্ভীক সমর্থক**। এইবার রূপায়ণ বা নাট্যকার-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

দীনবন্ধুর "নাট্যকার-প্রতিভা"

'নাট্যকার প্রতিভা'র স্বরূপ নির্দ্ধারণ না করিয়া, বিশেষ কোন নাট্যকারের প্রতিভার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। প্রতিভা ছোট কি বড় তাহা তখনই বিশেষভাবে পরিমাপ করা যায় যখন প্রতিভার সাধারণ ও বিশেষ সব লক্ষণ সম্বন্ধেই স্পষ্ট চেতনা থাকে। শিল্পের সাধরণ লক্ষণ, আমরা ক্রোচের বা রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলিতে পারি—Art is expression,—"প্রকাশই কবিত্ব" এবং একথাও বলিতে পারি—শিল্পীর দক্ষতা বা প্রতিভা—ভাবের বা জীবনের চিত্তাকর্ষক রস-রূপ সৃষ্টিতে—অর্থাৎ যে শিল্পী যত গভীরভাবে ও যথাযথভাবে জীবনকে প্রকাশ করিতে পারেন তিনি তত দক্ষ শিল্পী। সাহিত্য-শিল্পের এই সাধারণ লক্ষণ সর্বত্র প্রযোজ্য বটে, কিন্তু যেহেতু সাহিত্য শিল্পের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রজাতি (species) আছে এবং প্রত্যেক প্রজাতি সামান্য লক্ষণে

এক হইলেও বিশেষ লক্ষণে পৃথক, নাট্য সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ একটি প্রজাতি —ইহা জীবন-সত্যকে বিশিষ্ট রীতিতে (দৃশ্য) রস-রূপ দান করে, সেই হেতু **নাট্যকার-প্রতিভা সাধারণতঃ সাহিত্যিক প্রতিভা হইলেও— বিশেষতঃ দৃশ্য-রীতিক কাব্য সৃষ্টির প্রতিভা—দৃশ্য রীতিক উপস্থাপনার বিধিনিষেধ—সচেতন এবং দোষ-গুণাভিজ্ঞ প্রতিভা।** দেখা গিয়াছে, বড় কবি হইলেও বড় নাট্যকার হওয়া সম্ভব হয় নাই। আমরা জানি— **বায়রণ, শেলি** প্রমুখ বড় কবিরা নাটক লিখিতে গিয়া সফল হন নাই। উঁচুদরের কবিতা লিখিতে পারিলেই উঁচুদরের নাটক লেখা যায় না—টি. এস. এলিয়ট, আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাহার আধুনিক দৃষ্টান্ত।

সুতরাং নাট্যকার-প্রতিভা শুধু প্রকাশ-দক্ষতা নহে—বিশেষ ধরনের প্রতিভা— জীবনের বাস্তবকল্প প্রত্যক্ষ রূপ সৃষ্টি করিবার প্রতিভা—জীবনের উপলব্ধিকে একাধারে **দৃশ্য বাস্তবিকল্প চিত্তাকর্ষক** করিবার প্রতিভা—অর্থাৎ নাট্যকীয় প্রতিভা—উপস্থাপ্য বিষয়কে সন্ধি-বিভক্ত একটি কাহিনীতে রূপ দেওয়া, কাহিনীতে সুনির্ব্বাচিত ঘটনা বা পরিস্থিতি কল্পনা করা এবং সেই পরিস্থিতির পটভূমিতে নায়ককে প্রধানভাবে, পাত্র-পাত্রীকে আনুষঙ্গিক হিসাবে দাঁড় করাইয়া—সমুচিত আবেগ সংলাপ ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া চরিত্র ও রস অভিব্যক্ত করা তথা সব কিছুর মধ্য দিয়া মুখ্য উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করার—প্রতিভা। নাট্যকার প্রতিভাকে বড়ো বলিয়া তখনই মর্য্যাদা দেওয়া উচিত, যখন নাট্যকারের সৃষ্টি সর্বতোভাবে—অর্থাৎ **রূপে ও রসে** অনবদ্য হইয়া উঠে। অনেক ক্ষেত্রে স্রষ্টা বড় না হইয়াও, মিথ্যা মায়া দ্বারা আমাদের ভুলাইতে পারেন এবং অংশের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়া 'সমগ্র'-এর হিসাব ভুলাইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা এই সমগ্রের পরিকল্পনা'গত দুর্বলতা নানাভাবে ঢাকিবার চেষ্টা করেন—পাত্র-পাত্রীর মুখে বড় বড় কথা দিয়া কল্পনাশক্তির—অর্থাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির বাহার দেখাইয়া সংলাপে বক্রোক্তি শ্লেষ প্রভৃতির চটক দেখাইয়া, চরিত্র-চিত্রণে বাস্তবিকতার মায়া সৃষ্টি করিয়া অথবা অস্বাভাবিকতার (abnormality) দ্বারা কৌতূহল উদ্দীপিত

ইহারা **রূপ-পরিপাট্যের** এবং **রস-গম্ভীরতার** ত্রুটি ঢাকিতে চেষ্টা করেন। এ-সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের উক্তিটি স্মরণীয়—"novices in the art attain to finish of diction and precision of portraiture before they can construct the plot" (Poetics vi)। বাস্তবিক যে-স্রষ্টার 'অখণ্ড-দৃষ্টি' যত স্বচ্ছ—খণ্ডে-বিভক্ত অখণ্ড রূপটির ধারণা যত সঙ্গতিময় ও যথাযথ সেই স্রষ্টা তত বড় প্রতিভার অধিকারী। বড় প্রতিভার মধ্যে—সদা জাগ্রত ঔচিত্যবোধ, অনিমেষ মাত্রা-চেতনা, ব্যাপক ক্রান্তদর্শিতা, গভীর সহৃদয়তা (power of identification) ও রসানুভূতির একত্র সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী

বড় নাট্যকার হওয়ার পক্ষে—শুধু ভাবকে কল্পনা-পরম্পরায় তান-বিস্তার করিবার শক্তিই যথেষ্ট নহে, শুধু চমৎকার পরিস্থিতি ও কাহিনী কল্পনার শক্তি যথেষ্ট নহে, শুধু চরিত্র-বিশ্লেষণের গভীর দক্ষতা ও চরিত্রের জ্ঞান যথেষ্ট নহে, শুধু সংলাপের অর্থগৌরব ও লালিত্য ও চমৎকারিত্ব যথেষ্ট নহে; বড় নাট্য-প্রতিভা তাঁহারই যিনি এইসব বিশেষ বিশেষ উপকরণের প্রযোজনায় দক্ষ তো বটেই, অধিকন্তু যিনি সহজ মাত্রাবোধের দ্বারা সকল উপকরণকে একটা মহা-সঙ্গিতময় রূপ-রস-পরিণতি দান করিতে সক্ষম।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্মুখে রাখিয়া আমরা এখন দীনবন্ধুর নাট্যকার-প্রতিভা পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইতে পারি। দীনবন্ধুর প্রতিভাকে প্রথম যিনি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি আর কেহ নহেন, তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক—বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অনেকেই দীনবন্ধুর প্রতিভা সম্বন্ধে বেশী কম আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা অন্যদিকে সম্প্রতি-প্রকাশিত ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের "দীনবন্ধু মিত্র" (শরৎচন্দ্র-বক্তৃতা) গ্রন্থ দীনবন্ধু-প্রতিভা বিশ্লেষণের—দুই সীমা। মাঝখানে আছেন—কবি-সমালোচক মোহিতলাল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

লেখক শ্রেণী এবং বাংলা নাটকের ইতিহাস-লেখক শ্রেণী—[শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সমালোচক।]

দীনবন্ধুর প্রতিভা-বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু-প্রতিভায় দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন—এক —'অলৌকিক সমাজজ্ঞতা—বিস্ময়কর সামাজিক অভিজ্ঞতা, দুই—তীব্র সহানুভূতি, তিন—কল্পনাশক্তির অভাব। অন্য বৈশিষ্ট্য—বাকপটুত্ব ও রসিকতা—ব্যঙ্গ প্রিয়তা। ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে—পাত্রপাত্রীর আচার-বিচার, হাব-ভাব প্রভৃতিতে বাস্তবিকতা, সহানুভূতির ফলে—"যাঁহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না, কেন-না তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। ...

উহার পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—* কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের 'দীনবন্ধু'-প্রবন্ধটি (১৩৩৮, পৌষ, প্রকাশিত), কারণ এই প্রবন্ধটিও পরবর্ত্তী সমালোচনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সমালোচকের সিদ্ধান্তরাজি সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে—

(১) "দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙ্গালী।"

(২) "তাঁহার দৃষ্টি, প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে পরোক্ষ আছে তাহাভেদ করিতে চাহে নাই; যাহার সঙ্গে প্রাণ-মনের সম্পর্ক অব্যবহিত যাহা বাহিরের বিকাশভঙ্গিমাতেই, অতি উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেই রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠে, তিনি ছিলেন সেই জীবনের মুগ্ধ-উপাসক"

(৩) "জীবনকে বর্ণনীয় না করিয়া তাহাকে দর্শনীয় করিবার আবেগেই নাটকের সৃষ্টি হয়। এ-আবেগের মূল—কল্পনার objectivity, বাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ—আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুসকলকে মণ্ডিত না করিয়া, বস্তুসকলের

রস-সত্তায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া কল্পনার এই objectivity. উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ"

(৪) "পরকায়-প্রবেশের মত প্রবেশ করিবাব শক্তি"—অনন্যসুলভ। (বঙ্কিমের 'সহানুভূতির' যুক্তি)

(৫) "দীনবন্ধুর স্বভাব-প্রেরণা, ট্র্যাজেডি বা অতি উচ্চ ভাবকল্পনার বিরোধী"।

(৬) যে "উৎকৃষ্ট হাস্য উৎকৃষ্ট কাব্যকল্পনার মতই দুর্লভ (কারণ, উভয়ের মধ্যেই জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে দেখিবার শক্তি আছে), দীনবন্ধু সেই হিউমার রসের রসিক।" **"এই হাস্যরসই দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা।"**

(৭) প্রতিভায়—কৌতুকপ্রবণতায় আতিশয্য, সমসাময়িক সমাজের প্রভাব।

"তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত আদুরী, আস্ত নিমচাঁদ দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" এই সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া বঙ্কিম দীনবন্ধুর দোষ-ত্রুটিগুলিও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনবন্ধুর—গ্রাম্যতা' বা অশ্লীলতা এই সহানুভূতিরই ফলন।—"দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই। তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই জন্মিয়াছে।" আবার যেখানে চরিত্র ভাবে ভাষায় আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে তাহার কারণও, বঙ্কিমের মতে—(ক) **অভিজ্ঞতায়** বা **'জীবন্ত আদর্শের** অভাব—এবং কাজে কাজেই **সর্ব্ব-ব্যাপিনী সহানুভূতির** অভাব, (খ) জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্লেষণটুকু খুবই অন্তর্দর্শী। তিনি যে-সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা দীনবন্ধুর গুণ-দোষ উভয়কেই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। *শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মোহিতলালের

সমালোচনার সহিত কিছু কিছু যোগ-বিয়োগ করিয়া দীনবন্ধুর প্রতিভা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বক্তব্য এই—(ক) **"দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা বিচিত্র হইলেও গভীর ও বিরাট ছিল না** এবং মানব-জীবনের মূল সমস্যাগুলির অপেক্ষা তুচ্ছ ও অজ্ঞাত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রবল ছিল" * **দ্বিতীয় বক্তব্য**—"বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন যে দীনবন্ধুর সহানুভূতি যত প্রবল ছিল **কল্পনাশক্তি** তত প্রখর ছিল না।" ***তৃতীয় বক্তব্য**—' দীনবন্ধুর নাটকে অবান্তর আখ্যানের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য্যের জন্য মূল প্লট সর্ব্বদাই কৃত্রিম এবং অনুজ্জ্বল।' * **চতুর্থ বক্তব্য**—"যথার্থ নাট্যকারের প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না, তাঁহার মধ্যে ছিল সুপ্ত ঔপন্যাসিক-প্রতিভা"। [এই শেষোক্ত মন্তব্যটির জন্য ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় 'উক্ত সমালোচকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা ছিল কি না তাহার সবিস্তার আলোচনা আমরা পরে করিব; কিন্তু তাঁহার যে ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার দুইটি গল্প রচনার ব্যর্থ চেষ্টা।]

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য

সমালোচক অধ্যাপক ঘোষ দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশ্লেষণে বেশ স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ,—তিনি স্পষ্ট করিয়া এই কথাটি বলিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর প্রতিভা 'গভীর ভাবাত্মক' নাটকের উপযোগী ছিল না; দ্বিতীয়তঃ—তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচনা করিতে ইতস্তত করেন নাই এবং বলিতে চাহিয়াছেন যে দীনবন্ধুর অনেক চরিত্র প্রাণহীন ও কৃত্রিম হইয়াছে, তাহার কারণ—অভিজ্ঞতার অভাব নহে—"নাটকীয় কলাকৌশলের দৈন্য'; তৃতীয়তঃ—দীনবন্ধুর নাটক—অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন ··· আতিশয্য দোষদুষ্ট। [অজিতবাবু বঙ্কিমের—"পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন—" এই যুক্তিটুকু উপেক্ষা করিয়াছেন।]

সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্য

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয় ("দীনবন্ধু মিত্র"-গ্রন্থে) দীনবন্ধু প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিপাটি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক অনেক মতের সমালোচনা করিয়া, তিনি দীনবন্ধুর প্রাপ্য মর্যাদা উদ্ধার করিতে প্রশংসনীয় অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই ঃ—

ডাঃ দে মহাশয়ের "দীনবন্ধুমিত্র-গ্রন্থের আলোচনা, সাল—১৩৩৮

(১) দীনবন্ধু প্রতিভা বহির্মুখী বাস্তব তন্ময়

(২) দীনবন্ধু প্রাণে-মনে খাঁটি বাঙালী ছিলেন ··· মানস প্রকৃতি ছিল—বাঙালীর; নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত প্রকাশভঙ্গী ছিল বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতি, বাঙালীর দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত নয় মাঠে-ঘাটে-হাটে-বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য।

ব্যাপক জীবনদৃষ্টি—

(৩) **অভিজ্ঞতা** ছিল ব্যাপক ও বিচিত্র (বঙ্কিমের—বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতা)

(৪) **সমবেদনা**—সহজাত রসবোধ এবং অনুভূত বিষয়ের মধ্যে আত্ম-বিলোপ করিবার শক্তি ছিল শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপযুক্ত (বঙ্কিমের—সহানুভূতি)

(৫) গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা তাহা দুর্নীতি বা আর্টের অশ্লীলতা নয় চরিত্রের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য (মোহিতলালের যুক্তি)

(৬) ভাষাগত অতিদোষ আছে ; কারণ :

(ক) কাব্যসম্মত বা শিষ্ট চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সেরূপ স্পষ্ট বা তীক্ষ্ণ ছিল না। সেইজন্য গম্ভীর আখ্যানে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন।

(খ) সাধুভাষা সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

(গ) **সাময়িক রোমান্স**—"তাই যেখানে বাস্তব ছাড়িয়া দীনবন্ধু ভাবুক-

তার আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের প্ররোচনায় পুস্তকগত আদর্শের বশীভূত হইয়াছেন সেখানে তাঁহার চিত্র, ভাব ও ভাষার অতিদোষে, স্বভাবসঙ্গত হয় নাই। (বঙ্কিমের সূত্রটি পরিবর্দ্ধিত) 'যেখানে রোমান্স ও বাস্তবের সংঘর্ষ হইয়াছে, সেখানে তাঁহার সহজাত রস-বোধও তাঁহাকে ভাবাবেশের আতিশয্য হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"

(৭) হাস্যরসই ছিল দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

দীনবন্ধু-প্রতিভার বিশ্লেষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাই সকলের আলোচনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং একথাটিও বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রগুলি আজও একহিসাবে অকাট্য হইয়াই আছে। বঙ্কিমকে যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বঙ্কিমের সব কয়টি সূত্রকে এক করিয়া দেখেন নাই—দেখিলেই দেখিতে পারিবেন যে—বঙ্কিমচন্দ্র আক্রমণের অবকাশ রাখেন নাই। আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক চরিত্র কেন দেখা দিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বঙ্কিম যেমন অভিজ্ঞতার বা জীবন্ত আদর্শের অভাবের যুক্তি—সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতির অভাবের যুক্তি, উপস্থিত করিয়াছেন তেমনি "জীবন্ত আদর্শ" থাকা সত্ত্বেও সহানুভূতি কাজ করিতে পারে নাই—এবং পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বনই যে তাহার কারণ একথাটিও বলিয়াছেন। আসল কথাটি এই যে বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন—দীনবন্ধুর সমবেদনার শক্তি (power of identification) তীব্র, কিন্তু অভিজ্ঞতা বা জীবন্ত-আদর্শ যেখানে নাই সেখানে তাহা কাজ করিতে পারে নাই, আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি যুক্তি—প্রথা বা পুস্তকগত আদর্শ অনুসরণের প্রবণতা সহানুভূতির সহজ ক্রিয়া স্থগিত করিয়া দিয়াছে। তারপর দীনবন্ধুতে কল্পনা-শক্তির দৈন্য যে আছে একথাটি বলিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই।

বঙ্কিমের বিশ্লেষণ হইতেই এইটুকু স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে যে দীনবন্ধুর প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নহে—'জীবন্ত আদর্শ' সম্মুখে না থাকিলে সহানুভূতি যাঁহার কাজ করে না, যিনি কল্পনা-বলে রূপোচ্চয়নে

মনসা-কৃত মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না, যিনি সহজ রসবোধের দৃঢ়তা দ্বারা প্রথার প্রলোভনকে জয় করিতে পারেন না, রস-দৃষ্টি যাঁহার আত্যন্ত অতন্দ্র বা সদাজাগ্রত নহে, তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী বলিতে পারি না।

অবশ্য গোড়াতেই মনে রাখা দরকার যে সকল প্রতিভাই সব্যসাচী হইতে পারে না। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত এমন প্রতিভা খুব অল্পই আছে। কবি-মানসের প্রকৃতি,—মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও চাহিদা এসব ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেখা যায়—কেহ কমেডি-সৃষ্টিতে, কেহ বা ট্র্যাজেডি-সৃষ্টিতে সহজ অধিকার ও দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে দীনবন্ধুর মানস-প্রকৃতি কমেডির পক্ষে যত অনুকূল, ট্র্যাজেডির জন্য তত প্রস্তুত নহে, আবার প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক—অর্থাৎ 'লো কমেডি'র জন্য যতটা প্রবণায়িত, 'সিরিয়াস কমেডি'র জন্য—গুরু-গম্ভীর রসের জন্য ততটা প্রবণায়িত নহে। যেখানে কৌতুক, যেখানে রসিকতা, যেখানে জীবনের বহিরঙ্গের লীলা, সেখানে দীনবন্ধু যেন "ঘরের ছেলে"। দীনবন্ধু একজন সিদ্ধ হাস্যরসিক। শুধু স্থূলবিকৃতি হইতে তিনি রসটুকু ছাঁকিয়া লইতে পারেন তাহা নহে—যেখানে চোখের জলের গভীর কেন্দ্রে হাস্যরস মিশিয়া আছে, সেখান হইতেও তিনি 'হংসৈর্যথাক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'—রসটুকু টানিয়া বাহির করিতে পারেন। হাস্যরসের ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞান তাঁহার খুবই টন্‌টনে—একটা অতীন্দ্রিয় স্পর্শকাতরতা যেন মাত্রা বোধকে সুরক্ষিত করিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, গুরুগম্ভীর রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকারের সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়াছে।—এই মাত্রা বোধের তথা ঔচিত্যজ্ঞানেরই অভাব।' একথা সত্য নহে যে নাট্যকার ভয়ানক বা করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন না বা সেই পরিস্থিতি-উপযোগী অনুভাব-সঞ্চারিভাব সৃষ্টি করিতে একেবারেই অক্ষম—অন্ততঃ নীলদর্পণ-নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে যে নাট্যকারের সেই শক্তির পরিচয়

আছে তাহা সত্য—কিন্তু যে কারণে করুণ দৃশ্যগুলি বিলাপ-প্রলাপের আতিশয্যে অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই মাত্রাজ্ঞানেইর অভাব।

শোকরূপ স্থায়ীভাবের অনুভাব-সঞ্চারিভাব উপলব্ধির ক্ষমতা দীনবন্ধুর একেবারে ছিল না একথা সত্য নহে—সাবিত্রীর উন্মত্ততা পরিকল্পনা করার মধ্যে এবং সেই অবস্থাটি ব্যক্ত করার মধ্যে নাট্যকারের রসানুপ্রবেশের ক্ষমতা অবশ্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু একথাটি অবশ্যই স্বীকার্য্য যে দীনবন্ধু করুণরস প্রভৃতি গম্ভীর রস সৃষ্টিতে সাধকের ভাব-সমাধির অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন নাই এবং করুণ-রস সৃষ্টিরকালে, স্রষ্টার প্রধান গুণ—মাত্রাবোধটিই হারাইয়া ফেলিয়াছেন, ফলে চরিত্র ভাবে ও ভাষায় অশুচিত তথা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে।* এখানেই মধুসূদনের সহিত দীনবন্ধুর একটা বড় পার্থক্য চোখে পড়ে। মধুসূদনের নাটকে আর যাহাই থাক আর না থাক—ভাষাপ্রয়োগে একটি প্রশংসনীয় মাত্রা চেতনা লক্ষ্য করা যায়—যেখানে মধুসূদন সংলাপে নিয়মিতভাবে কথ্য ভাষার ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করিয়া খানিক পরিমাণে বাস্তবিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তথা সংলাপকে অন্ততঃ রীতির দিক দিয়া কৃত্রিমতামুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দীনবন্ধু সেখানে মারাত্মক দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন—**লেখ্য ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে সংলাপকে অতিকৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন**। এত ক্ষীণ মাত্রা-চেতনা প্রতিভার পক্ষে খুবই বড় কলঙ্ক। সর্ব্বব্যাপী মাত্রাবোধ, সহজসতর্কতা বড় প্রতিভার স্বভাবধর্ম। দীনবন্ধুর মধ্যে এই ধর্মটির অভাব বেদনাদায়ক মাত্রায় দেখা যায়। এইদিক দিয়া, মধুসূদনের প্রতিভা দীনবন্ধুর প্রতিভা অপেক্ষা আরো বড়। "গুরুগম্ভীর রসের গভীরতায় ডুবিয়া যাইবার ক্ষমতা—এবং গভীরতায় পৌঁছিয়া—ঔচিত্য ও মাত্রা, কল্পনার objectivity" (মোহিতলাল) বজায় রাখিবার ক্ষমতা, দীনবন্ধুর অপেক্ষা মধুসূদনের বেশী। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে, দীনবন্ধুর মাত্রা বোধের, কল্পনাশক্তির এবং 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে, ডুবিবার ক্ষমতার যত ত্রুটিই থাক একটি বিষয়ে দীনবন্ধু মধুসূদনকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং

এই বিষয়টি হইতেছে অভিজ্ঞাত চরিত্রকে সহানুভূতি বলে তাজা একটি রক্ত-মাংসের ব্যক্তিতে পরিণত করা—হাবভাব ভাষায় একটি আস্ত চরিত্র সৃষ্টি করা—অর্থাৎ যেখানে দীনবন্ধুর সহানুভূতি অব্যাহতভাবে কাজ করিতে পারিয়াছে সেখানে দীনবন্ধু যেন খানিকটা তাজা জীবনকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সকল তাজা প্রাণের টাটকা রসের আস্বাদ দীনবন্ধুর নাটকের অন্যতম বিলক্ষণ আকর্ষণ। আর এক আকর্ষণ—দীনবন্ধুর 'কমিক' চরিত্রগুলির সংলাপ ও রসিকতার বৈচিত্র্য। নাটকে শুধু সংলাপকেই যে ক্রিয়া-শক্তির (action) প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সংলাপকে নাটকের প্রাণ-শক্তির কেন্দ্র করিয়া তোলা যায়, তাহার প্রথম ও সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়—দীনবন্ধুর নাটকেই। আসলে, বড় প্রতিভার সাধারণ মাল মসলা দীনবন্ধুতে বেশী কম প্রায় সবই আছে কিন্তু যাহার অভাবে বড় ট্র্যাজেডি বা সিরিয়াস-কমেডি তিনি রচনা করিতে পারেন নাই তাহা প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাব—বড় শিল্পী সুলভ সহজাত মাত্রাবোধের অভাব। বাস্তবিক দীনবন্ধুর নাট্যকার-প্রতিভা সম্বন্ধে এক কথায় সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। নাট্যকারের অভিজ্ঞতা ব্যাপক একথা যেমন সত্য, আবার অভিজ্ঞতা খুব ব্যাপক নহে ইহাও প্রমাণ করা যায়। সহানুভূতি তীব্র—ইহা যেমন সত্য, আবার সহানুভূতির অভাব আছে তাহাও সত্য, কল্পনার—objectivity আছে ইহা যেমনো দেখান যায় আবার ইহাও দেখানো যায়—বাস্তব তন্ময়তা অনেক ক্ষেত্রেই নাই। ভাবে-ভাষায় আস্ত চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা—অসাধারণ—একথা যেমন বলা যায়, তেমনি এ-কথাও বলা যায় অনেক চরিত্র শুধু ভাবগত ও ভাষাগত কৃত্রিমতার জন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারপর রস-সৃষ্টির ব্যাপারেও, দীনবন্ধু দুই-এক ক্ষেত্রে যেমন খুবই দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তেমনি অনেক স্থলেই শোচনায় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই কারণেই দীনবন্ধুর নাট্যকার-প্রতিভা সম্বন্ধে এক কথায় রায় দেওয়া যায় না।

তবে, এইটুকু অবশ্যই বলা যায় যে দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর সব্যসাচী

নাট্যকার-প্রতিভার অধিকারী না হইলেও, প্রহসন-রচয়িতা ও হাস্যরসিক-দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে এবং কোন কোন গুরু-রসাত্মক বিশেষ দৃশ্যের উপস্থাপনায়, দীনবন্ধু যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার সমকক্ষ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এক কথায় রায় দিতে গেলে নিশ্চয়ই আমরা দীনবন্ধুকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার বলিয়া ঘোষণা করিব না। সে যাহাই হউক একথা বলিতেই হইবে—দীনবন্ধুর নাট্যকার-খ্যাতির শুধু যে ঐতিহাসিক মূল্যই আছে তাহা নহে তাঁহার স্থায়ী কীর্তি আছে শৈল্পিক-মূল্যের মধ্যেই।

নীলদর্পণ নাটকের বিষয়বস্তু

নীলদর্পণ নাটকের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের মূলে নাট্যকারের মধ্যে যে প্রধান প্রেরণাটি কাজ করিয়াছে তাহা নাটকের শীর্ষদেশে লিখিত সংস্কৃত বাক্যটি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়,—নাটকখানি—'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্'। নাটকখানি পথিকের রচনা—অর্থাৎ এমন একজনের রচনা যিনি ঘরে বসিয়া, লোকের মুখে শুনিয়া প্রজাদের দুঃখদুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নাই, যিনি নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, স্বচক্ষে প্রজাদের 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর' মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পথিকটি আবার এমন পথিক যিনি দংশন-জর্জ্জরিত প্রজাদের মঙ্গল বিধান করিতে সঙ্কল্পিত। এই মঙ্গল বিধান করিতেই পথিক এমন একখানি 'দর্পণ' নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন যাহাতে নীল-করদের অত্যাচার উৎপীড়নের ছবিটি যথাযথ এবং স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। পথিকের এই দর্পণ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য—নীলকরদের মুখের সম্মুখে দর্পণখানি স্থাপন করা তথা তাহাদিগের 'ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক তিলক' ও নিজ নিজ মুখ 'সন্দর্শন'। পথিকের পরিশ্রমের সাফল্য "নিরাশ্রয়, প্রজাগণের মঙ্গল এবং * বিলাতের মুখরক্ষা"—

নীলদর্পণ নাটকে নাট্যকার নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

(ক) প্রজার ধন-প্রাণ মানের প্রতি নীলকর সাহেবদের চরম অত্যাচারের রূপ—গাঁকে-গাঁ ছারখার করিয়া দেওয়ার ইতিহাস (খ) যে-ইংরেজ দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা, সেই ইংরেজের জাতি-ভাই নীলকর-সাহেবদের অত্যাচারের মুখে নিরুপায় প্রজার দুঃখদুর্দ্দশা ও অন্তর্দাহ। ('বেঁধে মারে সয় ভাল'—অবস্থা) দুই একজন বর্দ্ধিষ্ণু গাঁতিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এবং ধনে-মানে-প্রাণে মারা পড়া। (গ) "সাহেবের দেশ, হাকিমের ভাই-ব্রাদার" বিচারের নামে যাহা হয় তাহাকে বিচারের প্রহসনই বলা চলে। অবশ্য সব সাহেবই খারাপ তাহা নহে। অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত লোক ব্যতিক্রম—ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটই নিয়ম। ইহাদের সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের গলায় গলায় পীরিত। ইহাদের কাছে প্রজার বিচার—"কাজির কাছে হিন্দুর পরোব", ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সকলেই প্রায় একসুরে বাঁধা। নিয়তির মত হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা সাহেবদের শাসন-শোষণের ও অত্যাচারের দুর্লঙ্ঘ্য পরিবেষ্টনীর চাপে প্রজার শোচনীয় দুঃখদুর্দ্দশা, ভাগ্যবিপর্য্যয়—বিপত্তি—এক কথায় বাংলার প্রজাদের 'ট্র্যাজেডি'।]

এই বিষয়সমূহকে ট্র্যাজেডি-রসে-রসিত করিয়া উপস্থাপিত করিবার জন্য, নাট্যকার যে ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন তাহারা কাল্পনিক নহে। এ-সম্বন্ধে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"নীলদর্পণের অধিকাংশ ঘটনাই প্রকৃত। গ্রামবাসীর দুর্দ্দশা, সাহায্যকারী মধ্যবিত্তের লাঞ্ছনা তিনি তো নিজ চক্ষেই দেখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ উড্‌ ও রোগও কল্পিত নয়। নদীয়া জেলায় হরমণি নাম্নী একটি চাষীর মেয়ে ছিল। জল আনিতে গেলে কচিকাটা কুঠির Arcibald Hills সাহেবের আদেশে পালকিতে করিয়া তাহাকে আনিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত হিল্‌সের ঘরে রাখা হয়। কমিশনের কাছে জনৈক পাদ্রী সাহেব এই সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়ায় (কমিশনার কৃষ্ণনগরের

ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘটনার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। হার্সেল সাহেব ঘটনাটির সত্যতা যথার্থ বলিয়া রিপোর্ট করেন। সিভিলিয়ান ইডেন সাহেব (পরবর্ত্তী ছোট লাট স্যার এস্‌লি ইডেন) সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর বড সাহেব মিঃ লারমুর চাবুকের সহায়তায় চাষাদের সায়েস্তা করিতেন।......... এই মিঃ লারমুর, হিলস ও হরমণি যথাক্রমে নীলদর্পণ নাটকের উড্, রোগ ও ক্ষেত্রমণি, আর হার্সেল সাহেব নবীন মাধবের "অমর নগরের নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট"।.........* "নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও তাহার ভাই দিগম্বর বিশ্বাস বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে প্রজাগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা প্রকৃত ঘটনা। নাটকের নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব রূপে ইহারাই শোভা পাইতেছে। তবে দীনবন্ধুর ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে যে-তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার সহিত শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের অনুমানে মিল নাই।" দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর "ভারত-সংস্কারক" পত্রিকার ৮ নভেম্বর (১৮৭৩) সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে এই নাটকের বাস্তব-ভিত্তির কিছু উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ—*নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দ্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তি-ভূমি।" উপাখ্যানের ভিত্তি যে জেলারই বর্ণনা হউক, নীলদর্পণ বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রত্যেক (নীল-উৎপাদক) জেলায় এবং কুঠিতে কুঠিতেই ঘটিয়াছিল। Hindu Patriot-এ পৃষ্ঠা খুলিলেই নানা সংবাদদাতার সংবাদে এই সকল ঘটনার নিদর্শন চোখে পড়িবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট—"Jessore correspondent-এর (শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের) যে-পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই দেখা যাইবে—নীলদর্পণ নাটকের সব উপাদানই সেখানে আছে। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"A hundredth part of the actual oppression has not been reported to the commission ... . Even now traces of house burning plunder, etc, ... innumerable rich men ruined to satisfy the unquenchable thirst for gain of the planters can be seen

in the indigo districts …… wives and daughters are carried and confined in the godown, where they are of course treated with the greatest insolence that can be imagined." Oates, Oman প্রভৃতি নীলকর এবং Skinner, Molony প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটদের জঘন্য অত্যাচার ও আচরণের বিবরণে পত্রখানি পূর্ণ।

উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির 'রস-রূপে' উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই বিষয়বস্তুর সহিত তদানীন্তন পল্লী বাংলার কঠিন একটি সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সুতরাং বিষয়বস্তুটি নিজেই ভাবোদ্রেকের পক্ষে সহজউদ্দীপক। এই সহজ সংবেদনা হইতে কবিকৃত অতিরিক্ত কল্পনা-পরিকল্পনার সংবেদনাটুকু পৃথক করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই এই নাটকের শৈল্পিক সংবেদনা বা মূল্য।

[নীলদর্পণ নাটকের রচনা প্রকাশ ও অভিনয়]

নীলদর্পণ নাটক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে গ্রন্থাকারের নাম ছিল না। গ্রন্থের আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ— * [নীলদর্পণং নাটকং নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর প্রজাণিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনাচিৎ পথিকেনাভি-প্রণীতং ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙলাযন্ত্রে মুদ্রিত.শকাব্দা ১৮৭২, ২ আশ্বিন] তারপর ……… "দীনবন্ধুর জীবিতকালে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' কর্তৃক প্রকাশিত দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড), [প্রকাশিত ১৩৫০, আষাঢ়ে প্রথম সংস্করণ, ১৩৫১ সালের শ্রাবণে দ্বিতীয় সংস্করণ]—নির্ভরযোগ্য এবং এখনকার শেষ সংস্করণ। নাটকখানির অভিনয় নানা কারণে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। "ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পাড়ায় পাড়ায় অভিনীত হয়। ইহাতে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। ১৮৬০-৬১" (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতীয় নাট্যমঞ্চ)। বাংলার ন্যাশনাল

থিয়েটার (পাবলিক থিয়েটার, নাট্যকার দীনবন্ধুর নীলদর্পণ-নাটকের অর্ঘ্য লইয়া ১৮৭২ খ্রীঃ সামাজিকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

[গোলক বসু+উড সাহেব+জনৈক রাইয়ত সাবিত্রী=অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নবীন মাধব=নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিন্দুমাধব=কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোরাপ+রাইচরণ গোপ এবং নীলকরদিগের মোক্তার=মতিলাল সুর সাধুচরণ+ম্যাজিষ্ট্রেট+পদীময়রাণী=মহেন্দ্রলাল বসু, সৈরিন্ধ্রি=অমৃত বসু, রোগ সাহেব=অবিনাশ কর, গোপী দেওয়ান=শিব চট্টোপাধ্যায়, (মোক্তার+আছুরী=গোপাল দাস, কবিরাজ=শশী দাস, সরলতা=ক্ষেত্র গাঙ্গুলি, রেবতী—তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, লাঠিয়াল—পূর্ণ মিত্র, রাখাল—যদু ভট্টাচার্য্য, খালাসী—গোলক বন্দ্যোপাধ্যায়।]

এই প্রথম 'গণ-নাটকে'র অভিনয় সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট—"নাটকখানি বঙ্গ সমাজে কি উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল বৃদ্ধ-বণিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা। বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার কাজ স্বরূপ নীলকরের সকল রচনা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ তাহাদেরই একজন। Uncle Tom's Cabin, Justice প্রভৃতি রচনার পাশেই দীনবন্ধুর নীলদর্পণের আসন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যাক্—"নীলদর্পণ Uncle Tom's Cabin. "টমকাকার কুটীর" আমেরিকায় কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"

নীলদর্পণ নাটকের জাতিবিচার

নীলদর্পণ নাটকখানির "বিষয়বস্তু'কে উৎসের দিক দিয়া বিচার করিয়া আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক" আখ্যা দিতে হয় বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, যে-ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-ঘটনাটি বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন। নীলকরদের অসহ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার প্রজারা ইতস্তত যে প্রতিরোধ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল এবং অনেক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার নীলকর-সাহেবদের শনির দৃষ্টিতে পড়িয়া যেভাবে অকালে ছারখার হইয়া গিয়াছিল—নীলদর্পণ নাটক অত্যাচারের, প্রজা-প্রতিরোধের এবং বহু পরিবারের শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দৃশ্য কাহিনী। যে-সকল ব্যক্তি অত্যাচার করিয়াছিল, যে-সকল প্রজা প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং যে-সকল পরিবার প্রতিরোধ করিতে গিয়া ধনে-মানে-প্রাণে মারা পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহাদের নাম স্মরণীয় হইয়া নাই—এই হিসাবে অবশ্যই নাটকের পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ব'লয়া' দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে নীল হাঙ্গামা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যে-সকল পরিস্থিতি ও ঘটনা নাটকে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ ঐতিহাসিক (কমিশনের রিপোর্ট সাক্ষ্য)—অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী নামতঃ ঐতিহাসিক না হইলেও, নাটকের ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রী কার্য্যতঃ ঐতিহাসিক – অবশ্য ঐতিহাসিক শব্দটি এখানে শুধু রাজনৈতিক ঘটনার বা ব্যক্তির ইতিহাস অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না, ইতিহাস কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গৃহীত, যে-অর্থে সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতি ইতিহাস কথাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব নাটকখানি উৎস-ভিত্তিতে—ঐতিহাসিক-'কল্প' বলিয়াই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 'সামাজিক'-বিশেষণটি যে-অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় এখানে

বিষয়বস্তুর উৎস ভিত্তিতে

সেইরূপ অবস্থা পাওয়া যায় না। এই নাটকে যে-দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে তাহার একপক্ষে আছে নীলকর সাহেবদের নিরঙ্কুশ শাসন-শোষণ-ক্ষমতা—অর্থাৎ একটা অর্থনৈতিক পরিবেষ্টনী, অন্যপক্ষে আছে শাসিত-শোষিত-উৎপীড়িত প্রজাশক্তি। সুতরাং এই দ্বন্দ্বটিকে, ঠিকভাবে বলিলে, "অর্থনৈতিক সমস্যামূলক' নাটক বলা যায়।

অন্যান্য ভিত্তিতে নাটকখানিকে কি কি বলা যায়, সেই বিচার স্থগিত রাখিয়া এবার রস-সংবেদনার দিক দিয়া বিচার করিয়া জাতি-বিচার মুখ্য কাজটি শেষ করা যাক্। এই বিচারকে একটি প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে—**নীলদর্পণকে ট্র্যাজেডি বলা যায় কি ?**

এই প্রশ্নটি অনিবার্য্য, অপরিহার্য্যও বটে। নাটকখানিকে যখন 'কমেডি-' গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে, তখন নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি মেলোড্রামা প্রভৃতির একটির মধ্যে স্থান করিয়া দিতেই হইবে। সুতরাং যিনি নীলদর্পণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তিনি উক্ত প্রশ্নের অল্প বিস্তর মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকলের মত উদ্ধার করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রচলিত মতগুলি জানিতে পারিলেই এক্ষেত্রে কাজ চলিয়া যাইবে। **কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার** মহাশয় লিখিয়াছেন—"নীলদর্পণের ঘটনা-বস্তু (action) melodrama-য় পর্য্যবসিত হইয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত emotion-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজনে লেখকের কল্পনা সংযম হারাইয়াছে, * তাছাড়া লেখক এখানে স্বল্পবস্তু সম্বল লইয়া সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির ছাঁচে ঢালিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন"—(দীনবন্ধু, ১৩৫০)।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০)—ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন— 'নীলদর্পণ করুণ রসাত্মক" (২৬ পৃষ্ঠা) ....।

নীলদর্পণের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে তরল ও অবাস্তব করিয়া দিয়াছে ...... **নীলদর্পণ ঠিক নাটক নহে, নাট্যচিত্র। ইহাতে**

কোন চরিত্রের পরিণতি অথবা মানবজীবনের কোন মূল সমস্যা কিংবা মানুষের সঙ্গে মানুষের চিত্ত-সংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই”—(১০০ পৃষ্ঠা)

'বাংলা নাটকের ইতিহাস'-- লেখক বন্ধুবর ডঃ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—“যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা শ্মশানে মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুর দৃশ্য অন্তরে যেমন কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না, এই নাটকেও তেমনি বারবার মৃত্যু দেখাইয়া মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গোলক, ক্ষেত্রমণি ও নবীনমাধবের মৃত্যু, সাবিত্রীর শোচনীয় মস্তিষ্ক বিকৃতি, ক্ষিপ্ত শ্বশ্রূর হাতে মধুর-স্বভাবা সরলতার হত্যা প্রভৃতি দৃশ্য চতুর্দ্দিকে এক লোমহর্ষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এইসব দৃশ্য নাটকখানিকে বীভৎসতামূলক (Horror Tragedy) করিয়া ফেলিয়াছে। এই রকম ট্র্যাজেডি পাত্রপাত্রীর চরিত্রের অভ্যন্তর হইতে গড়িয়া উঠে না, কেবল বাহ্যঘটনা ও দৃশ্যই এই ট্র্যাজেডির মূল উপাদান, ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা এই শ্রেণীর নাটকে নাই।”—(৭৪ পৃষ্ঠা)

বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত (১৩৫৪)—লেখক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—“নীলদর্পণ যেমন নিষ্ঠুর কাহিনীর পরিচায়ক, তেমনি মর্মন্তুদ”...

১৯৪৭

“পুত্রশোকে সাবিত্রীর উন্মাদ দশা-প্রাপ্তি পুত্রবধূর প্রাণনাশ, পুনর্জ্ঞানসঞ্চার, অনুতাপ ও মৃত্যুতে নাটকের শেষ হওয়ায় ইহাকে **বিয়োগান্ত নাটক** বলা চলে”—(৭৩ পৃষ্ঠা)। * [সাধারণ মন্তব্য]

ডাঃ শ্রীসুশীল কুমার দে মহাশয় (দীনবন্ধু মিত্র-গ্রন্থে) লিখিয়াছেন—“কিন্তু এইসব জীবন্ত চরিত্রে ও চিত্রে আশ্চর্য্য স্বভাবাঙ্কণ ও করুণ রসের অভিব্যক্তি

১৯৫১

থাকিলেও আধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞায় নীলদর্পণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইতে পারিয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। করুণ ও ট্র্যাজেডি একার্থক নয়। বিয়োগ বা মৃত্যু ট্র্যাজেডির মূল কথা নয়, কারণ অকরুণের মধ্যে এমনকি জয়ের মধ্যে মিলনের মধ্যেও ট্র্যাজেডি থাকিতে পারে।......

"ইহা সত্য, অসহায় সংগ্রামের নিষ্ফলতা, দুঃখদুর্দ্দশার কারুণ্য অথবা মৃত্যুর ঘনঘটা নীলদর্পণে যথেষ্ট রহিয়াছে। মনুষ্যত্বের অকারণ লাঞ্ছনা, জীবনের নিষ্ঠুর অপমান—এ-সমস্তই রহিয়াছে। কিন্তু এই যে অসহায়তা দুঃখদুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা. অপমান ও মৃত্যু—এখানে এ-সকলের কারণ সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ, কেবল কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার দুর্ব্বিপাক। ইহাকে দৈব বলিতে পারা যায়, কিন্তু এ-দৈব শুধু বাহিরের অন্ধ প্রকৃতির মত জগন্নাথের নিষ্পেষক রথচক্র।...... ইহার মধ্যে দুঃসহ শোক বা কারুণ্য আছে, কিন্তু সত্যকার ট্র্যাজেডি কোথায়? ট্র্যাজেডির মূলে যে সূক্ষ্ম ভাব কল্পনা থাকে, যাহা কেবল বাহিরের ঘটনা-রূপ দৈব নয়, অন্তরের পরস্পর দ্বন্দ্বপ্রবণ প্রবৃত্তিকে মানুষের নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা নীলদর্পণে নাই বলিলেও চলে।... কিন্তু আধুনিক নাটকের না হোক, প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা, তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে। বাহিরের বৃহত্তর নির্ম্মম শক্তির সহিত মানুষের অসহায় জীবনের নিষ্ফল সংগ্রাম—ক্ষুদ্র মানুষ যেন দুর্লঙ্ঘ্য দৈবের ক্রীড়নক মাত্র—এই গ্রীক ভাবটি বোধ হয় দীনবন্ধুর বিস্তীর্ণ ও বাস্তব—সচেতন সহানুভূতির উপযোগী ছিল। তথাপি ট্র্যাজেডি হউক বা না হউক, নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা অসত্য হয় নাই।"

এইবার উল্লিখিত মন্তব্যসমূহকে সিদ্ধান্তের আকারে এইভাবে সাজাইয়া লওয়া যাক্।

(১) মোহিতলাল মজুমদার—
(ক) action মেলোড্রামায় পর্য্যবসিত (মাত্রাতিরিক্ত ইমোশানের উপর জোর।)
(খ) স্বল্পবস্তু সম্বল—(কাহিনী)
(গ) সাধারণ চরিত্র-(নায়ক) ফলে
(ঘ) ট্র্যাজেডির ছাঁচ ঢালিতে গিয়া বিফল মনোরথ

[সিদ্ধান্ত—"ট্র্যাজেডি" হয় নাই [মেলোড্রামা ?]

(২) ডঃ সুকুমার সেন—

(ক) ঠিক **নাটক** নহে—
নাট্যচিত্র [?]

(খ) করুণরসাত্মক—

(গ) (মৃত্যুর ঘনঘটায়) ট্র্যাজেডি—
তরল ও অবাস্তব

* **[সিদ্ধান্ত—স্পষ্ট হয় নাই। ট্র্যাজেডি তরল ও অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও "ট্র্যাজেডি"ত্ব—অক্ষুণ্ণ আছে কি না বা না থাকিলে কি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই।**

(৩) ডঃ অজিত ঘোষ—

(ক) বারবার মৃত্যু মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট করিয়াছে।

(খ) বীভৎসতামূলক (horror tragedy) করিয়া ফেলিয়াছে।

(গ) ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা এই শ্রেণীর নাটকে নাই।

* [**সিদ্ধান্ত**—বারবার মৃত্যুতে ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট হইয়া গেলেও বীভৎসতামূলক ট্র্যাজেডি (হরর ট্র্যাজেডি) হইয়াছে—যদিও ট্র্যাজেডির—নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডি বলিতে এখানে উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডি ধরা হইয়াছে। নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা নাই।]

(৪) ডাঃ সুশীলকুমার দে— (ক) গ্রীক ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার সহিত সাদৃশ্য আছে।

(খ) বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইতে পারিয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

* [**সিদ্ধান্ত**—উভয়-কোটিক। বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকৃত ট্র্যাজেডি না হইলে কি হইবে, তাহা বলা হয় নাই।]

(ক) কবি সমালোচক মোহিতবাবুর মন্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়—শ্রদ্ধেয় সমালোচক ট্র্যাজেডিত্বের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন—এক—ঘটনার বা ক্রিয়ার মেলোড্রামাত্ব, দুই—বিষয়বস্তুর স্বল্পপ্রাণত্ব, তিন—নায়কের সাধারণত্ব। এই আপত্তির মূলে যে প্রধান ধারণাটি কাজ করিয়াছে তাহা এই যে, এই ধরনের সাধারণ বিষয়বস্তু এবং চরিত্র লইয়া ট্র্যাজেডি সৃষ্টি সম্ভব নয়। ট্র্যাজেডির জন্য চাই—মহাপ্রাণ ঘটনা এবং অসাধারণ—(যেন হয়, ধনে-মানে) ব্যক্তি চরিত্র। কিন্তু নবীনমাধবের মত ধনী মানী নায়ক এবং নীলদর্পণ-বর্ণিত ঘটনা লইয়া ট্র্যাজেডি সৃষ্টির পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক কোন বাধা নাই। আসল কথা—উপাদানকে উপাদেয় শিল্পকর্মে পরিণত করার ক্ষমতা। আর একটা কথাও এক্ষেত্রে বলিবার আছে—ঘটনাবস্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মেলোড্রামায় পর্যবসিত হইয়াছে সত্য কিন্তু মনে রাখা দরকার, মেলোড্রামাটিক ঘটনা থাক সত্ত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির স্তরে উন্নীত হইতে পারে কি না তাহাও বিচার্য। [সিরাজদ্দৌলা—দ্রষ্টব্য] একথাও অবশ্য স্মরণীয় যে সব ট্র্যাজেডিরই বিষয়বস্তুর প্রাণ একরূপ নহে এবং সব ট্র্যাজেডির আবেদনে সমান মাত্রায় সর্বজনীনতা থাকে না। গেটের 'ফাউস্ট' শেক্স্পীয়রের 'ম্যাকবেথ', গলসওয়ার্দির 'স্ট্রাইফ', পিনেরোর 'সেকেণ্ড মিসেস ট্যাঙ্কেরী',—একইরূপ আবেদন জাগায় না।

একথা ঠিক বটে যে, যে ট্র্যাজেডিতে মানবজীবনের কোন মৌলিক বা স্থায়ী সমস্যাকে উপস্থাপিত করা হয়, জীবনকে কোন অদৃশ্য অমোঘ মহাশক্তির বিরুদ্ধে বিস্ময়জনক অথচ ব্যর্থ সংগ্রাম করিয়া শোচনীয় পরিণাম লাভ করিতে দেখা যায়, সেই ট্র্যাজেডি যথার্থই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি : কিন্তু একথাও সত্য যে সকল ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এক নয়। রসের আস্বাদনও এক নয়।

(খ) ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি পর্য্যালোচনা করা যাক্। **প্রথমতঃ**—ডঃ সেন নীলদর্পণকে **'নাটক'** বলিতেই চাহেন নাই। তাঁহার মতে ইহা **নাট্যচিত্র**। তাঁহার যুক্তি—"ইহাতে কোন চরিত্রের পরিণতি অথবা মানবজীবনের মূল সমস্যা কিংবা মানুষের সঙ্গে মানুষের চিত্তসংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় পতিত কতকগুলি অসহায় মানুষের অত্যাচার পীড়নের বাস্তব চিত্র ছাড়া ইহাতে আর কিছু নাই।" নাটক ও নাট্যচিত্রের পার্থক্য নির্দেশিত না হওয়ায় ডঃ সেনের এই মন্তব্য যুক্তির মর্য্যাদা পায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ—"মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে তরল ও অবাস্তব করিয়া দিয়াছে"—এই সিদ্ধান্তটি নাটকখানির জাতি পরিচয় নিরূপণে বিশেষ কোন সহায়তা করে না। নাটকখানি ট্র্যাজেডি কি না এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না। ট্র্যাজেডি **তরল ও অবাস্তব** হইলেও ট্র্যাজেডি থাকে কি না, অথবা অন্য কোন শ্রেণীর স্তরে নামিয়া যায় কি না অথবা ট্র্যাজেডির মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ আছে কি না এ-সম্বন্ধে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

(গ) বন্ধুবর ডঃ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এইদিক দিয়া অনেক পরিমাণে স্পষ্ট। নীলদর্পণ নাটক, তাঁহার মতে—"Horror Tragedy" ; তাঁহার **প্রথম বক্তব্য** এই যে "এই নাটকেও তেমনি বারবার মৃত্যু দেখাইয়া মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" অর্থাৎ, বারবার মৃত্যু দেখানো হইয়াছে, ফলে ট্র্যাজিক অনুভূতি—(Tragic impress-

ion) নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—বক্তব্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই এই যে শেষ দিকে বারবার মৃত্যু ঘটাইয়া **ট্র্যাজিক অনুভূতি** নষ্ট করা হইয়াছে। **দ্বিতীয় বক্তব্য** এই যে নাটকখানি—বীভৎসতামূলক (Horror Tragedy)—["বাহ্য ঘটনা ও দৃশ্যই এই ট্র্যাজেডির মূল উপাদান'—আব Horror Tragedy ও এক রকমের ট্র্যাজেডি।। **তৃতীয় বক্তব্য**—"ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা এই শ্রেণীর নাটকে নাই।" প্রথম প্রশ্ন এই যে বারবার মৃত্যু ঘটিলেই কি মৃত্যুর ট্র্যাজিক অনুভূতি নষ্ট হয়?—মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুর উপস্থাপন-রীতিই কি ট্র্যাজিক অনুভূতিকে নষ্ট করে না? তারপর, ট্র্যাজিক অনুভূতিই যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে—**'হরর ট্র্যাজেডি'** বলা যুক্তিসঙ্গত কি না—(ট্র্যাজিক অনুভূতি যে-নাটকে নষ্ট, সে-নাটক ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা পাইতে পারে কি?), দ্বিতীয় কথা এই যে 'হরর ট্র্যাজেডিও' যখন এক শ্রেণীর ট্র্যাজেডি তখন তৃতীয় বক্তব্যের—'ট্র্যাজেডি' শব্দটির আগে 'উচ্চাঙ্গের' বা 'প্রথম শ্রেণী'র এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ করা দরকার, অন্যথা এইরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে "নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা"ই যেন ট্র্যাজেডির সামান্য লক্ষণ। ** ডঃ ঘোষ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—সামাজিক ট্র্যাজেডিতে তথাকথিত "নিষ্করুণ বৈরাগ্য ও সমুন্নত মহিমা"-বোধ জাগাইতে কোন দেশের কোন নাট্যকারই সমর্থ হন নাই। তাই বলিয়া সামাজিক ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই।

(খ) পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ দে মহাশয় "দীনবন্ধু মিত্র" গ্রন্থে এ-বিষয়ে—অর্থাৎ জাতি পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। (ডাঃ সেন বা অধ্যাপক ঘোষ সেইরূপ অবকাশ পান নাই) এবং অবকাশের সদ্ব্যবহার করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার **প্রথম** বক্তব্য এই যে "**আধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞায়** নীলদর্পণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইতে পারিয়াছে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে' এই সন্দেহের কারণ—"ট্র্যাজেডির মূলে যে-সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা থাকে, যাহা কেবল **বাহিরের ঘটনারূপ দৈব নয়, অন্তরের পরস্পর**

দ্বন্দ্বপ্রবণ প্রবৃত্তিকেও মানুষের নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা নীলদর্পণে নাই বলিলেও চলে"—অর্থাৎ নীলদর্পণে যে-দ্বন্দ্ব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বহির্দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়। এ-সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে ডঃ দে মহাশয়ের আলোচনায় "আধুনিক যুগের বিশিষ্ট সংজ্ঞাটি" উল্লিখিত হইলেও বিশেষ বিস্তারিতভাবে লিখিত হয় নাই এবং একথাটিও বলা হয় নাই যে, "There are tragedies of different kinds and that these kinds may differ widely from each other.

A general principle applicable to all tragedy is not to be found in the old saying that character is destiny and in the nation that tragedy reveals the influences from within which work unconsciously on outward events, ...

(এবং এমন অনেক নাটক আছে যেখানে)—there is no working out of destiny by the influence of the mind and temperament of the victim on his own fate. The overwhelming blow has come from without, from the deeds of others, the passions or errors, the ignorance or neglect of those who are plunged into misery—[Tragedy—John. S. Smart]

আসল কথা "আধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞাটি খুব স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত বা নির্দ্ধারিত হয় নাই। তেমনি বিশিষ্ট সংজ্ঞায় এমন কথাও পাওয়া যায় না যে ট্র্যাজেডির জন্য সব ক্ষেত্রেই একটা "sense of mystery" বা "Spiritual conflict", অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে—গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে-ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণাভাবের সাদৃশ্য আছে—অর্থাৎ গ্রীক মতে যেন ইহাকে ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে। তৃতীয় বক্তব্য এই যে 'ট্র্যাজেডি হউক বা না হউক নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা অসহ্য হয় নাই।' এখন, গ্রীক মতে যাহা ট্র্যাজেডি,

আধুনিক মতে তাহা কেন ট্র্যাজেডি হইতে পারিতেছে না—ট্র্যাজেডির প্রাচীন সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগের সহিত আধুনিক সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য কি তাহা ডঃ দে সম্যক আলোচনা করেন নাই। বিশেষ করিয়া আধুনিক মতে—নীলদর্পণকে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে সে বিষয়েও তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ইংরেজী মতানুসারে জাতি-নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইয়া, 'ট্র্যাজেডি হউক বা না হউক' বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া অথবা 'করুণ রসাত্মক' বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাওয়া দুইটির কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। ডঃ দে প্রশ্নটি লইয়া প্রশংসনীয় আলোচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আলোচনা একটু অসম্পূর্ণ হইয়া আছে।

আমার ধারণা—নীলদর্পণের জাতি পরিচয় নির্দ্ধারণ করিবার মূলে এত গণ্ডগোলের কারণ এই যে—আলোচনার আগে প্রধান একটি কাজ সারিয়া লওয়া হয় নাই—সেই কাজটি, আর কিছুই নয়—(ক) ট্র্যাজেডি-গোত্রীয় নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগ, এবং (খ) ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার স্বরূপ বিচার বিশেষতঃ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা: (১) ট্র্যাজেডি-রচনার চেষ্টা কোন্ কারণে 'মেলোড্রামা'-সৃষ্টিতে পরিণত হয়, (২) (ট্র্যাজেডি) রস নিষ্পত্তি না ঘটিলেই নাটক মেলোড্রামা হয় না, (৩) মেলোড্রামাটিক ঘটনা থাকিলেও নাটক ট্র্যাজেডি হইতে পারে কি না—যদি পারে কি কারণে পারে, (৪) ট্র্যাজেডিতে দ্বন্দ্বের কত রূপ হইতে পারে, (৫) ট্র্যাজেডির অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে বহির্দ্বন্দ্বের সদ্ভাবেই ট্র্যাজেডি হইতে পারে কি না। এই সকল প্রশ্ন এড়াইয়া গেলে জাতি বিচার-চেষ্টা কিছুতেই সফল হইতে পারে না, কারণ বিচার মাত্রই বিধানসাপেক্ষ। সুতরাং প্রথমেই শ্রেণীবিভাগের রূপটি দেখা যাক। শ্রেণীবিভাগের প্রথম পর্ব্বে—(এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস-এ) মাত্র দুইটি শ্রেণীর নাম দেখা যায়। এক—ট্র্যাজেডি (imitation of serious actions—incidents arousing pity and fear), দুই—(dramatising the

ludicrous) ট্র্যাজেডিতে **ভয়ানক ও করুণ** (অথবা **ভয়ানক বা করুণ ?**) ঘটনার উপস্থাপনা—**এমন সব নায়কের ঘটনা যাহারা**—"have done or suffered something terrible"। আর কমেডি নিম্নস্তরের লোকের ভাব ও হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনা—এইরূপ কথা থাকিলেও, এ্যারিস্টটলের কাছে "spirit of comedy" শুধু যে হাস্যরস নয়, আনন্দ-পরিণামত্বই কমেডির আত্মা, তাহা প্রমাণ করা চলে। যাহা হউক, দৃশ্যাত্মক serious imitation বলিতে এ্যারিস্টটল মোটামুটিভাবে ট্র্যাজেডিই বুঝিয়াছেন এবং ট্র্যাজেডিকে সাকল্যে চার (পাঁচ বলা যায়) ভাগে ভাগ করিয়াছেন—যেমন, (১) **কম্‌প্লেক্‌স ট্র্যাজেডি** (গঠন-ভিত্তিতে), (২) **সিম্পল ট্র্যাজেডি** (গঠন-ভিত্তিতে), (৩) **প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি** (রস-ভিত্তিতে), (৪) **এথিক্যাল ট্র্যাজেডি** (তত্ত্ব-ভিত্তিতে), (৫) **স্পেক্‌টাকুলার** ?—(দৃশ্য-ভিত্তিতে)।

তারপর, রোমান ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রকৃতি, শ্রেণীবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। **'সেনেকা'র** ট্র্যাজেডিতে ভয়ানক-রস প্রাধান্য লাভ করে—'pity' অপেক্ষা 'fear' সৃষ্টির দিকে তথা 'moral sense' চরিতার্থ করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি **প্লটাস ও টেরেন্সের** কমেডিতে হাস্যরস বেশ গাঢ় হইতে থাকে—লঘু ঘটনার সহিত গুরুভাবাত্মক ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটে। এইভাবে ক্রমে ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগে '**হরর ট্র্যাজেডি**" শ্রেণী এবং কমেডির শ্রেণীবিভাগে—"**নিউ কমেডি**" শ্রেণী দেখা দেয়।

তারপর, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে নাটকে এবং নাটকের শ্রেণীবিভাগে আরো নূতন সংযোজনা ঘটে। কমেডি বলিতে আর শুধু হাস্যোদ্দীপকের নাট্যরূপ বুঝায় না, কমেডি এখন—"deal with the most familiar and domestic not to say base vile operations" (ডেনিয়োলা ১৫৩৬) অন্যদিকে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাচীন ট্র্যাজেডিতে নায়ক ও ঘটনা প্রধানতঃ ঐতিহাসিক—অর্থাৎ রাজরাজড়া গোছের ব্যক্তি। এ্যারিস্টটল প্রমাণ তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে ট্র্যাজেডিতে

নায়কের বা ঘটনার ঐতিহাসিকত্ব অপরিহার্য্য নয়, কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা লইয়াও ট্র্যাজেডি লেখা সম্ভব, তবে একথাও বলিয়া দিয়াছেন--চরিত্র ও ঘটনাকে অবশ্যই যথাক্রমে উচ্চবংশীয় এবং গুরু-গম্ভীর হইতে হইবে। **রেণেসাঁসে** এই সিদ্ধান্তটি এইভাবে গৃহীত হইয়াছে—ট্র্যাজেডির কাজ করিবার—"with the death of high Kings and the ruins of great empires"। **কিন্তু এই সময়েই** "Domestic Tragedy" **জাতীয় ট্র্যাজেডির জন্ম হয়** এবং নাট্যকার মার্লোর ডাঃ ফসটাসে—ডোমেষ্টিক ট্র্যাজেডির নায়কে তথা ট্র্যাজেডি-নায়কের সংজ্ঞায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়। ট্র্যাজেডি লিখিতে হইলে রাজা-মহারাজাকে বা রাজপরিবারের লোককেই নায়ক করিতে হইবে তথা সর্ব্বজনীন কোন বিখ্যাত ঘটনাকেই বিষয়বস্তু করিতে হইবে—এই নিয়মটি শিথিল হইতে থাকে।—'Arden of Feversham' এর মত নায়ক এবং তাঁহার মত লোকের পারিবারিক ঘটনা ট্র্যাজেডির উপস্থাপ্য বিষয় হইবার যোগ্যতা লাভ করে।

অধিকন্তু এই সময়েই—**ট্র্যাজেডি-কমেডি** জাতীয় নাটকও জন্ম লইতে থাকে। স্পেনদেশীয় **লোপ ডি ভেগা ও ক্যালডিরণের** রচনাতে এবং ইংলণ্ডের 'জন লিলির' (Joan Lyly)—রচনায় (Campaspe—A Tragical Comedie—1584) এই শ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। তারপর ড্রাইডেনের—'An Essay of Heroique plays (1672)—প্রবন্ধে একটি নূতন শ্রেণী-কল্পনার সাক্ষাৎকার ঘটে'—এই নাটকের বিষয়বস্তু—"love and valour aught to be the subject of it".

অষ্টাদশ শতাব্দী, নাটকের শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া, খুবই স্মরণীয়। ফরাসী দেশীয় **দিদেরো** এবং **বুমারকেইস** 'সিরিয়াস ড্রামা'কে শ্রেণীবিভক্ত করিতে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখান। **দিদেরো** লিখিয়াছেন—(১৭৫৮) "Here is the whole field of drama. The gay Comedy whose purpose it is to ridicule and chastise vice; Serious Comedy whose

office it is to depict virtue and duties of man ; that sort of tragedy which is concerned with our domestic troubles and finally, the sort of tragedy which is concerned with public catastrophes and misfortunes of the great" এই শ্রেণী-বিভাগ ছাড়াও আরো কয়েকটি শ্রেণীর কল্পনা তিনি করিয়াছেন—যেমন, "Moral Drama" যাহাতে ·· ··· "the most important moral problems will be discussed without interfering with the swift and violent action of the play" [বার্ণার্ড শ' মহাশয়ের Drama is discussion and nothing but discussion—নূতন চিন্তা বা কথা নয়] ; যেমন—"Philosophical Drama" ······

ইহা ছাড়াও **দিদেরো**—নাটককে ঘটনা, রস ও চরিত্রের আপেক্ষিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার মতে—"play of incident" (ঘটনা-মুখ্য নাটক) অপেক্ষা—রস-মুখ্য (play of Passion, Ideas) এবং চরিত্র-মুখ্য নাটক (play of character) অধিকতর উন্নত সৃষ্টি। **বুমারকে** মহাশয়—"সিরিয়াস ড্রামা'র পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—(১৭৬৭) "Tragic Comedy, Bourgeois Tragedy. Tearful Comedy—I can find no term to designate this hybrid."—তাঁহার সিদ্ধান্ত The serious emotional drama stands midway b tween heroic Tragedy and light Comedy'—অর্থাৎ বুমারকেইস-দিদেরোর "Domestic Tragedy" এবং "সিরিয়াস কমেডি"—সিরিয়াস ড্রামার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই ভদ্রলোকের একখানি চিঠিতে ('Dedicatory Letter to the Barber of Seville') "Pathetic drama" লেখার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং উলটো ধরনের একটা ঘোষণাও আছে—"There is no mean way between Comedy and Tragedy"। এই শতাব্দীরই শেষ দিকে (১৭৯২) **ক্রিডিশ**

ভন শিলার মহাশয় (on Tragedy Art প্রবন্ধে) ঐতিহাসিক রচনা (historic imitation) এবং রস রচনার ('poetic imitation') মধ্যে একটা পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আলোচনার মধ্যে আমরা পরবর্ত্তীকালের **"হিষ্ট্রি প্লে"**, এবং **"হিষ্টোরিক্যাল ট্র্যাজেডি-কমেডি"** বিভাগের রচনা দেখিতে পাই। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা মোটামুটিভাবে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ পাই—(১) হিরোইক ট্র্যাজেডি, (২) ড্যমেষ্টিক ট্র্যাজেডি, (বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি, প্যাথেটিক ড্রামা), (৩) সিরিয়াস কমেডি, (৪) গে কমেডি *, [(৫) ইতিহাস নাট্য, (৬) সমস্যামূলক নাট্য ··প্রভৃতির ভ্রূণাবস্থা।] তবে এই শতাব্দীর শেষেই, সিরিয়াস ড্রামার বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে উপরিভাগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। এই ক্ষেত্র "মেলোড্রামার" ক্ষেত্র। আমরা দেখিয়াছি—এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া—'স্পেকটাকুলার' ট্র্যাজেডিকে অধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই কথাটিই বলিতে চাহিয়াছেন যে—নাটকে রস যে-পরিমাণে বাহ্য-দৃশ্য বা উপায়ের মুখাপেক্ষী সেই পরিমাণেই নাটকের লঘুত্ব। আর একটি বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—তাহা এই যে—'within the action there be nothing irrational' তাৎপর্য্য এই যে, নাটকে যেখানে দৃশ্যের বা বাহ্য উপায়ের প্রাধান্য থাকে, ঘটনায়, রসে ও চরিত্রে অনৌচিত্য দোষ প্রকটভাবে দেখা দেয়, সেখানে নাটকের রস-নিষ্পত্তি অনবদ্য হইতে পারে না। ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়—**এ্যারিস্টটলের নির্দ্দেশের মধ্যেই মেলোড্রামার স্বরূপটি বীজাকারে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে মেলোড্রামার স্বরূপ আলোচনায় এই বীজটিই অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়াছে।**

'মেলোড্রামা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত—অর্থ (Melos = গীত + drame = নাট্য) গীতনাট্য। ইতালীতে "অপেরা" ও মেলোড্রামা প্রায়ই একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইতালী হইতে ফ্রান্সে শব্দটি অপেরা-অর্থ লইয়াই প্রবেশ করে এবং

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে "বিশিষ্ট"-অর্থ পরিগ্রহ করে, এই "specialized significance—signifying a popular play with a sensationally serious plot broken by comic scenes and accompanied throughout by incidental music. In this kind of production no attempt is made at securing depth of purpose or literary grace; hence the melodramatic characters tend to become a series of stock types, presented in simple terms of white and black, while the author frankly allow action to preponderate over dialogue"—(World Drama—Nicoll) 'Kotzebue' এবং pexere' court এই জাতীয় মেলোড্রামার প্রবর্ত্তক এবং বলা যায় রোমান্টিসিজিমেরই বিকৃতি হইতে ইহারা জন্ম গ্রহণ করে। দুর্ব্বল রোমান্টিকের মাত্রাহীন ও আপাত-গভীর অসংযত আবেগ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে, এইরূপ উত্তেজক ঘটনাময়, ধরাবাঁধা বা ছাঁচে-ঢালা—চরিত্র-যুক্ত, মাত্রাহীন ভাবাবেগোচ্ছ্বাসময়, অগভীর ট্র্যাজেডি-জাতীয় 'সিরিয়াস ড্রামা' অর্থেই মেলোড্রামা শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর নাট্যতত্ত্ব-গ্রন্থে 'মেলোড্রামা'র লক্ষণ নিরূপণে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়—অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়ের—"দি থিওরি অফ ড্রামা"-গ্রন্থে (১৯৩১)। অধ্যাপক নিকলের মতে **মেলোড্রামা**—one of the chief antitheses to high tragedy" এবং উচ্চাঙ্গের নাটক ("great drama") যাহা distinguished by ...... penetrating and illuminating and power of characterisation or at least by an insistence upon something deeper and more profound than mere outward events." তাঁহার সিদ্ধান্ত, এক কথায়,—"It is, then some inner quality—the stressing of the spiritual as opposed to the

merely physical—that makes tragedy out of melodrama and comedy out of farce অধ্যাপক নিকলের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তই সংগ্রহ করা যায় যে মেলোড্রামা ট্র্যাজেডিরই 'plebeian relative'—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি রচনার উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয় না, তখনই 'মেলোড্রামা'র সৃষ্টি হয়। **কিন্তু নিকলের এই সিদ্ধান্তকে সকলে মানেন না।** কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে শুধু ট্র্যাজেডি লেখায় ব্যর্থ হইলেই যে মেলোড্রামার সৃষ্টি হয় তাহা নয়—'প্রব্লেম প্লে' লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, মেলোড্রামার সৃষ্টি হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ—ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ না হইলেই মেলোড্রামায় পর্য্যবসিত হয় না, অরসোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি মাত্রই মেলোড্রামা নয়।**

এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। ট্র্যাজেডি অরসোত্তীর্ণ বা অসার্থক রচনা হইয়াও যদি মেলোড্রামা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে **মেলোড্রামাত্ব বিশেষ ধরনের অসার্থকতা—যে অসার্থকতা দেখা দেয়—বিষয়বস্তুর বাস্তবিক গুরুত্বের অভাবে, ঘটনা ও চরিত্রের ঔচিত্য গুরুত্বের অভাবে, জীবনের রস ও রূপের এক কথায় জীবনের গভীর তাৎপর্য্য ব্যঞ্জনার অভাবে।** বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং ঘটনা চরিত্র, রস প্রভৃতির মধ্যে ট্র্যাজিক সংবেদনা থাকলে—এবং তদ্দ্বারা ট্র্যাজেডি-বোধ (impression of tragedy) উদ্রিক্ত হইলে চরিত্র-সৃষ্টির চমৎকারিত্বের অভাব, রস-নিষ্পত্তির অভাব সত্ত্বেও, নাটককে ট্র্যাজেডি-শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি, **রসনার** দিক দিয়া দুর্বল বা অসম্পূর্ণ হইলেও **বোধ** অংশের দাবীতে ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান পাইবে—অবশ্য, 'অসার্থক' সৃষ্ট হিসাবেই পাইবে।

নীলদর্পণ নাটকের জাতি-পরিচয় দেওয়ার আগে উল্লিখিত আলোচনা স্মরণ করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। একথা সত্য—নীলদর্পণে মেলোড্রামাটিক ঘটনা আছে, চরিত্র পরিস্ফুট রূপ পায় নাই, রস-নিষ্পত্তিও ভাব-ভাষার অনৌচিত্যের

প্রতিবন্ধকতায় তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই ; **কিন্তু একথাও সত্য, নীলদর্পণ নাটকের ঘটনাবস্তুর বাস্তবিক বা সামাজিক গুরুত্ব অবিসংবাদিত।** ইহাতে—ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে মহাশয়ের ভাষায়—"অসহায় সংগ্রামের নিষ্ফলতা, দুঃখদুর্দ্দশায় কারুণ্য, অথবা মৃত্যুর ঘনঘটা ····। মনুষ্যত্বের অকারণ লাঞ্ছনা, জীবনের নিষ্ঠুর অপমান ··· রহিয়াছে। আর একথাও স্বীকার্য্য যে—এই অসহায়তা দুঃখদুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান ও মৃত্যু"—প্রভৃতির কারণ সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ, কেবল কতকগুলি "আকস্মিক ঘটনার দুর্ব্বিপাক" নয়। নাটকে যে পরিবেষ্টনীর সহিত নায়কের দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে তাহাকেও 'তাৎপর্য্যহীন শক্তি' বলা চলে না, কারণ যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেষ্টনী উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা কাল্পনিক নহে—বাঙালীর ইতিহাসের বিশেষ পর্ব্বের একটি জীবন-মরণ সমস্যা দিয়া এই পরিবেষ্টনী গঠিত।

তারপর একথাও বলা চলে না যে নায়কের ভাগ্য-বিপর্য্যয় বা শোচনীয় পরিণতির মূলে নায়কের কোন 'প্রবৃত্তি'র দায়িত্ব মোটেই নাই। বসু-পরিবারের শোচনীয় পরিণামের জন্য, নবীনমাধবের আত্মমর্য্যাদাবোধ, প্রজা-বাৎসল্য বা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তি যে অংশতঃ দায়ী, একথা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। **প্রথমতঃ**—দেখা যায় নাটকের দ্বন্দ্বের জন্য যে পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি এক অর্থে অর্থনৈতিক বটে কিন্তু বিশেষ অর্থে ঐতিহাসিক-কল্প (semi historical)। এই কারণেই **এই দ্বন্দ্বটি** "game-level"-**এর কোন ব্যাপার নয়**—ইহার সহিত বাঙালী-জীবনের একটি ঐতিহাসিক সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব শুধু বসু-পরিবারের দ্বন্দ্ব নয়, বসু-পরিবার এখানে পল্লী-বাংলারই প্রতিনিধি—নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরুপায় বাঙালী কৃষক-প্রজার কেন্দ্রীভূত প্রতিরোধ। এই কারণেই যাহাকে বলে—depth of purpose বা 'pervasiveness of problem' তাহা এখানে আছে। সুতরাং ইহা যে সামাজিক ট্র্যাজেডির উপযুক্ত

পরিস্থিতি এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। **দ্বিতীয়তঃ**—এই নাটকের যে-নায়ক সেই বসু-পরিবারটির শ্রেষ্ঠ সন্তান নবীনমাধবের এই জাতীয় ট্র্যাজেডি-নাটকের নায়ক হইবার যোগ্যতা অবশ্যই আছে। অবশ্য ইহা আমরা জানি বংশগৌরব নায়কের অপরিহার্য্য কোন গুণ নয়, বংশে সাধারণ গুণের অসাধারণ যে-কোন লোকই ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে পারে। নবীনমাধব ধনে মানে সুখ্যাত ব্যক্তি। **নবীনমাধবের সাহস বিস্ময়কর।** সাহেবের সামনে দাঁড়াইয়া বলেন—"আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ-বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।" **নবীনমাধব নীলকর গোষ্ঠীর প্রধান শত্রু**—"পলাশপুর জালানো কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বসু ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, ..." **নবীনমাধব প্রজারক্ষার্থে দীক্ষিত।** তাহার কথা—"গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে" দীক্ষিত হইয়াছ, নিষ্ঠুর **নীলকরের** পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব" ... অর্থাৎ নবীনমাধবের নায়ক হইবার নৈতিক যোগ্যতাও যথেষ্ট।

তৃতীয়তঃ—নবীনমাধবের চরিত্রে যদি কোন দোষ থাকিয়া থাকে তাহা তাঁহার মহত্ত্ব; বস্তুত, মহাপ্রাণতাই তাঁহার শোচনীয় পরিণতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। মানের প্রতি বা প্রজার দুঃখঃদুর্দ্দশার জন্য মমতা না থাকিলে তাঁহার জীবনে অত বড় শোচনীয় পরিণাম অত শীঘ্র দেখা দিত না। **চতুর্থতঃ**—নায়কের আচরণে একটা নির্ভীক অথচ নিরুপায় সংগ্রামের দৃশ্য একটা "reaction against calamity" ফুটিয়া উঠিয়াছে। **পঞ্চমতঃ**—নাটকে যথেষ্ট ভয়ানক ও শোকাবহ ঘটনা আছে। **ষষ্ঠতঃ**—নাটকের পরিণাম রীতিমত বিষাদান্ত—মৃত্যু, হত্যা, উন্মত্ততা, প্রলাপ, বিলাপ প্রভৃতিতে "element of calamity and suffering (Smart-এর) নিদর্শন পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ লক্ষণ নাটকে সবই আছে এবং নাটকখানি tragic

impression-এর প্রধান লক্ষণটি—"the unmeritted suffering"-এর বোধও জাগ্রত করে। একথা সত্য—নাটকের শেষে ভয়ানক ও করুণ রসের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে, কিন্তু **রস-নিষ্পত্তির ত্রুটির** কথা বাদ দিলে—আপাততঃ হিসাবের বাহিরে রাখিলে এবং জন এস স্মার্ট মহাশয়ের নিম্নলিখিত উক্তিটি—"A general principle applicable to all tragedy is not to be found in the old saying that character is destiny and in the notion that tragedy reveals the influences from without ….

"A person in ordinary life who has been conspired against and sinned against, brought to misery or death by the crimes of others, becomes for most men a tragic figure … It is a legitimate one, and we can only refuse to call it tragic by putting some refined or esoteric significance.—সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, একথাও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে—নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি-গোত্রীয় নাটক বটে তবে, পূর্ণমাত্রায় রসোত্তীর্ণ নয়। মেলোড্রামা-সুলভ ঘটনা বিন্যাস থাকিলেও বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য ও তাৎপর্য্য—ঘটনার গুরুত্ব, নায়কের জীবনের সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতি, নাটকখানিকে মেলোড্রামার পংক্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। নীলদর্পণ পরিকল্পনায় এবং সংবিদ সৃষ্টির দিক দিয়া (impression) ট্র্যাজেডি বটে কিন্তু **রস-নিষ্পত্তির দিক দিয়া অসার্থক রচনা হইয়া আছে।** একথা আগেই বলা হইয়াছে, রস-নিষ্পত্তির দিক দিয়া অসার্থক হইলেই ট্র্যাজেডি মেলোড্রামা হইয়া যায় না। নীলদর্পণ অসার্থক বা অনবদ্য সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মেলোড্রামা হইয়া পড়ে নাই।

*** নায়ক কে?**

এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠিতে পারে—নীলদর্পণ নাটকের 'নায়ক' বলিয়া যিনি পরিচিত, সেই নবীনমাধব যথার্থই ট্র্যাজেডি নায়কের একক প্রাধান্য পাইয়াছেন

কি না ? একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে নাটকে নেতৃচরিত্র যতখানি প্রত্যক্ষবৎ হওয়া উচিত ততখানি হয় নাই এবং হয় নাই বলিয়াই নবীনমাধব প্রাধান্য পাইয়াও সমুন্নত এককত্বের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এখন প্রশ্ন, এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'-প্রাধান্য ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে অপরিহার্য্য কি না ? এই প্রসঙ্গে নাট্যতত্ত্ব-বিশারদ অধ্যাপক নিকল "দি ট্র্যাজিক হিরো"—অধ্যায়ের "দি হিরোলেস ট্র্যাজেডি"—পরিচ্ছেদে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। নাট্যকার গলস্ওয়ার্দির "স্ট্রাইফ্" এবং "জাষ্টিস" নাটক, নাট্যকার মিঃ ও-'কেসি'র "সিলভার ট্যাসি" নাটক, তাঁহার মতে—"seem to be entirely lacking in a hero of adequate proportions." তিনি বলেন—"In none of these plays does one single figure, or one single pair of figures, loom up sufficiently large to take dominating importance in our minds, and we have, therefore no hero or heroes in the older sense of the word."—কিন্তু তবু "each of those plays definitely summons something of a tragic impression" ট্র্যাজিক সংবিদ জাগে কেন তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—এই ধরনের নাটক ব্যক্তি-এককত্বার প্রাধান্য আপেক্ষিত নয় কারণ এই নাটকে প্রধান পাত্র-পাত্রীরা "are regarded merely as symbols, or as part of humanity"। এই ধরনের নাটকে "The person who takes the chief role in the play is there, not in himself the hero ; he is such only by virtue of the fact that he is a man" নীলদর্পণ নাটকের নায়ক নবীনমাধব প্রতিরোধ শক্তির অধিনায়ক—প্রতিরোধের প্রতীক নবীনমাধব শুধু স্বরপুরের 'বড়বাবু' নন, সমগ্র বাংলা দেশের বড়বাবু—যিনি নীলকর অত্যাচারের বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া, মরিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার একক প্রাধান্য স্পষ্টভাবে রূপায়িত না হইলেও তিনিই এই নাটকের নায়ক। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—এই নাটকে নায়ক এক নয়—নায়ক একটি 'দল' (group), নবীনমাধব সেই দলের দলপতি।

সমালোচনা

বৃত্তের গঠন

নীলদর্পণ নাটকে উপস্থাপ্য বিষয়—গোলোক বসু ও সাধুচরণ—এই দুইটি পরিবারের ট্র্যাজেডির দর্পণে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, অবিচার জুলুম এবং প্রজার ধন-প্রাণ-মান-ইজ্জৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলার দৃশ্য প্রতিফলিত করা। গোলোক বসুর পুত্র নবীনমাধব সাহেবদিগের প্রধান প্রতিপক্ষ, কারণ সাহেবদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া তিনিই দাঁড়াইয়াছেন। প্রথম অত্যাচার—ধনমানের উপর জুলুম, তাহার প্রধান লক্ষ্য নবীনমাধবের পরিবার। দ্বিতীয় এবং চরম অত্যাচার নারীর ইজ্জতের উপর—সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণি ইহার লক্ষ্য। তৃতীয় অত্যাচার—সাধারণ প্রজাদের উপর সাত কুঠির জলখাওয়ানো, শ্যামচাঁদের প্রহার, বুটের লাথি, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া……আরো কত কি। এখানে বসু-পরিবারের বৃত্ত প্রধান কাহিনী 'আধিকারিক'; সাধুচরণ-ক্ষেত্রমণি কাহিনী প্রাসঙ্গিক। * * *

সন্ধি অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক-বিভাগ

* প্রথম সন্ধিতে বীজস্থাপনা—(Exposition)। প্রথম অঙ্কের চারিটি গর্ভাঙ্কে এই বীজ স্থাপনা করা হইয়াছে। প্রথম গর্ভাঙ্কে—গোলোক বসু ও সাধুচরণের কথোপকথনের মধ্য দিয়া বসু-পরিবারের অবস্থা—'সোনার স্বরপুরে'র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র—বাস্তুভিটার প্রতি স্বাভাবিক মমতা (sentiment), সাহেবদের পত্তনি লওয়ার পরে গ্রামের দুরবস্থা—সাহেবদের অত্যাচারের নমুনা, নায়ক নবীনমাধবের চরিত্র—সাহেবদের জুলুমের মুখে সৎসাহস দেখানো—সাহেবদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার সঙ্কল্প উপস্থাপিত। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—সাধুচরণের পরিবারের উপর—অত্যাচারের আরম্ভ: 'পাঁপোলতলার জমিতে

দাগ মেরেচে', তারপর রাইচরণ-সাধুচরণকে জোর করিয়া কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—কুঠির সাহেব ও তদনুচরদের চরিত্র ও নিষ্ঠুর আচরণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—সাহেবের উৎপীড়ন হইতে সাধুচরণকে বাঁচাইতে গিয়া নবীনমাধবের ভাগে;—'শালা বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর, গালা-গালি ও চরম লাঞ্ছনা। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—নবীনমাধবের পারিবারিক সম্প্রীতি—সুখের সংসারের চিত্র—শাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে দুই জায়ে জায়ে মধুর সম্পর্ক—সাবিত্রীর সহিত ক্ষেত্রমণির-মা রেবতীর আলাপ-আলোচনায়—পদী ময়রাণীর আনাগোনা ও ক্ষেত্রমণির প্রতি সাহেবের লোভের কথা প্রকাশ। * ভাবী ঘটনা ও রস সৃষ্টির আয়োজন এই অঙ্কে সুন্দর মিতব্যয়িতার সহিত স্থাপিত হইয়াছে। এই নাটকে যে-রস সংবেদনা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হইয়াছে, তাহাতে একাধারে গোলোক বসুর সোনার সংসার—নবীনমাধবের সৎসাহস ও প্রজাদরদ যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক সাধারণ রাইয়ত সাধুচরণ-রাইচরণের সংসার—বিশেষতঃ গর্ভবতী ক্ষেত্রমণি। শেষাদকে যে-করুণ রস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার জন্য সাবিত্রী, সরলা ও সৈরিন্ধ্রীর মধুর সম্পর্কটি অপরিহার্য্য উপাদান।

প্রতিমুখ-সন্ধি—দ্বিতীয় অঙ্কে—তিনটি গর্ভাঙ্কে। বীজ এখানে অঙ্কুরিত। নবীনমাধবকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে সাহেবরা মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়াছে, নবীনমাধবের অনুরক্ত প্রজাদের মুখ হইতে মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য প্রজাদের কুঠির গুদাম-ঘরে আটক করিয়া অত্যাচার চালানো হইতেছে। প্রথম গর্ভাঙ্কে—বেগুনবেড়ের কুঠির গুদাম-ঘরে—তোরাপ ও আরও চারজন রাইয়ত বন্দী। তাহাদের মনে বড় দ্বন্দ্ব—"ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে যার· হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হালগোক বেঁচয়ে নে ব্যাড়াচ্চে মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বডবাবুর বাপকে কি কয়েদ করে দেব?"—(তোরাপ) কিন্তু 'রামকান্ত' ও বুটের গুঁতায় সকলেরই প্রাণ যায় যায়। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—বিন্দুমাধবের পত্র মারফত মকদ্দমার সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং সরলতাকে

বিরহ-ব্যথার সাহায্যে হৃদয়-পীড়নের বেদনা সঞ্চার করার চেষ্টা হইয়াছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—পদী ময়রাণীর স্বগতোক্তির সাহায্যে—ক্ষেত্রমণির জন্য সাহেবের জিদ, এবং লাঠিয়ালপক্ষীয় সংলাপে—লুঠের বিবরণ পেশ করা হইয়াছে—নবীনমাধবের স্বগতোক্তিতে—মকদ্দমার অবস্থা—ম্যাজিষ্ট্রেট ও নীলকুঠি সাহেবের বন্ধুত্বের সংবাদ প্রভৃতি আক্ষিপ্ত হইয়াছে।

গর্ভসন্ধি।—তৃতীয় অঙ্কে—চারটি গর্ভাঙ্কে॥

প্রথম গর্ভাঙ্কে—গোপী ও উডের কথোপকথনে নবীনমাধবের বর্তমান অবস্থা বর্ণিত··· "নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়েছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ একপ্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবার একেবারে পতন হইয়াছে"। অবশ্য নবীন বসুর ব্রত এখনও ভাঙ্গে নাই। প্রজার ধনপ্রাণ বাঁচাইবার ঝোঁক এখনও আছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে দেশের যে-শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে নবীনমাধবের জবানিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—"এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না···" এক কথায় **চরম কৃষি সঙ্কট**। তারপর—চরম অত্যাচার—নারীর ইজ্জৎ নষ্ট করা—লাঠিয়ালরা ক্ষেত্রমণিকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যায়। নবীনমাধব—বড়বাবু; বড়বাবু ছাড়া আর কে উদ্ধার করিতে পারে? নবীন ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়া যায়।* তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—বিখ্যাত পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্যটি—(মোহিতলালের মতে—'এ-দৃশ্যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে) গর্ভিনী নারীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের—এবং

নবীনমাধব ও তোরাপের সৎসাহস ও বীরত্বের দৃশ্য। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—সাবিত্রীর আক্ষেপ ক্রন্দনের মাধ্যমে গোলোক বসুর দুঃখ-দুর্ভোগ 'ফোজদুরিতে ধয়্যে নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে'—প্রভৃতি দুর্ঘটনার উপস্থাপনা।

চতুর্থ অঙ্কে—বিমর্ষ-সন্ধি। এই অঙ্কে ঘটনা ট্র্যাজেডির উপকণ্ঠে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম গর্ভাঙ্কে—'ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারি'তে বিচারের প্রহসন! গোলোক বসুর প্রতি—নীলকর-ক্রীতদাস মূঢমতি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি'। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—নবীনমাধব—বিন্দুমাধব প্রভৃতির অন্তর্দাহ। ডেপুটির মুখে নবীনমাধবের ট্র্যাজেডির উদ্‌ঘোষণা—"নবীনবাবু অতি বীরপুরুষ পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্‌ঝটিকায় নবীনবাবুর সদগুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।" পণ্ডিতের মুখে—সমস্ত শাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের সমালোচনা এবং শেষ অংশ—জেলে কোনরূপ বিপত্তর ইঙ্গিত। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—ইন্দ্রাবাদের জেলখানায়—গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান—বিন্দুমাধবের শোকোচ্ছ্বাস বসু-পরিবারের চরম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দৃশ্য।

পঞ্চম অঙ্কে—উপসংহার। যাহাকে বলা যায় Catastrophe—Calamity and suffering-এর একশেষ—বীজের চরম পরিণতি। প্রথম গর্ভাঙ্কে—গোপী ও গোপের কথোপকথনের মধ্য দিয়া নবীন বসুর পরিবারটির জন্য গোপীর আক্ষেপ দেখানো হইয়াছে এবং সাবিত্রী ও সরলার গুণপনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সরলা-হত্যাজনিত করুণ রসের উদ্দীপন-বিভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোপীর ভক্তিতে অনন্য নেতৃচরিত্রের উপর নূতন করিয়া আলোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—জানানো হইয়াছে—"নবীন মরেও এক কামড কামড়াবে।" গোলোক বসুর অপমৃত্যুর শোচনীয়ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ।"—(গোপী)। নবীন বসুর বিরুদ্ধে উড সাহেবের নূতন অত্যাচারের উদ্যোগ করিতে দেখা যায়—"হারামজাদাকে কাল আমি

গ্রেপ্তার করবো।" আর বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে—গোপীর চরিত্রটির মাধ্যমে নীলকর সাহেবদিগের অনুচরদের অধঃপতনকে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—নবীনমাধবের মান বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ দেওয়ার দৃশ্য—তোরাপ প্রভৃতির বড়বাবুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা—কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মূর্চ্ছাপন্ন নবীন-মাধবকে লইয়া শোকের উৎক্ষেপ—সাবিত্রীর মূর্চ্ছা—সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ ও প্রলাপ (এমনকি পয়ার-ছন্দে বিলাপ)—'সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ' সাবিত্রীর উন্মাদ অবস্থা। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—'ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি—ও মৃত্যু। (সাধুচরণের পরিবারে চূড়ান্ত দুঃখের আঘাত) চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—সাবিত্রীর মৃত পুত্রের শব লইয়া উন্মাদ-প্রলাপ—উন্মত্ত সাবিত্রীর হাতে সরলতার অপমৃত্যু (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান—গলার উপর নৃত্য, বিন্দুমাধবের আর্ত্তনাদ—সাবিত্রীর জ্ঞানসঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে শোকাঘাতে ভূতলে পতনান্তর মৃত্যু··· বিন্দুমাধবের 'রোদন—আক্ষেপ='স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তি-নাশায় বিলুপ্ত হইল।' এবং শেষে পয়ারবন্ধে বিলাপ।

* নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং নাটকে উপযুক্ত ঘটনার সুনির্ব্বাচন অবশ্যই চাই এবং ঘটনাকে অধিকতর মাত্রায় দৃশ্য বা প্রত্যক্ষবৎ করিবার প্রয়োজনও বেশী। দৃশ্য-পরিকল্পনা নাট্যকার-প্রতিভার প্রথম পরীক্ষা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই নাটকের দৃশ্য-পরিকল্পনায় অধিকতর মাত্রায় প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা রীতি অবলম্বিত হয় নাই; নায়কের গুণ ও চরিত্রকে যত পরোক্ষভাবে রূপ দেওয়া হইয়াছে তত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয় নাই। তাহা করা হইলে অবশ্যই নায়কের ব্যক্তি-প্রাধান্যের এবং নাটকের রস-নিষ্পত্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাইত। তবে নীলদর্পণের বৃত্ত সমালোচনার সময় এই কথাটি সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে নাটকখানির 'এ্যাকশান'. অনেক পরিমাণে যাহাকে বলে 'ইলাসট্রেটিভ এ্যাকশান' তাহা না হইয়া পারিবে না। নীলকরদের অত্যাচারের রূপগুলি উপস্থিত করাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে দৃশ্য-পরিকল্পনার মধ্যে অত্যাচার নির্দ্দেশগুলির প্রদর্শনের দিকে অধিকতর ঝোঁক

পড়িবে ইহাই স্বাভাবিক। তাই বলিয়া ইহা নীলকর অত্যাচারের খাপছাড়া কতকগুলি দৃশ্য নহে। আগেই দেখাইয়াছি এই বৃত্তটি যথারীতি সন্ধি-বিভক্তি এবং একটি আরম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত কাহিনীতে ক্রমগতি রহিয়াছে। প্রতিরোধের সঙ্কল্পে কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে এবং নবীনমাধবের শোচনীয় মৃত্যুতে প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। ইহাও লক্ষণীয় যে প্রধান বৃত্তের পাশাপাশি অপ্রধান বৃত্তটিকে—অর্থাৎ সাধুচরণের পরিবারের ঘটনাকে, নাট্যকার এমনভাবে স্থান দিয়াছেন যে অপ্রধান বৃত্তটি অসংলগ্ন কোন বৃত্তে পরিণত হয় নাই প্রধান বৃত্তটির পরিপোষকই হইয়াছে। রাইচরণকে কুঠি হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টার দৃশ্যের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রমণিকে কুঠিয়াল সাহেবের কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিবার দৃশ্যের মধ্যে, একদিকে যেমন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রূপ প্রকটিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নবীনমাধবের প্রতিরোধ চেষ্টার নিদর্শনও ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, নেতৃচরিত্রের সঙ্গে এইসব দৃশ্যের অন্বয় বা সম্পর্ক রহিয়াছে। তারপর বেগুনবেড়ের কুঠির দৃশ্যগুলি মূল কার্য্যের সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। প্রজাদের ও কুঠির কর্ম্মচারীদের আলাপ-আলোচনার ইতস্তত নানা বিষয়ে পরিভ্রমণ করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত মূল কার্য্যের দিকেই ফিরিয়া আসিয়াছে—নবীনমাধবের চরিত্র ও বসু-পরিবারের সংবাদ প্রতিফলিত করিয়াছে। এই কারণে, একথা কোন মতেই বলা চলে না যে নীলদর্পণ নাটক না হইয়া নাট্যচিত্র হইয়াছে।

[চরিত্র]

নীলদর্পণ নাটকে পুরুষ-চরিত্রের সংখ্যা—ছোটবড় মিলাইয়া ত্রিশ (৩০) এবং নারী-চরিত্রের সংখ্যা সাত (৭)। পুরুষের মধ্যে প্রধান—গোলোক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সাধুচরণ, রাইচরণ, গোপী, উড্, রোগ প্রভৃতি, বাকী সব অপ্রধান বটে কিন্তু চরিত্র হিসাবে লক্ষ্যণীয়। স্ত্রী-চরিত্রগুলি সকলেই বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকে অশরীরী নায়ক একজনকে ধরা যায়—তাহার নাম 'বসু-পরিবার'। বসু-পরিবারের সোনার সংসার। নবীনমাধবের আক্ষেপে এই সোনার সংসারের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে—"আমার ৭ শত টাকার মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খানা লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়-স্বজনের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি। আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া·········।" প্রজাদের অনেকেরই মুখের কথা বলিয়াছে গোপ—"নুন না থাকিলে নুন চেয়ে আনছি, তেল পলাডা তেল পলাডাই আনলাম, ছেলেডা কাস্তি লাগলো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিবার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ে মানুষ,·········।" এই পরিবারের নুন খায় নাই এমন রাইয়ত কমই আছে। এই পরিবারের কর্ত্তা—গোলোক বসু সাধু ব্যক্তি এবং 'কায়স্থ কুল তিলক' বলিয়া অধ্যাপক 'মহলে' সুপরিচিত। কিন্তু এই গোলোকচন্দ্র "অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখনও কাহারও মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না········ ······।" "গোলোক বসু যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোক জানে।"

নায়ক স্থানীয় বসু-পরিবার

গোলোক বসু

গোলোক অতি নিরীহ "ঘরবাসী মানুষ" বটে কিন্তু নির্ব্বোধ নন—তিনি ভালভাবেই জানেন—"সাহেবদিগের রাজী রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ 'হাকিম ভাই-ব্রাদার' সাহেবদের কি অমতে চলিতে আছে?" তবুও অবস্থাচক্রে—নবীনমাধবের প্রজাবাৎসল্য ও মহানুভবতার জন্য তাঁহার জীবনে শোচনীয় দুর্ভোগ। বস্তুতঃ তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের পক্ষে এত বড় বিপত্তি কি হইতে পারে—'মানী মানুষ-এর কারাবাস—অস্পৃশ্য

লোকের হাতের অন্নজল নিশ্চয়ই 'মরণাদতিরিচ্যতে'। গোলোক বসু স্বভাবে নিরীহ হইলেও হিন্দু-সংস্কারের দিক দিয়া দুর্ব্বল নন। এখানে তিনি অটল অভিমানী এবং দুঃসাহসী ব্যক্তি; নবীনেব বহু মিনতির সংক্ষিপ্ত উত্তর—"নবীন তিনদিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিনদিনের মধ্যে এ-পাপ মুখে কিছু মাত্র দিব না।" পাপমুখ যাহাতে আর না দেখাইতে হয় এইজন্য তিনি শেষ পর্য্যন্ত উড়ানি-পাকান, দড়ি দিয়া উদ্‌বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

এইরূপ বসু-পরিবারে নবীনমাধবের জন্ম।—অস্মিংস্ত নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে—অধ্যাপকের কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। নবীনমাধবের সম্বন্ধে ডেপুটিবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাব একবর্ণও মিথ্যা নয়—"নবীনবাবু **অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী।**"

নবীনমাধব

প্রথমতঃ সাধুচরণের মুখে (১ম+গর্ভাঙ্কে) নবীনমাধবের সাহসের উল্লেখ—পরোক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়—"বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস!" সাহসই বটে। যিনি সাহেবের শাসানির মুখে—যে সে শাসানি নয়—"যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোন, চিহ্নিত জমিতে নীল না কব তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীব জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুঠির গুদামে ধান খাওয়াইব—" এইরূপ শাসানির মুখে, বলিতে পারেন—"আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ-বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ বাড়ী কি ছার" তিনি শুধু সাহসী নন—দুঃসাহসী। "সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার" এই কথা জানিয়া শুনিয়াও তিনি সাহেবদেব বিরুদ্ধে মকদ্দমা লড়িতে পশ্চাৎপদ নন। এই সাহসের জন্যই নবীন বসু নীলকুঠির প্রধান শত্রু। গোপীর কথায় প্রমাণ—"পলাশপুর জ্বালানো কথনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বসু ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল-মোক্তারদের এমন সলা-

পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়।" এই দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়—ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের কামরা হইতে উদ্ধার করার দৃশ্যে। কিন্তু নবীনমাধবের এই বীরত্বের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা নাই। রোগের মত শয়তানের সহিত ব্যবহারেও নবীনমাধবের সহজ উদারতা ও ক্ষমা-বত্তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ভীষণ উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তাঁহার মুখে শোনা যায়—"তোরাপ মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বলে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়।" ধীরোদাত্ত নায়কেরই লক্ষণ। কিন্তু যেখানে আত্মমর্য্যাদা অপমৃত্যুর সম্মুখীন, সেখানে নবীনমাধবের এই স্থৈর্য্য নির্ভীক প্রতিশোধ চেষ্টা রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—কাতর প্রার্থণার উত্তরে সাহেব যখন বলে—'যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে' এবং পায়ের জুতা নবীনমাধবের হাঁটুতে ঠেকাইয়া বলে—"তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই" তখন নবীনমাধব 'সাহেবের বক্ষঃস্থলে' পদাঘাত করিতে ইতস্তত করেন না। বাস্তবিক নবীনমাধবের বীরত্বের নিদর্শন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে যথেষ্টই পাওয়া যায়। যদিও যতখানি পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় ততখানি প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই বীরত্ব নিছক অহঙ্কারের স্ফূর্তি মাত্র নয়—ইহার রসমূল বা ধারণী-শক্তি নিহিত আছে পরোপকার বৃত্তির মধ্যে। পরোপকার বৃত্তি বসু-পরিবারের সকলের মধ্যেই কমবেশী আছে; 'বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়ে মানুষ'—এমন মানুষ গোপের মত আরো অনেকেই আছে। নবীনমাধবের মধ্যে 'পরোপকার' ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। নবীনমাধবকে গোপীর কথার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে শোনা যায়—"গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব" ...... প্রথম মোক্তারের স্বীকৃতিও,

ইহার প্রমাণ—"আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন একথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড্ সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালানো মকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে।"* নবীনমাধব শুধু নিজের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্যই সাহেবদের বিরুদ্ধে দাড়ান নাই, তিনি পরার্থপরতার অনুপ্রেরণাতেই নীলকর সাহেবদের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন।

পিতা গোলোক বসু "ফৌজদারীর ভয়ে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে" চাহিলে নবীনমাধব যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা পরার্থপরতার বড প্রমাণ—"পিতা, আমাদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপ বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহাদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" নবীনমাধবের সম্মুখে একবার বড পরীক্ষা আসে যখন তিনি পিতার চক্ষে জল দেখেন। বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয়ে দুর্ব্বলতা দেখা দেয়—প্রশ্নও জাগে—"আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি—?"—কিন্তু ইহা ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা; সঙ্গে সঙ্গেই স্থির সঙ্কল্পে মন দৃঢ় হয় "না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম সহসা পরাঙ্মুখ হব না," পুরুষসিংহ—অযথা বিশেষণ নহে।

এই পরোপকার বৃত্তির ধারাটিই দেশ-হিতৈষিতা এবং বিদ্যোৎসাহিতার ধারায় শাখায়িত হইয়া বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া নবীনের দেশহিতৈষিতার মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক আবেগ উত্তাপ নাই—ইহাতে আছে শুধু প্রজা-সাধারণের ধন-প্রাণ-মানের নিরাপত্তার এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির কামনা। নবীনমাধব স্কুল স্থাপনের মত মাঙ্গলিক কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নন, বরং উৎসাহী। ইনস্পেক্টর বাবুর প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁহার মনোভাব—"আমি এ-মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে

কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। [উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন যথার্থ উত্তমবিত্ত ব্যক্তি এই নবীনমাধব। তখনকার সমাজচেতনা এই কথাটি হিন্দুর বাহিরে সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করিবার মানসিকতা তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।]

এই সকল গুণ চরিত্রের অঙ্গ বটে কিন্তু নবীনমাধবের চরিত্রের মর্ম্মস্থান তাঁহার পিতৃভক্তি। গোপী ইহা ভালভাবেই জানে এবং জানে বলিয়াই নবীনমাধবকে শাসিত করিবার জন্য বৃদ্ধ গোলোক বসুকে আসামী করিতে পরামর্শ দেয়—ফলও হাতেহাতে ফলে। সত্যই গোপীর কথা ঠিক—"নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাট্টা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে র হয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।" পিতার জেল নবীনমাধবের বুকে সাংঘাতিক আঘাত। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ভ্রাতৃবাৎসল্য পত্নী প্রেম—সব বিষয়েই নবীনমাধব প্রশংসার অধিকারী।

* কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টি বলিতে গুণ-খ্যাতি ছাড়াও আরো বেশী কিছু বুঝায়। বিশেষতঃ নাটকে, চরিত্রকে শুধু গুণের আধার বলিয়া প্রচার করাই যথেষ্ট নয়, চরিত্রকে জীবন্ত ও গোটা একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত করিতে হইবে—এবং তাহা করিতে হইবে চরিত্রের নিজেরই আচরণের ভিতর দিয়া। অবশ্য তাই বলিয়া যে পরোক্ষ উপস্থাপনা মোটেই থাকিবে না তাহা নহে। যে যে ঘটনায় চরিত্রের জীবনী শক্তির বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়, চরিত্র স্বধর্ম্ম লইয়া দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয় তাহাদের যথাসম্ভব প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থাপিত করা বিধেয়। নবীনমাধব-চরিত্রের উপস্থাপনায় প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ রীতির

সাহায্যই অধিক পরিমাণে লওয়া হইয়াছে। ফলে চরিত্রটি যে-পরিমাণে অনুমান-গম্য হইয়াছে সে-পরিমাণে দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় নাই। 'সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ'—করিয়া 'উড্' সাহেবের শ্যামচাঁদ-প্রহারে বাধাদান এবং ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের অত্যাচারের মুখ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসা—এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া আর সব দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবেই নবীনকে দেখানো হইয়াছে। নায়ক-চরিত্রের উপস্থাপনায় এইরূপ পরোক্ষ-উপস্থাপনারীতি নায়কের গুণপণা প্রকাশ করিলেও চরিত্রের জীবনী-শক্তি নষ্ট করে। কারণ, চরিত্রের জীবনী-শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে পরিস্থিতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে বুঝাপড়া করার চেষ্টার মাধ্যমেই—শারীরিক ক্রিয়া, অনুভূতি ও মননের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। যে-চরিত্রের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার রসোদ্দীপকত্ব বেশী সেই চরিত্রই সৃষ্টি হিসাবে প্রশংসনীয়। নবীনমাধব-চরিত্র অনুভব ও মননের দিক দিয়া উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।

নবীনমাধবের পরেই এই পক্ষের দুইটি চরিত্রের কথা মনে আসে। এক—সাধুচরণ, দুই—তোরাপ।

সাধুচরণ বসু-পরিবারের আশ্রিত। গোপীর মতে 'মাতব্বর রাইয়ত' বটে, কিন্তু আসলে 'ক্ষুদ্র প্রজা'। তাঁহার দেড়খানি লাঙ্গল, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা। সেই ২০ বিঘার মধ্যে ৯ বিঘাই নীলে গ্রাস করিয়াছে। এবং নূতন করিয়া সাঁপোলতলার জমিতে দাগ মারিয়া গিয়াছে—আর এ যেমন তেমন জমি নয়—রাইচরণের ভাষায় 'জমি তো না য্যান সোণার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম'।

সাধুচরণ

সাধুচরণ এইসব উৎপাতে দেশ ত্যাগ করিতে চাহে—গোলোক বাবু মহাশয়কেও দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু বড় বাবুকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহে না বলিয়াই থাকা। তবে সাঁপোলতলার জমিতে দাগ মারার পরেই মন স্থির করে—"কাল হাল গোরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পালিয়ে যাব।" কিন্তু যাওয়া আর হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠিতে

ধরিয়া লইয়া গিয়া শ্যামচাঁদকে প্রহারে জর্জ্জরিত করা সত্ত্বেও সাধুচরণ পলাইয়া যায় না। সাধুচরণের সঙ্কল্প ও আচরণের মধ্যে ঐক্য নাই এবং সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন কেন ঘটিয়াছে তাহাও দেখানো হয় নাই বটে কিন্তু সাধুচরণ যে বড়বাবু গতপ্রাণ ইহা দেখানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সাধুচরণ বীর বা সাহসী নয়। ক্ষেত্রমণিকে লাঠিয়ালরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—একথা জানিয়া সে যাহা করিয়াছে তাহা পুরুষের কাজ নয়। নবীনের প্রশ্নের উত্তরে সেই কাজের বিবরণ রেবতীর মুখেই শোনা যায়—"বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।" এই পরিস্থিতিতে মেয়ে-কান্নার বেশী আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তারপর, বড়বাবুর মাথা ফাটিয়া গিয়াছে—বড়বাবু অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন; ইহা দেখিয়া শুনিয়াও সে যাহা করে তাহার বিবরণ সে নিজমুখেই দিয়াছে 'আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না'। মোট কথা, তাহার সাধ আছে সাধ্য নাই -গোল ভেদ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাই বলিয়া সে বড়বাবুকে কম ভালবাসে, কম ভক্তি করে—একথা বলা চলে না—সবরকম অসহ্য জ্বালা সে সহ্য করিতে পারে কিন্তু "প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ" সহ্য করিতে পারে না। সাধু নিজমুখেই তাহা ব্যক্ত করে কবিরাজের কাছে এবং এমন সময়ে করে যখন কন্যার চরম কাল উপস্থিত। একটু অস্বাভাবিক হইলেও সাধুচরণের কল্পনা শক্তি ও আবেগ উল্লেখযোগ্য—"চৈতন্য বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদরি কাঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড় তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল ও বিদ্বান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমা-সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিনীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি আহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার দিয়া অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি ; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া

দশটা নীলকুঠি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।" **এহেন প্রভুভক্তির প্রমাণ সাধুচরণ কার্য্যে না দিক বাক্যে যথেষ্টই দিয়াছে**—জেলে কর্ত্তা মহাশয়ের সেবা করিবার জন্য সে চুরি করিয়া জেলে যাইতে প্রস্তুত—সে বলে—"আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দেন, আমি একবার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব"। সাধুচরণের **এই প্রভুভক্তির দিকটা খুব স্পষ্ট ও বাস্তবিক রূপ পায় নাই** একথা স্বীকার্য্য। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর দুঃখে সাধুচরণের পিতৃ-সত্তাটিকে বেশ একটি অচঞ্চল শোকের গভীরতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

এই পক্ষের দ্বিতীয় সহায়ক চরিত্র * **তোরাপ**। নীলদর্পণ নাটকে যতগুলি জীবন্ত চরিত্র আছে তাদের মধ্যে **তোরাপ** একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তোরাপ একটি আস্ত তোরাপ—যেমনি ভাবে-ভাষায় তেমনি আচরণে। তোরাপ একজন চাষী। তাহার আকৃতির কোন বিবরণ না দেওয়া হইলেও, দুই-একটি কথা হইতে চেহারাটা অনুমান করা যাইতে পারে। তোরাপকে সাধুচরণ 'একগুঁয়ে মহিষ' বলিয়াছে—এ অবশ্য পরোক্ষ উক্তি মাত্র, তোরাপের আকৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় তোরাপ নিজেই একটা দিয়াছে—রোগ সাহেবের উদ্দেশ্যে সে বড়বাবুকে বলিয়াছে—" ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি মোর তেমনি হাতের পোঁচা"। সত্যই, "সাহেবের গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত" করিবার ...... 'গাল টিপে ধরা' ...... "কানমলন" দেওয়ার শক্তি যাহার আছে, তাহার দৈহিক শক্তি সহজেই অনুমেয়। তোরাপের "হাতের পোঁচা"র স্নায়ুগুলি যে বেশ সহজেই উত্তেজিত হয়, বেগুনবেড়ের কুঠির গুদাম-ঘরের আলাপেও তাহার নিদর্শন আছে—প্রথম রাইয়তের বুকের রক্ত দেখিয়া তোরাপ অকৃত্রিম উত্তেজনায় বলিয়াছে—"উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরি

তোরাপ

অ্যাক্‌বার ভাতারমারি মাঠে পাই, এমনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাড ম্যাড করা হের ভেতর দে "বার করি।" তোরাপের দৈহিক শক্তি রেখাচিত্রে অঙ্কিত। তবে তোরাপের এই বলিষ্ঠ কৃষক-দেহের মধ্যে যে-একটি তাজা প্রাণ সহজ হৃদয় ও সরল ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ একটি মন আছে, তাহাতেই তোরাপের আসল ব্যক্তিত্ব। তোরাপ প্রাণ গেলেও 'নেমোখ্যারামি' করিতে পারিবে না;—সে আন্তরিক আবেগেই বলে—"ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বেঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচয়ে নে ব্যাড়াচ্চে মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান্ কবুল।" ইহা তোরাপের অন্তরের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তোরাপ শুধু "ভাবে-ভরা ফানুস" মাত্র নহে। 'রোগ সাহেবের হস্তে রামকান্ত'-রূপী 'নাদনা' দেখিয়া স্বাভাবিক-ভাবেই তোরাপের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে—সে "স্বগত"-উক্তি করে—"যে নাদনা, অ্যাকোন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো।" প্রাণ-প্রবৃত্তি সাময়িকভাবে মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে সত্য, কিন্তু মনোবৃত্তির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। নবীনমাধবের দৃঢ় বিশ্বাস—"তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না"। অবশ্য তোরাপের এই ন্যায়নিষ্ঠার কঠিন কোন পরীক্ষা হয় নাই। ইন্দ্রাবাদ হইতে তোরাপ "মোক্তার সমিন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে" একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পালাইয়া যায়। ফলে 'জান্ কবুল' করিয়া নেমোখ্যারামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অবকাশ আর আসে না। রোগ সাহেবের অত্যাচারের মুখ হইতে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করিবার দৃশ্যে নবীনমাধবের সহিত তোরাপের সহযোগ ঘটে—অবশ্য কোথায়, কিভাবে ঘটে তাহা অদৃশ্য (প্রমাণ নবীনমাধবের উক্তি—"তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পলাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস তাহা আমি শুনিতে চাই"—এই কথাটিতে মনে হয় নবীনমাধবের সহিত তোরাপের সাক্ষাৎকারের পর এতটুকু সময়ও যেন পাওয়া যায় নাই.

যাহার মধ্যে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া সম্ভব)। এখানেও 'নেমোখ্যারামি'র প্রতি তোরাপের সহজ ঘৃণা ব্যক্ত করা হইয়াছে। (তাতে আবার নেমোখ্যারামি কত্তে বলে।)

তোরাপ নাদনার গুতার ভয়ে মুখে যাহাই বলুক বা মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিয়া 'জান্ কবুল'-এর পরীক্ষা দিক বা না দিক, যে বড়বাবুর কাছে সে শতভাবে ঋণী, যে বড়বাবু তাহাকে অনেকবার বাঁচাইয়াছেন, সেই বড়বাবুকে বাঁচাইবার জন্য তোরাপ সত্যই জানের পরোয়া করে না। এই বে-পরোয়া তোরাপকেই আমরা দেখি যখন সে, সাধুচরণের ভাষায়—"বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।" তোরাপের কথাও অবিশ্বাস্য নয়—"একটু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেচেয়ে আনতি পাত্তাম, আর তুই সমদিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম।" সাধুচরণের কথাও অন্যতম প্রমাণ "ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়।" কিন্তু এই আক্রমণের ও আঘাতের মধ্যেও তোরাপের লক্ষ্য—বড়বাবু। তাই নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়াই তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। কাণ দুইটি ছিঁড়িয়া আনিবার সময় সে পায় নাই—'বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন তাহা হইলে সে 'সমিন্দির কাণ দুটো' ছিঁড়িয়া আনিতে পারিত। বড়বাবুর জন্য তোরাপ যেভাবে কপালে ঘা মারিয়া রোদন করে তাহাতে অবশ্যই মনে হয় বড়বাবুর সহিত তোরাপের নিছক কৃতজ্ঞতার বন্ধন ছাড়া আরো একটু কিছু—অর্থাৎ হৃদয়ের যোগ আছে।

তোরাপ হৃদয়ের দিক দিয়া স্বাভাবিকভাবেই বেশ একটু স্পর্শকাতর। প্রথম রাইয়তের বুকে রক্তের ধারা দেখিতেই তাহার দেহ শিহরিয়া উঠে—নিজের মুখেই সে বলে—"ন্নো দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে" এবং তাহার

সমবেদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও অসহিষ্ণু উত্তেজনায় ব্যক্ত হয়। এই স্পর্শ-কাতর স্নায়ুর সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় যেখানে সে বলে—"বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল তা সমিন্দিরগা মারবো কখন?" যে বড়বাবুকে প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসে সে কখনও এমন কথা বলিতে পারে না। এই হৃদয়বত্তার সহিত তাহার অশিক্ষিত নৈতিকবোধের একটা সহজ যোগ স্থাপিত হইয়াছে। যদিও উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সে দুই সাহেবকে জোরার বাড়ী পাঠাইতে প্রস্তুত, তবু খোদার জীবকে প্রাণে মারিতে তাহার বাধে। নীলকর সাহেবের মত অত্যাচারীকেও প্রাণে মারিতে তাহার এই যে আপত্তি তাহা গভীর অথচ সহজ নৈতিক সংস্কারেরই নিদর্শন। এই সহজ ন্যায় অন্যায় বোধ আছে বলিয়াই বোধ হয় তোরাপ নির্ব্বিচারে সব সাহেবকে নিন্দা করিতে পারে না। সাহেবদের মধ্যে যে ভাল মানুষ আছে এ-বিশ্বাস তোরাপের আছে। 'ভবানীপুরীর সাহেব' ও 'হালের গারনাল সাহেব'কে সে 'বড়লোকের ছাবাল' সুতরাং ভাল লোক বলিয়াই মানে।

* তবে, তোরাপ **চরিত্র-সৃষ্টি** হিসাবে একেবারে নির্দ্দোষ বা সঙ্গতিময় নহে। প্রথমতঃ—চরিত্রটিকে নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয় নাই। তোরাপের সহিত নবীনমাধবের যোগাযোগ বেশ খানিকটা অসংলগ্ন হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ—তোরাপের আচরণে কায়-মনো-বাক্যের সুসঙ্গতি তেমন পাওয়া যায় না। যেমন, লৌ' দেখিয়া তোরাপের গা ঝাঁকি দিয়া উঠে—বটে, কিন্তু হঠাৎ উত্তেজনা পর্য্যন্তই—রক্ত বন্ধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা তাহার মধ্যে যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাহা লইয়া সে আর কোন উদ্বেগও প্রকাশ করে না। এ-প্রসঙ্গ সে একেবারে ভুলিয়া থাকে। প্রথম রাইয়তের বুকের রক্ত আগেই তোরাপের চোখে পড়া উচিত ছিল—বুকের রক্ত জোঝানি দিয়া পড়িয়াছে এবং বন্ধ হইয়াছে শুধু যেন সাহেবের অত্যাচার এবং তোরাপের মুখে একটা উত্তেজনাপূর্ণ উক্তির প্রয়োজনে। নাট্যকার চরিত্রটিকে সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকতার সঙ্গে রূপ দিতে পারেন নাই। চরিত্রটির

ভাবের প্রকাশটুকু বাস্তবিক—ভাষাও বাস্তবিক—এমনকি (elemental) অতি বাস্তবিকও বলা যায়, কিন্তু যে-পরিস্থিতির মধ্যে সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, সেই পরিস্থিতির বাঁধুনি সর্ব্বক্ষেত্রে বাস্তবিক হয় নাই। চরিত্র-সৃষ্টি শুধু চরিত্রে দোষ-গুণ আরোপ নহে, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রকে ভাবে ও ভাষায় অনবদ্যভাবে সঙ্গত করিয়া তোলা। এই হিসাবে তোরাপ যে-পরিমাণে জীবন্ত হইয়াছে, সে-পরিমাণে সুসঙ্গত হয় নাই।

সহায়িক পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে—প্রতিপক্ষের অবশ্য—কুঠির দেওয়ান **গোপীনাথ** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি কথায় গোপী তাহার নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছে—"যদিও বান্দা জাতিতে **কায়স্থ, কিন্তু ক্যাওট,** ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে।" গোপীনাথ আগে **পেস্কার** ছিল—উড্ সাহেবের অনুগ্রহে **দেওয়ান** হইয়াছে। যে-গুণপনার জন্য এই উন্নতি তা গোপীনাথ নিজেই একটি উক্তিতে অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছে—"হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ-পদবীতে পদার্পণ করেছি **তখন ভয়, লজ্জা, সরম ও মান-মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালানো অঙ্গের আভরণ হইয়াছে,** আর জেলখানা শিয়রে করে বসে আছি।" আর একটি আক্ষেপে গোপীর এই কর্ম্মদক্ষতার পরিচয়ও ফুটিয়া উঠিয়াছে—"মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীলাম করিবার জন্য এবং গোলোক বোসের সাতপুরুষে লাংরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যেসব কাম করিয়াছি, তাহা **ক্যাওট কি চামারেও পারে না**। গোপী এইসব কু কাজে নিষ্ঠুর ক্যাওট ও চামারকে হার মানাইয়াছে। বাস্তবিক এই সকল ব্যাপারে গোপীর কসুরও কিছু পাইবার যো নাই। গোপী অক্লান্তকর্ম্মা—প্রমাণ তাহার নিজেরই কথা "আমি প্রত্যুষে ভ্রমণ ক'রতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোনদিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, আবার কোনদিন বা একটাও বাজে।" কিন্তু এত করিয়াও তাহার যশ নাই। উড্ সাহেবের গালাগালির বরাদ্দ

—"তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে", "অ্যারান্ট কাউয়ার্ড হেলিশ নেভ" "বজ্জাত ইন্‌সেস্‌চিউয়স্‌ ব্রুট" "শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্চা" প্রভৃতি ঠিকই আছে। গালাগালিতেই শেষ হইলে কথা ছিল না। গালাগালির উত্তেজনা দেখিতে দেখিতে 'শ্যামচাঁদ'-প্রহারের শাসানিতে এবং 'পদাঘাতে' পরিণত হয়। কিন্তু গোপী আমাদের সিদ্ধ সেবক। পদাঘাত তাহার গায়েই লাগে - শুধু লাগে না, লাগিয়া তাহাকে ভূমিশায়ীও করে—কিন্তু মনে তাহার কোন আঘাতই লাগে না। আঘাত-লাগার মনটি একেবারেই যেন মরিয়া গিয়াছে অথবা মান-অপমান-বোধের ব্যাপারে মনে কেমন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অসাড়তা—তাই তো সে পদাঘাতের পরে গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া "বলে—সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে?" পদাঘাতের পর পদাঘাতের পরেও গোপী নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকারও ঠিক নয় মনের বিক্রিয়া বিস্ময়জনকভাবে বিপরীত মেরুতে পৌঁছায়—রসিকতার রূপ পায়। পরের গায়ে পদাঘাত দেখিয়া রসিকতা করা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া এবং 'গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া' যে রসিকতা করিতে পারে—পদাঘাত লইয়া উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না, সে নিশ্চয়ই অসাধারণ; রসিক গোপী এ-বিষয়ে বাস্তবিকই অসাধারণ। ঐরূপ পদাঘাতের পরেও, সাহেব "দেওয়ান! দেওয়ান!" হাঁকিতেই—"বান্দা হাজির" বলিয়া সে শুধু সাড়াই দেয় না, রসিকতাও করে—"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"। ঐ দিক দিয়া গোপী জাত গোলামের প্রতিনিধি।

কিন্তু তাই বলিয়া সে বোকা নয়। বোকার পক্ষে এই দেওয়ানী পদ পাওয়া সম্ভবও নয়। সে জাতিতে কায়স্থ—কথায় বলে—গোপীও বলে—' কায়েত ধূর্ত আর কাক ধূর্ত"। মন মজাইবার ও মন ভাঙ্গাইবার ছলা-কলা প্রয়োগ করিতে সে কম কুশলী নহে। আমিনের বিরুদ্ধে সে উড্‌ সাহেবকে সুকৌশলেই উত্তেজিত করে। বুদ্ধির ও কথার ধার তাহার বেশই তীক্ষ্ণ। পরিস্থিতি জ্ঞানও

তাহার টনটনে।—সে জানে—"লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।"

তাহার বক্রোক্তির ধারালো খোঁচা 'খাঁড়ার ঘা' বিশেষ। সাধুচরণ, ভুক্তভোগী (১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক) অবশ্য তাহার ভাষায় জোর অলঙ্কারে নয়, প্রবচনের ও ছড়ার সহজ শক্তিতে। আর এই সমস্তের মূলে আছে তাহার বিশেষ মনোভঙ্গী এবং সেই মনোভঙ্গীর ফল—রসিকতাটুক। * গোপীর মনোভঙ্গীর মূল কারণ গোপী নিজেই কিছুটা ব্যক্ত করিয়াছে—'যখন এ-পদবীতে পদার্পণ করেছি তখন ভয়, লজ্জা, সরম ও মান-মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালানো অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। গোপীর রসিকতার মূলও এখানেই নিহিত। গোপীর বোধ হয় এখন "চোখের জল ফেলতে হাসি পায়"—অবস্থা।

* গোপী রসিকতায় তাহাদেরই সমকক্ষ যাহারা নিজের দুর্দ্দশা-দুর্ভোগকেও নির্লিপ্তভাবে শিল্পীর চোখে দেখিয়া রস-সম্ভোগ করিতে পারে। গোপী বোধ হয় গোলামির শেষ ধাপে নামিয়াই নূতন জীবনদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে এবং এত নির্লিপ্ত হইয়া গিয়াছে যে সাহেবের গোলাম হওয়া সত্ত্বেও যে-কাজ করিতেছে সেই কাজের আসল রূপটি সে সাদা চোখেই দেখে। তাইতো সাধুচরণকে সে বলিতে পারে—সাহেব কি কথায় ভোলে—

"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষে নাই।"

এই হাস্য-রসিকের নির্লিপ্ততা পদাঘাতের দৃশ্যে চরমে উঠিয়াছে—কি পদাঘাতই করিতেছে; বাপ! "বেটা যেন আমার কলেজ আউট বাবুদের গোঁফ-পরা মাগ।"

কিন্তু গোপীর রসিকতা অনেক ক্ষেত্রে দোষারোপ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ উড্ সাহেবের সহিত কথোপকথনে গোপীর-রসিকতা নীলকর সাহেবদের কঠোর সমালোচনা হইয়া পড়িয়াছে। সাহেবের মুখের পরে—অত স্পষ্ট

করিয়া বলা ! [যখন এ-পদবীতে·········(১ম—৩য় গর্ভাঙ্ক) গোপী বলে—"আমরা হুজুর কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। আপনারা যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে সেইরূপ নীল গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্ণাম হইত না" অধিকন্তু মহাজনের পক্ষে সে রীতিমত ওকালতি করে। উডের সামনেই সাহেবদের "নীলমামদো," বলিয়া ফেলে—যদিও সঙ্গে সঙ্গে জিব কাটিয়া নিজের বলাটা "হারামখোর" বেটাদের উপর আরোপ করে। গোপীর সমালোচনার রোখ যেন আরো চড়িয়া যায়—"ধর্ম্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা, কুটিতে ডিস্‌পেন্সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুলি হইলেই আমরা।" সত্য হইলেও যে অতি অপ্রিয় এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতখানি স্পষ্টবাদিতা গোপীর চরিত্রে খুব সঙ্গত বা প্রচারধর্ম্মিতার লক্ষণ কি না এ-প্রশ্ন উঠিতেই পারে। তবে উড্ সাহেবের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে—"তোমায় ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে······।"

তবে কি বড় বড় পাপকে অঙ্গের আভরণ করা সত্ত্বেও গোপীর বিবেকের অবশেষ একেবারে মুছিয়া যায় নাই ? উডের উক্তি—"কমিস্তনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিশ নিগার !"—যথার্থ কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তবে উডের সন্দেহ গোপীর বিবেকের অস্তিত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নবীন বসুকে অসম্মানের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সে বলে—"নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কার্য কি আপনি বাড়ী যান।" গোলোক বসুর কয়েদখানায় মৃত্যু ঘটিবার পরে, গোপীর "ব্যাঙের সদ্দির" (গোপ ; মত হইলেও বড় ক্লেশ হয়—সে অকপটেই বলে—"আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মকদ্দমা করে মানী মানুষটাকে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।"

কিন্তু আদর্শহীনতা যাহাদের চরিত্রের বড় আদর্শ তাহাদের মনের বা মানের

দায় না থাকিলেও প্রাণের ভয় থাকে ষোল আনাই। 'মানী মানুষটারে নষ্ট,' করিয়া গোপীর মনে একটু আক্ষেপ হয় বটে, তবে গোপীর কথাই ঠিক, তা' "ব্যাঙের সর্দি", কিন্তু গোপীর অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তাহার কারণ তাহার গুরুদেব জানেন, আমরাও কিছুটা অনুমান করিতে পারি। গোপীর এই উচাটনের কারণ—মজুমদারের মকদ্দমা—বিশেষতঃ চাকর কয়েদ হলে সাহেবদের দুর্ব্যবহার। "গোপী খুলিয়াই বলে—কাজেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকী মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পাবে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই।" উডের কথাই প্রমাণ—"বাক্ততকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা অমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে…"। যাহা হউক, গোপী চরিত্রটি এই নাটকে একখানা প্রতিফলক দর্পণের কাজ করিয়াছে। নীলকর সাহেবদের অদৃশ্য কু-কাজগুলি গোপী-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাহারা, তাহাদের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এমন একাধিক ছোট ছোট চরিত্র আছে যাহাদের উল্লেখ না করিলে চরিত্র-বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। *সাহেব চরিত্র—মোট চারটি :—দুইজন নীলকর—উড্ ও রোগ, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন ডাক্তার। নীলকর অত্যাচারের দুইরূপ—এক প্রজাপীড়ন, দুই নারীর প্রতি অত্যাচার। এই দুই রূপের প্রতিনিধি—উড্ ও রোগ। উডের হাতে প্রজাপীড়ন, রোগের হাতে—নারী নিগ্রহ। দুই জনই—অমানুষিক অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত! * ম্যাজিষ্ট্রেট-চরিত্রের মাধ্যমে তখনকার "নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রেট" —সাহেব-বিচারকের হস্তে বিচারের নমুনা দেখানো হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সম্পর্কে পণ্ডিত মহাশয় এক কথায় অনেক কথা বলিয়াছেন "এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার।'

* ডাক্তার চরিত্রে—আদর্শ ডাক্তারের রূপ আঁকা হইয়াছে। এই ডাক্তার

দুঃশাসন ডাক্তারের বিপরীত। কবিরাজের মুখে ডাক্তারের প্রশংসা—"ডাক্তার বাবুটি অতি দয়াশীল।" যেমন মিষ্টভাষী তেমনি উদার—"অর্থপিশাচ" নয়। যে ডাক্তার হাত না ধরিয়াই বলে—'বাঁচবে না' এবং গোরু বেচিয়া টাকা লইয়া যায়, ইনি সেই দুঃশাসন ডাক্তার নন। বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে ইনি বলেন—"বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না। আমি যে বেহারায় আসিয়াছি, সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না।" অধিকন্তু—অন্নাভাব দেখিয়া ক্ষেত্রমণির নাম করিয়া সাধুচরণকে দুইটি টাকা দিয়া যান। পাদ্রী সাহেবের বদান্যতা, বিনয় ও ক্ষমা দর্শন করিয়া প্রজারা যে কথা বলাবলি করিয়াছিল, আমরা সেই ভাষা ধার করিয়া বলিতে পারি—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোন্ খানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

এদেশীয় চরিত্রের মধ্যে—বিন্দুমাধব, সাধুচরণের ভাই রাইচরণ, আমিন, রাইয়ত চারিজন, লাঠিয়াল, খালাসী, নাজির, ডেপুটি, দারোগা, পণ্ডিত, গোপী, মোক্তার কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই আছে।

* **বিন্দুমাধব** কলেজে পড়েন—'কি সুচরিত্র, মধুমাখা কথা'। ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি তাঁহার স্বভাবের প্রধান স্থায়ীভাব। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে অনুভাব-সঞ্চারি ভাবের সংযোগ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই। সুতরাং চরিত্র-সৃষ্টি তথা রস-নিষ্পত্তি খুব প্রশংসনীয় মাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই।

* **সাধুচরণের ভাই রাইচরণ**—লাঙ্গল তাহার উপলক্ষণ—জমি অস্ত প্রাণ—খাঁটি চাষী—মাটি লইয়া তাহার কল্পনা-ভাবনার জগৎ। সাঁপোলতলার জমি—আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা! এক কোণ কেটে মহাজন কাং···এই জমিতে দাগ মারিলে তাহার প্রাণের যে-অবস্থা তাহা সে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছে—"জমিতে দাগ মারতি নাগলো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতি নাগলো"। রাইচরণ কায়-মনোবাক্যে একটি আস্ত 'চাষী'। কিন্তু সে "টাইপ"

নয়—প্রাণধর্ম-মনোধর্মের ওতপ্রোত সংযোগে—ভয়ে, ভাবনায়, কল্পনায় সঙ্কল্পে ও সাহসে সে একটি জীবন্ত চরিত্র।

* **আমিন**—সেবা-সাধনার তুরীয়লোকে অবস্থিত। যে পেস্কারি পাইবার লোভে নিজের বোনকে ছোট সাহেবের মুখে তুলিয়া দিতে পারে, তাহার বিবেক যে শশাঙ্কেরও বাঁদিকে—একথা অনায়াসেই বলা যায়। পদী ময়রাণীর কথাটিই আমিনের চরিত্র সম্বন্ধে প্রধান এবং যথেষ্ট প্রমাণ—"আমিন আঁটকুড়ির বেটাই এ-দেশ মজ্জাচ্ছে।" তোরাপের সাক্ষ্যেও একই কথা জানা যায়—"এডা কেবল আমিন সমিন্দির ফিরভিত্তি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। এ সমিন্দি সব চুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি ষ্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে ছাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে।"

চারিজন রাইয়ত—প্রথম রাইয়ত—তোরাপের "পরাণে চাচা" আসলে লোকটি ভালই, সে বড়বাবুর নুন খাইয়াছে—প্রাণ তাহার নেমোখ্যারামি করিতে অনিচ্ছুক—চোখের চামড়া ঠিকই আছে কিন্তু 'শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা তাই নিরুপায় হইয়াই সে সাক্ষী দিতে রাজী হইয়াছে, কারণ "সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উড্ সাহেব···বুকি দেঁড়য়ে উটেলো—"। এই অত্যাচারের অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই সে তোরাপের 'জান্ কবুল' সঙ্কল্প শুনিয়া বলে—"কুঁদির মুখ পাক থাকবে না। শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।" প্রথম রাইয়ত মন-মেজাজে একটু গম্ভীর।

* **দ্বিতীয় রাইয়ত** অভিজ্ঞতা জাহির করিবার প্রবণতা এই চরিত্রের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। সাহেবরা যে 'প্যারেক' মারা জুতো পরে তাহা জানাইবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারে না,—একবার আন্দারবাদে 'কেচারির ভেতর অনেক 'তামাসা' সে দেখিয়াছিল তাহাও বর্ণনা করিতে ছাড়ে না। ভবানী-পুরীর যে সাহেবকে সকলেই ভাল বলে তাহার গুপ্ত খবরও সে সকলের চেয়ে ভাল জানে—"এবারও সমিন্দির ইসকুল করা বেইরে গেছে, সমিন্দির গুদোমতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে······ সুমুন্দি গাইবাচুর গুদোমে ভরেলো—";

"এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো ক্যামন করে৷?"—তাহাও বুঝে,—কারণটি ব্যক্তও করে—"তানার বুঝি ভাগ ছেল।'

* **তৃতীয় রাইয়ত**—প্রথম রাইয়তের কথাই সত্য—একটু "হেব্‌লো" তোরাপের উক্তিও সমর্থক—"মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না।" লোকটির "বউ-গত" প্রাণ, 'বউ-এর' কথাই তাহার কাছে প্রমাণ— নীলমাম্‌দো' শব্দ শুনিয়াই সে "সভয়ে" না মরিতেই ভূত হয়—"মাম্‌দো ভূতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বললো।" বউয়ের বলাই যেমন বড় কথা তেমন বউকে সব কথা না বলা পর্যান্ত তাহার শান্তি নাই—"বউরি গিয়ে এ-কথা ব'লবো—শুন্‌লি তো মর্য্যে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতে পারিনি।" হেব্‌লোই বটে!

* **চতুর্থ রাইয়ত**—"ভিনগাঁর রায়েত"—"বস মশার কাছে মির্চার নিতে আ্যকবার স্বরপুর আসিয়া সে বসু মহাশয়কে দেখিয়াছিল—আহা কি দয়ার শরীর, কি চেহারার চটক, কি অরূপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন যেন গজেন্দ্রগামিনী।" (কয়েকটি শব্দের রেখায় জলজ্যান্ত একজন চাষীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।)—সেও নিরুপায়। দুর্দ্দিনই বটে।—তাহার আক্ষেপ "যা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাডে না।"

* **লাঠিয়াল**—কয়েকটি কথার একটি চরিত্র। কিন্তু যে-কয়টি কথা সে বলে তাহাতে এইটুকু স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে যে সে বাহিরে লাঠিয়াল বটে, কিন্তু ভিতরে একজন রসিক নাগর। রসিকমাত্রেরই বোলচাল একটু বাঁকা—লাঠিয়ালেরও কোন কথা সোজা নয়।

* **খালাসী**—আরো কম কথার চরিত্র—মাত্র একবার কথা বলিয়াই খালাস। কিন্তু সেই একটি কথাতেই আসর মাৎ। গোপীর সঙ্গে তাহার কথোপকথন—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। গোপীর চাপান "তোদের ভাগে কম না পড়িলে তো আমার কাণে কোন কথা তুলিস্‌ নে।" খালাসীর উত্তোর—

"ও গু কি অ্যাকা খ্যাযে হজম করা যায় ? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজীব দিয়ে খাও ..." খালাসী অশিক্ষিতপটু রসিক। * [কবির লড়াই যে-দেশে চলিত, সেখানকার আকাশে-বাতাসে রসিকতা খুবই স্বাভাবিক।]

* **নাজির**—ইংরেজের বিচারালয়ের অভ্যন্তরভাগ নাজির-চরিত্রের এক আঁচড়ে প্রকাশিত। নাজির চিরপুরাতন—চিরনূতন; তাহার ভাষা এবং ভাবও সনাতন—"কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজী হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওদের পূজো আলাহিদা হয়েছে কি না।" ইহাদেরই কীর্তির ঐতিহ্য প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—বিচারালয়ের ইটখান পর্যন্ত ঘুষের জন্য হা করিয়া থাকে—

* **পণ্ডিত মহাশয়**—কলেজের 'পণ্ডিত।' স্বাভাবিকভাবেই শরীর তাঁহার কিঞ্চিৎ উষ্ণ। চৈত্র-বৈশাখ মাসে নাকি উন্মত্ত হইয়া উঠেন। তবে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ, কিন্তু তাঁহার টিপ্পনির তাপ অত্যন্ত কড়া—কাটিয়া কাটিয়া বসে। শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা সবকিছু সম্বন্ধেই তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন—শিক্ষকের বৃত্তি তাঁহার কাছে **শ্ববৃত্তি**। কুঠির-ক্রীতদাস **ম্যাজিস্ট্রেটটির** বিচার সম্বন্ধে তাহার টিপ্পনি—"কাজির কাছে হিন্দুর পরোব" **মোক্তার সম্পর্কে**—"সকল দেবতাই সমান, ঠক বাঁচাতে গাঁ উজোড়" **কমিশনার সম্পর্কে**—"এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার, যেমন ম্যাজিস্ট্রেট তেমনি কমিশনার", **জেলদারোগাকে** তিনি মারাত্মক টিপ্পুনি দিয়াছেন—আপনি বুঝি **নরকের দ্বারপাল** ? উষ্ণ-মস্তিষ্ক পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে দীনবন্ধু অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

* **কবিরাজ**—ভাবে ভাষায় আমাদের সুপরিচিত কবিরাজেরই একজন। ডাক্তারদের দিকে কনুই উঁচু থাকায় আরো বেশী করিয়া চেনা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ডাক্তারদের যেটুকু প্রাপ্য তাহা তিনি দিতে কুণ্ঠিত নন—ডাক্তার না ডাকলেই নয় অথচ ডাক্তার ডাকিতে বলার অর্থ কবিরাজত্বের অবমাননা; তাই কবিরাজী অভিমান বাঁচাইবার জন্য তিনি বলেন—"ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে

গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল, ব্যয়-বাহুল্য…"। তবে তিনি ভাল ডাক্তারদের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত নন। দুঃশাসন ডাক্তার সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় যে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা আজও মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবসায়-বুদ্ধি, হৃদয়কে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলে নাই। ক্ষেত্রমণির মা-বাপের কান্না দেখিয়া—তাহারও হৃদয় কাঁদিয়া উঠে…। "জননীর কি পরিতাপ, সন্তান না হওয়াই ভাল"—অল্প কথা বটে কিন্তু অনেকখানি হৃদয় গলিয়া কথা কয়েকটি বাহির হইয়াছে।

[স্ত্রী-চরিত্র]

[স্ত্রী-চরিত্র—নাটকে সাতটি :—বসু-পরিবারের ৪টি—(সাবিত্রী=গোলোকের স্ত্রী ; সৈরিন্ধ্রী=নবীনের স্ত্রী ; সরলতা=বিন্দুমাধবের স্ত্রী, আদুরী=বাড়ীর দাসী) ; সাধুচরণের পরিবারের ২টি—(সাধুচরণের স্ত্রী=রেবতী, সাধুচরণের কন্যা=ক্ষেত্রমণি) এবং পদী ময়রাণী]

* **সাবিত্রী** গোলক বসুর স্ত্রী—নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবের জননী, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার মাতৃকল্প শাশুড়ী, বসু-পরিবারের এবং সেইদিক দিয়া সমস্ত গ্রামেরই কর্ত্রীস্থানীয়া। এই কয়টি ব্যক্তিত্বের আচরণ দিয়া সাবিত্রীর চরিত্রটি গঠন করা হইয়াছে এবং নাটকের যে মুখ্য ভাব ও রস সেই ভাব ও রসের উপযোগী করিয়া অভিব্যক্তি দেওয়া হইয়াছে। সাবিত্রী নবীনমাধবের উপযুক্ত গর্ভধারিণী—প্রথম অধ্যাপকের কথাই ঠিক—"আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।" যে মা একটি নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য তথা দেশের মঙ্গলের জন্য পুত্রকে ভয়ানক বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিতে পারে—"যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।"—সাবিত্রী সেই মা। সন্তানমাত্রেই তাহার কাম্য নহে—সুসন্তানই কাম্য—সাবিত্রী বেশ একটু শক্ত মা। নবীনের উক্তিতেও প্রমাণিত—"মাতা

আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন।"

কিন্তু সাবিত্রী-চরিত্রের আসল পরীক্ষাস্থল—পতিকে জেলায় লইয়া যাইবার পরের অবস্থা—*(পতির উদ্বন্ধনে মৃত্যুর সংবাদ শুনিবার প্রতিক্রিয়া অদৃশ্য রাখা হইয়াছে, তবে পরোক্ষভাবে উপস্থিত হইয়াছে) এবং নবীনমাধবের মৃত্যুর পরে—শোকার্ত মাতৃহৃদয়ের প্রতিক্রিয়া। নাট্যকার সাবিত্রী-চরিত্রের নাটকীয় প্রয়োজন সম্পর্কে বেশী সচেতন হইয়া পড়ায় (৩য়, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে) পতি-পুত্র এবং ছোট বধূর (যাহাকে তিনি হত্যা করিবেন) দিকে সাবিত্রীর আবেগকে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভাগ করিয়া দেওয়া আপত্তিকর নয় বটে কিন্তু যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার স্বাভাবিকত্ব প্রশ্নাধীন। তবে পতি-শোকের পরোক্ষ নিদর্শন; আমরা পুরোহিতের মুখে যাহা পাই তাহা সাঙ্কেতিক হিসাবে জোরালো—"প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পাপ পৃথিবীর অন্নগ্রহণ করিবেন না"—গভীর প্রতিক্রিয়ারই নিদর্শন; অবশ্য পুরোহিতের মুখেই শোনা যায়—নবীনমাধবের পীড়াপীড়িতেই তিনি উপবাস ভঙ্গ করিলেন এবং নবীনকে **পঞ্চ বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন**"।

এই "মাতা"ই পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইয়াছেন। এই উন্মত্ত অবস্থার পরিকল্পনে এবং রূপায়ণে নাট্যকারের যে উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমে মূর্চ্ছাবস্থা—তখন "মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে গলা পুড়ে যাচ্যে"—মূর্চ্ছাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্তাবস্থা—মাতৃত্বের তথা বাৎসল্যের প্রাথমিক পর্য্যায়ে প্রত্যাবর্তন (Regression) ঘটিয়া গিয়াছে। সাবিত্রীর প্রলাপোক্ত প্রলাপ বটে কিন্তু নিরর্থক নয়—("There is reason in his madness"), প্রত্যেক Regression-এর —অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্তির সঙ্গে "Dissociation" কমবেশী থাকে—এখানেও তাহা আছে। কবিরাজও তাহা বলিয়াছেন—"সহসা এরূপ হওয়া সম্ভব এবং

নিদানসঙ্গত।" (অবশ্য জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে তিনি 'হিমসাগর তৈলের ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না।)

* কিন্তু নাট্যকার এই উন্মত্ত অবস্থাকে বেশী কচলাইতে গিয়া তিক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—যে-পরিস্থিতির কল্পনা করিয়া এই উন্মত্ত মাতাকে দেখানো হইয়াছে তথা করুণ রস-নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা ঔচিত্য-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ—বিভাব কল্পনায় দোষ দেখা দিয়াছে এই যে—"নবীনমাধবের মৃত শরীর' "ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা'—এই ঘটনা অস্বাভাবিক। নবীনের মৃতদেহের কাছে একমাত্র ঐ পাগলিনী আছেন, আর কেহ নাই—ইহা ধারণা করা যায় না। 'গাল চাপড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে এখেচে" এই যাঁহার অবস্থা, তাঁহাকে এবং মৃত শরীরকে একা রাখিয়া—সরলার মুখে—"এঁরা সব কোথায় গেলেন—এইটুকু দিয়া ঘটনার ঔচিত্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ—একই রসের পুনঃপুনঃ দীপ্তিজনিত যে-রসগত দোষ তাহা এখানে প্রকট। সাবিত্রীকে সরলার "গলার উপরে নৃত্য" করাইবার প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার্য, কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে ঘটনা-বিন্যাসে এবং অনুভাব-সঞ্চারি-ভাবের রূপায়ণে বাস্তবতার মায়া অক্ষুণ্ণ রাখাও অত্যাবশ্যক। এই গর্ভাঙ্কের ঘটনা-বিন্যাসে এবং চরিত্রের অনুভাবাদি প্রকাশে নাট্যকার ঔচিত্যবোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তারপর সাবিত্রীর উন্মত্তাবস্থার অপগমও খুব নিয়মসম্মত হয় নাই। নাটকীয় প্রয়োজনকে, যুক্তিসঙ্গত তথা শিল্প-সুন্দর রূপ দেওয়ার কথা যেন নাট্যকারের মনে নাই। 'মূর্চ্ছাপগম' এবং "ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু" উভয়ই আকস্মিক তথা—মেলোড্রামাসুলভ ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

* **সৈরিন্ধ্রী**—বসু-পরিবারের (যৌথ পরিবারের) বড় বউ—নবীনমাধবের পত্নী—"সারল্যের পুত্তলিকা"—পতিগত-প্রাণা এবং আদর্শ কুলবধূ। ছোট জা'কে পেটের ছেলে বিপিনের মতই ভালবাসেন—শ্বশুর-শাশুড়ীর এবং স্বামীর জন্য তিনি তাঁহার সব কিছুই ত্যাগ করিতে পারেন। "অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে ?"—

এই এক কথাতেই তাঁহাকে চেনা যায়। কিন্তু এ তো শুধু তাঁহার মানস-প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। চরিত্র-সৃষ্টি হিসাবে বড কি ছোট সে বিচার ভিন্ন। সৈরিন্ধ্রী সহজ কথাবার্ত্তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু গুরুতর আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে, ভাবে যতটা হউক বা না-হউক ভাষায় অনুচিত মাত্রায় কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। সৈরিন্ধ্রীর গুরুতর পরিস্থিতি—নবীনমাধবের মূর্চ্ছা এবং মৃত্যুর দৃশ্যে। নাট্যকার এইসব স্থলে চরিত্রটিকে সমুচিত ভাব-ভাষা আবেগাদি দিয়া অঙ্কিত করিতে পারেন নাই—চরিত্রটি যে-পরিমাণে কৃত্রিম বা অবাস্তর হইয়াছে সেই পরিমাণে করুণ রসের রস-নিষ্পত্তির অন্তরায় হইয়াছে।

* **দীনবন্ধু** এখানে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত—ভুলিয়া গিয়াছেন যে নাট্যকার জীবন-নিরপেক্ষ ভাব-শিল্পী নয়, জীবন-শিল্পী—জীবনসাপেক্ষ যে-ভাব সেই ভাবেরই শিল্পী। জীবনের রূপ যেখানে কৃত্রিম ও বিকৃত হয় সেখানে নাট্যকারের পরাজয়। দীনবন্ধুর তন্ময়ীভবনযোগ্যতা কম ছিল না. অথচ সেই শক্তি এখানে যেন কে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। প্রথার প্ররোচনায় শিল্পী পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। (সৈরিন্ধ্রীর ভাষা একে 'লেখ্য' তাহাতে 'বিদ্যাসাগরী'।)

অথচ যেখানে প্রথার চেতনা নাই, সেখানে ভাব ও ভাষা স্বাভাবিকতার পরিধির মধ্যেই আছে। আদুরী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, পদী ময়রাণী—চমৎকার দৃষ্টান্ত।

* **আদুরী**—গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী। কাণে সে একটু কম শোনে—খুব সম্ভব প্রয়োজনমত। সৈরিন্ধ্রীর কথায় জানা যায়—মাথায় একটু ছিট আছে 'পাগলী'। বিশেষতঃ 'ভাতারে'র কথা উঠিলে আদুরীর আর কথা নাই। 'মন্সের মুখখান মনে পড়াল' 'আজও তাহার পরানডা ডুকরে কাঁদে ওটে'। তাহারে নাকি সে "বড্ডি ভালবাসতো"; ভালবাসার বড় প্রমাণও আছে—"বাউ দিতি চেয়েলো"। বিবরণ হইতে সে প্রত্যক্ষ ভাষণে চলিয়া যায়। স্বামী যে ভাবে ও ভাষায় আদর করিত তাহা আবেশভরে যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতে থাকে—

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ পুঁইচে কি এত ভারি
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি।

দেখদিনি খাটে কি না।। ঝিমুলেই নাকি বলিতো—"ও পরাণ ঘুমুলে"। ভাতারকে নাম ধরিয়া ডাকিবে কেমন করিয়া?—সে ডাকিত—"হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো।" (A slice of life বটে!) তারপর, সাবিত্রী যতই বলুন—"তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?"—সে কথার পিঠে কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না—অর্থ থাক্ আর না থাক্ একটা কিছু বলা তাহার চাইই চাই—"পোড়া-কপালি কি বলিতে কি বলে কিছুই বোঝে না"। সৈরিন্ধ্রী বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনিতে চাইবামাত্র আদুরী মন্তব্য করে—"সেই সাগর নাড়েক্ষত্রবিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে—মুই আজাদের দলে।" রেবতী সাবিত্রীর কাছে আপদের কথা বলে—পদীর কথা জানায়, আদুরী বলিয়া বসে—থু-থু গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোরা যাইতে পারি ··· মুই সব সইতি পারি প্যাজির গোন্দো সইতি পারিনে ······"। সাহেব ক্ষেত্রমণিকে 'কামরাঙ্গার ঘরে' লইতে চায় এই কথা শুনিবামাত্র সে বলে—"মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগল ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুইতো কখনুই যাতি পারবো না, থু-থু। গোন্দো প্যাজির গোন্দো।" রেবতী যেই বলে—"না কি এ ম্যাদের পিল হয় না," আদুরী পাত্রোচিত অতিস্থূল আদিরসাত্মক রসিকতায় মুখর হয়—ম্যাদের বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।" সাবিত্রী যতই বলুন—'আদুরী তুই একটু চুপ কর বাছা" আদুরী কাণেও তোলে না—মাচের টক সাহেবের সঙ্গে বিবির যে কেলেঙ্কারি হইয়াছে তাহা বলিয়া যায়। সেইক্ষণে সরলতা কাপড় তুলিয়া লইয়া আসিতেই—আদুরী টিপ্পনি করে—এই যে ধোপা বউ কাপড় নিয়ে আলেন। **আদুরী 'পাগ্‌লী' হইলেও বেশ 'রসিকা'।**

বয়স বাড়িয়াছে বটে কিন্তু গ্রাম্য বয়স্কাদের মতই তাহার রসিকতা একটু আদিরস ঘেঁষা। বাস্তবিক আদুরীর মত চরিত্রকে আস্ত রাখিতে গেলে এই ধরনের রসিকতা বাদ দেওয়া কঠিন। যত অশ্লীলই হউক রসিকতার সুযোগ সে

কিছুতেই নষ্ট করে না। সরলতা যেই বলে—"আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।' সে 'কাপড় তুলি'কে অন্য অর্থে যোজনা করিয়া বলে—ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক। এবং নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা হা করিয়া হাসে। নবীনমাধব যখন—নিদ্রাভঙ্গের পরে, 'নেপথ্যে আদুরী'কে ডাকেন, 'সৈরিন্ধ্রী' বলে—আদুরী তোরে ডাকচে। কিন্তু আদুরী সঙ্গে সঙ্গে বলে 'ডাকচেন মোরে কিন্তু চাচ্চেন তোমারে'। কিন্তু তাই বলিয়া আদুরী শুধু যে পাগলামি আর বাচলামি করিতেই জানে তাহা নহে, এই পরিবারের দুর্বিপাকে আদুরীকে আমরা তীব্র আবেগে কাঁদিতেও দেখি। নবীনমাধবের অবস্থা দেখিয়া সে আর্তনাদ করে—আহা! **নব**, হা বলে যাব, **পরাণ ফ্যাটে বার হলো**। আদুরী কোন ভাবের মানুষ নহে, একটি রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ।

* **রেবতী:**—সাধুচরণের স্ত্রী—চাষার ঘরের স্ত্রী হইলেও হিন্দু নারীর ধর্মনিষ্ঠা তাহার মেরুমজ্জাগত—সে স্পষ্ট বলে—"ধর্ম কি ব্যাচবার জিনিস, না এর দাম আছে। তাইতো পদীর প্রস্তাব শুনিবা মাত্র লাথি মারিয়া মুখ ভাঙিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুধু এই মনে করিয়াই ইচ্ছা দমন করে যে—"বিটী সাহেবের লোক'। রেবতী চরিত্রের প্রধান দিকটি এই যে সে **ক্ষেত্রমণির মা**। এই 'মা'-রেই ক্ষেত্রমণির বিপত্তি ও মৃত্যুর পরিস্থিতিতে সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর দৃশ্যে "রেবতীর মাতৃহৃদয় যে ঐকান্তিক ও স্বাভাবিকভাবে রূপ পাইয়াছে যে নাটকে খুব তীব্র অথচ স্বাভাবিক যে কয়টি দৃশ্য আছে তাহাদের মধ্যে এই দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু তন্ময় থাকিলেও গুরু ভাব ও রসকেও যে আদায় করিতে পারেন—ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগের অত্যাচার এবং এই দৃশ্যটি তাহার বড় উদাহরণ।

* **ক্ষেত্রমণি**— সাধুচরণ ও রেবতীর একমাত্র কন্যা। মায়ের ধর্মনিষ্ঠা মেয়েতেও বদ্ধমূল। সে পরাণ দিতে প্রস্তুত, ধর্ম দিতি পারিবে না। তাহার দৃপ্ত ঘোষণা—"মুই পরাণ দিতে পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়ায়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি

পারবো না।…”…“মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবে না।” এই তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নাট্যকার **রোগ** সাহেবের অত্যাচারের মুখে ক্ষেত্রমণির দেহ-মন-আত্মার যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া রূপায়িত করিয়াছেন তাহাকে এককথায়—**elemental** বলা যাইতে পারে।

সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন—“এই দৃশ্যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার একটি অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই অতি অশ্লীল দৃশ্য গ্রাম্য নারী চরিত্রের গ্রাম্য ভাষায় দীনবন্ধু এই একটা জীবনের সত্য—**criticism of life**—এখানে কাব্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।” বস্তুত, এ-দৃশ্যটি যেমন দীনবন্ধু-প্রতিভার তেমনি ক্ষেত্রমণির সতীত্ব সংস্কারেরও অগ্নি-পরীক্ষা। ক্ষেত্রমণি কায়-মনোবাক্যে সতী, এ-সতীর কাছে পরপুরুষের স্পর্শটুকুও পাপ। ক্ষেত্রমণি দৃপ্ত কণ্ঠেই বলে—‘মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না.’। পদী ময়রানী তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে—তোর ভাতাব কোথায়, তুই কোথায়, একথা কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু যে ধর্ম্মবোধের সহিত সতীত্ব ধর্ম্ম এক হইয়া আছে, তাহার প্রেরণা তো অনিবার্য। ক্ষেত্রমণির কাছে-যে দেবতা ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা তিনি তো সতীত্ব ধর্ম্মেরও বিধাতা। স্বামীর অজ্ঞাতে পাপ করিলে স্বামী না জানিতে পারেন কিন্তু দেবতার চোখে ধূলি দিবে কে? আর দেবতার শাস্তির আগে, বিবেকদহনের তুষানলের নিত্য দাহ হইতে নিষ্কৃতি কোথায়?—ক্ষেত্রমণি বলে—“আমার প্রাণের ভিতর তো পাজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বলো মোরে যত ভালবাসবে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক অজানাই হোক, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।”

এই মেয়েকে পদী ‘বিবির পোশাকে’র লোভ দেখাইতে চায়! যোগ্য উত্তরও পায়—‘পোড়া কপাল বিবির পোশাকের—১ট পর্যে থাকি সেও ভাল তবু যাান বিবির পোশাক পরতি না হয়।’ তৃষ্ণা প্রবল—তবু সে ‘সাহেবের জল’ খাইবে না, লাঠিয়ালরা ছুঁইয়াছে। সুতরাং স্নান না করিয়া, ঘরে না যাইয়া জল খাইতে

পারিবে না। কিন্তু পদীর কথাই ঠিক—'সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ানো ভার।" শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে কাল সাপের গর্ত্তের মধ্যে একা রাখিয়া পদী চলিয়া যায়।

সত্তার জীবনে চরম সঙ্কট মুহূর্ত্ত। ক্ষেত্রমণির দুই হাত ধরিয়া **'রোগ'** আকর্ষণ করে। অগত্যা ক্ষেত্রমণি, **রোগ** সাহেবকে **'মানুষ'** মনে করিয়া তাহার পবিত্রতম একটি ভাববন্ধে (সেন্টিমেণ্ট) আবেদন করে,—রোগকে বলে "—ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা"—কিন্তু "রোগ" **rogue**ই বটে। সে একটু আগেই নিজের পরিচয় দিয়াছে—"আমার কাছে বলা শূয়ারের কাছে মুক্ত ছড়ানো। হা হা হা, আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি ··· পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে' কত মাতা পুড়িয়া মরিল তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি?" সে যে বলিবে—"তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে··· বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব'—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ক্ষেত্রমণি **নবজাত মাতৃসত্তার** কাতর আবেদন করে—"মোর ছেলে মরে যাবে এই সাহেব মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।" তবু রোগ সাহেব তাহাকে উলঙ্গ করিতে উদ্যত। পিতৃ-ভাববন্ধ অসাড়!—পিতা হওয়ার সুযোগ নাও হইতে পারে, কিন্তু মাতৃগর্ভে তো জন্মিয়াছে! মাতৃস্তন্যে—মাতৃক্রোড়ে বঞ্চিত যে হইয়াছে, মাতৃ শব্দটি তাহার কাছে অবশ্যই পবিত্র। তাই নিরুপায় ক্ষেত্রমণি শেষ পর্য্যন্ত পবিত্রতম মাতৃ ভক্তির-ভাববন্ধে আবেদন করে—"ও সাহেব মুই তোর মা···তুমি মোর ছেলে। কাপড় ছেড়ে দাও।"

সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়। তবু সে আত্মসমর্পণ করে না—সাহেবের আক্রমণের মুখে সে মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। নিরস্ত্রের পক্ষে যতভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো সম্ভব সে তাহা দেখায়। সমস্ত জ্বালা গালাগালি-রূপে উৎক্ষিপ্ত হয়—"ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে তোর বাড়ী ঘোড়া মরা মরো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এচ্‌ড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো, তোর মা-বুন নেই তাদের গিয়ে

কাপড় কেড়ে নিগে না।" ইহাকে শুধু প্রতিক্রিয়া না বলিয়া, সমস্ত সত্তায়-আগুন-জ্বলিয়া-যাওয়া বলাই ভাল।

* এই চরিত্রটিকে শুধু "জীবনের সমালোচনা বলা যথেষ্ট নহে ইহা এক মহা সঙ্কট মুহূর্তে নারী-জীবনের দেহ-মন-প্রাণের অতি অকৃত্রিম তথা অতি বাস্তব অভিব্যক্তি। এই ক্ষেত্রে, সৃষ্টি সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর। প্রাণ-মন-আত্মার ক্রিয়াকে কায়-মনোবাক্যে এমনিভাবে যিনি প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন জীবন শিল্পী হিসাবে তাহার বিশেষ মর্যাদা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

'জীবন দেখার দৃষ্টি নাট্যকার দীনবন্ধুর যে তীক্ষ্ণ * **পদীময়রাণী চরিত্র** বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়। পদী টাকার জন্য তাহার নারী ধর্ম্ম খোয়াইয়াছে—কুটির সাহেবের কাছে ধর্ম্ম বেচিয়া দিয়াছে—উপপতি করিয়াছে! সাবিত্রীর কথাই সত্য—"বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়"। তবে সব সত্য নয়—নিজেই সে বলিয়াছে—"উপপতি করিচি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই……। বস্তুতঃ, তাহার শরীরে দয়া আছে এবং ঘৃণালজ্জাও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কচি কচি মেয়ে সাহেবকে ধরিয়া দিয়া সে নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতে চায় না, কিন্তু ছোট সাহেবের যে আগায় না—সে এবং কলিবুনো থাকিতেও, আরো চাই। কলিবুনোর বিছানা ছুইতে হয় এজন্য তাহার ঘৃণার অন্ত নাই—"ওমা কি ঘৃণা! টাকার জন্যে জাতজন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো…" সংস্কার মরিয়াও মরিতে চায় না। তারপর—প্রত্যেক 'আমি'-টাই তো বহুধা বিভক্ত—নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত। পদী উপপতি করিলেও বিবেককে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। তাহার কাজ যে অন্যায় সে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে। কম জ্বালা? সে গ্রামে বাহির হইতে পারে না। কাকের পিছনে যেমন ফিঙে লাগে লোক তেমনি তাহার পিছনে লাগে। গ্রামের সম্ভ্রান্তদের কাছে মুখ দেখাইতে তাহার লজ্জা করে—নবীনমাধবকে দেখিয়া সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বলে—"ওমা কি লজ্জা। বড় বাবুকে মুখখান দেখালাম।" এবং ঘোমটা দিয়া প্রস্থান করে। মানুষের আত্মাটি তাহার মধ্যে একেবারে মরিয়া যায় নাই—

শিশুরা যখন করতালি দিয়া ছড়া কাটে—"ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই।" সে 'পিসি দিদি' প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক তুলিয়া সস্নেহ ব্যবহারে নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে। তাহার এই চেষ্টাটুকুর মধ্যে নারী হৃদয়ের কোমল মধুর ভাবগুলির ভগ্নাবশেষেরও প্রকাশ পায়। ক্ষেত্রমণির মুখে—"পিসি, ডাক শুনিয়াও সে অস্বস্তি বোধ করে—সে ব্যথিতই হয়। তাহার স্বগতোক্তিতে দেখা যায়—"ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমারে দেখে ময়রা পিসি ময়রা পিসি বলে কাছে আসে।" রোগ সাহেবের কামরায় পদী ক্ষেত্রমণিকে যেমন—বাছা "লক্ষ্মী মা আমার, সম্বোধন করে—তেমনি স্বগতভাবে জাত ধর্ম্মের জন্য একটু আক্ষেপও করে—সাহেবকে বলে—"ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর এক দিন আসবে।" রোগের কথা সত্য নয়—পদী ক্ষেত্রমণিকে সরাইয়া দিয়া সাহেবের সঙ্গে মজা করিবার উদ্দেশ্যেই যে একথা বলে তাহা নহে। *পদী-চরিত্র সৃষ্টিতেও দীনবন্ধু চমৎকার দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এখানে আগে পরিকল্পিত করিয়া পরে প্রাণ যোগ করা হয় নাই—এ-সৃষ্টি অপৃথগ্ যত্ননির্ব্বর্ত্ত্য। চরিত্র সৃষ্টি আসলে "soul complex"-কে রূপ দেওয়া—ইহা তাহারই নিদর্শন।

এইবার 'চরিত্র-সৃষ্টির দক্ষতা' সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—চরিত্র-বৈচিত্র্যের কথা ধরা যাউক। এই নাটকে দীনবন্ধুর সামাজিক-অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এক কথায় বিস্ময়কর। তদানীন্তন সমাজের খুব কম শ্রেণীই আছে যাহা এখানে প্রদর্শিত হয় নাই। ডাক্তার, কবিরাজ, অধ্যাপক, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি, দারোগা, পেস্কার, আমিন, খালাসী, লাঠিয়াল, হিন্দুমুসলমান, চাষী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত নীলকর সাহেব, কলেজের পণ্ডিত, দাস-দাসী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর চরিত্র নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—কয়েকটি চরিত্র ছাড়া আর সকল চরিত্র ভাবে ও ভাষায় লৌকিকের মতই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে চরিত্র উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি—বিশিষ্ট পরিবারের লোক, সেখানে ভাব ও ভাষায়

কৃত্রিমতার জন্য, লেখ্যরীতির প্রয়োগের জন্য চরিত্রের সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য, কিন্তু যেখানে দীনবন্ধু চরিত্রকে ভাবে-ভাষায় শিষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য কোন সংজ্ঞান তথা পৃথক চেষ্টা করেন নাই—"আত্মগত রসকল্পনায় বস্তু সকলকে মণ্ডিত না করিয়া বস্তুসকলের রস-সত্তায় আপনাকে বিলাইয়া" (মোহিতলাল)—দিয়াছেন—চরিত্রকে স্বরূপে অবস্থিত করিয়া প্রত্যক্ষ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রে দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার-প্রতিভা দেখাইয়াছেন। ইহারই ফলে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি শুধু শ্রেণী প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়ায় নাই, প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে দীনবন্ধু চরিত্রস্রষ্টা হিসাবে "naturalist"—who know the richness of soul complex and recognise that "vice has a reverse side very much like virtue'—(Strindberg)। সব ক্ষেত্রে যদি নাট্যকার সমানমাত্রায়—'Naturalist' হইতে সমর্থ হইতেন, নীলদর্পণ বাংলা নাট্যসাহিত্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত। ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই—দীনবন্ধু প্রধান প্রধান চরিত্রকে রূপ দিতে গিয়া এই 'naturalism' হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। [চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।]

[নীলদর্পণ নাটকে ভাববস্তু—বা সমাজ সমালোচনা।]

'উত্তরচরিত-সমালোচনা প্রসঙ্গে, **বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে*ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রথম প্রযোজক,** মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য আলোচনা করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—**কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে-উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন-চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না; তাঁহারা সৌন্দর্য্যের**

চরমোৎকর্ষ স্জনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" এবং যাঁহারা বলেন—'ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাগাদের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—**"কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া জানিতে হইবে।** এই "**অন্য লাভ**" অবশ্যই ভাববস্তু বা জীবন-সমালোচনা হইতে আসে।

বস্তুতঃ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবনের ভাব ও রূপের অনুভূতিকে (সর্ব্বোত্তম) আনন্দদায়ক রূপে প্রকাশ করা—এই (সর্ব্বোত্তম) আনন্দদায়ক রূপে যাহা প্রকাশিত তাহাই রসোত্তীর্ণ। শিল্পী জ্ঞাতসারে সর্ব্বোত্তম আনন্দদায়ক তথা ,আদর্শ রূপটিকে প্রকাশ করিতেই ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের বিবাদ সকলের পক্ষে সমানভাবে মিটানো সম্ভব নহে। এখন যে-কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য তাহা এই যে --আনন্দ কোন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নহে, জীবনের বাসনা কামনার বন্ধেই আনন্দের জন্ম এবং বড় আনন্দ সেখানেই যেখানে জীবনের গভীর বা প্রধান বাসনা-চক্র চরিতার্থ হয়। আবার এই বাসনার বলয়টি কোথাও স্থির হইয়া নাই—মৌলিক কয়েকটি স্থায়ীভাবের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক স্থির রূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা-বলয় নানাদিকে নানারূপে প্রসারিত হয়, এক কথায়—বিশেষ বিশেষ সামাজিক জীবনের মধ্যেই বাসনাকে ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। শিল্পীরা এই সামাজিক জীবনের বাসনা-কামনাকে রূপে রসে ব্যক্ত করেন। এখানে এক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীর যে-পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি—এক, ভাববস্তু ধারণার সামর্থ্য, দুই ধারণাকে সুন্দরভাবে রূপ দেওয়ার দক্ষতা। এই ভাববস্তু ধারণার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। কেহ সর্ব্বজনীন "ভাববস্তু' নির্ব্বাচন করেন, কেহ আবার প্রাদেশিক "বিষয়বস্তু"

নির্ব্বাচন করেন। অবশ্য, যেমন সর্ব্বজনীন ভাববস্তু নির্ব্বাচন করিলেই বড় সাহিত্য হয় না, তেমনি প্রাদেশিক ভাববস্তুকে সর্ব্বজনীন আনন্দের বস্তুতে পরিণত না করা পর্যন্ত তাহা শিল্প হইয়া উঠে না। সমাজের বিশেষ এক বৃত্তাংশে অবস্থিত জীবনের মাধ্যমেই জীবন-সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটানো—শিল্পীর উদ্দেশ্য। জীবন সমালোচনার মধ্য দিয়াই এই সাক্ষাৎকার আসে। সুতরাং মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ বা রস সৃষ্টি বটে কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্য—ভাববস্তুর বাসনা পূরণ—তথা সমাজ সত্যের সমালোচনা। এই ভাব-বস্তু এক নহে। এই নাটকে যে 'ভাব-বস্তু'কে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে এক কথায় আমরা বলিতে পারি নীলকর অত্যাচারের যুগে বাংলা দেশের নিরুপায় প্রজাবর্গের দুঃখদুর্দ্দশা। ইহা নিতান্তই প্রাদেশিক ঘটনা। স্বরূপতঃ একরূপ অর্থনৈতিক আন্দোলন হইলেও, ইহা সাধারণ অর্থনৈতিক আন্দোলন নহে—জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের অথবা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের আন্দোলন নহে। বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ পর্য্যায়ে—ইউরোপীয় বণিকের—ও নীলকরের শাসন-শোষণ-অত্যাচারের রূপ। এই হিসাবে—বিষয়বস্তুটি, অবশ্যই, (topical) প্রাদেশিক এবং উদ্দেশ্য—সঙ্কীর্ণ। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে পরাদর্শনের পটভূমিতে দেখিতে বা দেখাইতে যাওয়া ঠিক হইবে না। [সব সামাজিক ট্র্যাজেডিতে এই প্রত্যাশা অনুচিত—**strife** দ্রষ্টব্য]। জীবনকে দেখিতে হইবে—বিশেষ এক সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতির পটভূমিতে আর সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের সংগ্রাম ও শোচনীয় পরিণতির মধ্যেই ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

নীলদর্পণ নাটকে নাট্যকার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজের একটি বৃত্তাংশ পরিপাটিরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। নীলকর সাহেবের অত্যাচারের রূপ যতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাদের কোনটিই বাদ পড়ে নাই। দেশীয় সমাজেরই একটি অংশ কেমন করিয়া টাকার লোভে নীলকরদের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল—গোপী, পদী, আমিন, লাঠিয়ালরা তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

তখনকার কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট হইতে দারোগা জমিদার পর্যন্ত—"এক

ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার”—অবস্থা। এই অবস্থাটির ফলে বিচার যে অত্যাচারেরই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—একথাটিও স্পষ্ট ভাষায় নাট্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন। তখনকার—অরাজকতার রূপটি নাটকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত। ধন-প্রাণ-মনের উপর এত বড় অত্যাচারের চাপ—প্রজাসাধারণের পক্ষে মহাসঙ্কটরূপেই দেখা দিয়াছিল। দীনবন্ধু এই মহাসঙ্কটের সমস্ত দিক নাটকে তুলিয়া ধরিয়াছেন—অকথ্য অত্যাচারের রূপ এবং অত্যাচার সত্ত্বেও প্রজার প্রতিরোধস্পৃহা উভয়ই সমানভাবে রূপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ বাংলার কৃষকের জীবনের এত সম্পূর্ণ আলেখ্য আগে বা পরে খুব কমই পাওয়া যায়। এত বাস্তব পরিস্থিতি দিয়া নাট্যকার পটভূমিটি গঠন করিয়াছেন এবং তাহাতে এত বাস্তবিককল্প চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যে, নীলদর্পণ-নাটকে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ-সময়ের বাংলার সমাজ যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে—সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিরাপত্তাবোধের তাগিদে ইংরেজ-প্রীতি, ইংরেজ-ভক্তি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজের রাজ্য মগের মুল্লুক নয়—“ইংরেজের রাজ্যে কেউ কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।” —এ বিশ্বাস অনেকের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু চাষার অবস্থা যে মুসলমান-আমল অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নততর হয় নাই “চাষার ঘরে সব পারে—” রেবতীর এই হতাশা এবং “রাইষতের” কান্না—“কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না”—চাষা শ্রেণীর নিরুপায় অবস্থাটিকেই ব্যক্ত করিয়াছে। জন-চাষী; ক্ষুদ্র কৃষক, গাতিদার—সমস্ত কৃষক শ্রেণীর বিপত্তিকে, শ্রেণীবিন্যাসের রূপ ও পারস্পরিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াই, নাট্যকার রূপ দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায় —নাট্যকার তদানীন্তন বাংলার অর্থনৈতিক—রাজনৈতিক—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপটি এই নাটকে যথাসাধ্য এবং যথাপ্রয়োজন উপস্থিত করিয়াছেন। নীলদর্পণ তদানীন্তন বাংলার ইতিহাসের একখানি মূল্যবান সাহিত্যিক দলিল।

উপসংহারে একটি কথা অবশ্যই বলা দরকার—সেই কথাটি এই যে নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহার নাট্যরচনার মাধ্যমে যেভাবে সমাজ ও জীবন সমালোচনা

করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা অবশ্যই প্রগতিপন্থী বলিতে পারি বটে কিন্তু একথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রূপ তুলিয়া ধরিলেও, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে—পরাধীনতার বিরুদ্ধে কোন সচেতন প্রতিক্রিয়া দেখান নাই। বরং ভূমিকায় এমন সব কথা আছে যাহাতে ইংরেজ ভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে মনে করা যাইতে পারে। ভূমিকার কথা যুগের কথা মাত্র—অর্থাৎ আত্মরক্ষার আবরণ মাত্রও হইতে পারে।

গিরিশচন্দ্র

বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাসে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র যে একজন যুগন্ধর ব্যক্তি একথা প্রত্যেক ঐতিহাসিককেই স্বীকার করতে হ'য়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। উন্নাসিক সমালোচকদের উদাসীনতা যত মাত্রাহীনই হোক, এই সত্যটি কেউই অস্বীকার করতে পারেননি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে আরম্ভ ক'রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত, নট হিসাবে এবং নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রই বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ—একাধারে নটগুরু নট এবং নাট্যকার; এক কথায় বাংলা নাট্যজগতের অধিনায়ক। সব কিছু অস্বীকার করার পরেও একথা অবশ্যস্বীকার্য্য থাকবে যে গিরিশচন্দ্র বাংলার নাট্যাভিনয়ে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন বাংলার নতুন প্রাণের স্পন্দনকে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাঙালীর প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন. বাংলার নাট্য সম্পদকে ৮০ খানি নাটক দিয়ে সমৃদ্ধতর করেছিলেন—বাংলার রঙ্গমঞ্চে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের নতুন এবং বাস্তব প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—বাংলার রঙ্গালয়কে যুগপৎ আমোদালয়ে এবং শিক্ষালয়ে পরিণত করেছিলেন। এ মিথ্যা নয়—সত্য ঘটনা এবং তার সাক্ষী বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাস—গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলী। এও অতি সত্য ঘটনা যে গিরিশচন্দ্রের নাটক একদিন তার রূপ-রসে বাঙালীর চিত্ত আকর্ষণ করেছিল—বাঙালীর রসরুচিকে পরিতৃপ্ত ক'রেছিল। কারণ, একথা স্বীকার না করলে 'যা স্বীকার করলে হয় তা' খুবই হাস্যোদ্দীপক—স্বীকার করতে হয় যে, গিরিশচন্দ্রের নাটক দেখতে বাঙালীরা উদগ্র আগ্রহে টিকিট কিনতো, সমুৎসুক হয়ে অভিনয় দেখতো এবং আত্মহারা হয়েই দেখতো, কিন্তু দর্শকদের রসরুচি অতৃপ্তই থেকে যেতো। এর চেয়ে হাস্যকর সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না বলেই আমাদের

একথা স্বীকার করতে হবে যে গিরিশচন্দ্রের নাটকের রূপ ও রস তদানীন্তন বাঙালী সমাজের রসবোধকে যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছিল এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দর্শকচিত্তাকর্ষণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, যেহেতু নাটক দৃশ্য—অর্থাৎ অভিনেয় কাব্য, অভিনেয়ত্বই নাটকের প্রাণ এবং অভিনয় সাফল্যের মাত্রা নাটকীয় সার্থকতার অন্যতম লক্ষণ—নাটকের সার্থকতা বিচারে নাটকের কাব্যমূল্য এবং অভিনেয়ত্ব-মূল্য উভয়েই বিচার্য্য। একথাও অবশ্য স্মরণীয় যে এই দুই মূল্য পরস্পরসাপেক্ষ। নাটকের বিচার—অভিনেয় কাব্য হিসাবে রচনাটি কতদূর সার্থক হয়েছে তারই বিচার। এই বিচার-সূত্র প্রয়োগ করতে গেলেই বুঝা যাবে গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনেয় রচনা হিসাবে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সেই হিসাবে গিরিশচন্দ্র একজন সিদ্ধ নাট্যশিল্পী।

এই প্রসঙ্গেই, নাটকের রূপ-রস এবং দর্শক-রুচি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই এবং বলতে চাই তাঁদের উদ্দেশ্যেই যাঁরা নাটকের রূপ-রস এবং দর্শকরুচির আলোচনায় বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে সরে গিয়ে সবকিছুর একটা নিরপেক্ষ আদর্শ কল্পনা করে থাকেন—রচনার রূপ-রসকে এবং দর্শকরুচিকে ইতিহাস-নিরপেক্ষ বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর অবৈজ্ঞানিক সমালোচকরা বস্তুর বিবর্ত্তন-ধর্ম্মিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না বলেই, রূপ-রস-রুচির পরা-আদর্শ (Absolute standard) খুঁজতে ব্যস্ত থাকেন এবং স্বকপোল-কল্পিত একটি অবাস্তব আদর্শের মানদণ্ডে সবকিছুকে যুগধর্ম্মনিরপেক্ষভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেন। একটু বাস্তবাত্মগ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই এঁরা দেখতে পাবেন যে যেমন বস্তু-জগতের, তেমনি মনুষ্য সমাজেরও প্রত্যেকটি বস্তুই বিবর্ত্তনের অধীন—সমাজের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকের মনের তথা শিল্পেরও রূপ-রস-রীতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টিই বিশেষ বিশেষ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ—বিশেষ বিশেষ সমাজের, বিশেষ বিশেষ যুগের দান। নাটকের কথাই ধরা যাক্। গ্রীক নাটকের রূপ, সংস্কৃত নাটকের

রূপ এবং ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগের নাটকের রূপ ও রস এক নয়। তেমনি মার্লো ও শেকস্‌পীয়রের নাটকের রূপ-রস থেকে কর্ণেইর অথবা রাসিনের নাটকের রূপ-রস ভিন্ন; আবার কর্ণেই-রাসিন প্রভৃতির নাটকের রূপ-রস থেকে ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, বার্ণাডশ' প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের রূপ ও রস স্বতন্ত্র। তারপর আধুনিক একস্‌প্রেশানিস্ট বা ইম্‌প্রেশানিস্ট নাট্যকারদের নাটকের রূপ-রস পূর্ব্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকের রূপ-রস থেকে অতি সংলক্ষ্য-ভাবে পৃথক। এদের মধ্যে একমাত্র ঐক্য আছে লোকবৃত্ত উপস্থাপনার ব্যাপারেই; তা'ছাড়া রূপ-রস রীতিতে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য রয়েছে। বলা বাহুল্য এই পার্থক্য—অর্থাৎ রূপ-রসের বিশেষত্ব সত্ত্বেও এরা সকলেই নাটকপদবাচ্য এবং নাট্যের ইতিহাসে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের ও যুগের রুচির চাহিদাতেই তাদের রূপ-রসের এই পার্থক্য ঘটেছে। গ্রীক নাটকের 'কোরাস' দেখে কেউই একথা বলেন না—শেকস্‌পীয়র নাটকে কোরাস নেই, অতএব গ্রীক নাটক নাটকই নয় অথবা মার্লো-শেকস্‌পীয়র নাটকের পদবন্ধ বা দৃশ্যবিভাগ দেখে কেউ একথা বলে না যে ইবসেনের নাটক যেহেতু গদ্যে লেখা এবং ইবসেনের নাটকের অঙ্কগুলি দৃশ্য-বিভক্ত নয়, অতএব শেকস্‌পীয়রের নাটক নাটকপদবাচ্যই নয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের নাটকের রূপ-রসের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে, কবি-নাট্যকার-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট মহাশয় নাট্যসমালোচকদের উদ্দেশ্যে যে-সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এক্ষেত্রে সেই কথাটিই আমি নতুন করে স্মরণ করাতে চাই। তিনি বলেছেন—"নাটক এত বিভিন্ন প্রকার যে খুব কম সমালোচকই নাটকীয় অনাটকীয় বিচার করার কালে একখানা কি দুখানার বেশী নাটকের কথা মনে রাখতে পারেন। নাটকীয় কি? কারো মন যদি জাপানের 'নো' নাটকের, ভাসের ও কালিদাসের নাটকের, ইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাটকের এরিস্টো-ফনিসের ও মিনান্দরের নাটকের ইউরোপীয় মধ্যযুগের নাটকের এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ও ফরাসী বিখ্যাত নাটকগুলির রূপ-রসে ভরপুর থাকে এবং কেউ

যদি প্রত্যেককেই সমান অনুরাগের সঙ্গে (যা' অসম্ভব) গ্রহণ করে, তাহলে কি একের চেয়ে অন্যকে অধিকতর নাটকীয় বলে সাব্যস্ত করার আগে ইতস্ততঃ করবে না?" (সেনেকা ইন এলিজাবেথান ট্রানস্লেশান—প্রবন্ধ)। কবি-সমালোচক অবশ্যই বলতে চান—ইতস্ততঃ করতেই হবে এবং না করলেই হঠকারিতা হবে। বাস্তবিক নাটক-সমালোচনার সময়ে এই ভুলের আবর্তে অনেকেই ঘুরপাক খেয়ে থাকেন—বিশেষ এক দেশের বা যুগের রূপ-রসের রুচি নিয়ে ভিন্ন দেশের বা যুগের রূপ-রসের বিচার করতে প্রবৃত্ত হন। ফল যা হবার তাই হয় - ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ধানকেই শস্য বলে গণ্য করতে চান না। বাংলা নাটকের সমালোচনা ক্ষেত্রে এ-বিপত্তি আরো বেশী মাত্রায় দেখা যায়। তার কারণ, পরাধীনতার চাপে চাপে বাঙালীর মেরুমজ্জায় হেয়মন্যতার যে-ক্ষয়রোগ প্রবেশ করেছিল তার ফলে বাঙালীর বুদ্ধি স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল—এবং দেশ-দেখা চোখ হারিয়ে বিদেশের সব কিছুকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। সেই দুর্ব্বলতা, সেই মোহ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। কাটেনি যে তার বড় প্রমাণ—প্রতীচ্য নাটকের বিচিত্র রূপ-রসের হিসাব-নিকাশে প্রবেশ না করেই সমালোচকরা বাংলা নাটককে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হাস্যজনক আস্ফালন করে থাকেন। বাংলা নাটকের রূপ-রস যে বাঙালীরই রস-রুচির সৃষ্টি—এই সামান্য কথাটিও তাঁরা মনে রাখতে চান না।

এই সব সমালোচক গ্রীক নাটকের রূপ ও বিষয়বস্তুকে গ্রীক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে প্রস্তুত, মার্লো-শেকস্পীয়রকে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে বিচার করতে উৎসুক, রাসিন-কর্ণেই-মলিয়েরকে সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের পটভূমিতে রেখে বিচার না করলে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু বাংলা নাটকের রূপ-রসের বিচার করতে গিয়ে এঁরা দেশ-কাল-পাত্র চেতনা হারিয়ে বসেন এবং রূপ-রসের এক তুরীয় আদর্শের ভূত এমন

করে এঁদের ঘাড়ে চেপে বসে যে বা'ল। নাটকের নাম শুনলেই—'কিছু না' 'কিছু না' বলে চেঁচাতে থাকেন। নাটকের রূপ ও রসকে বিচার-বিশ্লেষণ করার ধৈর্য্যটুকু পর্য্যন্ত থাকে না। শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে—এই বচনটি তাঁরা মানেন না এমন নয়, কিন্তু মানেন শুধু বিদেশী নাটকেরই বিচারে। এই শ্রেণীর ভূতাবিষ্ট সমালোচকদের কাণের কাছে টি. এস. এলিয়টের সতর্কবাণী কীর্ত্তন করবার প্রয়োজন আছে, আশা করি উদ্ধৃতিটি সেই প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করবে।

বাস্তবিকই, নাট্য-সমালোচকদের এই সতর্কবাণীটি স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। কারণ, এই কথাটি মনে থাকলে সমালোচক আর যাই করুন না কেন, হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করবেন না—কোন একটি বিশেষ রূপ বা বিশেষ রসকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বলে ঘোষণা করবার আগে অনেকখানি ভেবে দেখবেন—একথা ভাবতে বাধ্য হবেন যে নাটকের রূপ ও রসের প্রকৃতি সমাজের অবস্থা তথা যুগের প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলেই দেশে দেশে এবং যুগে যুগে নাটকের রূপ ও বিষয়বস্তু পৃথক হ'য়ে থাকে। অতএব, নাটক বিচারে রূপের বা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিচার্য্য বিষয় বটে, কিন্তু এক রূপের বিচারে অন্য রূপাদর্শের মাপকাঠি ব্যবহার করলে চলবে না অথবা একটিমাত্র পুরুষার্থকেই—সার্ব্বজনীন এবং একমাত্র বিষয়বস্তু বলে গণ্য করলে চলবে না। প্রকৃতিস্থ থাকলেই সমালোচক দেখতে এবং বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেক যুগের নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁর সমসাময়িক সমাজেরই পুরুষার্থ বা বাসনা যথাসাধ্য পূরণ ক'রে থাকেন—প্রত্যেক শিল্পীরই সৃষ্টি যুগসাপেক্ষ—শিল্পীর বাসনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা—এক কথায় জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার দ্বারা—পরিচ্ছন্ন। বুঝতে পারবেন—যত বড় মহাকবিই যিনি হউন এ নিয়তি খণ্ডন করবার শক্তি কা'রো নেই—শেক্সপীয়র যে শেক্সপীয়র তিনিও বিশেষভাবে তাঁর যুগেরই—তাঁর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন, তাঁর নাটকের রূপ ও রীতি এলিজাবেথীয় যুগেরই আবেগ, সংস্কৃতি ও রসবোধ দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত। বুঝতে পারবেন—বিশেষ এক যুগের একটি চিত্তের পক্ষে সব যুগের এবং সব চিত্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়—এবং এক যুগের ধ্যান-জ্ঞানে সব যুগের ধ্যান-জ্ঞান প্রতিফলিত হতে পারে না। প্রত্যেক শিল্পী সামাজিক ব্যক্তি এবং বিশেষ সমাজের বিশেষ পর্য্যায়েরই ব্যক্তি। ঐ বিশেষ সমাজও বিবর্ত্তনশীল সমাজেরই বিশেষ অবস্থা। শিল্পী সেই অবস্থাটির পরিবেশেই মানুষ হয়ে থাকেন এবং সেই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে করতে এগিয়ে যান। শিল্পীর জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা যত ব্যক্তিগত বলেই মনে হউক, আসলে তা বিশেষ সমাজেরই পুরুষার্থ সাধনার সঙ্গে নিগূঢ় যোগে যুক্ত। শিল্পীরা সমাজের পুরুষার্থেরই কোন-না-কোন একটিকে বা একাধিককে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে থাকেন। কোন্ পুরুষার্থকে শিল্পী প্রকাশ করতে চান, কোন্ মূল্যকে তিনি কাম্য করে তুলেতে চান—তারই মধ্যে শিল্পীর জীবনবোধ ব্যক্ত হয়। একথাও বুঝতে পারবেন যে সমাজবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থ সাধনাতেও পরিবর্ত্তন এসে থাকে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পুরুষার্থ-প্রীতি ভিন্ন হয়ে থাকে।

এইসব বুঝতে পারলে অবশ্যই তিনি প্রতিভার স্বরূপ ধরতে পারবেন—এবং বুঝতে পারবেন—প্রতিভা সম্বন্ধে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে কথা বলেছেন তা সত্য—প্রতিভা হচ্ছে করণীয় কার্য্যকে সবচেয়ে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে করার ক্ষমতা। কবি-ব্যক্তিত্ব বিচারে, কবি কি কি করণীয় কাজ করেননি তার হিসাব করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সৃষ্টি নৈপুণ্য বিচারে আসল বিচার্য্য কবি যা করতে চেয়েছেন তা করণীয় কিনা এবং তা নিখুঁত এবং নিপুনভাবে করতে পেরেছেন কিনা—যে বিষয়বস্তুকে কবি ব্যক্ত করতে চান তাকে সন্তোষজনক ও সম্পূর্ণ আকার দিতে পেরেছেন কিনা। একথা ঠিক যে বড় প্রতিভা যুগের আত্মাটিকে, যুগজীবনের বিচিত্র রূপটিকে গভীর আলোকে ব্যক্ত করে থাকেন, কিন্তু এও ঠিক যে কোন শিল্পী যদি তাঁর সমাজ চেতনার বিশেষ কোন অংশকেও সার্থকভাবে রূপ দিতে সমর্থ হন, তা'হলেও তাঁকে কৃতী মর্য্যাদা দিতে হবে। সমালোচকের কাজ

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অথবা নির্বিচার নিন্দা দু'য়ের কোনটিই নয়। সমালোচনা—শিল্পকর্ম্মের মূল্য-বিচার, শিল্পী যা সৃষ্টি করেছেন রূপে-রসে তা কতখানি সার্থক হয়েছে তারই বিচার—শিল্পীর ধ্যান ও রূপদক্ষতার বিচার। নিজের ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগার অহঙ্কারকে জাহির করার মধ্যে আর যাই থাক সমালোচনা থাকে না। অন্ধভক্তি এবং-অভক্তি দুইই সমালোচনার শত্রু। অতএব, দুইই পরিত্যাজ্য।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করবার মুখে এই কয়েকটি কথা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে এই কারণেই যে সমালোচকগণ অতি সহজেই অন্ধভক্তি বা অন্ধ-অভক্তির হাতে ধরা দিয়ে সমালোচনা শব্দটিকেই কলঙ্কিত করে থাকেন। এঁদের কাহারও হাতে গিরিশচন্দ্র শতকরা একশো নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন, কাহারও হাতে আবার পাশ নম্বরই পাচ্ছেন না। কেউ প্রাপ্যের অধিক দিচ্ছেন, আবার কেউ প্রাপ্যটুকুও থেকে বঞ্চিত করছেন। এই অপ্রকৃতিস্থ সমালোচনার অরাজকতা দূর করবার জন্যই—অন্তত: নাট্যরসিকদের একটু সতর্ক করবার জন্যই, কথাগুলি বলেছি। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভার বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ না করেও আমরা একথা বলতে পারি—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালীর মনে আত্মচেতনার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনার যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল—একদিকে ভারতীয় ধর্ম্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য সম্পদ প্রদর্শন করবার; আর একদিকে আত্মসমালোচনার সাহায্যে আত্মসংশোধনের এবং আর এক দিকে স্বাধীনতাহীনতার বেদনা তথা স্বাধীন জাতি হিসাবে জগৎসভায় দাঁড়ানোর কামনা, এক কথায় স্বাধীনতা-কামনা বা দেশপ্রেমের যে আবেগ দেখা দিয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের নাটক সেই আবেগগুলিই নানাভাবে প্রকাশ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের নাটক রঙ্গমঞ্চের চাহিদায়—অর্থাৎ বাহ্যিক প্রেরণায় রচিত হয়েছিল —একথা সত্য বটে (প্রত্যেক রচনারই বাহ্যিক প্রেরণা একটা থাকে)

কিন্তু যে আভ্যন্তরিক প্রেরণা রচনার পিছনে কাজ করেছিল তাকে আপাততঃ বলা যায়, পৌরাণিকী প্রবৃত্তি এবং বিশেষত বলা চলে জাতির তথা নাট্যকারের নতুন জীবনবোধ—নতুন বাসনা-কামনা। ঐ যুগে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামনায় অতীত ঐতিহ্য স্মরণ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উজ্জীবন ও প্রদর্শন কতখানি স্থান অধিকার করেছিল তা ঠিকভাবে না বুঝতে পারলে ঐ যুগের কোন লেখককেই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারা যাবে না—গিরিশচন্দ্র কেন পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক লিখিতে অত বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন তার কারণও সম্যক জানা যাবে না। জাতির নতুন আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা কেন অতীত স্মরণের এবং আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শনের খাতে প্রবাহিত হয়েছিল নিশ্চয়ই তা বলে বুঝাতে হবে না। রাজনৈতিক অধিকারে যে বঞ্চিত, জীবন যার রুদ্ধস্রোত, সে যে অতীতের কীর্ত্তিকাহিনী দেখিয়ে নিজের অস্তিত্ব ও গৌরব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে—আধ্যাত্মিকতার জয়ধ্বজা উড়িয়ে মুখ রক্ষার চেষ্টা করবে—এটাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভূমিকাকে এই পটভূমিতে রেখে দেখলেই তাঁদের স্বরূপ দেখা যাবে এবং দেখা যাবে—জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার জন্য যে নতুন আবেগ দেখা দিয়েছিল তা এসেছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনারই গভীর উৎস থেকে। এই আবেগেই জাতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অত আবেগে আঁকড়ে ধরেছিল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুজ্জীবনকে মুক্তির উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এই আবেগেই পণ্ডিতরা শাস্ত্রমন্থন করে দার্শনিক মাহাত্ম্য প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সাধকরা সাধনরহস্য এবং যোগমাহাত্ম্য প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শিল্পীরা অতীত কীর্ত্তিকথা প্রচার করে জাতির লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধার করার—জাতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। অতীত আবিষ্কারে অতীতের আলেখ্য প্রদর্শনে যিনি যত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন জাতি তত তাঁকে আপনার মুখপাত্র বলে বরণ করে নিয়েছিল। এই আবেগ চরিতার্থ করেই গিরিশচন্দ্র অন্যতম মুখপাত্র হয়েছিলেন।

একথা ঠিক বটে যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আলেখ্য প্রদর্শনে অধিকতর আগ্রহী হয়েছিলেন—তাঁর রচনার এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু বেশী ধর্ম্মমূলক নাটক—কিন্তু তাই বলে একথা সত্য নয় যে তিনি ঐ যুগের অন্যান্য প্রবৃত্তিকে পরিহার ক'রে চলেছিলেন। সকলেরই জানা আছে—প্রথম পর্ব্বে বাংলা নাটক রচনায় প্রেরণা এসেছিল একদিকে নাট্যের অভাব পূরণের চেষ্টা থেকে, অন্যদিকে প্রহসনের সাহায্যে সমাজের কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা থেকে। আমার বক্তব্য এই—কীর্ত্তিবিলাস বা ভদ্রার্জ্জুন, শর্ম্মিষ্ঠা বা কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি গুরুরসাত্মক নাটক রচিত হয়েছিল—বাহ্যতঃ নাট্যাভাব পূরণের চেষ্টা থেকে, এবং ট্র্যাজেডি-জাতীয় গুরুগম্ভীর নাটক রচনার সঙ্কল্প থেকে। বিশেষ কোন সমাজ-সমস্যা সমাধানের সঙ্কল্প ঐ সব সৃষ্টির মূলে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেনি। সমাজ-সমস্যা-চেতনার গুরুরসাত্মক উপস্থাপনা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে না হলেও, ইংরেজ নীলকরদের শোষণপীড়নের বিরুদ্ধে নীলদর্পণ নাটক প্রথম প্রত্যক্ষ আক্রমণ। অবশ্য ট্র্যাজেডি-জাতীয় প্রথম নাটকে সমাজ-সমস্যা-চেতনা—তখনকার মুখ্য দ্বন্দ্ব—জাতিদ্বন্দ্বের চেতনা—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়নি বটে কিন্তু প্রহসনগুলিতে সমাজ-সমস্যার-চেতনা প্রতিফলিত না হয়ে পারেনি। কারণ, প্রহসনের উপজীব্যই হচ্ছে বিকৃতি—তা ব্যক্তিগতই হউক আর শ্রেণীগতই হউক। 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব', একেই কি বলে সভ্যতা, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি প্রহসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা বুঝতে পারব তখনকার প্রহসনকাররা কি উদ্দেশ্যে নাটক রচনা করেছিলেন—বাঙালী সমাজের কোন্ কোন্ বিকৃতিকে বা কুসংস্কারকে তাঁরা উপহাস্য তথা সংশোধিত করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, সুরাসক্তি, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি সমস্যাকে প্রহসনকার হাসির অস্ত্রে আক্রমণ করেছিলেন এবং সমাজ দেহকে ঐ বিকৃতি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

একথা মনে রাখতে হবে—সমস্যার উপস্থাপনায় ট্র্যাজেডিকার এবং প্রহসনকার উভয়েই তৎপর বটে কিন্তু দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য তা আক্রমণের উপায়ের বা রীতির পার্থক্য। ট্র্যাজেডিকার বিশেষ সমস্যার বেদনা বা শোচনার দিকটিকে তুলে ধরে সমস্যার দিকে সামাজিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, অন্যপক্ষে প্রহসনকাব সমস্যার বিকৃতির দিকটিকে তুলে ধরে বিকৃতিকে হাস্যাস্পদ তথা হেয় করতে চান। প্রহসনকারের দৃষ্টি যেন অতি নিরাসক্তের দৃষ্টি—কৌতুকপ্রিয়ের নির্ম্মম দৃষ্টি, অন্যপক্ষে ট্র্যাজেডিকারের দৃষ্টি সমবেদনা-কাতর দৃষ্টি। প্রহসনকার আত্মবিস্মৃত বা সমবেদনাকাতর হ'লে প্রহসন—"একেই কি বলে সভ্যতা" না হ'য়ে "সধবার একাদশী" হয়ে দাঁড়ায়—নিমে দত্তের মত চরিত্র সৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নাট্যকার আরও একটু সমবেদনা মিশালে 'নিমে দত্ত' ট্র্যাজিক নায়কের সমগোত্রীয় চরিত্রে পরিণত হতে পারতো। সে যাই হোক—গিরিশচন্দ্র ঐরূপ প্রহসনকার হয়ে সমাজ-সমস্যাকে আক্রমণ করেননি বটে, কিন্তু তাই সমাজ-সমস্যাকে এড়িয়ে যাননি—ভিন্ন পদ্ধতিতে—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি রসের আধারে সমাজ-সমস্যাকে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রফুল্ল (১৮৮৯), মায়াবসান (১৮৯৮), বলিদান (১৯০৫), শাস্তি ও শাস্তি (১৯০৮), গৃহলক্ষ্মী (১৯১১) প্রমুখ নাটকে গিরিশচন্দ্রের সমাজ-সমস্যা-চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে একদিকে যেমন নতুন ও স্বাধীন চিন্তার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি শিথিল শাসন নাগরিক জীবনে অনেক গ্লানি জমে উঠেছিল—ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে (বিশেষ করে উকিলশ্রেণীর মধ্যে?) স্বার্থপরায়ণতা এবং যৌথ পরিবার-বিরাগ দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্ত্তনে সমাজ নীতিতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল, শ্রেণীসম্পর্কে এবং ব্যক্তিসম্পর্কে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল, তার ফলে, কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবনে যে সরল ও সুখী যৌথ পরিবার ছিল, ব্যবসায় ও চাকরি ভিত্তিক নাগরিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতার

চাপে তা ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। "প্রফুল্ল" নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল ও যোগেশের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে সেই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বেদনাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা কতখানি সজ্ঞান চেষ্টার ফল ছিল বা কতখানি তা সফল হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে না পারে এমন নয় কিন্তু চেষ্টা যে তিনি করেছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপর পণপ্রথার বেদিতে কন্যা বলিদানের যেসব মর্মন্তুদ ঘটনা তিনি দেখেছিলেন, তার বেদনাও তাঁর প্রাণে বেজেছিল। বলিদান নাটকের সাহায্যে তিনি সেই বেদনাকেই সামাজিকের প্রাণে সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কোন্ পথে সমস্যার সমাধান হবে তা তলিয়ে দেখা তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি, কিন্তু কুপ্রথার নিষ্ঠুর অত্যাচারের রূপটিকে যে তিনি সামাজিকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন তথা কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিকদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন সেকথা স্বীকার করতেই হবে। যেমন কুমারী কন্যার বিবাহ কন্যার পিতার কাছে এক মহাসমস্যা ছিল, তেমনি বিধবা কন্যাও কম মহাসমস্যা ছিল না। বিধবাবিবাহ বিধি বিধবার বিবাহকে বৈধ করেছিল বটে, কিন্তু সংস্কারের বাধা দূর করতে পারেনি—বিধবা বধূকে সতী স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বিধবা কন্যা বিবাহের পরে যৌন কামনা পূরণের সুযোগ বা অধিকার পেয়েছিল বটে, কিন্তু স্বামীর আন্তরিক সোহাগ এবং সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তি পায়নি—সুতরাং অন্তর্দাহের জ্বালা সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি। 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে গিরিশচন্দ্র এই সমস্যাকেই তুলে ধরেছিলেন—দেখাতে চেয়েছিলেন—শুধু বিয়ে দেওয়াই সমস্যার সব সমাধান নয়, সমাধানের উপায় আরও গভীরে নিহিত। একথা ঠিক বটে, গিরিশচন্দ্র সমাধানের উপায় নির্দেশ করতে পারেননি, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, নারীমুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারেননি। কিন্তু একথাও মিথ্যা নয় যে গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহ-সমস্যাকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন—বিবাহের পরে বিধবাকে যে সমস্যার সম্মুখীন

হতে হয়, যে নির্য্যাতন ও মর্ম্মপীড়া ভোগ করতে হয় সেই সমস্যার দিকে, সেই নির্য্যাতন ও মর্ম্মপীড়ার দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিবাহ-সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করেছিলেন। আগেই বলেছি সমস্যার জড় যেখানে, সেই মূল কারণে পৌঁছানোর শক্তি গিরিশচন্দ্রের ছিল না, কিন্তু বিবাহ-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন একথা মানতেই হবে।

এবার আর একটি দিকের কথা—ঐতিহাসিক নাটকের কথা—স্মরণ করা যাক। আগেই বলেছি—বাঙালীর আত্মসচেতনতা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠা কামনা অতীত ঐতিহ্য স্মরণ এবং আত্মসমালোচনার আকারে সুরু হয়েছিল এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কীর্ত্তিকাহিনী আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে এই জাতীয় রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক লেখার আবেগ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। হরলাল রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারের নাটক তার নিদর্শন। স্বাধীনতা-কামনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগও বৃদ্ধি লাভ করেছিল। রোমান্টিক ঐতিহাসিক রচনার পাত্রে জাতির অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের সঞ্জীবনী সুরা পরিবেশন করার আগ্রহ অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯০৫, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে এই আবেগ এমন একটি চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে, কোন কোন নাট্যকার ইংরেজ আমলের কাহিনীর ভিতর দিয়ে, সোজাসুজি ইংরেজকেই আক্রমণ করার —ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এঁদের অগ্রণী ছিলেন। তাঁর "সিরাজদৌল্লা" এবং "মীরকাশিম" নাটক সম্মুখ সমরের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সিরাজদৌল্লাই প্রথম ইংরেজের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান। ইংরেজ সরকার ইতিহাসের সিরাজকে হত্যা করিয়েছিল আর নাটকের সিরাজের কণ্ঠরোধ না করে স্বস্তি পায়নি! বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার সংযোগে গিরিশচন্দ্র এমন এক সিরাজ তৈরি করেছিলেন যিনি

শুধু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবই ছিলেন না, নবজাগ্রত জাতির প্রতিরোধেরই প্রতীক ছিলেন—যিনি ফিরিঙ্গির—অর্থাৎ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র, 'কায়াকে মায়াময়ী' করেছিলেন সত্য—ঐ যুগটাই ছিল—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে—"ছায়াকে কায়াময়া এবং কায়াকে মায়াময়ী" করার যুগ। কিন্তু ঐ মায়াময়ী মূর্তির সাহায্যেই তিনি জাতির প্রাণে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাহস সঞ্চারিত করেছিলেন। নীলদর্পণের পরে প্রতাপক্ষের বিরুদ্ধে এত বড় প্রত্যেক্ষ আক্রমণ আর হয়নি। সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম নাটকের রচয়িতার কাছে বাঙালীর এজন্য 'চিরকৃতজ্ঞ' থাকা উচিত। 'সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক লিখে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সংগ্রামশীল সাহিত্যিকের এবং বিপ্লবী থিয়েটারের এক চিরস্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। আজকে তাঁদের আবেদনে যত ভাঁটাই পড়ুক—(সব সৃষ্টির আবেদনেই ভাঁটা পড়ে, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে বস্তুর বাজার-দাম ওঠা-নামা করে এবং এককালের রস অন্যকালে "ফিকে" হয়ে যায়)—তাদের ঐতিহাসিক দান এবং নাটকীয় সাফল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর একটি কথা বলেই আমি এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি। কথাটি আগেও একবার বলেছি—এখানে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। গিরিশচন্দ্রের নাটকের এবং তাঁর প্রতিভার বিচার করতে যেয়ে আমরা যেন তাঁর যুগের প্রধান প্রবৃত্তি—তখনকার সামাজিক রুচি এবং নাট্যপ্রথা প্রভৃতি বিষয় বিস্মৃত না হই। একথা সকলেই স্বীকার করবেন—প্রথা থেকে পৃথক করে নিলে গ্রীক নাটকের কোরাস প্রভৃতি অনেক কিছুই আমাদের কাছে অনাটকীয় বলে বর্জনীয় হবে, এমনকি, শেক্সপীয়রের মত অদ্বিতীয় নাট্যকারের নাটকেরও কোন কোন উপাদান (ছন্দোবদ্ধ ও কল্পনাতিশয্য) অবাস্তব এবং অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে (সমালোচকদের কাছে হয়েও থাকে)। দ্বিতীয়তঃ, একথাও স্বীকার করবেন যে এককালে যা নতুন, অন্যকালে তা পুরাতন,

এককালের যা রিয়েলিষ্টিক, অন্যকালে তা রোমান্টিক, "the realism of one generation is apt to be the Romanticism of the next— (Tragedy by Edith Hamilton in Theatre Arts Anthology). এককালে যা পরমপুরুষার্থ—অন্যকালে তাই অপদার্থ বা অসেব্য। এই কারণে কোন শিল্পীর পক্ষেই বিশেষ অর্থে সর্ব্বকালীন হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবিকই রূপ-রসে-রীতিতে সব কালের সকল লোকের মনে সমান আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো নেই, থাক্‌া সম্ভব নয় বলেই নেই। গ্রীক নাটকই হউক, আর শেক্সপীয়র-ইবসনের নাটকই হউক, কারো নাটকেরই আগেকার মত আধিপত্য এখন নেই, নতুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হ'য়েছে। প্রশ্নকৌতুহলেই আজ গ্রীক নাটক অভিনীত এবং আস্বাদিত হয়; শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ে বা ইবসনের নাটকের অভিনয়েও রীতিমত ভাঁটা পড়ে গেছে। আজ তারা যে পরিমাণে পঠিত হয়, সেই পরিমাণে অভিনীত হয় না। এক কথায় তাদের "দিবসা গতা"—দিন চলে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার পেশাদার এবং অপেশাদার রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়র-ইবসন আজ কোথায়? আর থাকলে কতটুকু স্থান নিয়ে আছেন? সুতরাং গিরিশচন্দ্রের নাটক আজ আর আমাদের মনে তেমন সাড়া জাগায় না বা পেশাদার-অপেশাদার দল গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করে না—শুধু এই যুক্তিতেই আমরা যেন গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভাকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা না করি। গিরিশচন্দ্র যা সৃষ্টি করেননি তা নিয়ে আক্ষেপ না করে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মূল্য নির্দ্ধারণেই আমরা যেন মনোযোগী হই। যে বিষয়বস্তুকে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়বস্তুর মূল্যবিচারে এবং যে রূপে ব্যক্ত করেছিলেন সেই রূপের উৎকর্ষ বিচারেই আমরা যেন সীমাবদ্ধ থাকি।

আগেও বলেছি—এখনও বলছি—বিষয়বস্তুর দেশ কাল নিরপেক্ষ কোন উপযোগিতা বা নির্ব্বিশেষে রূপ নেই এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বা

আচার-আচরণও সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে না। বিষয়বস্তুর মূল্য বা উপযোগিতা বিচার করার সময়ে এবং চরিত্রের আচার-আচরণের প্রকৃতি বিচার করার সময়ে একথাটা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। গ্রীক নাটকের ঘটনার এবং চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকের ঘটনার এবং চরিত্রের হুবহু মিল পাওয়া যাবে না, তেমনি শেক্সপীয়রের নাটকের ঘটনার এবং চরিত্রের সঙ্গেও ইবসনের নাটকের ঘটনার ও চরিত্রের হুবহু মিল পাওয়া যাবে না। আবার একই যুগের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের গঠন-বৈশিষ্ট্যের বা অবস্থা গুণে কোন চরিত্রে সক্রিয়তা কোন চরিত্রে নিষ্ক্রিয়তা প্রাধান্য লাভ করে থাকে। চরিত্রের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত হলে বিচার বিভ্রাট অনিবার্য। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন এবং চরিত্র সৃষ্টি বিচার করার সময় গ্রীক নাটকের অথবা এলিজাবেথীয় নাটকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলবে না, যে বাঙালীর সমাজের জন্য, যে যুগের জন্য তিনি নাটক লিখেছিলেন, সেই সমাজের সেই যুগের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এইরূপ খোলা মন নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে পরেই আমরা গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পারব।

নাট্যকার-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—দৃশ্য-লোকবৃত্ত রচনার কুশলতার মধ্যে বিশেষ একটি ভাবকে সুষম সার্থক এবং সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের শরীরে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এই ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না, শক্তির তারতম্য থাকবেই। কেউ হয়ত সুষম বা সুপরিকল্পিত কাহিনী রচনায় দক্ষ, কেউ বা ঘটনা, বা পরিস্থিতি কল্পনায় খুব দক্ষ না হলেও, চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ-বিকল্পনায়—অর্থাৎ চরিত্রের গভীর রূপ প্রদর্শনে—তথা গভীর জীবন সমালোচনায় সুদক্ষ। পরিস্থিতি-পরিকল্পনা এবং চরিত্র-বিকল্পনা এই দুই ক্ষমতা যেখানে সমধিক সেখানেই প্রতিভার শক্তি বেশী। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে গিরিশচন্দ্রের এই নাটকে সর্ব্বক্ষেত্রে দুই শক্তির সমান স্ফূর্তি ঘটেনি, পরিস্থিতি-পরিকল্পনা যেমন সর্ব্বক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয়নি,

চরিত্র-বিকল্পনাও সর্ব্বক্ষেত্রে সুগভীর হ'তে পারেনি—অর্থাৎ চরিত্রগুলি ভাবনা, কল্পনা, আবেগ ও আঙ্গিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তির দুর্লভ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে এই দুই শক্তিরই প্রশংসনীয় নিদর্শন গিরিশচন্দ্রের নাটকে পাওয়া যায় এবং ঐ শক্তিগুণেই গিরিশচন্দ্রের নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের বহুমূল্য সম্পদ এবং গিরিশচন্দ্র চিরস্মরণীয় একটি প্রতিভা।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও পরিবেশ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ বেনিডেটো ক্রোচে, প্রতিভাবানবাদীর ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরেও—অর্থাৎ শিল্পকে দেশকাল-নিরপেক্ষ স্বাধীন এবং নির্ব্বিকল্প আত্মিক ক্রিয়ায় পরিণত করার পরেও যে কথাটি স্বীকার না করে পারেননি সেই উল্লেখযোগ্য কথাটি এই যে শিল্পী একজন সামাজিক ব্যক্তি এবং শিল্পীর শিল্পিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা অবিচ্ছেদ্য। যিনি স্রষ্টার শিল্পী সত্তাকে ব্যক্তিসত্তা থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করেন, তিনি নাকি গোড়াতেই বড় ভুল করেন, কারণ 'man-artist' থেকে 'artist-man কে পৃথক করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকই শিল্পরচনা যেহেতু মানসিক ব্যাপার, সেইহেতু মনের বিশিষ্টতার উপরে শিল্পের প্রকৃতি নির্ভর করবেই। আর মনও ত কোন নির্ব্বিশেষ পদার্থ—অর্থাৎ অসম্ভব পদার্থ নয়। জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা রূপে মনের স্বরূপ ব্যক্ত হয় বটে কিন্তু সেই জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বিশেষ ব্যক্তিরই এবং ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক ব্যক্তি—বিশেষ সমাজের ব্যক্তি। এই হিসাবে প্রত্যেকটি মনই অন্যান্য বস্তুর মতই বিশিষ্ট এবং ইতিহাস-সাপেক্ষ, এক কথায়—সমাজ-সাপেক্ষ। অর্থাৎ—পরিবর্ত্তনশীল সমাজের বিশেষ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হয়ে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে নিত্য অভিযোজনে ব্যাপৃত থাকে, সেই অভিযোজন-চেষ্টা থেকে ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বিশেষ প্রকৃতি গড়ে উঠে এবং স্রষ্টার জ্ঞান-অনুভব

ইচ্ছার বিশেষত্বই সৃষ্টির বিশেষত্বের মৌলিক কারণ। এই কারণেই যেমন স্রষ্টার শিক্ষাদীক্ষার মাত্রা, মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচয় জানার প্রয়োজন আছে, তেমনি স্রষ্টার পরিবর্তনশীল পরিবেশের তথা নতুন নতুন উদ্দীপকের (ষ্টিমুলাস্) সঙ্গেও পরিচিত হওয়া দরকার। সৃষ্টির বাহিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণার হিসাব সৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য একান্তই আবশ্যক।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য আমাদের চোখের সামনে রাখা যেতে পারে—

(ক) গিরিশচন্দ্রের জন্ম—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে—মৃত্যু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক—এই যুগটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। সকলেই জানেন—এই যুগটি বাঙালীর নব-জাগরণের যুগ। এই যুগে বাঙালী আত্মসংবিদ ফিরে পাওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছে—আত্মসমালোচনার এবং আত্মপ্রদর্শনে তৎপর হয়েছে—স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে—বাঙালীর দেহ মনে মুক্তির আবেগ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছে।

(খ) পারিবারিক—'প্রত্যেক শিশুরই মনে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রভাব অজ্ঞাতসারে কাজ করে থাকে। এইসব প্রভাব ক্রমে ক্রমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভিত্তি গড়ে উঠে এবং তা উঠে অজ্ঞাতসারেই।

গিরিশচন্দ্রের মনে পিতার প্রভাব কি পড়েছিল না পড়েছিল তা আমরা জানিনে কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মাতা এবং খুল্লতাত পিতামহীর প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। জানা যায় গিরিশচন্দ্রের মা ছিলেন খুবই ভাবপ্রবণ এবং খুল্লতাতপিতামহীর ছিল পুরাণকথার উপরে অগাধ বিশ্বাস ও প্রীতি। এঁদের ভাবপ্রবণতা গিরিশচন্দ্রের মনে অনেক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল; গিরিশচন্দ্রের মনকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। নাট্যকারের ভাবপ্রবণতার এবং পুরাণ-প্রীতির উৎস হিসাবে আমরা সেকথা স্মরণ করতে পারি।

(গ) শিক্ষাদীক্ষা—শিক্ষাদীক্ষা বলতে আমরা আপাতবুদ্ধিতে স্কুলকলেজের বিদ্যা

বা ডিগ্রীর কথাই বুঝি। কিন্তু আসলে শিক্ষাদীক্ষা ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও ব্যাপক একটি ব্যাপার। একথা ঠিক—"ইংরেজি স্কুলকলেজের উন্নত শিক্ষা লাভ করা গিরিশচন্দ্রের অদৃষ্টে ঘটে নাই। স্কুলের পরে স্কুল ঘুরিয়া প্রবেশিকার দ্বার পর্য্যন্তও যখন পৌছিতে পারিলেন না, তখন তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া বসিতেই বাধ্য হইলেন"—কিন্তু একথাও ত মিথ্যা নয় যে পরে তিনি "যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনি শেক্সপীয়র, মোলিয়ার, মার্লো, মিলটন, বেকন, মিল প্রভৃতি কবি নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের গ্রন্থপাঠ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।" মোট কথা, একথা স্বীকার করতেই হবে যে গিরিশচন্দ্র স্কুলকলেজে নিয়মিত পড়াশুনা না করলেও নিজে নিজে অনেক কিছু পড়েছিলেন—পরিপাটি শিক্ষা না পেলেও সাধারণ শিক্ষিতের চেয়ে তিনি কম কিছু জানতেন না। শেক্সপীয়র যিনি অনুবাদ করতে পেরেছেন, তাঁর ইংরেজি শিক্ষায় সন্দেহ করবে কে? বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধচরিত প্রভৃতি নাটক যিনি লিখতে পেরেছেন তাঁর পুরাণ জ্ঞানে বা ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলনে সন্দেহ কোথায়? তবে একথাও উপেক্ষণীয় নয় যে গিরিশচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞান পরিশীলিত জ্ঞান বলতে যা বুঝায় তা ঠিক নয়।

(ঘ) কর্ম্মজীবন :—

(১) মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকুরি—১৮৮১ পর্য্যন্ত।

(২) ১৮৮১-৮৩ খ্রীঃ—ন্যাশানাল থিয়েটারের ম্যানেজার। ১৮৮১ খ্রীঃ ১৫০·০০ টাকার চাকুরি ছেড়ে প্রতাপ জহুরীর অধীন ম্যানেজার পদ গ্রহণ করেন।

(৩) ১৮৮৩ খ্রীঃ—জুলাই মাসে স্টারে—(৬৮ বিডন স্ট্রীট—গুর্মুখ রায় সত্বাধিকারী) ১৮৮৩-৮৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্টারে ম্যানেজার।

(৪) ১৮৮৭ খ্রীঃ ৩বা ডিসেম্বরে, গোপাললাল শীল-পরিচালিত 'এমারেল্ড থিয়েটারে ম্যানেজার হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ 'এমারেল্ড' ছেড়ে স্টারে আসেন।

(৫) ১৮৮৮-৯১ খ্রীঃ স্টারে—(ম্যানেজার)। (পদ থেকে অপসারিত।)

(৬)* ১৮৯৩ খ্রীঃ মিনার্ভা প্রতিষ্ঠিত।—গিরিশচন্দ্র ১৮৯৩-৯৬ খ্রীঃ—মিনার্ভায়।

(৭) স্টারে নাট্যাচার্য্য—১৮৯৬ খ্রীঃ।

(৮) নাট্যাচার্য্য—'ক্ল্যাসিক' থিয়েটারে—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেব এপ্রিল মাসে।

(৯) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিনার্ভায় যান, নভেম্বরে আবাব ক্ল্যাসিকে ফিরে আসেন এবং ১৯০৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত থাকেন।

(১০) ১৯০৫ ০৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত "কোহিনুব" থিয়েটারে ম্যানেজার হন (মাইনে ৪০০ ০০)। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেব জুলাই মাসে কোহিনুর থেকে বিদায় গ্রহণ ক'বে মিনার্ভায় যোগ দেন।

(১১) ১৯০৮ খ্রীঃ জুলাই থেকে ১৯১১ খ্রীঃ পযান্ত—মিনার্ভায়। ১৫ই জুলাই ১৯১১ খ্রীঃ, বলিদান নাটকে করুণাময়েব ভূমিকায় শেষ অবতরণ—১৮ই নভেম্বব 'তপোবল'—শেষ নাট্য অবদান।

এবার **গিরিশচন্দ্রের পরিবেশ** সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য। 'পরিবেশ' শব্দটিব অর্থ খুবই ব্যাপক। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ঐ ব্যবস্থাধীন সামাজিক বিধি-বিধান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নানা প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান সব কিছুই—পরিবেশের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তির পরিবেশের পরিচয় দিতে গেলে ঐ সব কিছুরই বিবরণ দেওয়া দরকার এবং ব্যক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির বুঝাপড়ার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখতে হবে অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যক্তি কোন্ দৃষ্টিতে দেখছেন, সমাজের বিধিবিধান-

জনিত ঘটনার এবং ব্যক্তি-সম্পর্কের বিচারে ব্যক্তি সংরক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল দৃষ্টির কোনটিকে আশ্রয় করছেন, কোন্ পুরুষার্থকে ব্যক্তি পরমকাম্য বলে গ্রহণ করছেন—এক কথায় কোন্ দর্শনকে (পরাদর্শন, সমাজদর্শন, নীতিদর্শন) তিনি সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তদনুযায়ী আচরণ করছেন—এইসব কিছুরই হিসাব-নিকাশ করতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, গিরিশচন্দ্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় দিতে হবে এবং তাদের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রকৃতি বিচার করতে হবে। এতখানি ব্যাপক পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই এবং নেই বলেই আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি তথ্য উপস্থাপনা করছি।

গিরিশচন্দ্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে এইটুকুই বলা যেতে পারে—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটেছিল এবং ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ইংলণ্ডের শাসনাধীন একটি পরাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল বটে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে—দেশীয় রাজাদের এবং জমিদারদের আধিপত্যে এবং অধিকারে—উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বণিকশ্রেণীর শক্তিসামর্থ্য বেড়ে উঠেছিল এবং বড় বড় চাকুরির প্রাসাদে নতুন এক ধনবান অভিজাত শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল। কলিকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে বিরাট এক নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং ব্যবসায়, শিল্প ও চাকুরির আকর্ষণে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের স্থিতিশীল জীবনে কেন্দ্রাতিগ গতির অস্থিরতা সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্যবসায়, চাকুরি এবং ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার জন্য লোকে গ্রাম ছেড়ে সহরে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল—ফলে কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। যে অর্থনৈতিক অবস্থায় যৌথ পরিবার সুরক্ষিত থাকে, সেই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেওয়ায় ফলে যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছিল, স্বাতন্ত্র্য চেতনার এবং স্বার্থপরতার মাত্রা

আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং স্বার্থপরদের চক্রান্তে ও দ্বন্দ্বে পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। শুধু যে স্বার্থপরতার মাত্রাই বেড়ে গিয়েছিল তাহা নয়, স্বার্থপরতার আনুষঙ্গিক বিকারগুলিও কমবেশী দেখা দিয়েছিল। ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে সমাজের, বিশেষত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করার লোভ এমন করে পেয়ে বসেছিল যে কোন কোন লোক ধনোপার্জ্জন করতে কোন অপকর্ম্মকেই ভয় করত না—পাপ বলে মনে করত না। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতার সুযোগে—অর্থাৎ অব্যবস্থার রন্ধ্রপথে, সমাজদেহে দুর্নীতির বিষ-ক্রিয়া ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল। কামিনী এবং কাঞ্চনকে কেন্দ্র করে ধনিক সমাজে রিপুর যে-তাণ্ডবলীলা চলেছিল—মদ্যপান বেশ্যাগমন এবং আনুষঙ্গিক অনাচার ও অত্যাচারের যে অবাধ প্রশ্রয় ঘটেছিল তাহাতে সমাজের আবহাওয়া ও দূষিত হয়ে গিয়েছিল। ধনিক-বণিক তন্ত্রে এবং বৈদেশিক শাসনাধীন সমাজের যে-পরিণাম স্বাভাবিক, সমাজদেহে সেই বিকারগুলি ফুটে বেরিয়েছিল। সুন্দর বা প্রকৃতিস্থ সমাজের জন্য কাহারও কোন মাথা ব্যথা বোধ নেই, যেখানে আর্থিক সামর্থই একমাত্র সামর্থ্য এবং আভিজাত্যের নিদর্শন, সেখানে অর্থশালী ব্যক্তির খেয়াল খুশী, লোভ ও হিংসাকে বাধা দিবে কে? অর্থশালী ধনিক-বণিকদের কেন্দ্র করে যে সব সেবকগোষ্ঠী—বাগান বাড়ীর অনুচরবর্গ—নূতন এক মাতাল ও দালাল শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাহাদের হাতে দরিদ্র ও দুর্ব্বলের মান, ইজ্জৎ খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মদ্যপান নারী হরণ, নারীধর্ষণ, হত্যা, জালিয়াতি ও জুয়াচুরি—বাগান বাড়ী সভ্যতার আনুষঙ্গিক ফল যত, সব কিছুই তাদের কাছে সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই সামাজিক বিকৃতির আগুনে কত সুখী পরিবারের, কত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সুখশান্তি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি বটে কিন্তু তখনকার নাটক-উপন্যাসে 'সাজানো বাগান' শুকিয়ে যাওয়ার কিছু কিছু ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে এই সমাজেরই খানিকটা অংশ প্রতিফলিত হয়েছিল।

তবে এটাই সমাজের সমগ্র পরিচয় নয়—ইহা নূতন কলকাতার নাগরিক সভ্যতার বিকৃতির দিক্। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। ব্যাধির উপর ব্যাধি। একে কৌলীন্ত প্রথা, পণ প্রথা, বাল্যবিধবা প্রভৃতি সমাজের বহু কালের পুরাতন ব্যাধির প্রকোপে সমাজ জর্জরিত ছিল, তার উপর এল নূতন ব্যাধির আক্রমণ।

কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত দেহে যেমন ব্যাধি সত্য, তেমনি ব্যাধি প্রতিরোধ শক্তিও সত্য। ব্যাধি দেহে থাকতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ প্রতিরোধ শক্তি ব্যাধির মূল কারণকে দেহ থেকে অপসারিত করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে না পারে। ব্যাধির অস্তিত্ব প্রতিরোধ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করে বটে, কিন্তু অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। তখনকার বাঙালী সমাজে বিকৃতি ছিল বটে, কিন্তু প্রতিরোধ শক্তিও ছিল। এই প্রতিরোধ শক্তি ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করেছিল। একদিকে শিক্ষার জন্ত, অন্ত দিকে কৌলীন্ত প্রথা, পণ প্রথা, চির বৈধব্য, বেশ্যাসক্তি পানাসক্তি সব রকম বিকৃতি দূর করবার জন্ত শিক্ষিতদের অনেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষিতদের অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন—নারী-পুরুষ সকলেরই মুক্তির উপায় শিক্ষা। কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ-সমস্যা, একটি মূল সমস্যারই নানারূপ এবং সেই মূল সমস্যাটি হচ্ছে—শিক্ষা-সমস্যা। শিক্ষাই নারীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে—ব্যক্তিত্ব এবং উপার্জনক্ষমতা দিয়ে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করতে পারবে, অথচ তারই অনিবার্য পরিণতি ঘটবে কৌলীন্ত প্রথা বিলোপে এবং বিধবা বিবাহ-সমস্যার সমাধানে—এ-ধারণা অনেকেরই মনে অস্পষ্টাকারে দেখা দিয়েছিল। অস্পষ্টাকারে বলছি এই কারণে যে দুই একজন ছাড়া আর কেহই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পরাধীনতার মূল কারণ এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পারা সম্ভবও ছিল না। যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পারা সম্ভব তাহা অনেকেরই মধ্যে ছিল না এবং ছিল না বলেই তাঁহারা সমস্যার মূলদেশে পৌঁছাতে পারেননি—অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তিই যে মুক্তির

প্রথম শর্ত একথা ধরতে পারেননি। তবে তাহা না ধরতে পারলেও, যে-শক্তি নারী মুক্তির জন্য অপরিহার্য্য সেই শক্তির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল। আগেই বলেছি—গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে—এই সমস্যাটিকেই প্রশ্নের আলোকে রেখে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই ছিল না যে তিনি সমস্যার মূলে পৌঁছেছিলেন, কৃতিত্ব এই যে তিনি দেখেছিলেন—বিধবা-বিবাহ আইন থাকাই সমস্যার যথেষ্ট সমাধান নয়; সমস্যার জড় আরও গভীরে এবং সেই গভীরে হস্তক্ষেপ না-করা পর্য্যন্ত 'সধবার একাদশীর' উৎপাত থাকবেই। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে সমাজের প্রতিরোধ শক্তিকেই জোরদার করা হয়েছিল। মোট কথা, যাঁরা শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন দ্বারাই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাঁরা সকলেই সমাজের প্রতিরোধ শক্তিকে পুষ্ট করেছিলেন। সমাজের এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টা একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রসারে ও কুসংস্কার দূরীকরণে ব্যক্ত হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে জাতির আত্মসংবিদ জাগিয়ে দেওয়ার—জগৎসভায় যোগ্য আসন অধিকার করবার প্রেরণা হয়ে কাজ করছিল। আগেই বলেছি পরিবেশ স্থিতিশীল কিছু নয়। গিরিশচন্দ্র যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্মেছিলেন, তাহার মধ্যেও বিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বাঙালী সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সংকেত উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

(ক) সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭ সাল)।

(খ) জাতীয় গৌরব সভা (রাজনারায়ণ বসু—প্রতিষ্ঠাতা)।

(গ) হিন্দুমেলা (১৮৬৭ ৮০ সাল পর্য্যন্ত———নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নেতা)।

(ঘ) ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫ সাল)—শিশিরকুমার ঘোষ।

(ঙ) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান (ভারত-সভা) ১৮৭৬ সাল, ছাত্রসভা (১৮৭৭ সাল)।

* (চ) কংগ্রেস—১৮৮৪ সাল।

(ছ) গণপতি উৎসব (১৮৯০ সাল)
(জ) শিবাজী উৎসব (১৮৯৫ সাল) } লোকমান্য তিলক।

(ঝ) ডন সোসাইটি (১৯০৩ সাল) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(ঞ) অনুশীলন সমিতি—প্রমথ নাথ মিত্র।

* (ট) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—(১৯০৫ সাল)।

বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশের রাজনৈতিক মুক্তির আবেগ বেশ সংহত হয়ে উঠেছিল এবং স্পষ্টতররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আবেগের ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, কোন্ উত্তেজনায় গিরিশচন্দ্র সিরাজ-উদ্দৌল্লা, মিরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। পরিবেশের উচ্চ তাপই সিরাজ-উদ্দৌল্লার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সিরাজ-উদ্দৌল্লাকে অত স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। এই তাপ একদিনে বা হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। যে ইংরেজী শিক্ষা 'ইয়ং বেঙ্গল' তৈরি করেছিল সেই শিক্ষাই ইয়োরোপ-আমেরিকার সঙ্গে জাতীয় মনের সান্নিধ্য ঘটিয়েছিল; সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিত মনকে কৌতূহলী করে তুলেছিল—ইয়োরোপ ও আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের জীবনাদর্শ ও জীবনাবেগকেও আমদানি করেছিল।

ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের মৃত্যুঞ্জয় জীবনের কীর্ত্তিকাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, রাজপুত বীরত্বের অমর কাহিনী—শিক্ষিত বাঙালীর মনে উত্তর সাধকেরই প্রেরণা রূপে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিল। বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে এই সাহসেরই প্রথম উৎক্ষেপ ঘটেছিল—স্বদেশী আন্দোলনের রূপ ধরে—কর্ম্মীদের কর্ম্ম সাধনায় এবং ভাবুকদের শিল্প সাধনায়।

কিন্তু সকল কর্ম্মীর সঙ্কল্প ও ঐকান্তিকতা, সকল জ্ঞানীর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং সকল ভাবুকের জ্ঞান-কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তির মাত্রা কোনকালেই সমান হতে পারে না—সমান ছিলও না। পরিবেশ এক হলেই যে ব্যক্তি একরূপ আচরণ করবে, জ্ঞান অনুভব ও ইচ্ছায় এক হবে—এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না এবং চলে না এই কারণেই যে সব ব্যক্তি সমান মাত্রায় পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করে না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও অবস্থা অনুযায়ী পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে—পরিবেশকে অল্প অথবা অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। গিরিশচন্দ্র সিরাজ-উদ্দৌলা নাটকে যে-সাহসের বা ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, আর কেউ তাহা পারেননি এবং তাহতে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-চরিত্রেরই মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

পরিবেশের রাজনৈতিক প্রেরণাকে গিরিশচন্দ্র ভয়ে অস্বীকার করেননি বলেই, সিরাজ-উদ্দৌলা, মিরকাশিম প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক লিখতে পেরেছিলেন।

পরিবেশকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন কে? জ্ঞানের, অনুভবের এবং ইচ্ছার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ক'জনের থাকে? আর থাকলেও কতটুকু থাকে? ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যতটুকু পরিচয় তখন সম্ভব হয়েছিল তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'জন করতে পেরেছিলেন? ক'জন বিজ্ঞান ও নূতন দর্শনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং নূতন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। ধর্ম্মদর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বে যে-নূতন দর্শন জন্মলাভ করেছিল তার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে, তাকে স্বীকার করতে ক'জনে পেরেছিলেন? অতি-প্রাকৃত শক্তিতে বা সত্তায় যে-বিশ্বাস ধর্ম্মদর্শনের ভিত্তি সেই বিশ্বাস ত্যাগ করবার, সেই ভিত্তিকে অস্বীকার করবার মত শক্তি ও সাহস ক'জনের এসেছিল? এক ভিত্তি ছেড়ে অন্য ভিত্তি আশ্রয়

করা এক ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ, হিন্দু ধর্ম্ম ছেড়ে খ্রীষ্টান হওয়া বা ব্রাহ্ম হওয়া —বৈপ্লবিক কোন কিছু করা নয়। এই অর্থে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কেহই বৈপ্লবিক কোন কিছু করেননি। এঁরা সাকার অতি-প্রাকৃত সত্তা ছেড়ে নিরাকার অতি-প্রাকৃত সত্তাকে উপাস্যের আসনে বসিয়েছিলেন; কিন্তু অতি-প্রাকৃত সত্তার উপাসনা ত্যাগ করতে তথা বৈপ্লবিক কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেননি।

গিরিশচন্দ্রের মনেও তখনকার দার্শনিক দ্বন্দ্বের উত্তাপ এসে লেগেছিল। কোমতের 'পজিটিভিজম' এবং তাঁর 'প্র-পরা-অপ' শিষ্যের দল, বাংলাতেও দেখা দিয়েছিল। একদিকে চলেছিল আস্তিক্য-নাস্তিক্যের সংগ্রাম, অন্যদিকে চলেছিল সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব। গিরিশচন্দ্র নিজেই এই সময়কার দার্শনিক দ্বন্দ্বের কথা লিখে গেছেন—তিনি লিখেছেন—"আমাদের পাঠদ্দশায় যাঁহারা ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই সমাজে গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী অল্প সংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও চলে। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল।......... ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পায়খানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন।......... আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি ও বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয় .... এ অবস্থায় স্ব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্ক চলে, আদি সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া আসা করি।... .....। নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে

লাগিল .... ভাবিলাম ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা। .... (পরে দুর্দ্দিনে তারকনাথের শরণাপন্ন হইবার পরে) আমার দৃঢ় ধারণা জন্মে দেবতা মিথ্যা নয় ...... ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—গিরিশচন্দ্র।—জন্মভূমি—১০ বর্ষ, আষাঢ় ১৩০১ সন)।

আস্তিক্য-নাস্তিক্যের এবং সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্বের পরিমণ্ডলে গিরিশচন্দ্রের মন কিভাবে কাজ করেছিল, কিভাবে নাস্তিক্যের কোটি থেকে আস্তিক্যের কোটিতে এসে শান্ত হয়েছিল—সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য করে নিয়েছিল তার সুন্দর স্বাকৃতি পাওয়া গেল এই উক্তিটির মধ্যে। আমরা দেখতে পেলাম গিরিশচন্দ্রের মনে জড়বাদের স্পর্শ লেগেছিল কিন্তু তাহা কোন সংস্কারে পরিণত হয়নি, সাময়িক অশান্তি সৃষ্টি করেই দূরে সরে গিয়েছিল। বিজ্ঞান-দর্শনাদি শাস্ত্র যতখানি আত্মসাৎ করতে পারলে নূতন দর্শনের সিদ্ধান্ত স্থায়ী সংস্কারে পরিণত হতে পারতো, গিরিশচন্দ্র তেমন শিক্ষাদীক্ষা অর্জ্জন করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র কেন তখনকার অনেক সুশিক্ষিত সন্দেহবাদীরাও ঘুরে-ফিরে শেষ পর্য্যন্ত একই কক্ষে এসে আবর্ত্তন করেছিলেন।

এমনকি যাঁরা নিয়মিতভাবে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরাও জড়বাদকে যতটা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, ততটা সংস্কারে পরিণত করতে পারেননি। সংস্কার কাটিয়ে উঠা কত বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার তখনকার শিক্ষিতদের মন, মুখ এবং কার্য্যের তুলনামূলক আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই আলোচনায় প্রবেশ করব না। আগেই বলেছি—পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনী অবিশ্বাস করা, সাকার ঈশ্বর ভজনা ত্যাগ করা, এক হিসাবে প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধেই দাঁড়ানো বটে কিন্তু জড়বাদ গ্রহণ করার মত বৈপ্লবিক কোন ব্যাপার নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, তখন এই ধরনের বিপ্লবী—কায়মনোবাক্যে জড়বাদী খুব অল্পই ছিলেন—ছিলেন না বললেও মিথ্যা বলা হয় না। এই অর্থে কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বা ব্রহ্মোপাসকই বিপ্লবী ছিলেন না, আগেই বলেছি। প্রথম বয়সে সংশয়বাদে এবং অজ্ঞেয়বাদে

অনেকেই হয়ত ভুগেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই অতি-প্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাসের ভূমিতে এসে শান্তি পেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বাঙালীর যে-পার্থক্য ছিল তাহা অতি-প্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাসগত নয়, পার্থক্য ছিল দেবসত্তার স্বরূপ এবং উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে। সকলেরই মনে তখন 'ন্যাশানাল রোমান্টিসিজমে'র আবেগ এসেছিল এবং সেই আবেগের প্রেরণাতেই সকলে সৃষ্টকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু এই আবেগ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মানসিক গঠনের বিশিষ্টতার জন্য, বিশেষ বশেষ খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র খ্রীষ্ট ধর্ম বা ব্রাহ্ম ধর্মের কোনটিই গ্রহণ করেননি বলে এবং সাকার দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই, গিরিশচন্দ্রের আবেগ পৌরাণিক কাহিনীর খাত ধরে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। নাট্য-প্রযোজক ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রকে জাতির সংস্কারের নাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রেরণাতেই পৌরাণিক নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিল। একথা ঠিক যে গিরিশচন্দ্রের ধর্মদর্শনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটলে—গিরিশচন্দ্র খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হলে গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় পৌরাণিক নাটক লেখার কোন আভ্যন্তরীণ প্রেরণা পেতেন না, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়বস্তুতেই নির্ব্বাচন সীমাবদ্ধ রাখতেন ; আর পৌরাণিক কাহিনী নির্ব্বাচন করতে গেলেও সেই সব কাহিনী নির্ব্বাচন করতেন যাহাতে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের চেয়ে মানব মাহাত্ম্যই বেশী। ঈশ্বরের সাকার উপাসনার চেয়ে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনাকেই সত্য বলে উঁচুতে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। গিরিশচন্দ্রের ধর্মদর্শনে তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি বলেই তাঁহার মধ্যে কোনরূপ পুরাণ বিরাগ দেখা দেয়নি, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তিনি ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। আধ্যাত্মিক সাধনার সমস্ত মতের ও পথের কথাই তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবাসী যত রকম সাধনা

করেছিল, গিরিশচন্দ্র কোনটিকেই তুচ্ছ এবং তাচ্ছিল্য করেননি—সমস্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে যে-ঐক্য ফুটে উঠেছিল সেই ঐক্যের বা সমন্বয়ের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। সাকার-নিরাকার ঈশ্বরের দ্বন্দ্বকে গিরিশচন্দ্র মনে স্থান দেননি. ঈশ্বরের রহস্যময় লীলাকে নির্ব্বচনীয় করতে চেষ্টা করেননি এবং তাহা করেননি বলেই তিনি অতীত ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির তথ্য পুরুষার্থ সাধনার পরিচয় দিতে, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ কোন ধর্ম্মকেই নগণ্য বলে দূরে ঠেলে দেননি। মোট কথা, গিরিশচন্দ্র খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হননি বলেই এবং দেব-দেবী বিশ্বাসী ছিলেন বলেই আমরা এতগুলি মূল্যবান পৌরাণিক নাটক পেয়েছি এবং জড়বাদী হননি বলেই তাঁর সমস্ত নাটকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের তপ্ত নিঃশ্বাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত কথাটি শুধু যে গিরিশচন্দ্রেই প্রযোজ্য তাহা নয়, ঐ যুগের সকলেরই পক্ষে প্রযোজ্য—ঈশ্বর-বিশ্বাসের আবহাওয়া নেই এমন সৃষ্টি তখন ছিল না বললেই চলে। জড়বাদী সাহিত্যিক বলতে যা বুঝায় কেহই সেইরূপ ছিলেন না, কারণ সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহই তখন জড়বাদকে জীবন-দর্শনরূপে স্বীকার করে নেননি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেখেও বুঝতে পারা যাবে—তিনি পৌরাণিক দেব-দেবী বিশ্বাস এবং পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে অতি-প্রাকৃত—ব্রহ্মসত্তায় বিশ্বাস ত্যাগ করেননি এবং করেননি বলেই তাঁর সমস্ত রচনার মেরুমজ্জায় ঐ বিশ্বাসের আমেজ পাওয়া যায়—সমস্ত রচনাকেই যেন ব্রহ্মবিশ্বাসের একটি বলয় বেষ্টন করে আছে। যেখানে গিরিশচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় পৌরাণিক বিশ্বাসের আবহাওয়া, রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় প্রাক্-পৌরাণিক উপনিষদ্ যুগের ব্রহ্মচিন্তার সংস্কার—এই যা পার্থক্য। যে-অর্থে গিরিশচন্দ্র জড়বাদী ছিলেন না, সেই একই অর্থে, দৈব বা ব্রহ্মসত্তায় বিশ্বাস করতেন বলেই রবীন্দ্রনাথও জড়বাদী ছিলেন না। দুইজনেই অধ্যাত্মবাদী ছিলেন—গিরিশচন্দ্র ছিলেন সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ যদি জড়বাদে বিশ্বাসী হতেন তাহা হলে আমরা আর যাই পেতাম—রবীন্দ্রনাথের এই সব ব্রহ্মবাদ-

বলম্বিত রচনা পেতাম না। আবার তিনি যদি গিরিশচন্দ্রের মত পৌরাণিক ধর্মে বিশ্বাস করতেন—দেব-দেবীর অস্তিত্ব ও উপাসনা বিধি মানতেন, বিশেষ করে তিনি যদি শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত হতেন তাহা হলেও তিনি ব্রহ্মপদাবলী না লিখে অন্য কিছু লিখতেন—'বিসর্জ্জন' নাটক লিখলেও প্রতিমাপূজার তথা শাক্তদের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন না—এক কথায়, গিরিশচন্দ্রের মতই পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে জাতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেষ্টা করতেন।

মোট কথা এই যে গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের মত অনেকেই প্রচলিত অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন না—বস্তুবাদী দর্শনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারেন না। এই ব্যাপারে তখনকার লেখকদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ছিল এই যে কেহ বা পৌরাণিক যুগের স্থূল বিশ্বাসের স্তরে ছিলেন, কেহ বা উপনিষদ্ যুগের সূক্ষ্ম উপলব্ধির স্তরে ছিলেন, কেহ বা একটু বেশী ভক্তিযোগী ছিলেন, কেহ বা একটু বেশী জ্ঞানযোগী ছিলেন তবে সকলেই যুগের তাড়নায়, নিষ্কাম কর্ম্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সে যাই হোক, এই দার্শনিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি দেখতে হবে এবং দেখলেই দেখা যাবে যে পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়ে গিরিশচন্দ্র জাতির ধর্ম্মীয় বাসনা চরতার্থ করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টায় সার্থক হয়েছিলেন। পৌরাণিক নাটকগুলির বিচার করার সময় শুধু একথা বললেই চলবে না যে গিরিশচন্দ্র অতি-প্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করতেন এবং অবাস্তব বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন, বিচার করে দেখতে হবে গিরিশচন্দ্র যে-বস্তুকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে পেরেছেন কি না। মনে রাখতে হবে—তখন সাকার এবং নিরাকার ঈশ্বর—উভয়কেই লোকে সত্য বা বাস্তব বলে মনে করত যদিও উভয়ই আজ বৈজ্ঞানিকের কাছে অবাস্তব।

প্রফুল্ল নাটকের জাতি পরিচয়

প্রফুল্ল নাটকের জাতি নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে প্রত্যেক সমালোচককে নিম্নলিখিত প্রশ্নের তথা সমস্যার বাধা অতিক্রম করতে হয়—(ক) প্রফুল্ল রসোত্তীর্ণ একখানি ট্র্যাজেডি কি না? (খ) প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি না বলে করুণরসাত্মক নাটক বা প্যাথেটিক ড্রামা বলা সমীচীন কি না? (গ) প্রফুল্ল মেলোড্রামা শ্রেণীর স্তরে নেমে গেছে কি না? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নগুলির নির্ভুল উত্তর দেওয়ার উপরেই জাতি নির্দ্ধারণ-সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে এবং নির্ভুল উত্তর দেওয়া নির্ভর করছে ট্র্যাজেডি, মেলোড্রামা, করুণরসাত্মক নাটক বা প্যাথেটিক ড্রামা প্রভৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করার সামর্থ্যের, এক কথায় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার উপরে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ, ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণরসাত্মক নাটকের বা প্যাথেটিক ড্রামার পার্থক্য কি, ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোড্রামার মৌলিক পার্থক্য কোথায়—এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে, বাস্তবিকই, সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে না। সুতরাং জাতি নির্দ্ধারণের আগে—উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ, ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে সাহিত্য-শাস্ত্রকাররা যে-আলোচনা করেছেন তাহা উপস্থাপিত করা যাক্। সকলেই জানেন—ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন—গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ। ট্র্যাজেডির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যে-আলোচনা করেছেন তার সারাংশ নিম্নলিখিতরূপ:—

ট্র্যাজেডি হচ্ছে 'সিরিয়াস এ্যাকশনে'র অনুকরণ—অর্থাৎ সেই সব ঘটনার উপস্থাপনা যাহা আমাদের মনে ভয়ের এবং শোচনার উদ্রেক করে—"events inspiring fear and pity"—actions which excite pity and fear'। এই সব ঘটনা তাঁদের জীবনে দেখা যায় যাঁরা—"have done or suffered

something terrible"—অর্থাৎ সাংঘাতিক কোন কাজ করেছেন অথবা ভয়ঙ্কর দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ট্র্যাজেডি আসলে শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যায়ের ও দুঃখ-দুর্ভোগের (misfortune) কাহিনী।—সাংঘাতিক কোন কাজের অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবেই সেই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যায় ঘটুক, অথবা নিয়তির ইচ্ছায় বা ঘটনাচক্রেই ভাগ্যবিপর্য্যয় ও দুঃখ-দুর্ভোগ ঘটুক।

ট্র্যাজেডির ঘটনা এমন হওয়া চাই—যাহা শুনে বা দেখে পাঠক "will thrill with horror and melt to pity"। অবশ্য "fear and pity'-কে "spectacular means" দ্বারা উদ্রেক করলে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না, তেমনি—"Those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible but only of the monostrous, are stranger to the purpose of Tragedy"—অর্থাৎ শুধু দৃশ্যের সাহায্যে যাঁরা ভয়ঙ্করকে সৃষ্টি করতে গিয়ে বীভৎসকে সৃষ্টি করেন তাঁরা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেন না। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে সেই বিশেষ ধরনের 'সিরিয়াস এ্যাকশন'—যাহা ভয়ঙ্কর এবং করুণ।

ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে এ্যারিস্টটলের যে-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহা এই যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য 'fear and pity'-র উদ্রেক করা (fear and pity —this being the distinctive mark of tragic imitation)। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে ট্র্যাজেডি কি তবে একাধারে ভয়ানক এবং করুণ রসের নাটক? অথবা ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথবা করুণ রসের নাটক? অন্যভাবে বললে, ট্র্যাজেডি কি ভয় এবং শোচনা দুটি ভাবকেই সমান মাত্রায় উদ্রেক করবে, অথবা কোনটিতে শোচনাকে, কোনটিতে ভয়কে মুখ্যভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এ্যারিস্টটল্ বহু স্থলে 'fear or pity' ব্যবহার করায় একথা যেমন মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে ভয়ানক অথবা করুণ এই দুই

রসের কোন এক রসের নাটক, তেমনি pity and fear ব্যবহার করায় একথাও মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি একাধারে ভয়ানক ও করুণ রসাত্মক নাটক—অর্থাৎ ভয়ানকমিশ্র করুণ কিংবা করুণ মিশ্র ভয়ানক রসের নাটক। এও এক সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান করতে হলে এ্যারিস্টটল 'fear এবং pity শব্দ দুইটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাহা অবশ্যই জানতে এবং বুঝতে হবে। শব্দ দুইটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"pity is aroused by the unmerrited misfortune and fear by the misfortune of a man like ourselves"—অর্থাৎ শোচনা জাগে তখনই যখন কোন ব্যক্তির দুঃখ-দুর্ভোগ দেখে এই কথা মনে হয় যে ঐ দুঃখ-দুর্ভোগ ঠিক তার প্রাপ্য নয় এবং ভয় জাগে এই মনে করেই যে আমাদেরই মত একজন মানুষ এত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। বলা বাহুল্য, ভয় এবং শোচনা উভয়ই জাগে—'misfortune' দেখে—উভয় ভাবই ভাগ্যবিপর্যয়জনিত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আত্মসম্পর্কে চেতনা থেকে ভয় এবং ব্যক্তিসম্পর্কে চেতনা থেকে শোচনা। এ্যারিস্টটল যে-ভাষ্য করেছেন তাহা গ্রহণ করলে একথা মানতেই হবে যে ভয় এবং শোচনা নামতঃ যত পৃথক্ই হোক, আসলে তত পৃথক্ নয়। ভয় ও শোচনা পরস্পরসম্পৃক্ত—ভয় শোচনারই অন্যতম নিমিত্ত-কারণ—প্রত্যেক শোচনার মূলে এই ভয় ভাবটি সক্রিয় থাকে—এই ভয় অনুকম্পার সহজ ভিত্তি।

'ভয়' শব্দটিকে এ্যারিস্টটল যে এই বিশিষ্ট অর্থেই প্রয়োগ করেছেন—তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে যেখানে তিনি 'utter villain'-কে নায়ক করতে নিষেধ করেছেন। সেখানে তিনি এই যুক্তিই দেখিয়েছেন যে—অতি-শয়তানের পতন দেখালে নীতিবোধ পরিতৃপ্ত করা যায় বটে কিন্তু ঐরূপ বৃত্ত শোচনা অথবা ভয় উদ্রিক্ত করতে পারে না। 'ভয়ঙ্কর' শব্দটিকে সাধারণ 'ভয়ঙ্কর ঘটনা'র অর্থে ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই তিনি এই সিদ্ধান্ত করতেন না, কারণ অতি-শয়তানের ক্রিয়াকলাপের এবং পরিণামের ভয়ঙ্কর হওয়ার পথে কোন

বাধাই থাকতে পারে না। অতি-শয়তানও can do or suffer something terrible। কিন্তু এ্যা রস্টটলের কাছে—utter villain-এর 'misfortune' —'neither pitiful nor terrible'। তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে অতি-শয়তানের পতন দেখে আমরা একথা মনে করিনি যে তার পতন—misfortune of a man like ourselves বা তাহা 'unmerrited misfortune'। অতি-শয়তানকে আমরা 'man like ourselves' বলে মনে করিনি —একথার তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই এই যে অতি-শয়তানের উপর আমাদের কোন সহানুভূতি থাকে না এবং তাহা থাকে না বলেই তার পতনে আমাদের মনে কোন ভয় তথা শোচনা জাগে না। তাহা হলে দেখা যাচ্ছে যে সহানুভূতির যোগ না থাকলে ভয় জাগতে পারে না এবং ঐ ভয় শোচনারই অব্যবহিত ও নিয়তপূর্ব্ব একটি কারণ। এই শোচনা ভয়েরই অনিবার্য্য পরিণতি। এই দিক দেখলে ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব—'শোচনা' এবং আমাদের পরিভাষায় ট্র্যাজেডি করুণ রসেরই নাটক।

তারপর 'ভয়' শব্দটিকে ভয়ঙ্কর ঘটনাজনিত 'ভয়াবেগ' অর্থে ব্যবহার করলেও এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে ট্র্যাজেডি নিছক ভয়ানক রসের নাটক, কারণ 'utter villain' দিয়ে করুণ রস সৃষ্টি করা না গেলেও ভয়ানক রসসৃষ্টি করা সম্ভব এবং তাহা করলে আর যাই করা যাক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা হবে না। অতএব, ট্র্যাজেডি যখন মূলতঃ 'change of fortune' বা 'calamity'র ঘটনা, তখন তার উপসংহারে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দৃশ্য বা বিপত্তির রূপ দেখে ভাগ্যাহত ও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ একটি মনোভাব জাগবেই এবং এই বিশেষ মনোভাবটি শোচনাত্মক না হয়ে পারে না। আসল কথা, ট্র্যাজেডির আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যত ভয়ঙ্কর ঘটনাই থাক, ভাগ্যাহত, বিপন্ন বা বিনষ্ট ব্যক্তির জন্য শোচনা জাগানোতেই ট্র্যাজেডির সার্থকতা। শোচনানিরপেক্ষ হয়ে ভয় যখন ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব হতে পারে না তখন এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই প্রসঙ্গে জেমস্ জয়েস

স্মরণীয় "the tragic emotion, in fact, is a face looking two ways towards terror and towards pity, both of which are phases of it. এবং pity এবং terror শব্দ দুইটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"Pity is the feeling which arrests in the presence whatsoever is grave and constant in human sufferings and unites it with the human sufferer" আর—"Terror is the feeling which arrests the mind in the presence of whatsoever is grave and constant in human sufferings and unites it with the secret cause" এখানেও দেখা যাচ্ছে—pity এবং terror একই অবস্থার ফল—মানুষের গুরুতর সঙ্কট এবং দুঃখ-দুর্ভোগ দেখে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মন 'পিটি' অনুভব করে যখন সঙ্কটাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে চায় এবং ভয় অনুভব করে যখন কারণের কথা চিন্তা করে, কারণ চেতনা ও কার্য্যচেতনা যেহেতু পরস্পরনিরপেক্ষ নয় এবং ব্যক্তির পরিণামটিই শেষ পর্য্যন্ত মনের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়, সেইহেতু ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ শোচনা জাগানোই। একথা যদি প্রমাণিত সত্য হয়ে থাকে যে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য শেষ পর্য্যন্ত 'শোচনা' জাগানো—মানুষের শোচনীয় পরিণামের বৃত্ত উপস্থাপিত করা, তাহা হলে এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য যে ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণ রসাত্মক নাটকের অন্ততঃ স্থায়িভাবের দিক থেকে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং বিশেষ ব্যাখ্যাই দাবি করতে পারে। ট্র্যাজেডির সঙ্গে করুণ রসাত্মক নাটকের সম্পর্ক কি এ-সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক এবং পরিপাটি আলোচনা হয়নি। হয়নি এই কারণেই যে হিন্দু কলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ার সময় থেকেই এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ট্র্যাজেডি-রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রস, জাতীয় সাহিত্য শাস্ত্রকারগণ এ-রসের স্বরূপ জানতেন না এবং ট্র্যাজেডির সঙ্গে নব-রসের কোনটিরই কোন সম্পর্ক নেই। তখন থেকে আজ

পর্যন্ত এই সংস্কারই কাজ করছে এবং করছে বলেই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচক 'রসে'র নাম শুনলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন এবং তাঁদের দেখাদেখি বাংলা সমালোচকরাও নাসিকা কুঞ্চন ব্যাপারে আরও দুই-এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে থাকেন। এই সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে ট্র্যাজেডি এবং করুণ রসের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিপাটি ধারণার অভাব। সমগ্র গ্রীক ট্র্যাজেডি, এলিজাবেথান যুগের ট্র্যাজেডি এবং আধুনিক ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডির স্বরূপ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আমাদের নেই, তেমনি নেই রসের এবং বিশেষতঃ করুণ রসের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। সমালোচকরা ভুলে যান যে ট্র্যাজেডি বলতে যেমন কেবল 'হাই ট্র্যাজেডি'ই বুঝায় না, করুণ রস বলতেও তেমনি শুধু খানিকটা বিলাপোক্তিই বুঝায় না। ট্র্যাজেডিতে যেমন বহুভাবের সংযোগে একটি বিশেষ ভাবকে স্থায়ী করা হয়, করুণ রসেও তেমনি বহু অনুভব সঞ্চারিভাবের সংযোগে একটি ভাবকে ব্যক্ত করা হয়। ট্র্যাজেডিতে যেমন বীর-ভয়ানক-রৌদ্র রসের মাত্রা বেশী মিশে ট্র্যাজেডি রসের দীপ্তি ও গাঢ়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে তেমনি করুণ রসের নাটকেও অঙ্গরস হিসাবে বীর-ভয়ানক-রৌদ্রাদি রস থাকতে পারে। ভুল ধারণাটির সংশোধন করার অভিপ্রায়েই আমি ট্র্যাজেডির এবং করুণ রসাত্মক নাটকের মৌলিক ঐক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমতঃ, করুণ রসের স্বরূপের কথাই বলা যাক্। রসবাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং যিনি প্রথম রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন— 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তি'—প্রথম নাট্যশাস্ত্রকার সেই ভরত করুণ রসের স্বরূপ এইভাবে নির্দেশ করেছেন :—

অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ। স চ শাপক্লেশ বিনিপতিতেষ্টজনবিপ্রযোগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংযোগাদিভির্বিভাবৈঃ সমুপজায়তে। অর্থঃ—করুণের স্থায়িভাব হচ্ছে: 'শোক' (শোচনা)। শাপ ক্লেশ বিনিপতিত—ইষ্টজনবিপ্রযোগ—বিভবনাশ—বধ—বন্ধ—বিদ্রব—উপঘাত-

ব্যাসন প্রভৃতি নিমিত্তকারণের ফলে উৎপন্ন হয়।' করুণ ত্রিবিধঃ—(১) **ধর্মোপঘাতজ** (২) **অর্থাপচয়োদ্ভব** এবং (৩) **শোককৃত**। ভরতের বিবরণ থেকে জানা গেল—(ক) করুণ-রসের স্থায়িভাব শোক বা শোচনা। (খ) তার নিমিত্ত কারণ বা বিভাব নানারকম হতে পারে—যে কয়টি বিভাব উল্লিখিত হয়েছে তারা ছাড়াও আরো অন্যান্য যত কারণে শোচনা উপজাত হতে পারে "আদি" শব্দ দ্বারা তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোট কথা এখানে এই যে, যত কারণে ব্যক্তির জীবনে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টিহতে পারে তাদের সব কিছুই "বিভাব"। (গ) করুণ ত্রিবিধ—(১) ধর্মোপঘাতজ করুণ—ধর্মের উপঘাত ঘটিয়ে যেখানে ব্যক্তি-জীবন শোচনীয় পরিণাম লাভ করে, সেখানে ধর্মোপঘাতজ করুণ (২) অর্থাপচয়োদ্ভব করুণ—অর্থের অপচয় ঘটায়—অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও সুখসম্ভোগ থেকে দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হওয়ার ফলে যেখানে শোচনা জাগে সেখানে অর্থাপচয়োদ্ভব করুণ এবং (৩) শোককৃত করুণ—ইষ্টজন বিপ্রযোগ ঘটায় যেখানে শোচনা জাগে সেখানে শোককৃত করুণ। বলা বাহুল্য—ধর্মোপঘাতজ করুণের সঙ্গে অর্থাপচয়োদ্ভভ করুণের এবং শোকাকৃত করুণের প্রকৃতি-গত পার্থক্য থাকবেই। তেমনি অর্থাপচয়োদ্ভভ করুণের সঙ্গে শোককৃত করুণেরও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। এবং একথাও বলা বাহুল্য যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ঘটে অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ বিয়োগের তারতম্যের ফলেই। যে করুণরসে বীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রসের মাত্রা বেশী মিশে থাকে, তার আস্বাদ এবং যাতে নির্বেদ-গ্লানি, চিন্তা, বিষাদ, দৈন্য, জড়তা আলস্য, বিলাপ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব বেশী মিশে থাকে তার আস্বাদ ভিন্ন হবেই। একের আস্বাদনকালে চিত্ত যে পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুষ্ক থাকবে, অন্যের আস্বাদনকালে চিত্ত সেই পরিমাণে উদ্দীপিত ও শুষ্ক থাকবে না—বেশ খানিকটা দ্রবীভূত হবে। প্রথম শ্রেণীর নাটক দীপ্তিগুণ প্রধান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক দ্রুতিগুণপ্রধান হবে।

এই আলোচনার পরে প্রথমেই যে কথা মনে হবে সে এই যে—ট্র্যাজেডির

স্থায়িভাব এবং করুণরসের স্থায়িভাব যখন একই—ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব—'pity' এবং করুণরসাত্মক নাটকের স্থায়িভাব—'শোচনা', তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যঘটবে, সেই পার্থক্য হবে উপাদানগত পার্থক্য—বিভাবগত এবং সঞ্চারিভাবগত পার্থক্য। কিন্তু প্রশ্ন, বাস্তবিকই সেরূপ কোন পার্থক্য আছে কি? ট্র্যাজেডির বিভাব বিশ্লেষণ করে যত রকম পরিস্থিতি পাওয়া যায়, করুণরসের বিভাবের তালিকার মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না কি? তারপর যেটা সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—ট্র্যাজেডির সেই বিলক্ষণ লক্ষণটি কি, যা' করুণরসের নাটকে পাওয়া সম্ভব নয়? যা শুধু ট্র্যাজেডিতেই আছে করুণরসের নাটকে নেই? আমরা জানি ট্র্যাজেডির মধ্যে 'what is common to all is the element of Calamity and Suffering" (জন এস, স্মার্ট—'ট্র্যাজেডি' প্রবন্ধ), করুণরসের উপাদানও তো ঐ "element of Calamity and Suffering" তারপর এ কথাও বলা চলে না যে ট্র্যাজেডিতে যে পরিমাণ অদ্ভুত, ভয়ানক, ও রৌদ্র রসাত্মক ঘটনার উপস্থাপনা সম্ভব করুণরসের নাটকে তা' সম্ভব নয় কারণ অঙ্গরস হিসাবে করুণরসের নাটকেও ভয়ানক, বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকতে পারে। তারপর একথাও বলা চলে না—ট্র্যাজেডি নায়ক সর্বত্র এবং সর্বদাই সবল ও সক্রিয় এবং সংগ্রামশীল, অন্যপক্ষে করুণরসে নায়ক এবং সর্বদাই দুর্বল, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব এবং পলায়নপরায়ণ; ট্র্যাজেডি নায়কের পতন যে যে কারণে ঘটে, সেই সেই কারণে করুণরসাত্মক নাটকে নায়কেরও পতন ঘটতে পারে না।

ট্র্যাজেডির নায়ক কে হ'তে পারে এবং কে পারে না—এ বিষয়ে আলোচন করলে দুয়ের ঐক্য আরো বেশী করে চোখে পড়বে। ট্র্যাজেডি ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনা -এই সিদ্ধান্ত করার পরে এরিষ্টটল্ কোন্ কোন্ ব্যক্তির পতন 'ট্র্যাজিক' পদবাচ্য হবে আর কোন কোন ব্যক্তির পতন তা' হবে না—তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার নির্দেশ এই—

(ক) অতিধার্মিক ব্যক্তির সৌভাগ্য থেকে দুর্দশায় পতনের দৃশ্

দেখাবে না, কারণ তা'তে ভয় বা শোচনা জাগে না, শুধু মনে আঘাতই লাগে।

(খ) অতিশয়তান ব্যক্তির পতনের দৃশ্য দেখাবে না। কারণ তা'তে নৈতিক বাসনা চরিতার্থ হয় বটে কিন্তু ভয় বা শোচনা জাগে না।

(গ) উল্লিখিত দুটি অতিকোটিক চরিত্র বাদ গেলে অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ একটি চরিত্র যে অতিভালো বা অতিধার্মিক নয়—যার ভাগ্য-বিপর্যয় কোন পাপের বা নীচতার ফলে ঘটে না, ঘটে – বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ত্রুটির ফলে।

(ঘ) ব্যক্তিটি অতি বিখ্যাত ও ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া চাই।

এরিষ্টটলের উল্লিখিত নির্দেশ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং অনেকেই ত্রুটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। **প্রথমতঃ, নায়কের খ্যাতি ও ঐশ্বর্য্যের কথাই ধরা যাক।** নায়ককে বহুখ্যাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী হতে হলে—এ নির্দ্দেশ আজ অচল; কারণ অতিসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিকে নায়ক করে ট্র্যাজেডি লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং নায়কের খ্যাতির ও ঐশ্বর্য্যের মহত্ব আজ আর কোন বিচার্য বিষয় নয়। **দ্বিতীয়তঃ, অতিনির্দ্দোষ অতিধার্মিক ব্যক্তির যোগ্যতার প্রশ্নটি।** এরিষ্টটল যে যুক্তিতে অতিনির্দ্দোষ অতিধার্মিক ব্যক্তিকে বাদ দিতে বলেছেন তার বিরুদ্ধেও কথা উঠেছে। কথা তুলেছেন জন এস্ স্মার্ট মহাশয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন—Is it really true that when we read a work which describes the undeserved Suffering of an innocent man or woman we find it too terrible and lay it aside because we can not endure it? এবং প্রশ্নকারেই উত্তর দিয়েছেন—Is it not rather the case that such descriptions have a peculiar and intense interest of their own…" বলেছেন—অতিনির্দ্দোষ ও অতিনিরীহের দুঃখদুর্ভোগের কাহিনী পাঠ ক'রে মানুষ আনন্দ পায়, তা'র দৃষ্টান্ত—'Four Gospels'। সুতরাং এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত যে ঠিক নয় "ফোর গসপেল্স"ই তার

প্রমাণ। তৃতীয়তঃ, নির্দোষ বা ক্রটিহীন চরিত্রের যোগ্যতার প্রশ্ন। এরিষ্টটলের 'গ' চিহ্নিত নির্দেশ পাঠ করলে এ ধারণা খুব স্বাভাবিকভাবেই জন্মাবে যে ট্র্যাজেডির চরিত্রে Vice বা depravity" থাকলে চলবে না—কিন্তু "error বা frailty" কিছু থাকবেই। অর্থাৎ চরিত্রের পতনের মূলে চরিত্রের নিজের কোন বুদ্ধিগত বা স্বাভাবগত ক্রটি থাকা আবশ্যক। এই সূত্রটি সম্বন্ধেও নানা কথা উঠেছে। উঠেছে এই কারণেই যে গ্রীক ট্র্যাজেডি-গুলির মধ্যে এমন এমন ট্র্যাজেডি আছে যেখানে নায়কের দুঃখভোগের মূলে তার নিজের 'error frailty" কোন কাজ করেনি, যেখানে নির্দোষ নায়ক, অবস্থার চাপের তলে নিরুপায়ভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে—যেখানে "চরিত্রই নিয়তি" এই সূত্র কোনভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে না এবং যেখানে চরিত্রের পরিবেশের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের প্রশ্নও বড় কথা নয়। এই সব নাটকে তাঁদেরই বৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে যারা "have suffered something terrible"। ইউরিপিডিসের 'ট্রোজান উইমেন' নামক ট্র্যাজেডিতে হেকুবা, এণ্ড্রোমেকী প্রভৃতি যে শোচনীয় দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে তার জন্য তাদের কোনরূপ দায়িত্ব নেই—তাদের বুদ্ধির কোন ভুলে অথবা স্বভাবের কোন অতিপ্রবণতার জন্য তারা গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়নি এবং দুঃখযন্ত্রণা পায় নি। তাদের ট্র্যাজেডি অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা ভোগের তীব্রতার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং ট্র্যাজেডি নায়কের বুদ্ধিগত বা স্বভাবগত ক্রটি না থাকলেই চলবে না—এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। এই প্রসঙ্গেই স্মার্ট বলেছেন—"A general principle applicable to all tragedy is not to be found in the old saying that 'character is destiny', and in the notion that tragedy reveals the influence from within which work unconsciously on outward events; whilst some tragic dramas may thus be innterpreted there are others which can not be approached in this way without forced exegesis

and departures from the author's own evident purpose" স্মার্ট বলতে চান—এবং ঠিক কথাই বলেন—'চরিত্রই নিয়তি' অথবা ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের দৃশ্যই ব্যক্ত হয়—এরূপ কোন একটি সাধারণ সূত্র সব ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। বাস্তবিকই, যে ক্ষেত্রে terrible doing-এর দৃশ্য এবং তার পরিণাম দেখানো হয় সেখানে যেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের তীব্ররূপ ফুটে উঠে, যেক্ষেত্রে শুধু terrible suffering এর দৃশ্য দেখানো হয় সেখানে সেরূপ সক্রিয় সংগ্রামের রূপ থাকে না; সেখানে নিরূপায় দুঃখভোগেরই বিচিত্র রূপ দেখা যায়। এখানেই আসছে আর একটি সমস্যার কথা—ট্র্যাজিক চরিত্রের সক্রিয়তার নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন। এরিস্টটল-এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন নি এবং দেননি বোধহয় এই কারণেই যে তাঁর চোখে—'those who have done something terrible' তাদের সক্রিয়তার রূপটি যেমন প্রতিভাত হয়েছিল,তেমনি প্রতিভাত হয়েছিল তাদেরও নিষ্ক্রিয়তার রূপটি—যারা "have suffered something terrible" তিনি দেখেছিলেন—ট্র্যাজেডির আত্মা নিহিত থাকে—'incidents arousing pity and fear' এর মধ্যে, unmerited misfortune-এর মধ্যে এবং সেই সব ঘটনা যেমন সক্রিয় ও সবল ব্যক্তির জীবনে ঘটতে পারে তেমনি নিষ্ক্রিয় ও দুর্ব্বল ব্যক্তির জীবনেও ঘটতে পারে। বাস্তবিকই unmerited misfortune -এর ঘটনার উপস্থাপনাই যদি ট্র্যাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা বিচার করা অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যদি একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই অর্থাৎ যে চরিত্র, বাধা অতিক্রম করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সচেতন সংগ্রাম করেছে—ক্রনেতিয়েরভাষায়—'consciously striving towards a goal' শুধু সেই চরিত্রেরই 'misfortune' 'unmerited' হ'তো—নিষ্ক্রিয়ের 'misfortune' unmerited হ'তো না, তা' হলেই এ কথা বলা যেতো যে ট্র্যাজেডি-নায়ককে 'সক্রিয়' হ'তেই হবে—প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অবিরাম

সংগ্রাম করতেই হবে। ট্র্যাজেডি জীবনের অলৌকিক দ্বন্দ্বক্ষেত্র—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এ-কথাও সত্য যে দ্বন্দ্বের রূপ ও পরিণাম যুযুধান পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবক্ষেত্রে এক নয়।

এরিষ্টটল নায়কের সক্রিয়তার উপরে সংলক্ষ্যভাবে কোন জোর না দিলেও তাঁরই—একটি কথাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চরিত্রের নিজের দায়িত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বলাভ করেছিল এবং দায়িত্বের প্রশ্নটি ধীরে ধীরে সক্রিয়ত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছিল। জার্মাণ দার্শনিক হেগেল ট্র্যাজিক চরিত্রের পতনের মূলে নিজ দায়িত্ব থাকবে—এ কথাটি এবং দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষই নাটকের প্রাণ—একথা খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছিলে। ফলে এই সংস্কার বদ্ধমূল হ'তে থাকল যে চরিত্র নিজের কাজের দ্বারাই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং নিজের শোচনীয় পরিণামের জন্য নিজেই শেষ পর্যন্ত দায়ী। জার্মাণ সমালোচকরা বিশেষ ক'রে—Gervinus এবং Ulrici সেক্স্‌পীয়র সমালোচনায় এই সূত্র প্রয়োগ করেছেন—এবং 'চরিত্রই নিয়তি' এই কথা প্রচার করতে থাকলেন। এরই ফল—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফার্ডিনাণ্ড ব্রুনেতিয়ে—নাটকের মূলসূত্র খুঁজে পেলেন—সক্রিয় ও সচেতন সংগ্রামী নায়কের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন—খাঁটি নায়কের নায়ককে 'acted upon' হ'লে চলবে না—acting হতে হবে; খাঁটি নাটকের নায়ক বাধা অতিক্রম করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করবে এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। ব্রুনতিয়ের এই সিদ্ধান্ত সব নাট্যতত্ত্ববিদ মেনে নেননি—আর্চার, জোনস্‌, স্মার্ট প্রভৃতি নাট্যবিদ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন——এমন বহু সার্থক নাটক আছে যেখানে নায়ক "acted upon" অর্থাৎ passive; এমন কি যেখানে নায়কের ইচ্ছা শক্তি একেবারেই শুকিয়ে গেছে এঁরা বলতে চান—নায়ক সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দু'রকমই হ'তে পারে, সক্রিয়তার ও নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা চরিত্রে চরিত্রে ভিন্ন হয়। বড় বিচার্য ট্র্যাজেডি-রস আর সবই ঐ রস সৃষ্টির উপায় মাত্র।

নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি আরো একটু বিশেষ সবিস্তারে আলোচনা করা আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে—ট্র্যাজেডি আসলে মানুষের unmerited misfortune-এর কাহিনী অর্থাৎ মানুষের দ্বন্দ্ব সংকট ও শোচনীয় পরিণামের কাহিনী। এ কথা ঠিকই বটে যে ট্র্যাজেডিতে আমরা মানুষের সত্তাকে তীব্রতম উত্তেজনা নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের দুর্নিবার চাপের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বুঝাপড়া করতে দেখি—মানুষের সত্তার জৈবিক ও মানসিক সংকটের জটিল, ভীষণ ঐকান্তিক এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখি কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ট্র্যাজেডিতে আমরা যে দ্বন্দ্বক্ষেত্র দেখি, সেখানে শুধু যে সক্রিয়ের ও সবলের বুঝাপড়ার দৃশ্যই দেখা যায়, তা' নয়, নিষ্ক্রিয় ও দুর্বলকেও পরিবেশের চাপের তলে তিলে তিলে ক্ষয়ে যেতেও দেখা যায়; দেখা যায়—কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবেশকে প্রতিকূল করে তুলেছে—পরিবেশের উপরে তীব্র চাপের সৃষ্টি করে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রবলতর চাপের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রাম ক'রে শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছে। আবার কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি মহৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায় অন্যায়ের গতি রোধ করতে যেয়ে প্রবলতর পরিবেশের নিষ্ঠুর আক্রমণের আঘাতে শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারিয়েছে। কোনক্ষেত্রে বা আকস্মিক কারণে বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়, ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে পতিত হয়ে অসহায়ভাবে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া আর কোন কিছুই করতে পারছে না। সব ক্ষেত্রই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র এবং একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য শুধু চাপের বণ্টন ব্যাপারে। কোথাও ব্যক্তি-চাপ পরিবেশের উপরে বেশী মাত্রায় কাজ করে, কোথাও বা পরিবেশ ব্যক্তির উপরে বেশী মাত্রায় চাপ সৃষ্টি করে—এই যা পার্থক্য। কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিবেশকে চাপতে চাপতে সংকুচিত করে কোণঠাসা ক'রে ফেলে, শেষপর্যন্ত পরিবেশের হঠাৎ আক্রমণে পরিবেশের কাছে পরাজিত হয়; কোনক্ষেত্রে বা পরিবেশই ব্যক্তিকে চেপে

ধরে এবং চাপতে চাপতে নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলে —কায়িক প্রতিক্রিয়ার পথকে এমন কি ইচ্ছাটুকুও বন্ধ ক'রে দেয় এবং শেষে শোচনীয় পরিণতির আবর্তে তলিয়ে দেয়। দুই ক্ষেত্রেই চরিত্র "up against something" বটে কিন্তু দ্বন্দ্বের গতি ও প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। সুতরাং এ কথা মনে রাখতে হবেই যে ট্র্যাজেডির চরিত্র সর্বত্র এবং সবদাই 'acting' হবে এমন কোন কথা নেই, —"acted upon" বা "passive" ও সে হ'তে পারে। যে ক্ষেত্রে চরিত্র সক্রিয় সে ক্ষেত্রে দর্শকের ঔৎসুক্য—দর্শকের ঔৎসুক্যই বড় কথা—চরিত্রের ক্রিয়াপরম্পরাকে অনুসরণ করে এবং যেক্ষেত্রে চরিত্র নিষ্ক্রিয় সে ক্ষেত্রে চরিত্রের দুঃখ-দুর্ভোগের ক্রমবিনিপাত এবং পরিণতি দেখার জন্য দর্শকরা উৎসুক থাকে। মনে রাখতে হবে—ঔৎসুক্যের উদ্‌বোধনে নাটকের আরম্ভ ঔৎসুক্যের ক্রমবৃদ্ধিতে নাটকের অগ্রগতি এবং ঔৎসুক্যের অবসানেই নাটকের উপসংহার। যতক্ষণ এ সিদ্ধান্ত করা না যাবে যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্রেরই ক্রিয়াকলাপ ঔৎসুক্যের জনক, নিষ্ক্রিয় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ঔৎসুক্যজনক নয় যতক্ষণ এ সিদ্ধান্তও করা যাবে না যে সক্রিয় চরিত্রই একমাত্র নাটকীয় চরিত্র, নিষ্ক্রিয় চরিত্র নাটকীয় নয়—শুধু সক্রিয় চরিত্রের ক্রিয়াই দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সমর্থ, নিষ্ক্রিয় চরিত্রের প্রতিক্রিয়া দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে বিবাদ ক'রে কোন লাভ নেই। লক্ষ্য—ট্র্যাজেডি রস আর সবই ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। সক্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস সৃষ্টি করা হোক আর নিষ্ক্রিয় চরিত্র অবলম্বনেই রস সৃষ্টি করা হোক—রসসৃষ্টিই আসল লক্ষ্য। রস নিষ্পন্ন হ'লে—'ট্র্যাজিক ইম্প্রেশান' সৃষ্টি হ'লে, —উপাদান যোজনার সূত্র নিয়ে চুল চেরা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন কি?

এই প্রসঙ্গেই, সাক্রিয়তার প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতা সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক। 'সক্রিয়' বলতে বুঝায় সেই চরিত্রকেই যে চরিত্র পরিবেশের চাপের বা বাধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পরাঙ্মুখ হয়

না—প্রতিকূল পরিবেশের আক্রমণের মুখে, পালিয়ে না যেয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকবে। যে ক্ষেত্রে এই চেষ্টা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চরিত্রের প্রত্যক্ষ আচরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত, সেখানে সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ, আর যেখানে তা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যান্য চরিত্রের বর্ণনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত সেখানে সক্রিয়তা পরোক্ষ। আমরা অনেক সময় পরোক্ষ সক্রিয়তাকে নিষ্ক্রিয়তা ব'লে ভুল ক'রে থাকি—এবং প্রত্যক্ষতাকে ও সক্রিয়তাকে এক ব'লে মনে করি। নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধব চরিত্রটি এর ভাল দৃষ্টান্ত। নবীনমাধবকে নিষ্ক্রিয় বলার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই। কারণ নবীনমাধব নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যেখানেই এবং যে ভাবেই অত্যাচার আসুক—তার প্রতিবিধানে তৎপর হ'য়েছে—নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যান্য জুলুমের সামনে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে। তবে এই কথা বলা যেতে পারে যে নবীনমাধবের ক্রিয়াগুলি যতটা পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ততটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়নি। অতএব নবীনমাধব পরোক্ষ সক্রিয় চরিত্র বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। দৃশ্যকাব্যে মুখ্য মুখ্য ঘটনাকে দৃশ্য করা, চরিত্রের আচরণকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ক'রে তোলা বাঞ্ছনীয়—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য ; কিন্তু এ কথাও অবশ্য লক্ষণীয় যে নাটকে সব কিছুকে দৃশ্য করার অবকাশ থাকে না ; অনেক কিছুকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করতে হয়। অবশ্য পরোক্ষতার মাত্রা বেশী থাকলে নাট্যলক্ষণে ঘাটতি পড়ে, চরিত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মাত্রা কম হয়। তা'ই বলে এ কথা ঠিক নয় যে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হ'লেই চরিত্র স্বভাবে নিষ্ক্রিয় হ'তে বাধ্য।

আগেই বলেছি—আসল বিচার্য—ট্র্যাজেডি-বোধ জাগে কি না সেই প্রশ্নটি। এই বোধটি নাটকে নানা কারণে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন হতে পারে এবং তার ফলে নাটকখানি ট্র্যাজেডির মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। ট্র্যাজেডির বিধি প্রথম সূত্রকার সেই এরিস্টটলও লক্ষ্য করেছিলেন ট্র্যাজেডির আসল রসের স্বরূপ

বুঝতে না পেরে কেউ কেউ ভয়ানক রসের স্থলে বীভৎস রস সৃষ্টি ক'রে বসেন এবং তাঁর মতে "Those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible, but only of the monstrous are stranger to the purpose of tragady !" যেহেতু ট্র্যাজেডি serious imitation সেখানে—"within the action there must be nothing irrational"। মোটকথা এরিষ্টটল এই কথাই ব'লতে চেয়েছিলেন যে দু'টো কারণে ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডিত্ব-হানি ঘটতে পারে—এক, অনুপযুক্ত ভাবের উদ্দীপনা দুই,—অনুচিত ঘটনার সন্নিবেশ। বাস্তবিকই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য এমন একটি ভাবের উদ্রেক করা—যার আস্বাদনের জন্য চিত্তের বিশেষ মনোভঙ্গী বা ভাবশুদ্ধি থাকা চাই—বিষয়বস্তু গ্রহণে ঐকান্তিক আন্তরিকতা এবং ঘটনার প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর গুরুত্ববোধ থাকা চাই। প্রকৃত শোচনার উদ্রেক দর্শকচিত্তের আন্তরিক সহানুভূতি ও গুরুত্ববোধের মাত্রার উপরে নির্ভর করে বলেই যা আন্তরিকতার লাঘব করে, গুরুত্ববোধের হানি ঘটায়, তা' ট্র্যাজেডির পরিপন্থী ব'লেই গণ্য হয়ে থাকে। অতএব সার্থক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি কর'তে হ'লে—এমন একটি বাস্তবকল্প ঘটনা বা সংকট উপস্থাপিত করতে হবে যা'কে মানুষ ঐকান্তিক আগ্রহে এবং একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে এবং এমনভাবে তাকে উপস্থাপিত করতে হ'বে যা'তে ঘটনার বাস্তবতা তথা গুরুত্ব কোন রকমে ব্যাহত না হয়। সংকটের বাস্তবতা অকৃত্রিমতা এবং গভীরতা যেখানে থাকে না সংকট সেখানে অনিবার্য এবং অপরিহার্য রূপে দেখা, দেয় না, সেখানেই ঘটনার আপাতগুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও নাটক ট্র্যাজেডি-ধর্ম হারিয়ে ফেলে ; কারণ নাটকে জীবন-সংকট, তীব্র দুঃখদ্বন্দ্ব এবং শোচনীয় পরিণতি তথা গভীর জীবন সমালোচনা দেখানোর অভিপ্রায় ঘটনা-চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়—নাটকের আপাতগুরুত্ব.লঘু ঘটনা-রসে পর্যবসিত হ'য়ে যায়। একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ট্র্যাজেডি মেলো ড্রামার পংক্তিতে নেমে যায়। আবার যেখানে প্রকৃত কোন সংকটকে নাট্যকার

বাস্তবিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ঘটনার কার্যকারণনিয়ম সম্মত বিন্যাসের সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারেন না—চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক আচরণের মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না, সেখানেও নাটকের হেয় বা লঘু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তা দেয় এই কারণেই যে অস্বাভাবিক ঘটনা বা আচরণে মন বিমুখ হতে থাকে এবং বিমুখ হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত সমগ্র কার্যের বা সংকটের গুরুত্বে সন্দিহান হয়ে পড়ে। যেখানে এই সব অস্বাভাবিক ঘটনায় বা আচরণের আধিক্যে দর্শকমনের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা, সংকট-ঔৎসুক্য, এক কথায় গুরুভঙ্গিমা নষ্ট হয়ে যায় সেখানেও নাটক ট্র্যাজেডি-ধর্ম হারিয়ে ফেলে। সুতরাং নাটক ট্র্যাজেডি হয়েছে অথবা মেলোড্রামায় পর্যবসিত হ'য়েছে—এ বিচার করার একমাত্র এবং শেষ উপায় নাটকে যে জীবন সমালোচনা করা হয়েছে তার আন্তরিকতা স্বাভাবিকতা ও গভীরতার মাত্রা পরিমাপ করা অর্থাৎ—যে জীবনের ট্র্যাজেডি দেখানো উদ্দেশ্য হয়েছে তার misfortune" দর্শকচিত্তে কতখানি গুরু মনোভঙ্গী সৃষ্টি করতে পেরেছে তার হিসাব করা। যেখানে সংকটের অবাস্তবতায় দ্বন্দ্বের ও দুঃখদুর্ভোগের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় অথবা অবাস্তবতায় দ্বন্দ্বের ও দুঃখদুর্ভোগের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় অথবা অবাস্তবিক ঘটনার ও আচরণের লঘুতায় জীবন-সমালোচনার আন্তরিকতা ও গভীরতা মারাত্মক রকমে ক্ষুণ্ণ হয়, সে খানেই নাটক ট্র্যাজেডির অকৃত্রিম গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য হারিয়ে মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়। মেলোড্রামা ও ট্র্যাজেডির সম্পর্ক নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই এ কথা বলেছেন যে মোলাড্রামার লক্ষ্য—অগভীর, আকস্মিক ও চমকপ্রদ ঘটনার আবেদনে চিত্তকে উত্তেজিত ও কৌতূহলী ক'রে রাখা—"mere insistence on incident"—শুধু ঘটনার চমক ও বৈচিত্র্য দিয়ে দর্শকের মন ভোলাবার চেষ্টা করা। আর (ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য—জীবনের সংকট ও শোচনীয় দুঃখদুর্ভোগের অকৃত্রিম ও সুগভীর রূপকে ব্যক্ত করা—ঘটনাকে লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার না করে, জীবনাবেগ উপস্থাপনার উপায় হিসাবে প্রয়োগ করা। একে—জীবনকে উপলক্ষ্য

ক'রে ঘটনার চমৎকারিত্ব দেখানো, অন্যে—ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে জীবনরহস্যের ভাগ্যবিপর্যয় ও দুঃখ দুর্ভোগের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা। মেলোড্রামায় ঘটনা নিজেকে দেখায়, ট্র্যাজেডিতে ঘটনা জীবনরহস্যের উপরে আলোকপাত করে—সত্তার গভীর সংকট এবং শোচনীয় বিপত্তি পরিণতিকে দেখায়। এখানেই দুয়ের মৌলিক পার্থক্য। এই মৌলিক পার্থক্যের স্বরূপটি বুঝতে না পারলে ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা এবং মেলোড্রামাকে ট্র্যাজেডি ব'লে ভুল করার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ সমালোচকদের সতর্ক করার জন্য জানিয়ে রেখেছেন—মেলোড্রামাসুলভ ঘটনা থাকলেই নাটককে মেলোড্রামা বলতে হবে অথবা ট্র্যাজেডি লেখার চেষ্টা সার্থক না হলেই যে তা' মেলোড্রামায় পর্যবসিত হবে—এমন কোন কথা নেই। তাঁরা বলতে চেয়েছেন এই যে মেলোড্রামার মতো চমকপ্রদ বা আকস্মিক ঘটনা সত্ত্বেও যেখানে সংকটের বাস্তবতা তথা গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, জীবনরহস্যান্বেষণের ঐকান্তিকতা এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের দুঃখযন্ত্রণাকে ও পরিণতিকে অকৃত্রিম আলোকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা অধ্যাপক নিকলের ভাষায় 'inwardness and universality' থাকবে, সেখানে নাটক ট্র্যাজেডির মর্যাদাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। লঘুত্বজনক এবং গুরুত্বজনক উপাদানের কাটাকাটির ফলে—যেখানে লঘুত্বজনক উপাদান অর্থাৎ লঘুত্ববোধ প্রাধান্য লাভ করে সেখানেই নাটক মেলোড্রামা আর যেখানে গুরুত্ববোধ প্রাধান্যলাভ করে সেখানে নাটক ট্র্যাজেডিই। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে নাট্যকার যেখানে ঐকান্তিক আন্তরিকতায় জীবনের শোচনীয় সংকট এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের (unmerited misfortune) বেদনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন, যেখানে ঘটনা চমৎকারিত্বকে ছাপিয়ে জীবনবেগের অকৃত্রিমতা ও করুণ পরিণতির কথা বড় হয়ে উঠে, যেখানে ঘটনা 'এহ বাহ্য' হয়—আগে মনে ভাসে সংকটের তীব্র আবর্তের রূপ, অন্তর্দাহের মর্মান্তিক যন্ত্রণার ছবি, মনে জাগে পরিণতির জন্য আন্তরিক শোচনা সেখানে নাটককে ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না। ট্র্যাজেডিতে চমকপ্রদ আকস্মিক এবং অকারণ ঘটনাকে

অবশ্যই দোষ বলতে হবে। কিন্তু এ দোষ অঙ্গ-দোষের মত সেই পর্যন্তই উপেক্ষণীয়, যে পর্যন্ত তা প্রাণান্তক না হয়—ট্র্যাজেডির আত্মাকে হনন না করে। এখানেই সমালোচকের অগ্নিপরীক্ষা। দোষ কোথায় এবং কতখানি আত্মাকে স্পর্শ করেছে, কোথায় তা আঙ্গিক খুঁত মাত্র হয়েছে—এই বিচারে যিনি যত নিখুঁত পরিমাপ করতে পারেন, তিনি তত বড় সমালোচক। তিনিই বুঝতে পারেন কোথায় মেলোড্রামাসুলভ ঘটনা থাকলেও নাটকের মেলোড্রামা বলা হবে না—কোথায় গুরুত্ব (সিরিয়াসনেস) অকৃত্রিম এবং কোথায় তা কৃত্রিম।

আগেই বলেছি, কৃত্রিম গুরুত্ব, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা থেকে অথবা যথার্থ সংকটকে অবাস্তবিক রূপের মধ্যে অঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা থেকে জন্ম নিতে পারে। যেখানে সংকটেরই কৃত্রিমতা সেখানে লঘুত্ব বিষয়েরই মধ্যে অর্থাৎ আত্মার মধ্যেই নিহিত—যেখানে উপস্থাপনার কৃত্রিমতা সেখানে লঘুত্ব অঙ্গজনিত। যেখানে সংকট স্বভাবে কৃত্রিম, সেখানে নাটকে—'mere insistence on incidents' অনিবার্যভাবেই আসে, আর যেখানে সংকটের ধ্যান অস্পষ্ট, যেখানে সংকটের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রূপ অপরিচ্ছন্ন, সেখানে ঘটনার ক্রম অন্বয় ও বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। এই ঘটনার ক্রম অন্বয় ও বাস্তবতা যেখানে আপত্তিকর অর্থাৎ বিরক্তিজনক মাত্রায় ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে নাটক মেলোড্রামার স্তরে নেমে যায়। তাই অধ্যাপক নিকল যেখানে মেলোড্রামার লক্ষণ নির্দেশ করতে যেয়ে—"mere insistence on incidents'-এর উপরে জোর দিয়েছেন, সেখানে Lajos Egri তাঁর 'The Art of Dramatic writing' গ্রন্থে মেলোড্রামার ও ড্রামার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—"In a melodrama the transition is faulty or entirely lacking. Conflict is over emphasized. The characters move with lightning speed from one emotional peak to another—the result of their one dimensionality. The lack of transition produces melodrama.

একদিকে সংকটের বা দ্বন্দ্বের কৃত্রিমতা অন্যদিকে উপস্থাপনার মারাত্মক অবাস্তবিকতা—নাটককে মেলোড্রামায় পরিণত করে।

এবার—গোড়ার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাক এবং তা' করার আগে প্রশ্নগুলিকে চোখের সামনে সাজিয়ে রাখা যাক।

(ক) প্রফুল্ল রসোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না?

(খ) প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি না হয়ে মেলোড্রামা হয়েছে কি না?

(গ) প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি না বলে প্যাথেটিক বা করুণরসাত্মক নাটক বলা হবে কি না?

প্রথমতঃ, বিচার করে দেখা যাক—প্রফুল্ল রসোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গেলে হিসাব করে দেখতে হবে যে প্রফুল্ল নাটক পড়ার বা দেখার পরে পাঠকের বা দর্শকের মনে প্রফুল্ল চরিত্রের পরিণাম বা যোগেশ চরিত্রের calamity and suffering দেখে 'unmerited misfortune বোধ তথা শোচনা জাগে কি না; দেখতে হবে—প্রফুল্লের জীবনে যে অবস্থায় এবং যে ভাবে শেষ হয়েছে তা' ট্র্যাজেডি সংবিদ উদ্রেক করার উপযুক্ত কিনা, এবং যোগেশের জীবনে যে বিপত্তি দেখা দিয়েছে যোগেশ যে আঘাত ও যাতনা পেয়েছে যেভাবে এবং যতখানি আত্মহারা এবং আসাড় হয়েছে তা' ট্র্যাজেডিবোধ জাগাতে সমর্থ কি না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে ঘটনাগুলি তেমনভাবে ঘটছে কিনা যেমনভাবে ঘটলে ট্র্যাজেডি-সংবিদের ধারণাত্মক এবং আবেগাত্মক উভয় দিকই অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ দেখতে হবে—ঘটনাগুলি স্বরূপতঃ ট্র্যাজেডি-বোধের উদ্‌বোধক কি না এবং যেভাবে তারা ঘটেছে তা ঐ বোধের উদ্দীপক হতে পারে কি না।

এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রফুল্ল নাটক একটি সুখী পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের অর্থাৎ 'misfortune'-এর কাহিনী, যোগেশের ভাষায় বললে—সাজানো বাগানের শুকিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। এ কথাও বাহুল্য যে এই নাটকে একাধিক চরিত্রের ভাগ্যে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপত্তি ঘটেছে—বিশেষ করে প্রফুল্ল, যোগেশ

এবং জ্ঞানদার ভাগ্যে। এইটুকু বুঝতে বা স্বীকার করতে কারো কোন কষ্ট হয় না, কারণ এটুকু খুবই স্পষ্ট। সুতরাং প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি বলার কুণ্ঠা যদি আসে তা আসতে পারে এই কথা মনে করার ফলেই যে এই নাটকে একটি সুখী পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে—প্রফুল্ল বা যোগেশের জীবনে যে বিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশা ঘটেছে—তা যথেষ্ট মাত্রায় "শোচনীয়" হয়নি অর্থাৎ ভাগ্যবিপর্যয়কে এমন এমন ঘটনার সাহায্যে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে দুঃখ-দুর্ভোগ-যন্ত্রণা'র গুরুত্ব তথা শোচনীয়ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে—কুণ্ঠা অমূলক কি সমূলক এই প্রশ্নটির মীমাংসার উপরে। প্রথমতঃ প্রফুল্লকে আমরা সাজানো বাগানের শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি হিসাবে বিচার করে দেখতে পারি। নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকার অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে কতকগুলি স্পষ্টরেখার সাহায্যে সাজানো বাগানের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। মা'কে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যোগেশ সম্পত্তি চিহ্নিত করতে যেয়ে নিজের অক্লান্ত সাধনার এবং পারিবারিক সমৃদ্ধির ও সুখের যে সুন্দর একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে নাট্যকারেরও 'exposition'-ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। এই ক্ষমতাকেই নাট্য-শাস্ত্রকাররা বলেছেন "dramatization of information"—সংবাদকে ক্রিয়াসাৎ করে তোলার, চরিত্রের স্বাভাবিক আচরণের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা। যোগেশের সম্পত্তি চিহ্নিত করণের ভিতর থেকে যে সব তথ্য উৎক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে আমরা জানতে পারি—যোগেশ অতি দীন-দরিদ্র অবস্থা থেকে শ্রম ও সততাগুণে নিজের সৌভাগ্য গড়ে তুলেছেন—প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—মা, দুই ভাই, স্ত্রী-পুত্র এবং ভ্রাতৃ-বধূ নিয়ে সুখে দিনযাপন করছেন। আরো জানা যায় যোগেশ শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার পরে মা ও দুই ভাইকে নিয়ে বস্তির এক কুঁড়ে ঘর ভাড়া করে বাস করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের এবং সৎভাবের দ্বারা ব্যবসায়ে

ধন ও সুনাম অর্জন করেন—দুই ভাইকে মানুষ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—রমেশকে উকিল করেছেন, সুরেশকে মানুষ করতে পারেন নি। এই ভাবে যোগেশ এক সুখী পরিবারের উপযুক্ত কর্তা ও কেন্দ্রীয়পুরুষ।

কিন্তু এই সুখী পরিবারের (সাজানো বাগানেরও) জীয়নকাঠি নিহিত ছিল রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাগারে। রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় পারিবারিক সৌভাগ্য চরম সংকটের সম্মুখীন হল। পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে গেলে যোগেশকে আবার ফতুর হয়ে যেতে হবে—পাওনা না মেটালে সততা ও সুনাম হারিয়ে মনুষ্যধর্মের দিক দিয়ে দেউলে হতে হবে। যোগেশের জীবনে মহাসংকট উপস্থিত হলো। যোগেশ অস্থির হলেও সততা ও সুনাম রক্ষার সংকল্পে স্থির থাকলেন—সব কিছু বিক্রয় করে পাওনাদারদের দায় মেটাবার সংকল্প করলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আর একদিক থেকে আরো এক বড় বিপদ দেখা দিল। মেজো ভাই-রমেশ উকিল; তার কাছে সততা সুনামের চেয়ে সম্পত্তি অধিক কাম্য। যোগেশের স্থির সাধু সংকল্পের গ্রাস থেকে ধনসম্পত্তি বাঁচাবার জন্য রমেশের উকিল মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে উঠল। তার কু-প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যোগেশের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্য রমেশ বদ্ধপরিকর হল এবং অন্যায়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

যোগেশের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগে রমেশ যোগেশের সই চুরি করে সমস্ত সম্পত্তি বেনামী অর্থাৎ আত্মসাৎ করল। যোগেশ বুঝতে পারলেন—সংসারে সকলেই বিষয় চায়, তাঁকে কেউ চায় না। যোগেশের জোচ্চোর নাম রটে গেল—যোগেশের অন্তরাত্মার অপমৃত্যু ঘটল। রমেশ অধিকার কায়েম করবার জন্য সুরেশকে জেলে পাঠাল এবং যোগেশকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করল। যোগেশের বিপত্তি ও দুঃখযন্ত্রণা ষোলকলায় পূর্ণ হল—অন্তরে বাহিরে যোগেশ রিক্ত হয়ে গেলেন। স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে যোগেশ আবার এক বস্তির কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিলেন। অন্তরে মর্মান্তিক

দাহ—জোচ্চোর নামের বৃশ্চিক দংশন—ক্রমবর্দ্ধমান অসাড়তা—বাইরে দুঃসহ অভাবের তাড়না ও পীড়ন। এত করেও রমেশ ক্ষান্ত হল না। নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য পাপের শেষ ধাপে নেমে গেল—যোগেশের একমাত্র পুত্র যাদবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। যোগেশের অসাড়তার সুযোগে যাদবকে হস্তগত করে বিষ প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করল। রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে যাদবকে রক্ষা করল—শেষ পর্য্যন্ত রমেশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মানুষ-যোগেশের প্রেত-মূর্ত্তি শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগানের দিকে চেয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে প্রফুল্ল নাটকে প্রফুল্লের বা যোগেশের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি যাই হোক না কেন একটি সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি যে ফুটে উঠেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না যে সৎ ও [illegible] যোগেশের সুখী পরিবারটি সঙ্কটের আবর্ত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে শোচনীয় পরিণামের অতলে তলিয়ে গেছে। রমেশ যোগেশকে জীবন্মৃত করেছে, মাকে পাগল করেছে, জ্ঞানদাকে অনাহারে মেরেছে, প্রফুল্লকে গলা টিপে হত্যা করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজে কারাগারে গিয়েছে শিশু ও নারী হত্যার দায়ে। পরিবারটি যে মৃত্যু বা অপমৃত্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—এ-বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহই নেই তেমনি যে পরিস্থিতিতে ঐ মৃত্যুর বা অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার বাস্তবতা সম্বন্ধেও মনে তেমন রসভঙ্গকারী প্রশ্ন জাগে না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রফুল্ল নাটকে যে-সব 'calamity and suffering'-এর ঘটনা দেখানো হয়েছে—তাহার সামগ্রিক ফল—'fear and pity'। এই হিসাবে প্রফুল্ল একখানি যথার্থ পারিবারিক ট্র্যাজেডি।

এখানেই এবং এখনই প্রশ্ন উঠবে যে পারিবারিক ট্র্যাজেডি হলেও নামকরণের ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাটকখানিকে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি হিসাবে গণ্য করা চলে না কি? প্রফুল্লকে—'she-tragedy' বলা যায় না কি?

একথা স্বীকার করতেই হবে যে নাট্যকারের মনে 'প্রফুল্ল' যে-কো কারণেই হোক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং সেই কারণেই তিনি নাটকখানির নাম রেখেছিলেন 'প্রফুল্ল"। কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডির আদর্শ বা 'সরলা'র অভিনয় সাফল্যের প্রেরণা—যাহাই প্রেরণা হিসাবে কাজ করুক, এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে গিরিশচন্দ্র প্রথমতঃ নিরপরাধ বালিকা-বধূর (প্রফুল্লের) নিরুপায় আত্মদানের ট্র্যাজেডিকেই বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তদানীন্তন পারিবারিক পরিবেশ একটি সরলা বালিকাবধূর ট্র্যাজেডি স্থাপনা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তাতে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙন পটভূমি স্বরূপে অত্যাবশ্যক ছিল। এই যৌথ পরিবারের ভাঙন দেখানোর তথা প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য নাট্যকার যোগেশের ট্র্যাজেডি দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে root-action বা পরিস্থিতি দ্বারা নাট্যকার প্রফুল্লের ট্র্যাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন তাহা তৈরি করতে যোগেশের ঐরূপ মানসিক পক্ষাঘাত অপেক্ষিত, একটু বিশ্লেষণ করলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

সকলেই জানেন যাদবকে কেন্দ্র করেই ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি। যে যাদবকে শয়তান মামীর হাত থেকে রক্ষা করতে এসেই প্রফুল্লকে ঐভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেই যাদবকে রমেশের হস্তগত করাতে হলে যোগেশকে এমন এক অসাড় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া দরকার যে-অবস্থার সুযোগে যাদবকে ভুলিয়ে বা চুরি করে নিয়ে যাওয়া সহজ বা সম্ভব। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই নাট্যকার যোগেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা করে যোগেশের আর্থিক এবং মানসিক অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখিয়েছেন—যোগেশকে ঘর থেকে পথে নামিয়ে এনেছেন, যোগেশের মনটিকে অসাড় করে তুলেছেন এবং সেই পরিস্থিতির পটভূমিতে প্রফুল্লের শোচনীয় পরিণতিকে স্থাপনা করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রফুল্লের যে-পরিণতি আমরা দেখি তাহা অবশ্যই শোচনীয়। আমরা দেখি স্বামীকে জঘন্য দুষ্কার্য্য থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে স্বামীর হাতেই সরল-প্রাণা বালিকাবধূর মৃত্যু ঘটেছে; রমেশ সরলপ্রাণা বালিকা প্রফুল্লকে গলা টিপে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। মহাপ্রাণা সরলা বালিকার এই আত্মদান বাস্তবিকই মহনীয় ও শোচনীয়। প্রফুল্ল বয়সে, বুদ্ধিতে এবং অধিকারে যত ক্ষুদ্রই হোক স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-প্রীতির নিষ্ঠায় সে অনেক বড়। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও সে মূল্য রক্ষা করেছে, প্রাণপণে ধর্ম্মের বিপর্যায়কে রোধ করবার চেষ্টা করেছে. স্নেহ-প্রেম-ভক্তি—প্রীতি ভিত্তিক যৌথ পরিবার—আদর্শের প্রতিনিধি যোগেশের বংশ (যাদবকে) রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে প্রফুল্ল নাটককে প্রফুল্লেরই ট্র্যাজেডি—"She Tragedy" বলে গণ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য যাই থাক, পতিভিখারী যোগেশের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের এবং দুঃখ-দুর্গতির কাহিনী এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে যোগেশের ট্র্যাজেডিই—সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডিই—দর্শকচিত্তে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে প্রফুল্লের কেন্দ্রীয়ত্ব যোগেশের আধিপত্য দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে—নাটকখানি যোগেশের ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই নামকরণের যাথার্থ্য নিয়ে অনেক কথা উঠেছে এবং সমস্যার সমাধানের জন্য নানা সমালোচক নানা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রফুল্ল নাটকে কেন যোগেশের এত প্রাধান্য ঘটেছে একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে। কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি মুখ্য উপস্থাপ্য হলেও, ভীমসিংহের ট্র্যাজেডি যে-কারণে কৃষ্ণার ট্র্যাজেডিকে ছাপিয়ে উঠেছে এখানেও সেই একই কারণে পুরুষপ্রধান-পরিবারের মধ্যে কন্যার বা বালিকাবধূর ব্যক্তিত্ব সেই একই কারণ—পুরুষপ্রধান-পরিবারের মধ্যে কন্যার বা বালিকাবধূর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশ খুব অল্প বলেই, যোগেশ পরিবারের কেন্দ্র বলেই, নাট্যকারের অজ্ঞাতসারেই যোগেশের ট্র্যাজেডি 'প্রফুল্লের' ট্র্যাজেডিকে

আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। যতখানি সতর্কতা থাকলে কেন্দ্রীয় চরিত্র কেন্দ্রে রাখা সম্ভব ততখানি সতর্কতা নাট্যকার এখানে রাখতে পারেননি বা রাখলেও নেতৃচরিত্রকে বহুপ্রত্যক্ষ করে দর্শকমনে বিশিষ্ট আসনে বসিয়ে দিতে পারেননি। যোগেশের সহজ প্রাধান্যকে চেপে দিতে হলে প্রফুল্লের ব্যক্তিত্বকে যতখানি প্রধান করে তোলা দরকার প্রফুল্লের বালিকাবধূর স্বাধীন সত্তার মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে নাট্যকার ততখানি প্রধান করে তুলতে পারেননি। ফলে যোগেশের ট্র্যাজেডিই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য ট্র্যাজেডি-বৃত্তের একাংশে প্রফুল্লের মুখখানিও স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয় নাই এমন নয়।

যোগেশের এই প্রাধান্য নাটকের ট্র্যাজেডিত্বকে ক্ষুণ্ণ না করলেও নামকরণ বিষয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 'জুলিয়াস সীজার' নাটককে ব্রুটাসের ট্র্যাজেডি বলা এবং প্রফুল্লকে যোগেশের ট্র্যাজেডি বলা প্রায় একই রকম অসঙ্গত ব্যাপার—অন্ততঃ নাট্যকারের সাধ ও সাধ্যের বৈষম্যের প্রতি যে কটাক্ষ করা এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নাট্যকারের সাধ যেখানে জুলিয়াস সীজারের ট্র্যাজেডি উপস্থাপনা করা যেখানে সীজারের প্রতিপক্ষ ব্রুটাসের ট্র্যাজেডি প্রাধান্য লাভ করলে নাট্যকারের সাধ্যের প্রতি অনাস্থা জাগা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য তবে এক্ষেত্রে একটি 'কিন্তু' রয়েছে। এই কিন্তুটি এই যে প্রফুল্ল এবং যোগেশ পরস্পর ভিন্নগোত্রীয় নয় তাহারা একই মূল্যের উপাসক এবং দুই জনেরই অন্তরাত্মা একই ধাতুতে গঠিত। দুই জনেরই কামনা—মানবিক মূল্য সুরক্ষিত হোক—অকৃত্রিম স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-প্রীতির ভিত্তির উপর সংসার সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। যে-মূল্য হারিয়ে বা যে-মূল্যকে নষ্ট হতে দেখে যোগেশের ট্র্যাজেডি, সেই মূল্যকে বাঁচাতে গিয়ে, সেই নষ্ট মূল্যকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি। অতএব যোগেশের ট্র্যাজেডির সঙ্গে—'সাজানো বাগান' শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডির সঙ্গে—প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির একটি নিগূঢ় ঐক্যের যোগ আছে এবং তাহা আছে বলেই প্রফুল্লকে যৌথ পরিবারের আত্মার প্রতীক রূপে

ণ করা যেতে পারে। এই যুক্তিতে অনেকে 'প্রফুল্ল' নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে থাকেন কিন্তু চেষ্টাটি সম্পূর্ণ সফল একথা বলা চলে না।

অবশ্য যাঁরা প্রফুল্ল নাটককে প্রফুল্লেরই ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করেছেন তাঁদের মুখপাত্র রূপে অধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বসু মহাশয় বলেছেন "বস্তুতঃ আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লের আত্মবিসর্জ্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রফুল্ল'। কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাঁহার শোচনীয় পরিণাম দেখানই যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত। কাহিনীটিকে এতদূর টানিয়া আনিবার কোন সার্থকতা থাকিত না। অধিকন্তু বংশরক্ষার জন্য পাগল মদন ঘোষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত।"

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য বটে কিন্তু যোগেশের কেন্দ্রীয়ত্ব খণ্ডন করবার জন্য তিনি যে-যুক্তি দিয়েছেন তাহা সর্বতোভাবে দোষমুক্ত নয়। প্রফুল্ল-নাটককে যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি রূপে গণ্য করলে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা-বিন্যাস পর্য্যালোচনা করলে একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে নাটকের উপসংহারের সঙ্গে যোগেশের ট্র্যাজিক পরিণতির বা নায়কত্বের কোন অসঙ্গতি নেই। যোগেশের ট্র্যাজেডির রূপটি লক্ষ্য করিলেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

যোগেশের সাজানো বাগান। মা ও দুই ভাই—রমেশ ও সুরেশ, ভ্রাতৃবধূ প্রফুল্ল, স্ত্রী জ্ঞানদা ও একমাত্র সন্তান যাদবকে নিয়ে যোগেশের সুখী পরিবার নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সততার গুণে, শৈশবে পিতৃহীন ও নিঃস্ব যোগেশ আজ ধনে-মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। একাধিক বাড়ীর এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন—অন্তরে-বাহিরে পরিবারটি সুখী। আর্থিক এবং

আন্তরিক কোন দৈন্যই সেখানে নেই। যোগেশের পরিবার-বাস্তবিকই একটি সাজানো বাগান। অর্থের সঙ্গতি এই সুখী পরিবারের অন্যতম ভিত্তি বটে কিন্তু আসল ভিত্তি হৃদয়ের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিবারস্থ সকলের পারস্পরিক স্নেহ-ভক্তি-প্রীতি-প্রেমের বন্ধন। এই পরিবারের আর্থিক ঐশ্বর্য্যের প্রাণসার রি-ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে গচ্ছিত এবং আন্তরিক ঐশ্বর্য্য নিহিত ভ্রাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম সম্পর্কের মধ্যে। রি-ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক 'ফেল' হওয়ায় পরিবারটির আর্থিক ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগল—যোগেশ সর্ব্বস্বান্ত হলেন। পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করতে গেলে বাড়ী-ঘর সব কিছু বিক্রয় করতে হবে। পরিশোধ না করলে সুনাম ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যোগেশ এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখে পড়িলেন। কিন্তু যোগেশ যে-নৈতিক ধাতুতে গঠিত তাঁর কাছে সেই সুনাম হারানোর ক্ষতিই সব ক্ষতির চেয়ে সাংঘাতিক। যোগেশ সঙ্কল্প করলেন সব কিছু বিক্রয় করে পাওনাদারদের দেনা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে আবার নিঃস্ব হতে হবে। যোগেশের জীবনে সে এক দারুণ বিপত্তিই বটে। কিন্তু যোগেশ অর্থের বিনিময়ে অন্তরের ধন বিকিয়ে দিতে চাইলেন না।

কিন্তু এই দুর্বিপাকের সুযোগে লোভী রমেশের মনে যে-কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠল তার কুটিল ও বিষাক্ত আক্রমণ যোগেশের সুখী পরিবারের পক্ষে দারুণতর বিপত্তি হয়ে দেখা দিল। যে-সততার উপরে যোগেশের জীবন এবং যে-অকৃত্রিম হৃদয় সম্পর্কের উপরে সমগ্র পরিবারটি স্থাপিত, রমেশের কুপ্রবৃত্তির বিষাক্ত দংশনে সেই সততার এবং হৃদয় সম্পর্কের অপঘাত মৃত্যু ঘটল।

রমেশের মনে সম্পত্তিলোভ এত প্রবল হয়ে উঠল যে সে যোগেশের দিকে একবারও চাইল না, যোগেশকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিতে ইতস্ততঃ করল না। যোগেশকে পরোক্ষভাবে 'জোচ্চোর' অপবাদ তথা দারুণতম আঘাত দিল, তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগে নাম সই করিয়ে নিয়ে জোচ্চোর অপবাদ পাকা করে রটিয়ে দিল এবং ছলনার দ্বারা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নিজের কুক্ষিগত করল।

যোগেশের পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটি সরে গেল—অন্তরে-বাহিরে যোগেশ নিঃস্ব হলেন। রমেশের হাতের মর্মান্তিক আঘাতের এবং সুনাম হারানোর জ্বালা জুড়াবার জন্য যোগেশ আত্মবিস্মৃতির উপায় খুঁজতে লাগলেন, মদের জ্বালা দিয়ে মর্মদাহের জ্বালা প্রশমন করতে চেষ্টা করলেন। শয়তান রমেশ মুখোস খুলে ফেলল। মাতাল অপবাদ দিয়ে রমেশ যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল—যোগেশ পথে এসে দাঁড়ালেন। রাজপথের ভিখারী হলেন। অন্তরে যত জ্বালা বাড়তে লাগল তত তিনি নেশার মাত্রা বাড়াতে থাকলেন এবং তত অসাড় বা অন্য মানুষ হতে থাকলেন। স্পর্শকাতরচিত্ত যোগেশের বেদনা-বক্ষ প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, বিস্মরণী প্রলাপের সমস্ত রূপ ভেদ করে অন্তরের অন্তস্তল স্তর থেকে মাঝে মাঝে আর্তনাদ জাগে—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"। প্রেমময়ী স্ত্রী জ্ঞানদা তাঁরই চোখের সামনে পথে পড়ে মরল। একমাত্র পুত্র যাদব পথের ভিক্ষুক বালক। যোগেশ এখন যোগেশের প্রেত মাত্র। অন্যদিকে রমেশের শয়তানি সম্পত্তি আত্মসাৎ করেই ক্ষান্ত হল না, নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য যাদবকে সে বিষ খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করল। রমেশের হাত থেকে যাদবকে বাঁচাতে গিয়ে নরপিশাচ রমেশের হাতে প্রফুল্ল প্রাণ দিল। রমেশকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। যোগেশ দাঁড়িয়ে তা দেখলেন—একভাঙ্গা আর্তনাদ করলেন—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

যোগেশের সাজানো বাগান এইভাবে বিচ্ছেদ, মৃত্যু, হত্যা ও অপমৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকিয়ে গেল। জ্ঞানদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাজানো বাগান সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি—প্রফুল্লের মৃত্যু এবং রমেশের বিপত্তি-কর পরিণতির পরেই বাগানটি নির্মূল হয়ে গেছে। রমেশ ও যোগেশের সাজানো বাগানের অন্যতম অঙ্গ, একথা বলে গেলে চলবে না এবং তাহা চলবে না বলেই একথাও বলা ঠিক হবে না—কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাঁহার শোচনীয় পরিণাম দেখানই যদি নাট্যকারের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে

জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত”। আগেই বলা হয়েছে যোগেশের অন্তর্দাহ বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যাবে—(১) ভাইয়ের হাতের মর্ম্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা, (২) সুনাম হারানোর জ্বালা, (৩) সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বেদনা। সুতরাং যোগেশের ট্র্যাজেডি একাধিক দাহের সংযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ একাধারে তাহা অতি-প্রিয়তম আত্মীয়ের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, আঘাত পাওয়ার ট্র্যাজেডি, অন্তরাত্মার অপমৃত্যু ঘটায়, আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আশ্রয় খোঁজার ট্র্যাজেডি এবং নিজের চোখের সামনে নিজের হাতে সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে দেখার ট্র্যাজেডি। অতএব, এক হিসাবে যেমন বলা যায় প্রফুল্লের শোচনীয় মৃত্যুতে নাটকখানি শেষ হয়েছে তেমনি একথাও বলা যায় যে যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার পরেই নাটকখানি শেষ হয়েছে।

প্রফুল্ল নাটককে প্রফুল্লের বা যোগেশের বা প্রফুল্ল ও যোগেশের উভয়েরই ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডিই বলা হোক নাটকখানি বাস্তবিকই ট্র্যাজেডির মর্য্যাদালাভ করেছে কি না সেই বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সমালোচকদের কেহ কেহ প্রফুল্লকে 'ট্র্যাজেডি'—মর্ম্মভেদী ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করেছেন। কেহ কেহ ট্র্যাজেডি বলেছেন বটে কিন্তু প্রথমশ্রেণীর ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করেননি। কেহ কেহ একই নিঃশ্বাসে ট্র্যাজেডি, প্যাথেটিক এবং মেলোড্রামা এই তিন শ্রেণীতেই প্রফুল্লকে স্থান দিয়েছেন। কেহ কেহ প্যাথেটিক, কেহ কেহ মেলোড্রামা বলেছেন এবং কেহ কেহ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলেও যোগেশ-চরিত্রে ট্র্যাজেডি নায়কের উপযুক্ত লক্ষণ এবং ঘটনার পিছনে বিশ্বাস্য কারণ দেখতে পাননি এবং নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি না বলার দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন। নানা মুনির নানা মতের কণ্টকে স্থির সিদ্ধান্তের পথ কণ্টকিত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কণ্টকরাজি উৎপাটিত করতে হলে ট্র্যাজেডি ও প্যাথেটিক ড্রামার এবং ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নিপুণভাবে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক এবং ট্র্যাজেডির ও ট্র্যাজেডি-নায়কের লক্ষণ

সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা দরকার। এ-বিষয়ে গোড়াতেই আমি আলোচনা করেছি। এখানে সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করে মীমাংসা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, প্যাথেটিক ড্রামা ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য সম্বন্ধে যে-আলোচনা করা হয়েছে তাহাতে দেখানো হয়েছে—'pathos' থাকলেই নাটক ট্র্যাজেডি হতে পারবে না এমন কথা কোনও নাট্যবিদই বলেননি।

একথা ঠিক যে 'high' tragedy-তে pity বা pathos কি পরিমাণে থাকতে পারে বা না পারে তাহা নিয়ে অধ্যাপক নিকল একটি প্রশ্ন তুলেছেন বটে, কিন্তু একথাও ঠিক যে প্রশ্নটি হয়েছে হাই ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গেই এবং সব ট্র্যাজেডিই 'হাই ট্র্যাজেডি' নয়। তারপর ট্র্যাজেডিতে 'পেথোস' থাকলেই নাটককে প্যাথেটিক ড্রামা বলতে হবে—'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি' পর্য্যন্ত বলা হবে না একথা যুক্তিযুক্ত নয়।

ট্র্যাজেডির রস বিচার প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে যে ট্র্যাজেডির 'অঙ্গীরস' করুণ—অর্থাৎ fear or pity জাগানোই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য এবং ট্র্যাজেডি এমন ঘটনার উপস্থাপনা করবে যাহা দেখে দর্শক—এ্যারিস্টটলের ভাষায় 'tremble with horror and melt to pity।' সুতরাং শোচনার ফলে চিত্তের বিগলন ঘটলে ট্র্যাজেডি-সংবিদ নষ্ট হয়ে যাবে একথা কেহ বলেননি। প্রত্যেক আবেগই বোধমূলক। শোচনাবেগের মূলেও বোধ কাজ করে থাকে। যে misfortune দেখে দর্শকের মধ্যে এই বোধ জাগবে যে misfortuneটি 'unmerited' এবং যতক্ষণ সেই বোধ থাকবে ততক্ষণ আবেগের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও ট্র্যাজেডি-সংবিদ অক্ষুণ্ণই থাকবে।

প্রফুল্লের মত একটি সরলপ্রাণা উদারহৃদয়া প্রেমময়ী বালিকাবধূর অতি নিষ্ঠুর স্বামীর হাতে মৃত্যু—হৃদয়ের মূল্য রক্ষা করবার মহৎ প্রেরণায় আত্ম-বিসর্জ্জন আকস্মিক এবং নিরপেক্ষ কোন দুর্ঘটনামাত্র নয়। এই মৃত্যু শোচনীয় এবং শোচনীয় কতকগুলি বোধের উদ্বোধন করে বলেই। জীবের দুঃখ-কষ্ট

প্রফুল্লের মাধ্যমে দেখিয়েছেন স্নেহ ও প্রেম নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারে মৃত্যু তুমি নেই। যোগেশের মাধ্যমে দেখিয়েছেন অর্থসম্পদের চেয়েও বড় সম্পদ নৈতিক সত্তার অক্ষুন্নতা, ঐশ্বর্যের চেয়েও বড় কাম্য—অকৃত্রিম স্নেহ-ভক্তি-প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের সম্পর্ক। অর্থনাশে মানুষের ক্ষতি হয় বটে কিন্তু নৈতিক সত্তা ক্ষুণ্ণ হলে, সুনাম হারালে, মানুষের 'মহতী বিনষ্টি' ঘটে, মানুষ অন্তরে অন্তরে অপদস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মানুষ বাইরে থেকে যে-আঘাত পায় তাহা শুধু তার শারীরিক ক্লেশ সৃষ্টি করেই শেষ হয়ে যায় এবং সেই আঘাতের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা এবং তাতেই তার উপশম ঘটে। কিন্তু যেখানে আঘাতটি আসে অতি-প্রিয়জনের হাত থেকে, সেই আঘাতে মানুষের মর্মস্থানটিই বা অন্তরাত্মাই বেশী করে আহত হয় এবং প্রত্যাঘাত করার ইচ্ছাটুকু পর্যান্ত মরে গিয়ে মনের আগুনে মনকে পুড়িয়া মারে। সেই মর্মদাহের একমাত্র উপশম হয় আত্ম-বিস্মৃতিতে বা আত্মহত্যার অবলুপ্তিতে। প্রফুল্ল নাটকে নাট্যকার যোগেশের চরিত্রের মধ্যে এরূপ একটি মর্মাহত ব্যক্তির সুদুঃসহ অন্তর্দাহ, তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার ট্র্যাজেডি দেখাতে তথা মানুষের হৃদয় রহস্যের গভীরে আলোক প্রক্ষেপের চেষ্টা করেছেন।

এই চেষ্টা—অর্থাৎ 'inwardness', যেখানে আছে, সেখানে নাটককে মেলোড্রামা বলা সঙ্গত নয়। ট্র্যাজেডি-নায়কের অকৃত্রিম ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখে যে-আন্তরিক সমবেদনা জাগে এখানেও প্রফুল্লের, বিশেষতঃ যোগেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখে সেইরূপ আন্তরিক সমবেদনা বা শোচনা জাগে। যোগেশ-চরিত্রে ট্র্যাজেডি-নায়কের গুরুত্ব যথেষ্ট মাত্রায় পাওয়া যায়।

এখানেই যাঁহারা ট্র্যাজেডি-নায়কের সূত্রের সঙ্গে যোগেশের চরিত্র মেলাতে পারেননি বলে যোগেশকে ট্র্যাজেডির নায়ক বলে গ্রহণ করেননি, তাঁহাদের সমালোচনা সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলতে চাই। ইঁহাদের বক্তব্য যে (ক) যোগেশ এমন কোন কাজ বা মারাত্মক ভুল করেননি যাহাতে তাঁর ট্র্যাজেডি

অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। (খ) যোগেশের মত নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না। ইঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে আমি ট্র্যাজেডি নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোড়ায় যে-আলোচনা করেছি সেই আলোচনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই এবং তাঁহাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নায়কের দোষ-ত্রুটি বা দায়িত্ব সম্বন্ধে নাট্যতত্ত্ববিদরা যে-নূতন সিদ্ধান্ত করেছেন তাহাতে দেখা গেছে নির্দোষ ও নিষ্ক্রিয় নায়কও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে। সুতরাং পুরাতন সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যোগেশের অযোগ্যতা প্রমাণ করতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কাজ হবে না। এ-সম্পর্কে পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে-কথাটি বলেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন—"ট্র্যাজেডি ঘটার কারণ নিয়তি প্রেরিত দুর্দ্দৈব বা নায়কের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা, ঘটনা নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা—সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে না, জাগতিক বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের আরও অনেক অভিনব হেতু আবিষ্কৃত হইতে পারে। সুতরাং কারণের দিকে বেশী ঝোঁক না দিয়া নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হতে পারে। আমাদের দেখিতে হইবে যে-দিক্ দিয়াই নায়কের জীবনে দুর্দ্দৈবের অভিঘাত প্রকাশ করুক না কেন তাহার আচরণে উপযুক্ত গভীরতা ও চরিত্রের মহনীয়তার নিদর্শন স্ফূরিত হইয়াছে কি না। ...... সমস্ত দুর্ব্বিপাকের মধ্যে তাহার চরিত্রে একটা গৌরবের লুপ্তাবশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পাঠকের মনে সর্ব্বশুদ্ধ যে-ধারণাটি স্থায়ী হয় তাহাতে যোগেশ-চরিত্রে এই মহনীয়তার লক্ষণ স্থান পায়। মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া লোকের ধর্ম্ম, কিন্তু পাতালের অন্ধতম স্তরে অতল গভীরতায় অবতরণ অভিজাত চরিত্র ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ না করিয়া চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ, স্ত্রীর মৃত্যুতে ঔদাসীন্য, ছেলের হাত হইতে তাহার শেষ সম্বল একটি সিকি কাড়িয়া লওয়া, ভস্মীভূত সমস্ত জীবন হইতে উত্থিত একটি শ্বাসরোধকারী ধূম্রোচ্ছ্বাস ও

বহির্গর্ভে খেদোক্তি—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—ইহাই যোগেশের ট্র্যাজিক নায়কের উপযোগিতার চরিত্রে কৌলিন্য মর্য্যাদার নিদর্শন।

নিষ্ক্রিয়তা যখন আসে অসংবরণীয় ভাবাবেগ হইতে সমস্ত সত্তার উল্লিখিত ভাব বিপর্য্যয় হইতে তখনই ইহা প্রকৃতির একটা রাজকীয় বহির্লক্ষণ রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যথা নহে।"—[নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার—দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা।]

আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগেশের চরিত্রের ট্র্যাজিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করেছেন তাহা প্রত্যেক সমালোচকের চোখে আলোক-বর্তিকার কাজ করবে—এ নিশ্চয়ই কোন অতিশয়োক্তি নয় সর্ব্বশুদ্ধ যে-ভাবটি স্থায়ী হয় তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই সমালোচকরা আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন। উপলব্ধি করতে পারবেন—ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও যোগেশের বাহ্যিক আচরণের আপাতহীনতা সত্ত্বেও যোগেশের নৈতিক সত্তা থেকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত মানব-মহিমার উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে চরিত্রটিকে মহিমময় করে রাখে। একথা ঠিকই যে যোগেশের চরিত্র ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু একথাও স্বীকার্য্য যে যোগেশের গুণের পরিমাণ দোষের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী এবং গুণগুলির গুরুত্ব এত বেশী বলেই যোগেশের চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি থেকে যোগেশ বঞ্চিত হন না। আগেই বলা হয়েছে সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন বড় কথা নয় এবং এইজন্যই নয় যে জীবন বৃত্তে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয়েরই স্থান আছে এবং শোচনীয় পরিমাণ বা ভাগ্যবিপর্য্যয় শুধু সক্রিয়ের জীবনেই ঘটে না, নিষ্ক্রিয়ের জীবনেও শোচনীয় পরিণাম ঘটে থাকে। বিশেষতঃ যে-নিষ্ক্রিয়তার পিছনে আহত মনুষ্যত্ব-অভিমানের জ্বালা তথা মর্ম্মদাহ কারণরূপে কাজ করে যে-নিষ্ক্রিয়তা ব্যক্তির নৈতিক বা আত্মিক মূল্য রক্ষারই পরোক্ষ চেষ্টা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যে-নিষ্ক্রিয়তা ব্যক্তির স্বকৃত অপরাধের নির্জ্জা-

প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আত্মবিলোপের চেষ্টারূপে দেখা দেয়, সেই নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠতে পারে না! যোগেশের নিষ্ক্রিয়তা এই জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা, সাধারণ নিষ্ক্রিয়তা নয়!

অতএব, যোগেশ নিষ্ক্রিয়—এই কথা বলে যোগেশের নায়কযোগ্যতা খণ্ডন করা চলে না। স্বীকার করতেই হবে যে ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়ার যোগ্যতা যোগেশের আছে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি হিসাবে যোগেশ উপযুক্ত নায়ক, কারণ যোগেশ অতিভাল বা অতিমন্দ এই দুই অতিকোটিক শ্রেণীর অন্তর্গত নন। * (অতিভালও নায়ক হতে পারে।) যোগেশ ত্রুটিহীন না হলেও মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণে ভূষিত—এক কথায় যোগেশ ধনী ও মানী এবং মোটামুটি ভাল লোক। দ্বিতীয়তঃ যোগেশের চরিত্রে ট্র্যাজিক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'radical defect in his character' অথবা error or frailty' লক্ষ্য করা যায়। ট্র্যাজেডি নায়কের পতন ঘটবে চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা বা প্রবণতার জন্য অথবা কোন মারাত্মক বুদ্ধিভ্রংশের জন্য—এই প্রচলিত সূত্র অনুসারেও যোগেশ একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। যোগেশের চরিত্রে অন্তর্নিহিত বা প্রবণতা খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে—"যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা—তাঁহার সুনাম-সুযশের আকাঙ্খা" (শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)। যোগেশ যদি গণেশ-উল্টানো ব্যবসায়ী হতেন, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অর্থকরী শয়তানির ভক্ত হতেন তাহা হলে ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বললেও যোগেশের বাড়ীর এবং গদির বাতি শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠত—যোগেশের আর এক যোগেশ হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকত না। যোগেশ সম্পত্তি বেনামী করে মহাসুখেই দিন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু যোগেশ ছিলেন অতিস্নেহপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ—অতিস্নেহ ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতাই যোগেশের ট্র্যাজেডির জন্য মূলতঃ দায়ী। সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রও যোগেশের চরিত্রে সুপ্রযোজ্য।

তৃতীয়তঃ, চরিত্রের উত্থান-পতনের—বিশেষতঃ ক্রমপরিণতির—প্রশ্ন। ট্র্যাজেডি ভাগ্যপরিবর্তনের—ভাল ভাগ্য থেকে মন্দ ভাগ্যে পতিত হওয়ার এবং শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও বিপত্তি ভোগ করার কাহিনী। সুতরাং ট্র্যাজিক চরিত্রের ক্রমবিকাশ বলতে বুঝায় ভাল ভাগ্য থেকে ধাপে ধাপে শোচনীয় বিপত্তিকর পরিণামে পৌঁছানো। নায়ক সক্রিয়ই হোক আর নিষ্ক্রিয়ই হোক—ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দৃশ্য—চরিত্রের অবস্থান্তর—দেখাতেই হবে। যে-ক্ষেত্রে নায়ক সক্রিয় সেখানে নায়ক পরিবেশের বাধা অপসারিত করতে করতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিপত্তির গহ্বরের দিকে এগিয়ে যায় এবং যে-ক্ষেত্রে নায়ক নিষ্ক্রিয় সেখানে পরিবেশ নায়কের উপরে আঘাতের পর আঘাত দিতে থাকে এবং নায়ককে নিষ্ক্রিয় করে ধীরে ধীরে তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ ও অসাড় করে তোলে। দুই ক্ষেত্রেই পতনের (misfortune) ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে নায়ক নিজের কাজের দ্বারা ধাপে ধাপে পতনের শেষ ধাপের দিকে এগিয়ে যায় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নায়কের বাহ্যিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নায়কের ভিতরে প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে—নায়ক ধীরে ধীরে প্রকৃতিভ্রষ্ট হতে থাকে এবং শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। যোগেশের চরিত্র বাহ্যতঃ যত স্থিতিশীল মনে হয় ভিতরে ভিতরে তত স্থিতিশীল নয়। যোগেশের চরিত্রের ক্রমবিকাশ—একটি প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির, প্রকৃতি হারিয়ে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার ব্যাপার—একটি অতি-স্পর্শকাতরচিত্ত লোকের আঘাতে আঘাতে অসাড় হয়ে যাওয়ার ব্যাপার—এক কথায় যোগেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ব্যাপার। বলা বাহুল্য, যোগেশের বাহ্যিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ে—ঐশ্বর্য্য হারানো, বাড়ী থেকে বিতাড়িত হওয়া, বস্তিতে আশ্রয় নেওয়া, পথে পথে ভিক্ষা করা, এমনি কতকগুলি ঘটনার ক্রম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যোগেশের আসল পরিবর্তন ঘটেছে অন্তরে। প্রথম দৃশ্যের জীবন্ত যোগেশ এবং শেষ দৃশ্যের মৃতকল্প যোগেশের দিকে চাইলেই এই পরিবর্তনের ক্রম সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে ভাগ্যহত যোগেশের দেহ তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছিল একথা যত সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য এই কথাটি যোগেশের মর্ম্ম জ্বলে পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যোগেশের ক্রমবিকাশ শুধু বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নয়, মানসিক অবস্থার ক্রমপরিবর্তন-একটি সুস্থ ইচ্ছার (will) ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। অতএব, যোগেশের চরিত্রে ক্রমবিকাশের অভাব রয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে যোগেশের নায়কত্ব খণ্ডন করা চলে না। চরিত্রের বিরুদ্ধে যে-কথাটি বলা চলে তাহা:এই যে চরিত্রটিকে অতিক্রুতলয়ে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে। ✓✓

এবার দেখা যাক্ যে-সব ঘটনার সাহায্যে নাট্যকার প্রফুল্লের এবং যোগেশের ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন, সেই ঘটনাগুলি এমন অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে কি না, আমাদের বাস্তবতা বোধকে এমনভাবে নাড়া দেয় কি না, যাহাতে আমরা সমস্ত কাহিনীটিকেই কাল্পনিক বলে মনে করতে পারি। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য 'Drama lives by logic and reality'। যদি বিষয়বস্তু এবং পরিস্থিতি real না হয়, এবং ঘটনাবিন্যাসে logic না থাকে, তাহা হলে কিছুতেই সেই নাটক গুরুত্বময় সৃষ্টি বলে গৃহীত হতে পারে না। যেমন বিষয়বস্তু 'বাস্তব' হওয়া চাই, তেমনি বাস্তব পরিস্থিতি এবং ন্যায়সঙ্গত ঘটনার ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তুকে ব্যক্ত করা চাই। বাস্তবিক পরিস্থিতি এবং ন্যায়সঙ্গত ঘটনার সাহায্যে যিনি 'বস্তু' উপস্থাপিত করতে পারেন তিনিই কৃতী নাট্যকার। আর যাঁহার হাতে পরিস্থিতির বাস্তবিকতা ও ঘটনার নৈয়ায়িক সঙ্গতি যে-পরিমাণে ক্ষুন্ন হয় তিনি সেই পরিমাণে অকৃতী। বিশেষ করে ট্র্যাজেডির জন্য পরিস্থিতির বাস্তবিকতা এবং ঘটনার নৈয়ায়িক সঙ্গতি অপরিহার্য, কারণ ঔচিত্যবোধ বার বার আহত হলে মন বিরক্ত হয়ে উঠে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে শেষ পর্য্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করে।

প্রফুল্ল নাটকের বৃত্ত-পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করলেই দেখা যাবে নাট্যকার যৌথ পরিবারের ভাঙনের তথা যোগেশের ট্র্যাজেডির পটভূমিকায় প্রফুল্লের

ট্র্যাজেডি স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। আগেই এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে নাট্যকার প্রফুল্লের যে-ট্র্যাজেডি দেখাতে চেয়েছেন তাহাতে যোগেশের ট্র্যাজেডি, বিশেষ করে তাঁহার অসাড় মানসিক পরিণতি অপরিহার্য্য। নাট্যকার নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি যৌথ পরিবারটির আর্থিক বনিয়াদে আঘাত হানবার জন্য ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বালিয়েছেন—যোগেশকে এক সঙ্গে আর্থিক এবং নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন করেছেন এবং রমেশের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ঘটনাটির ঔচিত্য নিয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন করা চলে না। কারণ, তদানীন্তন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক ফেল হওযা অসম্ভব কোন ঘটনা ছিল না। তারপর একথাও স্বীকার্য্য যে ঘটনাটি যোগেশের পক্ষে সাংঘাতিক একটি আঘাত যাহা তাঁহাকে স্বাভাবিকভাবেই অপ্রকৃতিস্থ করতে পারে। কিন্তু এই আঘাতের চেয়েও বড আঘাত আসে রমেশের হাত থেকে। রমেশ যোগেশের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগে যোগেশকে দিযে সই করিয়ে নিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার ষড়যন্ত্র করে—যোগেশকে 'জোচ্চোরে' পরিণত করে। এইটি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যই নাট্যকার প্রথমে রমেশের চক্রান্তে যোগেশকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছেন—মর্টগেজে সই করাবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য একটি পরিস্থিতি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছেন। মনে রাখতে হবে মর্টগেজে 'সই' দেওয়াতে না পারলে নাট্যকার যোগেশকে ধনে-প্রাণে মারতে পারেন না। মর্টগেজে সই যোগেশের নিজের মৃত্যু পরোয়ানার সই। 'সই'টি একদিকে যোগেশকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, অন্যদিকে সুনাম নষ্ট করে অন্তরেব দিক্ থেকে দেউলে করে দিয়েছে।

'সই' করার পরে যোগেশ ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন এবং আরও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন। রমেশ সুরেশকে জেলে পাঠিয়েছে এবং অপ্রকৃতিস্থ যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ

করতে চেষ্টা করেছে। যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যোগেশের বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ হইল তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, এ-ঘটনা না ঘটলে যোগেশের ট্র্যাজিক পরিণতির চূড়ান্তরূপ তথা প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। সেই দিক্ থেকে ঘটনাটি বাস্তবিকই—নাটকে যাহাকে বলে 'scene a faire'—অতি-অপরিহার্য্য। অতএব, অতি-প্রত্যাশিত দৃশ্য এবং খুবই দ্বন্দ্বগর্ভ। কিন্তু ঘটনাটি দ্বন্দ্বগর্ভ বলে যতখানি দৃশ্যত্ব দাবি করতে পারে, নাট্যকার ঘটনাটিকে ততখানি দৃশ্য করেননি। নাট্যকার রমেশের একটি কথার সাহায্যে অতি-দ্রুত গতিতে যোগেশকে এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে বাড়ী থেকে বস্তিতে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। যোগেশের ভাগ্য বিপর্য্যয়কে নূতন এক পর্য্যায়ে পৌছে দিয়েছেন। সত্য বটে এই পূর্ব্বের ঘটনা-গুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু একথা সত্য নয় যে ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ অসম্ভব বা অবাস্তব। বিতাড়িত যোগেশের বস্তিতে বাসা ভাড়া নেওয়া অথবা জ্ঞানদার পথে পড়ে মরা অহেতুক বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। যে-রমেশ যোগেশের মত ভাইয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারে, আত্মসাৎ করা যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই রমেশের পক্ষে যোগেশকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা নয়। তারপর যে-যোগেশ ভিতরে-বাহিরে নিঃস্ব হয়ে গেছেন—নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য যে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানদার বুকে লাথি মারা, বা ছেলের হাতের পয়সা কেড়ে নেওয়া অস্বাভাবিক কোন কাজ নয়। ঘর ভাড়া দিতে না পারায় জ্ঞানদাকে বাড়ীওয়ালী তাড়িয়ে দিয়েছে, অসুস্থ জ্ঞানদা পথে পড়ে মরেছে—এ-ঘটনাও অবাস্তব কোন কিছু নয়। ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে যাহা বলার তাহা আগেই বলেছি। ঘটনাগুলি অবস্থা পরিবর্ত্তনের একটি চূড়ান্ত রূপ। নাট্যকার পরিবর্ত্তনের বহু আরোহ-বিন্দু অতিক্রম করে এক-একটি চূড়ান্ত ঘটনাকে নির্ব্বাচন করেছেন। এরূপ নির্ব্বাচন নাটকে হামেশাই হয়ে থাকে,

কারণ নাটকের পক্ষে নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য। কিন্তু বড় কথা সেখানে এই যে ঘটনাটিকে মূল কাহিনীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া—তথা ক্রম রক্ষা করা। অবশ্য যেহেতু অবস্থার পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ; ক্রম রক্ষা করতে হলে শুধু ঘটনার ক্রম রক্ষা করলেই চলবে না, কালক্রমের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অবস্থান্তর ঘটানোর জন্য যেটুকু সময় অপেক্ষিত সেই সময়ের অতিপাত—অর্থাৎ কালের গতি দর্শকচিত্তে প্রতিভাত করতে হবে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র যেভাবে ঘটনাগুলি ঘটিয়েছেন তাহাতে ঘটনার ক্রমে একটু অসংলক্ষ্য হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু আবেগপ্রবণ যোগেশ-চরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাসের তীব্রতা দিয়ে নাট্যকার অতি কৌশলে দর্শকের কাল-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছেন।

মোট কথা এই যে নাট্যকার যোগেশের শোচনীয় পরিণতি দেখাবার জন্য যে যে ঘটনা নির্ব্বাচিত করেছেন, সেই ঘটনাগুলি খুব দ্রুত লয়ে ঘটলেও, স্বরূপে তারা কাল্পনিক নয় এবং পরিস্থিতি হিসাবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। একথা স্বীকার করতেই হবে—প্রথমেই যোগেশের চরিত্রটিকে নাট্যকার এমনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—যোগেশ সম্পর্কে এমন একটি সংস্কার সৃষ্টি করেছেন যে ঐ ঘটনাগুলি আমাদের বাস্তবতা বোধকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে না তথা যোগেশ সম্পর্কে আমাদের চিত্তকে লঘু করে তোলে না। ঘটনার অতি-দ্রুততা বা অসংলক্ষ্য-ক্ষমতা বা অপ্রস্তুতা যেখানে কাল্পনিকতায় পর্য্যবসিত হয় সেখানেঅবশ্যই তাহা মারাত্মক দোষ। এক্ষেত্রে ঘটনাগুলি সেই দোষে তেমন দুষ্ট নয় এবং তাহা নয় বলেই নাটকখানিকে 'মেলোড্রমা' বলা চলে না। একথা ঠিক বটে যে নাটকখানিকে নির্দ্দোষ এবং প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা দেওয়া চলে না, কিন্তু তাই বলে একথাও ঠিক নয় যে নাটকখানি মেলোড্রামা জাতীয় লঘু নাটকে পর্য্যবসিত হয়েছে, অথবা নাটকে নাট্যকার যে-রস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন তাহা নিষ্পন্ন করতে পারেননি—অর্থাৎনাটকখানি রসোত্তীর্ণ হয়নি। বহু ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও প্রফুল্ল ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

প্রফুল্ল নাটকের জাতি-পরিচয়

প্রফুল্ল নাটকের জাতি-নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে আমি প্রথমতঃ নাটকের নামকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছি এবং দেখিয়েছি যে নামকরণ নিয়ে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাহার আসল কারণ এই যে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির আবেদন যোগেশের ট্র্যাজেডির তীব্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—প্রফুল্লের কেন্দ্রীয়ত্ব যোগেশ অধিকার করে বসেছেন। এও বলেছি এই সমস্যার সমাধান করতে যোগেশের পক্ষের সমালোচকগণ যে-চেষ্টা করেছেন. যে-যুক্তি দিয়ে নামকরণ সমর্থন করতে চেয়েছেন তাহা অবশ্যই একটু কষ্টকল্পিত হয়েছে। বাস্তবিক, নাটকখানিতে যদি যোগেশের ট্র্যাজেডি দেখানোর উদ্দেশ্যই বড হয়ে উঠে থাকে, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রফুল্ল নামকরণ যথার্থ হয়নি। এই সমস্যা সমাধানের আর যে একটি উপায় আছে সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি—দেখিয়েছি—'প্রফুল্লকে' যৌথ পরিবারের বা সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি বলে ধরলে এবং প্রফুল্লকে যৌথ পরিবারের সংযমনী বা সংশ্লেষণী শক্তির প্রতিনিধি রূপে গণ্য করলে যৌথপরিবারের আদর্শ রক্ষার জন্য, বিশ্লেষণী শক্তির বিরুদ্ধে, প্রফুল্লই শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে, এই যুক্তিতে প্রফুল্ল নামকরণ সমর্থন করা যেতে পারে। এভাবে দেখলে প্রফুল্লের এবং যোগেশের ট্র্যাজেডিকে এক বৃত্তের মধ্যে নির্বিরোধে স্থান করে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে যে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডিকেই পরোক্ষভাবে বড করে তোলবার চেষ্টা করা হয়—একথাও অস্বীকার করা যায় না।

নাটকের নামকরণ নিয়ে যেখানেই প্রশ্ন উঠে, বুঝতে হবে সেখানে নাট্যকারের অভিপ্রায়টি সুস্পষ্টাকারে ব্যক্ত হতে পারেনি—নাট্যকারের প্রতিপাদ্য

বিষয়—(প্রেমিজ) খুব পরিচ্ছন্ন (clear-cut) হয়ে উঠেনি, অথবা রূপ দেওয়ার সময় নাট্যকারের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

বলা বাহুল্য,প্রতিপাদ্য বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে নাটকের গঠনেও অনিবার্য্যভাবে ত্রুটি দেখা দিবে। কারণ, উপায়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে লক্ষ্যের প্রকৃতির উপরেই এবং সেই কারণেই অংশের উপযোগিতার বিচার অংশীর প্রকৃতি-বিচার না করে করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিল্পবস্তুই এক-একটি সমগ্র অংশী, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে গঠিত একটি অঙ্গী, প্রত্যেক জীবদেহের মতই সে একটি বিশিষ্ট জীবাত্মার অভিব্যক্তি, বিশেষ উদ্দেশ্যের সিদ্ধি, বিশেষ প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদন। জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন বিশিষ্ট জীবাত্মাটিরই অভিব্যক্তি, নাট্যশিল্পের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্যও তেমনি নাটকের বৃত্তবন্ধের নিয়ামক শক্তি। এই কারণেই নাটকের বৃত্তবন্ধ বা সন্ধি-বিভাগ বিচার করতে হলে প্রথমেই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে বৃত্তটি প্রতিপাদ্যের আদর্শ আধার হয়ে উঠেছে কি না। আসল কথা বৃত্তবন্ধ বিশ্লেষণ করতে হলে গোড়াতেই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকরণ করতে হবে; প্রতিপাদ্য যেখানে সরল ও সুস্পষ্ট সেখানে কোন সমস্যা থাকে না, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় যেখানে অস্পষ্ট সেখানেই সমস্যা।

প্রফুল্ল নাটকের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের সামনে প্রতিপাদ্যনির্দ্ধারণের সমস্যা এসে দাঁড়ায়। মনে প্রশ্ন আসে যে প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাটক বটে, কিন্তু কার ট্র্যাজেডি? প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি না যোগেশের ট্র্যাজেডি? অথবা যোগেশের এবং প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি সংযোগে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি? এসব প্রশ্ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে নাটকখানিকে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি হিসাবে বিচার করতে গেলে এসিদ্ধান্ত করতেই হবে যে নাট্যকার পশ্চাৎপটকে এত বড় ও উজ্জ্বল করে ফেলেছেন বা ফেলতে বাধ্য হয়েছেন যাহার ফলে আসল মূর্তিটি ম্লান হয়ে গেছে—এমনকি হত্যার রং চড়িয়েও গুরুত্বে যোগেশের সমকক্ষ করতে পারেননি।

প্রফুল্লকে 'প্রথম ব্যক্তির' (প্রোটাগোনিষ্ট) ব্যক্তিত্ব তথা কেন্দ্রীয়ত্ব দিতে হলে চরিত্রটির উপরে যে-পরিমাণ আলোকপাত করা উচিত, চরিত্রটির জন্য যে-পরিমাণ স্থান ছেড়ে দেওয়া উচিত, নাট্যকার সেই পরিমাণ আলোক এবং স্থান প্রফুল্লকে দিতে পারেননি। কেন পারেননি সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি, দেখিয়েছি—প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনাটিই এমন যে যোগেশের ট্র্যাজেডি না ঘটিয়ে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি ঘটানো সম্ভব নয়। অথচ যোগেশের ট্র্যাজেডি ঘটাতে গেলে, যোগেশকে জড়ে এবং রমেশকে পুরা শয়তানে পরিণত করতে গেলে, যোগেশকে এবং রমেশকে অনেকখানি স্থান ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই। যোগেশকে রাজার ঐশ্বর্য্য থেকে পথ-ভিক্ষুকের নিঃস্বতার চরম সীমায়, প্রকৃতিস্থ ও স্নেহ-প্রীতি-ভক্তিময় যোগেশকে অপ্রকৃতিস্থ ও অসাড় হৃদয় যোগেশের স্তরে নিয়ে আসতে নাট্যকারকে এত দৃশ্যের পরিকল্পনা করতে হয়েছে, এতখানি মনোযোগ দিতে হয়েছে যে এই পর্ব্বে তিনি প্রফুল্লের দিকে সমুচিত দৃষ্টি রাখতে পারেননি। ফলে ঘটনা-বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ কেন্দ্রীয় চরিত্রের গুরুত্ব লাভ করে বসেছে। এই বিপর্য্যয় রোধ করবার একটিমাত্র উপায় ছিল। যদি নাট্যকার প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির সামগ্রিক আবেদন বা তীব্রতাকে এমন একটি মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারতেন যাহা যোগেশের ট্র্যাজেডির তীব্রতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক শুধু তাহা হলেই প্রফুল্লের ট্র্যাজেডিতার গুণগত গুরুত্ব দিয়ে প্রাধান্য বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু তাহা পারেননি; গুণগত গুরুত্বে যোগেশ প্রধান হয়ে পড়েছেন।

প্রফুল্ল যে-আঘাত পেয়েছে তাহা এসেছে একটি দিক্ থেকেই—তাহার স্বামীর হাত থেকে। আর যোগেশ পেয়েছেন ভাইয়ের হাত থেকে কৃতঘ্নতার আঘাত, সুনাম হারানোর মর্ম্মান্তিক বেদনা এবং নিজের হাতে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়া দেখার মর্ম্মজ্বালা। এই তিন মর্ম্মদাহের ধারা যোগেশের মধ্যে মিলিত হয়ে যোগেশের ট্র্যাজেডিকে যে গুণগত ও পরিমাণগত গুরুত্ব

দিয়েছে তাহার তুলনায় প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে পড়েছে। অতএব, নাটকখানি যে প্রফুল্লেরই ট্র্যাজেডি তাহা স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে নাট্যকার চরিত্রগুলি ভালো করে—orchestrate করতে, প্রাধান্যের তথা গুরুত্বের মাত্রা অনুসারে সাজাতে পারেননি। যোগেশের ট্র্যাজেডির তীব্রতা প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির প্রতিস্পর্দ্ধী হয়েও ক্ষান্ত হয়নি, তাহাকে ছাপিয়ে গেছে। সত্য বটে প্রফুল্ল যৌথ পরিবারের একজন বধূ—বালিকা-বধূ এবং এমন যুগের এক বিশেষ ব্যক্তি যাহার ব্যক্তিত্ব বলে কোন কিছু ছিল না, যাহার কাছে পতিই ছিল পরম গুরু এবং পতির ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই ছিল ধর্ম্ম-সাধনা এবং একথাও সত্য যে এরূপ একটি বালিকা-বধূকে সক্রিয় কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তোলা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুখ্য উদ্দেশ্য যদি নির্ম্মাণ দোষে গৌণ হয়ে পড়ে তবে তাহা স্রষ্টার ত্রুটি বলেই গণ্য করতে হবে।

অন্যপক্ষে নাটকখানি যদি যোগেশের ট্র্যাজেডি এবং যোগেশের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে যৌথ পরিবারের ট্র্যাজেডি—'সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার' ট্র্যাজেডি—দেখানোর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়ে থাকে, তাহা হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে নাটকের নামকরণের সার্থকতা নিয়ে এবং তারপর প্রশ্ন উঠবে যোগেশ-চরিত্রের ক্রমপরিণতির দ্রুতগতি নিয়ে। যোগেশেরই ট্র্যাজেডি দেখানো যে-নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সেই নাটকে যোগেশের পরিণতিকে দ্রুতগতিতে উপস্থাপিত করলে চলবে না। ক্রমপরিণতির ধাপগুলি বা মোড়গুলি যথাসম্ভব ক্রমান্বয়ে এবং সুস্পষ্ট করে দৃশ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলেছি, যোগেশের ট্র্যাজেডির পটভূমিতে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি স্থাপনা করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল বলেই যোগেশ-চরিত্রের পরিণতির ক্রম বেশ একটু অসংলগ্ন বা দ্রুত হয়েছে। তাই বলে যোগেশের পরিণামের শোচনীয়ত্বে কোন হানি ঘটেনি। আর এক দিক্ থেকে দেখলে দেখা যাবে পরিণতির ভঙ্গক্রমতা বা দ্রুততার ত্রুটিকে নাট্যকার অন্য এক প্রক্রিয়ায় মার্জ্জনা করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রক্রিয়াটি

এইযে নাট্যকার যোগেশের ট্র্যাজেডিকে শেষ পর্য্যন্ত 'সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার' ট্র্যাজেডিতে পরিণত করেছেন এবং নাটকের বৃত্তটির যৌগিকতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। (নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যোগেশকে রমেশ যে মর্ম্মান্তিক ও কৃতঘ্নতার নিদারুণ আঘাত দিয়েছে এবং সুনাম কেড়ে নিয়ে যোগেশের অন্তরাত্মাকে গলা টিপে মেরেছে—এই সবই মর্ম্মান্তিক আঘাত বটে, কিন্তু যোগেশের সবচেয়ে বড় ব্যথা এই যে তাঁহার 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।') "ভস্মীভূত সমস্ত জীবন হইতে উত্থিত একটি শ্বাসরোধকারী ধূম্রোচ্ছ্বাস ও বহ্নিগর্ভ খেদোক্তি 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)—যোগেশের ট্র্যাজেডির গভীরতম সুরটিকেই ব্যক্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে যোগেশের আসল ট্র্যাজেডি—নিজের হাতে সাজানো বাগানকে চোখের সামনে শুকিয়ে যেতে দেখার ট্র্যাজেডি। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া থেকে আরম্ভ করে, রমেশের কৃতঘ্নতা, সুরেশের চোর হওয়া, উমাসুন্দরীর উন্মত্ততা, জ্ঞানদার পথে পড়ে মরা, যোগেশের পথের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া. প্রফুল্লের মৃত্যু এবং রমেশের শাস্তি—সব কিছুই এই ট্র্যাজেডির উপাদান। এই সমস্ত ঘটনার সমাবেশেই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং (যোগেশের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি থেকে একটি সুখী পরিবারের ট্র্যাজেডি—'সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার' ট্র্যাজেডির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।) যে-পরিমাণে এই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠে সেই পরিমাণে দর্শকের মন ব্যক্তির কেন্দ্র থেকে 'সাজানো বাগানের' কেন্দ্রের দিকে সরে যায় এবং যোগেশের আর্ত্তনাদের ভিতর দিয়ে—'সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়া' রূপটি দেখে দর্শক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। (সুতরাং এ-সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডির মূল পরিকল্পনা বিশেষ কারণে যোগেশের ট্র্যাজেডিতে এবং তাহার মাধ্যমে, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার' ট্র্যাজেডির বৃত্তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, 'প্রফুল্ল' একাধারে প্রফুল্লের, যোগেশের এবং সমগ্র পরিবারটির ট্র্যাজেডি।)

'বৃত্ত' বিশ্লেষণ করার পরে এবার **চরিত্র-সৃষ্টি** সম্পর্কে সামান্যভাবে কয়েকটি কথা বলা যাক্।

'চরিত্র' বলতে সাধারণতঃ বুঝায়—মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তাহার দেহ-মনের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার—অর্থাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাসনার—এক কথায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিশেষত্বটিকে, যাহা তাহার আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। লৌকিক জগতে চরিত্রবান লোক বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকেই যাঁহার স্বভাবে প্রবৃত্তির চেয়ে নিবৃত্তির জোর বেশী, যিনি জ্ঞানে সত্যকে, অনুভবে প্রেম-প্রীতিকে এবং ইচ্ছায় ন্যায়-নীতিকে আঁকড়ে থাকেন বা কামনা করেন এবং চরিত্রহীন বলতে বুঝায় তাহাকেই যে প্রবৃত্তির বশীভূত, যে এক বা একাধিক রিপুর অনুগত দাস। আবার স্বভাবের বা প্রবণতার ভিত্তিতে চরিত্রকে নানভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। বলা হয়, অমুক বড় চিন্তাশীল ও ভাবুক; অমুখ বড় কল্পনাবিলাসী; অমুক বড় কর্ম্মতৎপর, অমুক বড় কামুক, বড় লোভী, বড় ক্রোধী, বড় মোহপ্রবণ বড় মৎসর, অমুক বড় কোমল হৃদয়, অমুক বড় কঠোর হৃদয়, অমুক বিষকুম্ভ পয়োমুখ, অমুখ পয়ঃকুম্ভ বিষমুখ, অমুখ দৃঢ়চেতা, আদর্শনিষ্ঠ, অমুক আদর্শহীন ও স্বার্থসেবী—এমনি প্রত্যেকটি প্রবণতার ভিত্তিতে আমরা ব্যক্তি-স্বভাবকে বিশেষিত করতে পারি এবং করেও থাকি। শিল্পের জগতে 'চরিত্র-সৃষ্টি' বলতে শুধু ঐরূপ কোন ব্যক্তি-স্বভাবকে কল্পনা বুঝায় না, তার সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়। ব্যক্তি-স্বভাবের পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়ার চেষ্টা এবং উভয়ের বুঝাপড়ার বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে কোন একটি পরিণতির দিকে ব্যক্তির অগ্রগতি—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আংশিক বা আমূল পরিবর্ত্তন। শিল্পের ক্ষেত্রে সুন্দর চরিত্র বলতে বুঝায় ব্যক্ত চরিত্র (শিল্পের ক্ষেত্রে—"what is expressed is beautiful") এবং ব্যক্ত চরিত্র হচ্ছে সেই চরিত্র যাহা তাহার সত্তার সমগ্রতা, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজনৈতিক আয়তন নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা যেখানে থাকে না সেখানেই

চরিত্র অব্যক্ত এবং যেখানে যে-পরিমাণে থাকে সেখানে সেই পরিমাণে চরিত্র ব্যক্ত। অতএব, চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্য আসলে চরিত্রকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট করে তোলার এবং বিচিত্র বাস্তব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা ক্রমপরিণামের সঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার প্রকাশ একদিকে যেমন পাওয়া যায় বিচিত্র-ব্যক্তিত্ব পরিকল্পনার মধ্যে; অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বকে বাস্তব সঙ্গতিপূর্ণ এবং ক্রমবিকাশী করে তোলার মধ্যে। বলা বাহুল্য, যে-ক্ষেত্রে চরিত্রের স্বভাবে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না সেখানে চরিত্র প্রকাশধর্ম্মী এবং যেখানে স্বভাবে পরিবর্ত্তন বা পরিণতি ঘটে সেখানে চরিত্র বিকাশধর্ম্মী এবং একথাও বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত অথবা বিকশিত করা উভয় ব্যাপারই শক্তিসাপেক্ষ, বিশেষতঃ বিকাশন ব্যাপার তো খুবই শক্তিসাপেক্ষ।

এই সামান্য কয়েকটি কথা মনে রেখে প্রফুল্ল-নাটকের চরিত্র পরীক্ষা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে নাট্যকার চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারে সব ক্ষেত্রে উচ্চ মান রক্ষা করতে পারেননি। প্রথমতঃ, প্রফুল্ল চরিত্রটির কথাই বলা যাক্। যদিও একথা উপেক্ষণীয় নয় যে তখনকার দিনের একটি যৌথ পরিবারের অশিক্ষিতা একজন বালিকা-বধূকে ব্যক্তিত্বে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলার অবকাশ কমই ছিল, তবু একথাও মিথ্যা নয় যে হৃদয়ের বিশিষ্টতা দিয়ে চরিত্রটিকে আরও ব্যক্তিত্বশালী করে তোলার পথে কোন বাধা ছিল না। বলা বাহুল্য, প্রফুল্লকে আরও স্নেহ-প্রীতিময়ী করতে পারলে প্রফুল্লের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেত এবং পরিবেশের সঙ্গে ঐ ব্যক্তিত্বের বুঝাপড়ার চেষ্টাকে আরও সুস্পষ্ট করতে পারলে প্রফুল্ল একটি সুসমন্বিত চরিত্রে পরিণত হতে পারত।

প্রফুল্লের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রমেশের ছলনার দ্বন্দ্ব এবং রমেশের ছলনার জয় সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেনি বলেই প্রফুল্ল-চরিত্র মধ্য পর্ব্বে পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হতে পারেনি এবং তাহা পারেনি বলেই চরিত্রের ক্রমবৃদ্ধি (গ্রোথ) ব্যাহত হয়েছে। প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি তখনই আরম্ভ হয়েছে

যখন সে স্বামীর ছলনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং সেখানেই শেষ হয়েছে যেখানে প্রফুল্ল যাদবকে বাঁচাতে গিয়ে, স্বামীকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে, নর-পিশাচ স্বামীর হাতেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে। প্রফুল্লের ব্যক্তিত্ব স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও প্রীতি দিয়ে গঠিত। এই দিক্ থেকে ব্যক্তি হিসাবে প্রফুল্ল খুব দুর্ব্বল নয়, বরং খুবই সবল। সেই সবলতার প্রমাণ রয়েছে তাহার আত্মদানের--স্বামীকে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত করবার, যাদবের প্রাণ রক্ষা করবার—ঐকান্তিক চেষ্টার মধ্যে। যে মুহূর্ত্তে ঘটনাটির মধ্যে প্রফুল্লের ইচ্ছাশক্তি (will) দারুণ তেজে জলে উঠেছে সেই মুহূর্ত্তে তাহার চরিত্রে সক্রিয়তম চরিত্রের সক্রিয়তা ব্যক্ত হয়েছে। প্রফুল্লের এই দীপ্তিটুকু নিশ্চয়ই ভুলবার বস্তু নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা মনে জাগবেই যে ইচ্ছা শক্তির এই দীপ্তি আমরা আগে তেমন উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত হতে দেখিনি।

দ্বিতীয়তঃ, যোগেশ-চরিত্রের কথা। যোগেশের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যোগেশের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ কতখানি সমুচিত হয়েছে তাহা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। যোগেশের ব্যক্তিত্বে দুইটি উপাদান খুব প্রবল—একটি হৃদয়বত্তা, বিশেষতঃ ভ্রাতৃ-স্নেহ; অপরটি সততা বা ন্যায়নিষ্ঠা—সুনাম তথা মানবিক মূল্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। এই দুই প্রবণতার প্রেরণাই যোগেশের ইচ্ছাকে শক্তি যুগিয়েছিল। যোগেশ অদম্য অধ্যবসায় নিয়ে এবং সৎ পথে থেকে ব্যবসায় করেছিলেন এবং একটি দুঃস্থ পরিবারকে ধনী ও সুখী পরিবারে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিলেন। যোগেশের চেষ্টা সফল হয়েছিল—যোগেশ একটি সুন্দর বাগান সাজিয়ে তুলেছিলেন—মা, দুই ভাই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলেন এবং আরও সুখের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

এমন সময়ে বজ্রপাত ঘটল—ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বহু কালের অধ্যবসায়ে গড়া ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ বিলীন হয়ে গেল। যোগেশ চোখে দুর্ভেদ্য

অন্ধকার দেখলেন—শতবর্ষের সাধনা এক নিমিষে ধূলিসাৎ হলে যে নৈরাশ্যে মন ভেঙ্গে পড়ে যোগেশের মনে তখন সেই নৈরাশ্য—সর্বস্বান্ত হওয়ার বেদনায় এবং আশাহীন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে যোগেশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লেন এবং মদ খেয়ে আত্মবিস্মৃত হতে তথা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। যোগেশের মত ভাবাবেগপ্রবণ চরিত্রে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া এরূপ উন্মত্তপ্রায় অস্থিরতা নিয়েই যে-ব্যক্ত হবে তাহা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঐ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ঘটনায় যোগেশের মনোবল ক্ষুন্ন হলেও তাঁহার নৈতিক দৃঢ়তায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেনি। যোগেশ সব-কিছুর বিনিময়ে সততা বা সুনাম রক্ষা করবার সঙ্কল্প জানিয়েছিলেন। কিন্তু যখন পরিবারের আর সকলে, বিশেষ করে রমেশ—যোগেশের চেয়ে সম্পত্তির কথাই বেশী করে ভাবতে লাগল, এমনকি রমেশ সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে মরিয়া হয়ে উঠল এবং যোগেশকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হল না তখনই যোগেশ একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন—আত্মবিস্মৃতির আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করতে মরিয়া হয়ে মদ ধরলেন। যোগেশ-চরিত্রের এই পরিবর্ত্তনটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষও বটে। যোগেশ যে-চরিত্রের লোক, যে-ধরনের স্নেহপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক, তেমন ধরনের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে আত্মসঙ্কোচন, আত্মপীড়ন এবং আত্মবিস্মৃতি তথা আত্মবিলোপ ঘটাবার প্রবৃত্তি। যেখানে আঘাতকারীকে আঘাত করার চেয়ে আর বড় আঘাত থাকে না, যেখানে আঘাত করে বা শত চেষ্টা করেও হারাণো মূল্যকে উদ্ধার করার কোন উপায় থাকে না, সেখানে ঐ প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক ; সেখানে ব্যক্তি আত্মাভিমানে আত্মাকেই ক্ষয় করে ফেলতে চায়, আত্মপীড়নের মধ্যেই আত্মরক্ষার শেষ উপায় খুঁজে নেয়।

কৃতঘ্নতার আঘাত—প্রাণপ্রিয় ব্যক্তির প্রতারণার আঘাত যে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত এবং সেই আঘাত যে দশটা শত্রুর আঘাতের চেয়েও

মারাত্মক—'the most unkindest cut of all' তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের সীজারের চরিত্রের আচরণে। ব্রুটাস ছিলেন সীজারের প্রাণপ্রিয় বন্ধু—"Caesar's angel"। সেই ব্রুটাসই যখন তাঁহার বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল তখন—সীজারের প্রতিক্রিয়া—

'For when the noble Caesar saw him stab
Ingratitute, more strong than traitors' arms
Quite vanquished him : then burst his mighty heart.
And in his mantle muffling up his face"···

নাট্যকার বলতে চেয়েছেন—ষড়যন্ত্রকারী শত শত্রুর আঘাতে যা হয়নি প্রিয়তম বন্ধুর একটি আঘাতে তাই হয়েছে—সীজার সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন। তখনই এবং তখনই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে, যখন ব্রুটাস অস্ত্রাঘাত করেছে। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সীজার গাত্রাবরণে মুখ ঢেকে ফেলেছিলেন এবং ফেলেছিলেন এই কারণেই যে মনুষ্যত্বের অতখানি অবমাননা তিনি চোখ মেলে সহ্য করতে পারেননি। সীজারের এই শেষ প্রতিক্রিয়া, গাত্রাবরণে মুখ ঢেকে ফেলা, নিশ্চয়ই কোন দুর্ব্বলতার লক্ষণ নয়—এই প্রতিক্রিয়া আহত মর্ম্মেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমাদের যোগেশও আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মুখ ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন, মদ খেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, সমস্ত মর্ম্মদাহকে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে—যোগেশ মাতাল ছিলেন বলেই তাঁহার ট্র্যাজেডি ঘটেনি—ট্র্যাজেডি ঘটেছিল বলেই যোগেশ মাতাল হয়েছিলেন এবং বিস্মৃতির বিনিময়ে মদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলেন। নাটকের শেষ দিকে যোগেশ যে-সব অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তথা শোচনীয় আচরণ করেছেন —সবই ঐ আত্মহারা যোগেশের ক্রমবর্দ্ধমান অসাড়তার নিদর্শন—প্রেত যোগেশের—আর এক যোগেশের ক্রিয়াকলাপ। ছেলের হাত থেকে পয়সা কেড়ে নেওয়া বা স্ত্রীর বুকে লাথি মারা ঐ প্রেত যোগেশেরই কাজ এবং যোগেশের আত্মবিলোপনের চূড়ান্ত

নিদর্শন। সাজানো বাগানের মালিক যোগেশ আঘাতে আঘাতে আর এক শোচনীয় যোগেশে রূপান্তরিত হয়েছেন। নাট্যকার যোগেশের সেই "unmerited misfortune-কেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। যোগেশ-চরিত্রের ট্র্যাজেডির মর্ম্মমূলে পৌঁছাতে না পারলে, যোগেশের আচরণগুলি অনেকেরই কাছে যে মেলোড্রামাসুলভ ঘটনা বলে মনে হবে—এই আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু যাঁহারা একটু তলিয়ে দেখবেন তাঁহারাই দেখতে পাবেন যে গভীর ট্র্যাজেডির স্থায়িভাবকে ব্যক্ত করার জন্যই ঐ আচরণগুলিকে সঞ্চারিভাবের মত নিয়োজিত করা হয়েছে এবং সেই গভীর ট্র্যাজেডি হচ্ছে—স্নেহপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ একটি চিত্তের ট্র্যাজেডি—একটি সরস জীবনের শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডিতে বহির্দ্বন্দ্বের উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ঘটনাদীপ্তি পাওয়া যায় না বটে কিন্তু যাহা পাওয়া যায় তাহার আকর্ষণও বেশী ছাড়া কম নয়। পাওয়া যায় মানুষের হৃদয়লোকের নিগূঢ় রহস্য, পাওয়া যায় মানবিক মূল্য হারাণোর শোচনীয় আত্মক্ষয়ী প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মানবসত্তার মূল্য-প্রীতির গভীর নিষ্ঠার মহিমা! শেকভের চরিত্রদের সম্পর্কে বিখ্যাত নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা ষ্ট্যানিশ্লাভস্কি যে-কথা বলেছেন সেই কথাটি—The very inactivity of his characters conceals complex inner activity —যোগেশের চরিত্র সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, যোগেশের ট্র্যাজেডির এই গভীরতা, যোগেশের প্রকৃতি এবং তিনি যে যে আঘাত পেয়েছেন তাহার গুরুত্ব যাঁহারা উপেক্ষা করবেন, তাঁহাদের চোখে যোগেশের আচরণ যেমন তাৎপর্য্যহীন লঘু ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, তেমনি নাট্যকারকেও তাঁহারা উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারবেন না।

* তাঁহারা ধর্ম্ম না জেনে মর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, যোগেশের চরিত্রে "কুৎসিত মাতলামি, কদর্য্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখবিলাস" ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। তাঁহাদের চোখে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া এবং মদ খাওয়াই

যোগেশের ট্র্যাজেডির আসল। সুতরাং লঘু কারণ বলে মনে হবে এবং তাঁহারা যোগেশ-চরিত্রের Spiritual value" উপলব্ধি করতে পারবেন না।

যোগেশ-চরিত্রের বিপরীত কোটির চরিত্র রমেশ। রমেশ উকিল। সে ছলনাকে বিদ্যা হিসাবে শিক্ষা করেছে এবং মিথ্যা-জালিয়াতিকে জীবিকার্জ্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। স্বার্থ তাহার কাছে পরমার্থ। তবে নূতন কলকাতার সাহেবি অর্থকৌলিন্যমোহ মনে প্রভাব বিস্তার করলেও যোগেশের যৌথ পরিবারের দৃঢ় আর্থিক বনিয়াদ রমেশের স্বার্থপর সত্তাটিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার অবকাশ দেয়নি। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সেই অবকাশ উপস্থিত হল। রমেশ যোগেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সম্পত্তি রক্ষার অজুহাতে সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করল। যোগেশকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিতে, সুরেশকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে একটুও তাহার বিবেকে বাধল না। রমেশ শয়তানে পরিণত হল—নিজের পিতৃকল্প দাদার উপরেই সে ছলনাবিদ্যার ধার পরীক্ষা করল। কিন্তু লোভের স্বভাবই এই যে সে অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, মাঝ পথে থামতেও পারে না। রমেশও পারেনি। যোগেশকে নির্ব্বংশ না করতে পারলে স্বস্তি কোথায়? সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। তাই যোগেশের একমাত্র ছেলে যাদবকে সে বিষ খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দিল তাহারই স্ত্রী প্রফুল্ল। প্রফুল্ল স্বামীকে এত বড় পাপ করতে দিবে না—যাদবকে বাঁচাবেই। যে রমেশ পাপের স্রোতে নেমেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছিল, তাহার কাছে কার কি মূল্য? প্রফুল্লকে না মেরে যখন যাদবকে মারা যাবেই না তখন প্রফুল্লকেই সে গলা টিপে মেরে ফেলল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। পুলিশ এসে পড়ায় সব ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, পাপের মাথায় শাস্তির বজ্র নেমে এলো, বিষপাত্র পাপীর নিজেরই মুখে এসে ঠেক্‌লো।

রমেশ সেই স্বার্থপরায়ণ কঠোরহৃদয় স্বভাবলোভী চরিত্রের বংশধর, যাহারা পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার পরে আর কূলের দিকে ফিরে তাকায় না,

যাহাদের হৃদয় থেকে স্নেহ-ভক্তি-প্রেম-প্রীতি এক নিমিষে উবে যায় বলে কোন অতীত স্মৃতি বা ভাবাবেগ এসে যাহাদের শয়তানী সঙ্কল্পের পথ রোধ করতে পারে না। রমেশ যেন একটি রূপক চরিত্র। উকিল কি চিজ-রে!—এই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ। রমেশের বৃত্তি ওকালতি—অতএব নাট্যকারের ধারণায় রমেশ যেন স্বভাবে স্বার্থপরায়ণ কুটিল এবং বিষয়লোভী। 'উকিল'—এই একটি পরিচয়েই তাহার আসল পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অনেক কথায় বা আচরণে চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজন আছে একথা তিনি মনে করেননি। আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে যে রমেশ কোন প্রস্তুত চরিত্র নয়, রমেশ সেই চরিত্রেরই দৃষ্টান্ত যাহার স্বভাব অবস্থার আনুকূল্যে অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত হয়ে উঠে। নাট্যকার দেখিয়েছেন—রমেশের স্বভাব অনুকূল অবস্থা না-পাওয়া পর্য্যন্ত অব্যক্ত হয়েই ছিল, কিন্তু যেই সুযোগ পেয়েছে অমনি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। রমেশের সুপ্ত বিষয়-কামনা জাগ্রত হয়েই সম্মোহে পরিণত হয়েছে—রমেশ অ-মানুষ হয়ে পিতৃকল্প দাদাকে অপ্রত্যাশিত আঘাত দিয়েছে, প্রতারিত ও বিতাড়িত করেছে, ছোট ভাইকে জেলে পাঠিয়েছে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছে, নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছে। এই দিক্ থেকে বিচার করলে রমেশ একটি হঠাৎ অভিব্যক্ত নিষ্ঠুর লোভী এবং বিষয়-সম্মোহিত চরিত্র।

বিষয়লোভ তাহার এতই প্রবল যে ব্যাঙ্কে বাতি জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশের স্বত্ব কিনে নেওয়ার জন্য কাঙালী-জগমণিকে হাত করেছে, হিসাব পাকা করে ফেলেছে—"ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখরা, তারপর বাপের বিষয় বখরা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু।" শয়তানিতন্ত্রের সার কথা বুঝে নিয়েছে—"যাহাতে পরের অপকার তাহাতে আপনার উপকার" এবং সঙ্কল্পও করেছে 'দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকানো চাই।' এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করার জন্য সে মদকে সহায় করেছে—যোগেশকে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাতাল করে রেখে কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করেছে—

—মর্টগেজে 'সই' করিয়ে নিয়েছে। ব্যাঙ্কের দেওয়ান সুসংবাদ দিতে এলে যোগেশের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, কপট উদ্বেগ অস্থিরতা এবং শোক দেখিয়ে সকলের চোখে ধূলো দিতে চেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বেনামীতে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। সে পাপের স্রোতে নেমে ধর্মের সঙ্গে কোন সন্ধি করার চেষ্টা করেনি—যোগেশকে দারোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দেয়নি ; প্রফুল্লকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে জ্ঞানদা ও মাকে বাড়ী-ছাড়া করেছে, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, 'মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রি করে দাদাকে ওয়ারিণ' ধরিয়েছে এবং বড় বৌকে বাড়ী বেচতে বাধ্য করেছে। যোগেশের পিছনে মাতাল লাগিয়ে রেখেছে এবং বড় বৌকে নিঃসম্বল করে ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। যোগেশকে পাগল করে এবং জ্ঞানদাকে পথে পড়ে মরতে বাধ্য করেও তার শয়তানি ক্ষান্ত হয়নি, শেষে যাদবকে ভুলিয়ে নিয়ে, বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছে। প্রফুল্লের মতো স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করেছে। রমেশে শয়তান মূর্তিমান। বাস্তবিকই সে 'কারুর নয় এবং অসাধারণ শয়তান।

তবে শয়তান একা রমেশকেই আশ্রয় করেনি, **কাঙালী** ও **জগমণি**—এই দু'টি চরিত্রও তার অন্তরঙ্গ পারিষদ। পাপাচারের সিদ্ধ সাধক। কাঙালী——রমেশের ব্যঙ্গের ভাষায়—যথার্থই "একজন অদ্বিতীয় 'ব্যক্তি': অসদগুণে তার তুলনা নেই। সে একজন সিদ্ধ জালিয়াত। তার বহু বদনাম এবং একাধিক বকেয়া নাম। কিছুদিন এ্যাটর্নির ক্লার্কগিরি করায়, মিথ্যে মামলা সাজাতে সে সুদক্ষ। সম্প্রতি কলকাতায় হরিহর ডাক্তার সেজে আছে।" জগমণি তার সুযোগ্যা সঙ্গিনী। তার বর্তমান পেশা—তার নিজেরই কথায়—"ডিস্‌পেন্সারি খুলে নিকরিপাড়া, ডোম পাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক করে দিন পোষায়। আরও আরও সব কার্য আছে তাতেও কিছু পাই।" বলা বাহুল্য—কাঙালীর এই "আরও আরও কার্য" অপ্রকাশ্য, কারণ মারাত্মক ব্যবসায়। যদিও ডাক্তারি তার নিকিরী আর ডোমপাড়াতে, তবু কতকগুলি ইংরেজী

বুলিও সে শিখে রেখেছে। যাতে ভদ্র পাড়াতেও প্রয়োজন মতো কাজ চালিয়ে আসতে পারে। 'রিঅ্যাকশান' 'কোলাপ্স' 'এপোপ্লেকসি' 'মাইল্ড ডোজা' প্রভৃতি পরিভাষা মুখস্থ করে নিয়েছে। এইসব ব্যবহার করে সে ভদ্রপরিবারে 'আরও আরও কার্য' করে থাকে। তার এক নমুনা পাওয়া গেছে—যোগেশকে মাতাল করবার চক্রান্তে, আর এক নমুনা পাওয়া গেছে—যাদবকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টায়। এইসব কার্যে কাঙালী এতো অভ্যস্ত যে কাজ করতে তার হাত বা বুক একটুও কাঁপে না। কাঙালী বাস্তবিকই একজন কুশলী শয়তান।

কিন্তু এত কুশলী হওয়া সত্ত্বেও কাঙালী জগমণির কাছে একেবারেই নাবালক—বলতে গেলে, 'স্টুপিড' 'মুখ্য'—'বে-আক্কেল'। সে যেন বিকৃতির আদ্যাশক্তি—শয়তানের স্ত্রী-সংস্করণ। বহুরূপী বিদ্যাধরীই সে বটে। সে চাপরাসীরূপে বিল সাধে, খানসামারূপে তামাক দেয় এবং খাস বিদ্যাধরীরূপে টাকা ধার দেয়—চার টাকা দিয়ে চল্লিশ টাকা লিখিয়ে নেয়। "আরও আরও কার্যে, সে কাঙালীর শুধু সহধর্মিণীই নয়—প্রধান মন্ত্রণাদাতা, যাকে বলে—মাথা। রমেশের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—জগমণি 'পানাউল্লার ঠাকুরদাদা'। এক আঁচড়ে সে মানুষ চেনে! রমেশকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে—'ও দেখতে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, ও যে উকীল দেখছি ততদিন ··· বিশটা জাল করবে ··· যখন ডাক্তারখানা রাখতে বললে কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে ত কি বলেছি।' বিনা বাঁধনে সে কোন কাজ করে না এবং কাজ করতে নেমে মাঝপথে থামতে জানে না। মিথ্যা, ছলনা, প্রবঞ্চনা, হত্যা কোন কাজকেই পাপ বলে পরিহার করে না। কোন্ প্যাঁচে কাকে জড়াতে বা ঘায়েল করতে হবে তার পরিষ্কার পরিকল্পনা তার মাথায়। রমেশ ঠিকই বলেছে—'বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো।' আর বলবেই বা না কেন? জগমণিই তো মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রি করে যোগেশের নামে ওয়ারেণ্ট বের করবার বুদ্ধি দিয়েছে

—পতিপ্রাণা জ্ঞানদা বাড়ী বিক্রী করে টাকা দিয়ে যোগেশকে ছাড়িয়ে নেবে জেনেই তা করেছে ; মদন পাগলাকে দিয়ে বাড়ীর দলিল চুরি করিয়ে এনেছে জ্ঞানদাকে নিঃস্ব করবার জন্য, অবশিষ্ট টাকা ফুরিয়ে ফেলবার জন্য যোগেশের মদ বন্ধ করে দেওয়ার বুদ্ধি দিয়েছে। কি অদ্ভুত শয়তানি প্রতিভা! জগমণি অবশ্যই বড় গলায় বলতে পারে—"মনে করিস আমি মেয়ে মানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের। মাই দুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝতুম কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি।...পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে কি করব ?"

তবে এইসব কুৎসিত এবং বিকৃত চরিত্রেই সংসার যদি পূর্ণ হতো তা'হলে সংসারের চেয়ে বড় নরক আর কোথায়ও থাকতো না—জগতের সব আলো কীটে-কাটা পুষ্পের মতো কালো হয়ে যেতো। বিকৃতি যত সত্যই হোক, প্রকৃতির চেয়ে সত্য হতে পারে না এবং পারে না বলেই প্রকৃতিকে সে কখনই নির্মূল করতে পারে না। প্রকৃতিকে সে আঘাত করতে পারে, সাময়িকভাবে পর্যুদস্তও করতে পারে, কিন্তু—কখনই একেবারে গলা টিপে মারতে পারে না। সংসারে কাঙালী, জগমণি এবং রমেশ যেমন আছে, তেমনি আছে যোগেশ, প্রফুল্ল, জ্ঞানদা, পীতাম্বর, সুরেশ, শিবনাথ, আছে ভজহরি, আছে মদন পাগল। এদের চরিত্রে ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, কারো কারো চরিত্রে অল্পস্বল্প বিকৃতিও আছে, কিন্তু সব কিছুর উপরে আছে—মনুষ্যত্ব-প্রীতি—স্নেহ-প্রেম-প্রীতির মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, এক কথায় ধর্মবোধ। প্রফুল্ল বালিকাবধূ—সরলা। রমেশের শয়তানি বুঝবার মতো বুদ্ধি তার নেই, কিন্তু আছে—স্নেহ-প্রেম-প্রীতিময় সুন্দর একটি হৃদয়—মানবিক মূল্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। জ্ঞানদাও—সরলবুদ্ধি পতিপ্রাণা স্নেহ-প্রীতিময়ী নারী। সরলতা তার সহজাত। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো তাঁর ধৈর্য। শত আঘাতেও তাঁর চরিত্রে কোন সংক্ষোভ জাগে না। পীতাম্বর—যোগেশের কর্মচারী বটে কিন্তু সে সাধারণ কর্মচারী মাত্র নয় ; যোগেশের পরিবারেরই সে একজন এবং এমন একজন

যে দুঃখ লাঞ্ছনার ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও যোগেশের পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য কৃতসংকল্প। ধর্মের ধাতু দিয়ে এমন ভাবে সে গড়া যে শত প্রলোভনেও তাকে ধর্মচ্যুত করতে পারে না। পীতাম্বর স্বভাবত ভাল মানুষদেরই একজন। এরা শুধু যে অন্যায় করে না তাই নয়, অন্যায়কে সহ্যও করে না। পীতাম্বর নিষ্কলঙ্ক সৎস্বভাব চরিত্র।

তবে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক না হয়েও আসলে সৎস্বভাব হওয়া যায়—'মানুষ' থাকা যায়—তার দৃষ্টান্ত সুরেশ ও শিবনাথ। প্রচলিত অর্থে এরা সচ্চরিত্র নয়, কিন্তু আসলে এরা চরিত্রহীন নয়। সুরেশ অল্প বয়সেই পয়সা উড়াতে শিখেছে—আমোদ-প্রবণ 'ইয়ার' হয়েছে; কিন্তু যাকে বলে নীচাশয় তা সে হয়নি—কোন হীন কাজ বা মিথ্যাচার সে করেনি। 'আপনার কুলবধূকে পুলিশে হাজির করার চেয়ে সে চোর অপবাদ মাথায় নিতে প্রস্তুত; বন্ধু—শিবনাথকে বাঁচাবার জন্য সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে সে কুণ্ঠিত নয় এবং ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ প্রভৃতি জীবন-রস তার হৃদয় থেকে শুকিয়ে যায়নি। সুরেশের বন্ধু শিবনাথ সুরেশের মতোই হৃদয়বান প্রকৃত বন্ধু। সুরেশকে সে যথার্থই ভালবাসে। তার জন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত। তার দুঃখে সে দুঃখিত, তার সুখেই সে সুখী। শিবনাথের মায়ের কথা মিথ্যা নয়—তারা শুধু বন্ধু নয় তারা যেন দু'ভাই।

চরিত্রহীন হলেও, লোক যে হীন চরিত্র বা 'অমানুষ' নাও হতে পারে, ভজহরি তার সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'নরানাং মাতুলক্রমঃ'—বলে যে কথাটি আছে ভজহরিতে তা কিছু কিছু ফলেছে। মাতুল কাঙালীচরণের শিক্ষা ও সঙ্গ দোষেই ভজহরির চারিত্রিক বিচ্যুতি ঘটেছে। ভজহরির অতীত ইতিহাস খুবই করুণ। জমিদারের অত্যাচারে তার বাপ অকালে মারা যায়, মা ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে বাধ্য হয় এবং না খেতে পেয়ে গাছতলায় পড়ে মারা যায়। ভাইগুলোও একে একে ঐভাবে মরে। বোনটিকে একজন নিয়ে যায়; সে আসে মামার কাছে। মামা-বাড়ীতে তার কাজ ছিল—"গরুর জাব দেওয়া,

বাসন মাজা, উনুন ধরানো, ভাত রাঁধা" আর খাস্ত ছিল—"মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত।" কাঙালীর সঙ্গে যে থাকবে, জেলকে শিয়রে রেখেই সে থাকবে—ভজহরি ইতিমধ্যেই জেলটা আসটা ঘুরে এসেছে, 'মদটা ভাঙটা' খায় এবং অস্থানে কুস্থানে রাত কাটায়। আর মামার আরও আরও কার্যে সাহায্য করে।

ভজহরির এসব কোন কাজেই 'কুচ পরোয়া' নেই। রেখে ঢেকে সে কথা বলে না—এমনকি লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া বলে তার একটা মেয়েমানুষ আছে সে কথাও সে সকলেরই সামনে বলে। সে আর কিছুই চায় না—চায় শুধু পুঁটিয়াকে নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে এবং তার জন্য কিছু টাকা। মাত্র ষোল টাকায় সে মিথ্যা জমিদার—মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজতে পারে এবং সাজে—'কারণ সেই রাত্রে নিদেন ষোল টাকা তার চাই'।—"এই ধরনা পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু'টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষ হবে না ···" অর্থলোভী সে নয়। তার কাছে অর্থ দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপায় মাত্র। সে রমেশের বা কাঙালীর মতো—ইচ্ছা করে বা প্রবৃত্তির বশে পাপ কাজ করে না। পাপ কাজের সঙ্গে তার মনের কোন যোগ নেই। এক কথায় সে শয়তানের চর নয়। সাদা লোক না হলেও রমেশ—কাঙালীর মনের মতো তার মন শয়তানের কারখানা নয়। ভজহরি চরিত্রহীন, কিন্তু হীনচরিত্র নয়। সে মদ-ভাঙ খায়—নেশা করে মেয়ে মানুষ নিয়ে থাকে—এই পর্যন্তই তার বিকৃতির পরিধি; কিন্তু যাকে বলে ইচ্ছার (Will) বিকৃতি—মনুষ্য-স্বভাবের মারাত্মক বিকৃতি, যাতে মন পচে যায়, সেই বিকৃতি তার চরিত্রে নেই। যেমন সে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া সেজে যোগেশের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিতে সাহায্য করে, তেমনি আবার ফাঁকি ধরিয়ে দিতেও যায়—বিপদ আছে জেনেও যায়। এই এদের চরিত্র। সে অর্থ চায় না, বিষয় চায় না—খ্যাতি চায় না, প্রতিপত্তি চায় না, চায় শুধু—নিশ্চিন্ত হয়ে পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকতে। শিবনাথকে সে বলে—"তোমরাও

সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকব"—এ তার অন্তরের কথা।

ভজহরিকে আমরা যদি বিকৃত-চরিত্রের পংক্তিতেই স্থান দিতে চাই, তা হলে সেই শ্রেণীতেই তাকে রাখতে হবে যাতে আছে সেইসব আপাত-বিকৃত চরিত্র—যারা অভ্যাসের বা সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে পাপ কাজ করলেও পাপ কাজের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ বা সায় থাকে না এবং থাকে না বলেই পাপ কাজের পরেই অন্তরের প্রেরণাতে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজও করে বসতে পারে; যাদের কায়-মনোবাক্যের আচরণের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না; বাতিকগ্রস্ত না হলেও যাদের বায়ু প্রবল। এই শ্রেণীরই একটি অতিকোটিক চরিত্র পাওয়া যায় মদন পাগলের মধ্যে।

মদন ঘোষ একটি বাতিকগ্রস্ত চরিত্র। বাহ্যত সে একজন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। বংশরক্ষা তাকে করতেই হবে এবং সেজন্য চাই একটি মেয়ে, সে যেমনই হোক না কেন। লোকে তাকে 'পাগল' বলেই জানে, শুধু দুই একজন জানে—"সে পাগল নয়, অমনি পাগলামো করে বেড়ায়। ওসব লোক কি ধরা দেয়।" যোগেশের মা সেই দুই-এক জনের মধ্যে একজন। কারণ, তার মাদুলী ধারণ করার পরেই তার ছেলে হয়েছিল। সে যাই হোক মদন অবদমিত কামের বিকারে 'বিয়ে-পাগলা' হয়নি, তার পাগলামো বা বিয়ের বাতিক এসেছে 'বংশরক্ষা' করার ঐকান্তিক আবেগ থেকেই। মদন ঘোষকে নিয়ে সকলে মজা করে। একবার দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, আর একবার বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, এবার সুরেশ তাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে কাঙালীর আড্ডায় নিয়ে এসেছে—জগমণিকে কনে বলে চালাতে চেষ্টা করেছে। এই বাতিকের ছিদ্রপথেই মদন ঘোষের মধ্যে পাপ প্রবেশ করেছে—মদন জগমণির পাপ কাজের সহায়তা করেছে। বংশরক্ষার লোভে এবং পাহারাওয়ালার ভয়ে, জগমণির আদেশে জ্ঞানদার চোখকে ফাঁকি দিয়ে দলিল চুরি করে এনেছে এবং যাদবকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। দলিল চুরি এবং

ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে আসা অসৎ কাজ বটে, কিন্তু এই কাজের জন্ম তাকে আমরা মূলতঃ দায়ী করতে পারিনে, কারণ চোর বলেই সে চুরি করেনি বা ছেলেধরা বলেই ছেলে ধরেনি, সমস্তই তার বাতিকগ্রস্ত সত্তার কাজ—আসল সত্তার কাজ নয়। সেই আসল সত্তা ছিল বাতিকে ও ভয়ে আচ্ছন্ন। সেই সত্তা বলে—'পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না' সেই সত্তাই আতঙ্কে অস্থির হয়ে বলে উঠে—না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে।…"হায়! হায়! কেন আমি পাহারাওয়ালা বে করেছিলাম!" কিন্তু ভয় কি সহজে যায়? প্রাণভয়ে সে অস্থির—দলিল চুরির দায়ে ছেলে চুরির দায়ে, পাহারাওয়ালা তাকে ধরে নিয়ে যাবে! তাকে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত, যমরাজের ভয়—ধর্মরাজের ভয় দেখানোর পরে—মদনের প্রাণভয় কেটে যায়। মদন ধর্মরাজের শরণাপন্ন হয়,—সব পাগলামো সেরে যায়; বলে—"মরি মরবো, ছেলেকে দেখিয়ে দেব—।" যে পারাভস্ম সে নিজে বেঁচে থাকার জন্য লুকিয়ে রেখেছিল, সেই পারাভস্ম সে যাদবকে খেতে দেয়। রমেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—না না বধ কত্তে পারবে না।…বধ কত্তে পারবে না। "জমাদার আর তোমার ভয় করিনি, পাহারাওয়ালা আর তোমায় ভয় করিনি। চাপরাসি আর তোমায় ভয় করিনি," এমনকি—জগমণি যখন রমেশকে যাদবকে নিয়ে যেতে বলে, তখন সে খুন করার ভয় দেখায়—প্রাণপণে বাধা দেয়। প্রাণের ভয় ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদনের বংশরক্ষার আবেগ তথা বিয়ে-বাতিকও দূর হয়ে যায়—মদন প্রকৃতিস্থ হয়!

['মদন' চরিত্র পরিকল্পনার তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে না পারলে, চরিত্রটিকে খাপছাড়া বলে মনে হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

বিয়ে পাগলা হঠাৎ কি করে বাতিকমুক্ত হলো—'আর আমি পাগল নই' বলে প্রকৃতিস্থ হতে পারলো, একটু তলিয়ে না দেখলে বুঝতে পারা যাবে না। আগেই বলেছি—মদনের বিয়ের বাতিক কামাবেগের বিকৃতি থেকে

জন্মেনি; জন্মেছে—বংশরক্ষার আবেগ থেকে। শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করলে দেখা যায়, বংশরক্ষার আবেগটিও—প্রাণরক্ষার মৌলিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—এবং সেই আবেগই প্রাণভয়ের আকারে তথা বংশরক্ষার আবেগ হয়ে দেখা দিয়েছে। মদনের বিকৃতির মূলে রয়েছে তার প্রাণভয়। প্রফুল্লের কথায় সেই ভয় দূর হতেই—তার বিকৃতির জড় নষ্ট হয়ে যায়—সে প্রকৃতিস্থ হয়। এই চরিত্রটিকে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বা ভাবের বাহন হিসাবে গণ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। এই পাগলটি গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পাগলের মতো নয়। এর ভিত্তি আধ্যাত্মিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। যোগেশের মা যাই বলুন—মদন ভাবের পাগল নয় এবং ঠিক উন্মাদও নয়।]

উন্মাদ চরিত্র একটিই আছে এবং তিনি যোগেশের মা **উমাসুন্দরী**। অনুতাপে উদ্বেগে এবং আঘাতে আঘাতে তিনি কেবল মনের ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেননি, একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন। উমাসুন্দরীর ধারণা—তার অনুতাপ—যোগেশকে সই করতে বলে তিনিই যোগেশকে অধর্মের প্রেরণা দিয়েছেন—যোগেশকে 'অন্য যোগেশে' পরিণত করেছেন। একে এই অনুতাপের জ্বালায় তিনি অহর্নিশি জ্বলছিলেন, তারপর এলো সুরেশের—অর্থাৎ ছোট ছেলের—জেলের ও পাথর ভাঙার সংবাদ—বুকভাঙা আঘাত। উমাসুন্দরী সে আঘাত সইতে পারলেন না। তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। মূর্চ্ছা ভেঙে যাওয়ার পর যিনি জেগে উঠলেন—তিনি সেই বালিকাবধূ উমাসুন্দরী—যিনি প্রফুল্লের বর্ণনায়—'যেন ছেলে মানুষ হন, যেন নতুন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, প্রফুল্লকে মনে করেন বাপের বাড়ীর ঝি।... আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী।' নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধবের মায়ের মতোই উমাসুন্দরী আঘাতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে শৈশবের বা কৈশোরের পরিবেশে ফিরে গেছেন। তাঁর চরিত্রে 'regression' ঘটেছে। আর ম্যাক্‌বেথ নাটকের লেডী ম্যাক্‌বেথের মতোই উমাসুন্দরী—ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন। চক্ষের পলক পড়ে না। দেখলে মনে হয় যে 'জেগে আছেন, তা

নয়, ঘুমুচ্ছেন।"[৩] লেডী ম্যাক্‌বেথের মতোই তাঁর চেতনা অতীত ঘটনার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তার অসংলগ্ন উক্তির ভিতর দিয়ে অতীত ঘটনাগুলি সঙ্কেতিত হয়েছে। বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্যোগ, যোগেশকে দিয়ে 'সই' করানো তথা বিষয় রক্ষার চেষ্টা, রমেশের শয়তানি—রেজিষ্টারি করে নেওয়া—সুরেশের জেলে পাথর ভাঙা—এই ঘটনাগুলির মধ্যেই তার চেতনা সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে আছে। (চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।) নতুন বালিকাবধূ-সত্তার গণ্ডী পার হয়ে চেতনা গিন্নী-সত্তায় প্রবেশ করে এবং উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনার পরিক্রমা শেষ করে আবার বালিকাবধূর স্তরে তলিয়ে যায়। গিন্নী সত্তা—'ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ বুক যায় বুক যায়' পর্যন্ত এসেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং আবার জেগে উঠে নতুন বৌ হয়ে। উমাসুন্দরীর মধ্যে এই দুই সত্তা একের পর এক কাজ করে চলেছে। তিনি অতীত স্মৃতির কারাগারে আবদ্ধ, বর্তমানহীন এক আত্মহারা উন্মাদিনী।

চরিত্র-বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করছি। তবে এই বিশ্লেষণে চরিত্রের ভাববন্ধের—অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পরিচয়ের দিকে সাধারণ পরিকল্পার দিকে যতখানি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চরিত্রের বাস্তবতা-অবাস্তবতা, সঙ্গতি-অসঙ্গতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। চরিত্র-সৃষ্টির দক্ষতা শুধু চরিত্রের ব্যক্তিত্ব পরিকল্পনার নৈপুণ্যের মধ্যেই তো সীমাবদ্ধ নয়, চরিত্রটির আচরণকে সর্বতোভাবে সমুচিত করে তোলার, চরিত্রকে বাস্তব, সঙ্গত, সমন্বিত এবং বহু-আয়তনিক করে তোলায় গণ্ডীতেও সম্প্রসারিত। চরিত্রের বিভিন্ন আয়তন (ডাইমেনশানস্) এবং ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরকে সুপরিস্ফুট করতে পারলে চরিত্রের মধ্যে যতখানি গভীরতা ও বাস্তবতা সৃষ্টি করা যায়, গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রে ততখানি গভীরতা ও বাস্তবতা আসেনি এবং তা আসেনি বলেই প্রফুল্ল নাটকখানি প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি-সাহিত্য হতে পারেনি।

এবার উপসংহার। উপসংহারে প্রথম বক্তব্য এই যে নাটকের প্রতিপাদ্য,

বৃত্ত, রস, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা' থেকে এ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যেতে পারে যে প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই বলা সঙ্গত নয়। তবে প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি হলেও খুব অনবদ্য বা প্রথম শ্রেণীর রচনা নয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে প্রত্যেক সাহিত্য কর্মের মধ্যেই প্রধান এবং অপ্রধান নানা বক্তব্য ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে এবং সেইসব বক্তব্যের মাধ্যমে মানবিক মূল্য সম্বন্ধে স্রষ্টার মনোভাব নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এর সবই হয়—জীবন সমালোচনার ভিতর দিয়ে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুই উপায়েই। প্রফুল্ল নাটকের প্রধান বক্তব্য কি এ নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি, এখানে অপ্রধান বা আনুষঙ্গিক বক্তব্য সম্বন্ধে সামান্যভাবে দুই একটা কথা বলছি। প্রথমতঃ নাট্যকার জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারিতা এবং মূর্খতাকে সমালোচনা বা তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং ভজহরি চরিত্রের উক্তির ভিতর দিয়েই তা' করেছেন। ভজহরির বাবাকে জমিদার মারতে মারতে মেরে ফেলেছিল এবং তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর—জমিদারদের বেকুবিকেও তিনি হাস্যাস্পদ করেছেন—এবং ঐ ভজহরির উক্তির সাহায্যেই—"জমিদারীর চালচুল সব ঠিক পাবেন, মোচমে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেঙ্গা এসাই, বাত করেঙ্গে হোঁ হোঁ, যেসাই,—বেকুবি মাঙ্গো—ওভি বেকুবি হ্যায়। গাদ্ধেকা মাফিক কলম পাকড়েগা উল্টাবি কাগজ লেসেগা, জমিদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন যায়গা"। দ্বিতীয়তঃ—তখনকার (আজকালকারও বটে) অলিতে-গলিতে শুঁড়ির দোকান খোলার এবং কোম্পানী রাজত্বের সমালোচনাও করেছেন। অলিতে-গলিতে শুঁড়ির দোকান থাকায় 'ভাতার-পুত' নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করা দুঃসাধ্য। কত সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কে দেখবে। কোম্পানী? কোম্পানীকে (সরকারকে) শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়। কোম্পানী টাকার লোভ ছেড়ে, সমাজের ভাল করবে যাতে

কেন? (তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।) (জ্ঞানদার—এই সমালোচনা বর্তমান সরকারের পক্ষেও প্রযোজ্য নয় কি?)

তৃতীয়তঃ 'এ্যাটর্নি' শ্রেণীর প্রতি নাট্যকারের বিরক্তি অতি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উকীল যে একটি চীজ, জালজুয়াচুরি খুন-জখম—কোনও অপকর্মেই তাদের অরুচি নেই, এই সত্যটি নাট্যকার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কাঙালীর উল্লাস—"আবার যখন এটর্নি পেয়েছি আর ভাবিনি"—এ্যাটর্নির নীচাশয়তার প্রতি তীব্রতম আলোকপাত।

চতুর্থতঃ নাট্যকার ডাক্তারদের টাকার লোভের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন—দেখাতে চেয়েছেন, ডাক্তার টাকা পেলে সব করতে পারে। জগমণি রমেশকে যখন বলে—"একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ বল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বলবে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন।"—তখন ডাক্তারের মুখে যে আলো পড়ে তাতে তার মুখ কালো না হয়ে পারে না। কাঙালীর মত 'আরও আরও কার্য' করতে সমর্থ এমন ডাক্তার যারা, তাঁরা অবশ্যই এই সমালোচনায় নিজের মুখ দেখবেন।

শেষ বক্তব্য এই—প্রফুল্ল নাটকে নাট্যকার প্রফুল্ল-যোগেশের ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়ে মানব মহত্ত্বকেই বড় করে তুলেছেন—পাপকে ঘৃণা করতে এবং মহত্ত্বকে প্রাণপণে রক্ষা করতে শিখিয়েছেন।

সমাপ্ত

জনা

(ক) পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি রস

জনা নাটকের জাতি-পরিচয় দিতে গেলে অথবা রস নিরূপণ করতে গেলে সমালোচকদের প্রথমেই এই প্রধান প্রশ্নটির সামনে দাঁড়াতে হবে—পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে-রচিত নাটকে—অর্থাৎ যে নাটকে দেব-মহিমাকে বা ভক্তি মাহাত্ম্যকে শেষ পর্যন্ত বড করে দেখানোর চেষ্টা করা হয় তাতে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন করা সম্ভব কি না এবং প্রশ্নটির উত্তরে হ্যাঁ বা না একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতেই হবে। এই কারণে, সব কিছুর আগে পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারে কি না, আমি এই মূল প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রেখে জনা নাটক দর্শক মনে ট্র্যাজেডি-বোধ জাগাতে সমর্থ হয়েছে কি না এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চাই।

কেন এই প্রশ্নটি উঠেছে, সেই 'কেন'র রহস্য খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, এর মূল রয়েছে, এ্যারিস্টটল আমাদের মনে ট্র্যাজেডি-রসের যে-সংস্কার তৈরি করে দিয়েছেন, তারই মধ্যে। এ্যারিস্টটলের আলোচনা থেকে এই সংস্কারই আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে যে, ট্র্যাজেডির ঘটনা আমাদের মনে ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি যতো ভাবই জাগাক না কেন নায়কের পরিণতি দেখে আমাদের মনে শেষ পর্যন্ত শোচনা স্থায়ী হওয়া চাই-ই। তা' না হলে, 'নাটক'কে আর যাই বলা যাক ট্র্যাজেডি বলা চলবে না। ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব 'শোচনা' (পিটি) ট্র্যাজেডি নায়কের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে একথাটা এ্যারিস্টটল বিশেষ ভাবেই প্রতিপাদন করেছেন। দেখিয়েছেন—'পিটি'ই (শোচনা) ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব। অতি ভালো নায়ক ট্র্যাজেডির নায়ক হবে না এই কারণে যে, অতি ভালোর ভাগ্যবিপর্যয় এবং দুঃখ-দুর্দশা আমাদের মধ্যে শোচনা না জাগিয়ে মনে দারুণ আঘাত দেয়। অতি মন্দের ভাগ্যবিপর্যয় এবং দুঃখ-দুর্দশা

আর যতো ভাবই জাগাক শোচনা জাগাতে পারে না এবং পারে না বলেই ট্র্যাজেডি নায়ক হওয়ার অনুপযুক্ত। ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে শুধু সেই চরিত্রই যে অতি ভালো বা অতি মন্দ নয়, যার ভাগ্যবিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্দশার দৃশ্য আমাদের মনে শোচনার উদ্রেক করতে পারে। এ্যারিস্টটল গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন—কোন কোন ট্র্যাজেডির ঘটনা বা দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে ভয় এবং বিস্ময় এই দুটি ভাবকেও বেশী কম তীব্রভাবে জাগায় এবং বিলাপপ্রধান প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির আস্বাদ থেকে এইসব ট্র্যাজেডির রসের আস্বাদ ভিন্ন, কিন্তু তাই বলে তিনি ভয় বা বিস্ময়কে ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব বলে গণ্য করেননি। বোধ হয় এই যুক্তিতেই করেননি যে, অতি মন্দ ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত শক্তির বিস্ময়জনক সংক্ষোভ আমাদের মধ্যে আতঙ্কমিশ্র বিস্ময় (awe) জাগাতে সক্ষম হলেও, অতি মন্দ ব্যক্তির পতনে শোচনা জাগে না এবং জাগে না বলেই তা ট্র্যাজেডির বিশেষ রসটি জাগাতে পারে না। ট্র্যাজেডি-নায়কের জন্য আমাদের মনে যতো (admiration)-ই থাক, ট্র্যাজেডির নায়ক শক্তির বিভূতি দেখিয়ে মনের মহিমা বোধে (sublimity) আমাদের যতো উদ্দীপিতই করুক, ট্র্যাজেডির নায়ককে যখন শেষ পযন্ত পরাজয় স্বীকার করতেই হবে, পর্যুদস্ত হতেই হবে এবং নায়কের পরাজয়ের বা বিনাশের বেদনা দিয়ে দর্শকচিত্ত সমবেদনাতুর করে তুলতেই হবে, তখন শোচনাই যে ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব হবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অধ্যাপক নিকলের ন্যায় সুপণ্ডিতও যে ট্র্যাজেডি-রস থেকে শোচনাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে অবিসংবাদিত সিদ্ধি লাভ করেননি, ট্র্যাজেডির তত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় দুর্বৃত্ত নায়ককেও শেক্‌স্‌পীয়র কি প্রক্রিয়ায় 'ট্র্যাজিক' করে তুলেছেন তার আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক নিকল্‌, "awe allied to lofty grandeur" সৃষ্টির কৌশলের উপর জোর না দিয়ে, 'pity' জাগানোর কৌশলের উপরেই বেশী করে জোর দিয়েছেন—অর্থাৎ ট্র্যাজেডির তত্ত্ব

আলোচনার সময় যাই বলুন না কেন, কোন নায়ক ট্র্যাজিক হয়েছে কি না এ প্রশ্ন আলোচনার সময় pity-কেই বিলক্ষণ 'ভাব' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা বলেন—"Tragic beauty is a species of the sublime" এবং ট্র্যাজেডিতে যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয় তা আসলে দুই "surpassingly great-এর দ্বন্দ্ব—একদিকে নিয়তিকল্প "Necessity", অন্যদিকে মানবের "grandeur d'ame"—নিয়তি—প্রতিস্পর্ধী শক্তির ঐশ্বর্য—এই দুই মহীয়ান্ শক্তির দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত এবং মানবের দেবদুর্লভ শক্তি-মহিমা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত মানবশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে, তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—'tragic emotion includes pity"—এমনকি ট্র্যাজেডি সৌন্দর্যকে মহীয়ানেরই রকম ফের বলে স্বীকার করলেও, যিনি চু কোয়াং ৎসিয়েন-এর (সাইকোলজি অফ ট্র্যাজেডি গ্রন্থের লেখক) মতো, মহীয়ানের (সাবলাইম) মধ্যে ভয় বা আত্মাবনয়ন এবং মহৈশ্বর্য-মহিমা বোধের সহাবস্থান মেনে নেননি, আত্মাবনয়নকে ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন, সেই ডি. ডি. র‍্যাফেল মহাশয়ও তাঁর দি প্যারাডক্স্ অফ ট্র্যাজেডি গ্রন্থে লিখেছেন—Chu Kwang—Tsien finds the distinction between the Sublimity of Tragedy and other forms of sublimity purely in the fact that the tragic emotin includes pity. I have suggested that peculiar mark of tragic sublimity is that tragedy presents a conflict between two forms of the sublime and makes one of these the sublimity of human heroism, appeal to us more than the other. I agree that tragic sympathy is important here……(৩৬ পৃষ্ঠা) 'Sympathy'-র প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—নায়কের প্রতি সমবেদনা থাকে বলেই আমরা নায়কের মহীয়ানত্ব বেশী করে উপলব্ধি করে থাকি এবং নায়কের সংগ্রাম দেখে এই কথাই মনে ভাবি আমাদেরই মতো

একজন মানুষ মহিমার এতো উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পেরেছে। প্রশ্ন হতে পারে—র‍্যাফেল মহাশয় কি ট্র্যাজেডির মহীয়ানত্বের মধ্যে শোচনাকে স্থান দিতে চান না? "Tragic emotion includes pity"—একথা স্বীকার করতে চান না? উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে—হ্যাঁ তিনি "pity"-কে স্থান দিয়েছেন, স্বীকার করেছেন, ট্র্যাজেডি-রসে শোচনার বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ তাঁর ধারণা—ট্র্যাজেডি সর্বদাই দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করে এবং এই দ্বন্দ্বের এক পক্ষে থাকে "inevitable power, which we may call necessity" অন্যপক্ষে থাকে—"reaction to necessity of self conscious effort"। অন্য দ্বন্দ্বের তুলনায়, ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য এই যে দ্বন্দ্বে জয়ী হয় নায়কের প্রতিপক্ষীয় শক্তি এবং নায়ক পর্যুদস্ত হয়ে যায়। ট্র্যাজেডির নায়ক—ম্যাক্‌বেথের মতো শয়তান হওয়া সত্ত্বেও "attracts our admiration, because of some grandeur d'ame' a greatness in his effort to resist and our pity for his defeat". আসল কথা, ট্র্যাজেডি দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যাই হোক না কেন নায়কের পরাজয়ে ও পতনে শোচনা জাগা চাই একথা র‍্যাফেলও স্বীকার করেছেন। চু কোয়াং ৎসিয়েনের এবং ডি. ডি. র‍্যাফেলের মতো এতো করে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেখাতে চাই—যাদের মতের উপরে গুরুত্ব দিয়ে অধ্যাপক নিকল তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থে, ট্র্যাজেডি-রসের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ট্র্যাজেডি-রসে মহীয়ানত্বের সঙ্গে সঙ্গে শোচনা ভাবেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্র্যাজেডি বোধের মধ্যে আর যে যে বোধের মিশ্রণই থাক না কেন, শোচনা-বোধ ট্র্যাজেডি-রসের জন্য অপরিহার্য। "আর যে যে বোধের" কথা বলছি এই কারণে যে, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ নাট্যতত্ত্ববিদ ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বকে যে পরিমাণে পারাদার্শনিক বা মহীয়ানের স্তরে নিয়ে গেছেন, তাতে দু'চারখানি গ্রীক নাটক এবং তিন-চার খানি শেক্সপীয়র নাটক ছাড়া আর কোন ট্র্যাজেডি নাটকই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে

স্থান পাবে না; গ্রীক ট্র্যাজেডির অনেকগুলি, সেনেকার নাটক, শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, এণ্টনি-ক্লিয়োপেট্রা প্রভৃতি নাটক, রাসিন-কর্ণেই রচিত নিওক্ল্যাসিক ট্র্যাজেডিগুলি এবং ইবসেন, বার্ণার্ডশ, প্রিয়ানদেল্লো, গলসওয়ার্দি প্রমুখ আধুনিক নাট্যকার নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডির তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সুতরাং ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বকে বা সৌন্দর্যকে আমরা সব ক্ষেত্রেই দুই 'সাবলাইম' শক্তির দ্বন্দ্ব বা, সেই দ্বন্দ্বের সৌন্দর্য বলে মনে করব না এবং এই সিদ্ধান্তই করব যে সাবলাইমের দ্বন্দ্ব ছাড়াও ট্র্যাজেডির পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং যে অর্থে 'ট্রোজান, উইমেন' রোমিও-জুলিয়েট, এণ্টনি ক্লিয়োপেট্রা, ওথেলো প্রভৃতি নাটক; কর্ণেই-রাসিন রচিত ট্র্যাজেডিগুলি এবং ইবসেন প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারের রচিত বিভিন্ন ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডির মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে সেই ব্যাপক অর্থেই ট্র্যাজেডি শব্দটিকে আমরা প্রয়োগ করছি।

এখন ট্র্যাজেডিকে স্থায়িভাব রূপে যদি 'শোচনা'-কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাহলে অবাধেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, যে, ভাব শোচনার পরিপন্থী হয়ে শোচনাকে তিরোহিত করে, সেই ভাব ট্র্যাজেডি-বোধকে ব্যাহত বা নষ্ট করে থাকে। এই যুক্তিকোণ থেকে বিচার করতে অগ্রসর হয়েই অনেকে—(সকলে নয়) বলেছেন, পৌরাণিক নাটকের পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হতে পারে না। এ-বিষয়ে আধুনিক যুগের সমালোচকরাই যে প্রথম সচেতন হয়েছেন তা নয়। খ্রীষ্টধর্মের পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি যে সম্ভব নয়, এ কথা সপ্তদশ শতকের জনৈক সমালোচক —সেণ্ট্ এভরেমণ্ড—কর্ণেই-রচিত "Polyeucte" নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—"আমাদের ধর্মীয় সংস্কার ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ বিপরীত। ট্র্যাজেডি নায়কের চরিত্রে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, আমাদের সাধু সন্তদের চরিত্রের বিনয় এবং সহিষ্ণুতা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।" বলা বাহুল্য সেণ্ট্ এভরেমণ্ড এখানে শোচনা ভাবের দিক থেকে আপত্তি উত্থাপন করেননি,

এখানে নায়ক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে চেয়েই মন্তব্য করেছেন। সেণ্ট্ এভরেমও বলতে চেয়েছেন—ট্র্যাজেডির নায়ককে যতখানি শক্তিমান, বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী হতে হবে, সাধুসন্তরা ততখানি বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী হতে পারে না বলেই সাধুসন্তদের বা খ্রীষ্টভক্তদের নায়ক করে ট্র্যাজেডি রচনা করা সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ, নায়ক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমস্যাটি পর্যালোচনা না করে, স্থায়িভাবের দিক থেকে বিচার করে দেখেছেন—ধর্মমূলক নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। আই. এ. রিচার্ড মহাশয়, 'প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে লিখেছেন—"Tragedy is only possible to a mind which is for the moment agnostic or Manichean. The least touch of any theology which has a compensating Heaven to offer the tragic hero is fatal"—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন করতে পারে শুধু সেই মনই যে মন সাময়িকভাবে অজ্ঞেয়বাদী বা ধর্মদর্শনবিষয়ে উদাসীন। যে ধর্মদর্শন ট্র্যাজেডির নায়ককে দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে স্বর্গের সুখ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, তার সামান্য স্পর্শেই ট্র্যাজেডি-রস নষ্ট হয়ে যায়। তারপর, অধ্যাপক কার্ল জেস্‌পারস্ তাঁর 'ট্র্যাজেডি ইজ নট এনাফ্' (১৯৫৩ খ্রীঃ) গ্রন্থে এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"Christian salvation opposes tragic knowledge. The chance of being saved destroys the tragic sense of being trapped without chance of escape. Therefore no genuinely christian tragedy can exist":—খ্রীষ্টধর্মের মুক্তিবাদ ট্র্যাজেডি-বোধের বিরোধী। ট্র্যাজেডি নায়ক যে অনিবার্য পরিস্থিতি বা সঙ্কটের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা' থেকে তার নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় থাকে না, নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকলে শোচনীয় নিরুপায় পরিণামের অনিবার্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতা থাকে না। ফলে ট্র্যাজেডি-বোধ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব খাঁটি খ্রীষ্টধর্মমূলক ট্র্যাজেডি বলে কোন ট্র্যাজেডি থাকতে পারে না। অবশ্য অধ্যাপক জেস্‌পারসের আগে, আর

একজন—অধ্যাপিকা—উনা এল্‌লিস-ফেরমোর—তাঁর 'দি ফ্রন্টিয়ার্স অফ ড্রামা' (১৯৪৫ খ্রীঃ) গ্রন্থে আরও সুন্দরভাবে ধর্ম-চেতনা ও ট্র্যাজেডি-বোধের সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"The tragic mood is balanced between the religious and non-religious interpretations of catastrophe and pain, and the form, content and mood of the play which we call a tragedy depend upon a kind of equilibrium maintained by these opposite readings of life to neither of which the dramatist can wholly commit himself" (পৃঃ ১৭-১৮)—এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, বিপত্তি ও বেদনাকে যুগপৎ ধর্মীয় এবং অধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার উপরে ট্র্যাজেডি-বোধ নির্ভর করে। এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর ভারসাম্যের উপর ট্র্যাজেডি নাটকের রূপ, বিষয়বস্তু এবং মেজাজ নির্ভরশীল। নাট্যকার এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর কোন-একটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। আই. এ রিচার্ডসের মত মিস এল্‌লিস ফেরমোরও বলেছেন—"that Manichaestic balance from which tragedy springs"। অ-ধর্মীয় দৃষ্টি বলতে তিনি বুঝেছেন—intense awareness of evil and pain—জগতে পাপ আছে, অন্যায় আছে, দুঃখ বেদনা আছে—এবং দৃঢ় চেতনা বা প্রত্যয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টি বলতে বুঝেছেন—Some reconciliation with or interpretation in terms of good—মঙ্গলের সঙ্গে সমন্বয় অথবা মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত চু কোয়াঙ্‌-ৎসিয়েন তাঁর 'দি সাইকোলজি অফ ট্র্যাজেডি'-গ্রন্থেও এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন—"With its emphasis on the moral order of the world, on original sin and last judgement, on submission and humility, christanity is in every sense antagonistic to the spirit of Tragedy. Tragedy, as it represents the struggle of

man with Fate and as it often expresses vividly to our eyes inexplicable evils and underserved sufferings, has always something profane and blasphemous in it." (পৃঃ ২৩৬)—এই বিশ্বজগতের মূলে একটি ন্যায়ের ভিত্তি রয়েছে, জগতে পাপ আছে, শেষ বিচার আছে। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণেই মুক্তি, নতি ও বিনয় বড় ধর্ম—এই সব বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করায়, খ্রীষ্টধর্ম ট্র্যাজেডি-বোধের পরিপন্থী। যেহেতু ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখি, নিয়তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, ট্র্যাজেডি স্পষ্টাকারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে অনির্বচনীয় পাপের এবং অনুচিত দুঃখ-দুর্ভোগের দৃশ্য, সেইহেতু ট্র্যাজেডির মধ্যে সব সময়েই ধর্মবিরোধী কিছু থাকে। চু-কোয়াড শুধু যে খ্রীষ্টধর্মকেই ট্র্যাজেডির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন তা' নয়, যে-সব ধর্মের পরিপাটি দর্শন অর্থাৎ ধর্মদর্শন (থিয়োলজি) আছে সেই সব ধর্মকে এবং পরাদর্শন (মেটা ফিজিকস্)-কেও ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে ধর্মদর্শন বা পরাদর্শন আমাদের দ্বন্দ্বের, দুঃখ-দুর্ভোগের এবং পাপ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করে, এবং বেদনাকাতর প্রশ্ন শ্রান্ত চিত্তকে দ্বন্দ্ববিক্ষোভের ঊর্ধ্বে আশ্রয় দিয়ে শান্তি ও সন্তোষ দান করে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী ডি. ডি. র‍্যাফেল মহাশয় তাঁর—'দি প্যারাডক্স অফ ট্র্যাজেডি'-গ্রন্থে (১৯৬০ খ্রীঃ) কেন বাইবেল-কথিত ধর্ম-সংস্কারের পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন করা দুঃসাধ্য তার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথম কারণ,—মঙ্গলময় দৈব বিধানের সঙ্গে অনুচিত দুঃখ-দুর্ভোগ ব্যাপারটিকে সমন্বয় করা যায় না; দ্বিতীয় কারণ—ট্র্যাজেডির নায়কের প্রতি যে কারণে admiration জন্মে, সেই কারণটির অভাব। ট্র্যাজেডির নায়কের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতা প্রেম, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ থাকতে পারে বটে কিন্তু যে বিনয়গুণটি সব গুণের সেরা সেই গুণটি দিয়ে—admiration জাগানো খুবই দুঃসাধ্য, বলা চলে, অসাধ্য ব্যাপার। ট্র্যাজেডির নায়ক যদি ভগবানের বা দেবতার সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, নায়ককে শ্রদ্ধার চোখে দেখা আর

অধার্মিক হওয়া একই কথা, কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান শুধু শক্তিরই পরাসত্তা নন, তিনি সত্য, শিব, সুন্দর, প্রেম—সব কিছুরই পরাৎপর সত্তা।

যে ধর্মদর্শন এমন একজন সর্বব্যাপী, সর্বাতিশায়ী এবং সর্বগুণাধারার ঈশ্বরকে স্বীকার করে, তার সংস্কার নিয়ে দেখলে দেখা যাবে—অনুচিত দুঃখ-দুর্ভোগ বলে কিছু থাকতে পারে না; মঙ্গলময় ঈশ্বর অন্যায় করতে পারেন না। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মানুষের জীবনে যে দুঃখ-দুর্ভোগ বা সঙ্কট নেমে আসে, তার কারণ মানুষ নিজেই, মানুষ পাপের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়, অথবা ঐ সব দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে ভগবান মানুষের ভগবদ্‌ভক্তি পরীক্ষা করেন। বাইবেলে যে-সব নির্দোষ মানুষের দুঃখ-দুর্বিপাকের কাহিনী আছে (জোভ, সামস্‌ এবং ইসায়া'তে বর্ণিত) তা' মানুষের ট্র্যাজেডি দেখানোর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি, লিখিত হয়েছে—ভগবদ্‌-বিধানের মঙ্গলময়তা প্রদর্শনের জন্য—পাপের পরিণাম দেখানোর জন্য। র‍্যাফেলের মতে জোভের কাহিনী—বা সামসনের কাহিনী, ট্র্যাজেডি বোধ জাগাতে পারে না। বিভিন্ন কাহিনী আলোচনার পরে, র‍্যাফেল সিদ্ধান্ত করেছেন…"the religion of the bible is inimical to tragedy, first because it is optimistic and trusts that evil is always a necessary means to greater good and secondly because it abases man before the sublimity of God. Tragedy on the other hand treats evil as unalloyed evil, it regreats the waste of human worth of any kind and does not think that innocent suffering can be justified. Secondarily it shows human effort to be sublime, a fit match for the sublimity of Nature and nature's "Gods." অর্থ:—বাইবেলের ধর্ম ট্র্যাজেডির পরিপন্থী। কারণ, প্রথমতঃ এ আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করে যে অমঙ্গল অধিকতর মঙ্গলেরই উপায়বিশেষ এবং দ্বিতীয়তঃ, এ মানুষকে ভগবানের

শক্তির কাছে অবনত করে। অন্যপক্ষে, ট্র্যাজেডি অমঙ্গলকে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলেই মনে করে, যে-কোন রকম মানবিক মূল্যের অবক্ষয়ের জন্ত অনুশোচনা করে এবং অনুচিত দুঃখ-দুর্ভোগকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে না; দ্বিতীয়তঃ এ মানব প্রচেষ্টাকে মহিমময় মর্যাদা দেয় এবং প্রাকৃতিক এবং দৈব মহিমায় প্রকৃত প্রতিস্পর্ধী বলে মনে করে। অধ্যাপক র‍্যাফেল 'রিলিজিয়াস ট্র্যাজেডি'-গুলি মিলটনের স্যামসন এগোনিষ্টিস্, কর্ণেই-এর পলিইয়ুক্তে, রাসিনের "ঈস্থের" "এ্যাথালিয়ে" এবং ফেদ্রে, বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন— "Racine plays are the only ones that can with any plausibility be called tragedy within the ambit of Biblical religion" তবে সেখানেও যে ট্র্যাজেডি-সংস্কার এবং ধর্ম-সংস্কারের দ্বন্দ্ব রয়েছে সে-কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করেননি।

জনা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে পরাদর্শনে ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব দুঃখ-দুর্ভোগের ঘটনার কোন পারমার্থিক অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব নেই, ঘটনাগুলি মায়াপ্রবঞ্চ ছাড়া আর কিছুই নয়, একজন মঙ্গলময় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সব কিছুর নিয়ন্তা বলে স্বীকার করা হয় এবং সব দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্বিপাককে মঙ্গলময়ের নিগূঢ় ইচ্ছার ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে দৈব বিধানকে অভ্রান্ত, অপক্ষপাতী এবং মঙ্গলময় বলে মনে করা হয়, তেমনি পরাদর্শনের সংস্কার সামাজিকের মনে প্রবল রূপে বিরাজ করলে, ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এবং সম্ভব হয় না এই কারণেই যে, ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টির জন্য, ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্দশা ও শোচনীয়

পরিণামের বাস্তবতা যেমন অপেক্ষিত, তেমনি অপেক্ষিত মানুষের শোচনীয় পরিণামের জন্য মানুষের সহজ সমবেদনাবোধ। যে বিশ্বাসে জীবনের দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্বিপাক এবং বিপত্তি-পরিণাম শেষ পর্যন্ত মায়া হয়ে, নতুনতর, উন্নততর সংস্থিতির মধ্যে মিলিয়ে যায়, যে বিশ্বাস জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্য জীবনের সহজ সমবেদনাকে তিরোহিত করে, সেই বিশ্বাস ট্র্যাজেডি-রসের পক্ষে খুবই মারাত্মক। বেদনাবন্ধ আছে বলেই তো ট্র্যাজেডি সম্ভব হয়েছে সুতরাং সব বোধকে ছাপিয়ে বেদনা বড় হয়ে না উঠলে ট্র্যাজেডি-রসের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। **পৌরাণিক নাটকে** ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নিম্নলিখিত কারণে :—

(ক) পৌরাণিক কাহিনীতে মানবলোকের ও দেবলোকের ব্যবধান খুব অল্পই থাকে, অনেক সময় থাকেই না। কখনও দেবতা অভিশপ্ত হয়ে নরদেহ ধারণ করেন, কখনো বা দেবতা ও মানুষের মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে কাহিনীটির লৌকিকতাব তথা বাস্তবতার গুরুত্ব হ্রাস পায়। যেমন অভিশপ্ত দেবতার—দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্ভোগ ও আপাত শোচনীয় পরিণাম আমাদের মনে ট্র্যাজেডি-রসের উপযুক্ত ভাবাবেগ জাগাতে পারে না, তেমনি দেবতা ও মানুষের সম্পর্কের ভিত্তির উপরে যে কাহিনী গঠিত হয়, সেখানে দৈববিধান ও নিয়তি চেতনার প্রাধান্য ঘটে, এবং ঘটে বলেই—মানুষের জন্য মানুষের সহজ সমবেদনার গতি ব্যাহত হয়। এই কারণে অভিশপ্ত দেবতার বা দেব-ঔরস-জাত ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও শোচনীয় পরিণাম (লৌকিক দৃষ্টিতে শোচনীয়) নিয়ে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) পৌরাণিক কাহিনীতে মানুষের জীবন বৃত্তের মাধ্যমে মুখ্যতঃ দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্যকেই উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে এবং এই সত্যটিই প্রচার করা হয়ে থাকে—দৈব ইচ্ছার উপরে কোন শক্তি নেই, দৈব-বিধান মঙ্গলময় দেবতার কৃপা লাভই একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের

দ্বারাই সেই কৃপা লাভ করা যায়। মানুষ রিপুর তাড়নায় মদান্ধ মোহগ্রস্ত হয়ে দেব-বিরোধী বা নীতি-বিরোধী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এবং দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা দেবতার দয়ায় দায়মুক্ত হয়। সমস্ত দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মান্তিক আঘাতের পরেও এমনকি মৃত্যুবরণ করেও, দৈবকৃপা লাভ করার পরম সৌভাগ্য বা পরম পদ অর্জন করে চিরধন্য হয়—জীবনের সব ক্ষতির আশাতীত পরিপূরণ হয়।

(গ) পৌরাণিক কাহিনী এই পরাদর্শনকেই প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করে যে এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময় সংসারের ঊর্ধ্বে আছে এক পরম সত্যের লোক, অমৃত-লোক, আছে এক পরম সত্তা—যা থেকে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, যাকে আশ্রয় করে এই বিশ্ব বিরাজ করছে এবং যার মধ্যেই সব কিছু লয় পেয়ে থাকে। তিনি সচ্চিদানন্দ। জগতের মধ্যে 'নানা'কে দেখা,—দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বিনষ্টি দেখা—মায়িক দৃষ্টির ফল। মায়িক দৃষ্টি অন্তর্হিত হলেই স্বরূপ দেখা যায়, দেখা যায়—সব ক্ষতি তুচ্ছ করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে, দেখা যায়—"ক্ষয় মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা"। মায়াচ্ছন্নদৃষ্টিই জগতে ক্ষয় দেখে, ক্ষতি দেখে, দুঃখ দেখে, দুর্গতি দেখে—জীবনের দ্বন্দ্বসংক্ষোভ দেখে বেদনার্ত হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে এই ধরনের দার্শনিক সত্যকে বড় করে প্রচার করার চেষ্টা করা হয় বলেই, ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও পরিণামের গুরুত্ব ছোট হয়ে যায়, মায়াবাদী সংস্কারের চাপে দুঃখ-দুর্গতি, পরিণতির শোচনীয়তা তলিয়ে যায় এবং অখণ্ড ও নির্দ্বন্দ্ব পরম সত্তার আশ্রয় লাভ করে মন বেদনাশূন্য এবং শান্তভাবাপন্ন হয়। বাস্তবিকই এই জাতীয় অদ্বৈতবাদী পরাদর্শন বা মায়াবাদী দর্শনের প্রবল সংস্কার ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী না হয়ে পারে না। যেখানে ট্র্যাজেডি-রসের জন্য দুঃখ-দুর্গতির ও বেদনার বাস্তবতা অত্যাবশ্যক, সেখানে অদ্বৈতবাদী পরাদর্শন বা মায়াবাদ সেই দুর্গতির ও বেদনার বাস্তবতাকেই অস্বীকার করে।

তবে কি পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ট্র্যাজেডি লেখা, ধর্মমূলক ট্র্যাজেডি লেখা, সম্ভব নয়?

আমরা জানি, প্রাচীন গ্রীসের ট্র্যাজেডিগুলি যখন রচিত হয়েছিল, তখন গ্রীক ধর্মদর্শন ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল, দেবাদিদেব বিধাতা—পুরুষের এবং অপ্রতিহত নিয়তির ধারণাও বেশ বদ্ধমূল হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই গ্রীসে ট্র্যাজেডি-নাটকের সোনার ফসল ফলেছিল। কেমন করে এ ঘটনা সম্ভব হল? দৈব ইচ্ছার অধীনে সব কিছু ঘটছে, জিউস সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং মঙ্গলময় বিশ্ব বিধাতা, তার ইচ্ছা বা নিয়তিকে কেউ রোধ করতে পারে না—এ সব সংস্কার থাকা সত্ত্বেও গ্রীসের সামাজিকরা ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন করেছে কিভাবে? কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যে গ্রীক ধর্মদর্শন দেবতা, এমনকি অধিদেবতাও মেনেছে বটে, কিন্তু তা'তে "the idea of a single, all-embracing God, in whom omnipotence, omniscience, justice and goodness are bound together in unity" সেই অর্থাৎ যে ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, এবং মঙ্গলময়, তেমন কোন সর্বব্যাপী একক ঈশ্বরের ধারণা নেই। তা' নেই বলেই গ্রীসের সামাজিকদের মন একান্ত ভাবে দেব-কোটিক্ হতে পারেনি; মানুষের ভাগ্যকে দৈববিধানের অধীন করে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

কথাটি সর্বাংশে সত্য, একথা সত্য না হলেও এইটুকু সত্য এর মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে যে গ্রীকরা জিউসকে অধিদেবতা রূপে এবং নিয়তিকে অমোঘ বলে স্বীকার করলেও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও শোচনীয় পরিণামের জন্য বেদনানুভব করার সময়, দৈববিধানের চেয়ে মানুষের জীবন রহস্যকেই বড় করে দেখেছেন। দৈববিধানের মঙ্গলময়তার বা নিয়তির অমোঘতার সংস্কার দিয়ে জীবনের সহজ ও সমবেদনাকে চেপে দিতে চেষ্টা করেননি। অবোধ প্রাণের কান্নাকে অস্বীকার করতে পারেননি—যেমন গ্রীক ধর্মদর্শনের আওতায় বড় বড় ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি খ্রীষ্ট ধর্মের আওতার মধ্য থেকেই ইয়োরোপীয়

নাট্যকাররা ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন এবং সামাজিকরা ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন করেছেন এবং এখনও করে আসছেন। ভারতেও ধর্মদর্শনের, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী দর্শনের আওতায় রামায়ণের মতো করুণ রসাত্মক মহাকাব্য এবং একাধিক নাটক রচিত হয়েছে এবং ভারতের সামাজিকরা করুণ-রস আস্বাদন করে আনন্দ পেয়েছেন। এখন একথা যদি সত্য হয় যে, অতি প্রাচীন কালেই মানব-সমাজে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস দেখা দিয়েছে, এমন সমাজ নেই যার কোন ধর্মদর্শন বা পরাদর্শন নেই, এবং ধর্মদর্শনের আওতার মধ্যে থেকেই মানুষ ট্র্যাজেডি রচনা করেছে, ও করছে এবং সামাজিকরা ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন করেছে ও করছে তাহলে শেষ পর্যন্ত এই কথাই মেনে নিতে হবে যে, যে কোন ধর্মদর্শনের আওতাতেই ট্র্যাজেডির-রস নিষ্পন্ন হতে পারে—যদি না নাটকের বৃত্ত পরিকল্পনায় ধর্মাদর্শকে প্রধান করে তোলার সঙ্কল্পকে বিশেষভাবে সিদ্ধ করা হয়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও বিপত্তি পরিণামের গুরুত্বকে হেয় করে, দৈব মহিমাকে বড় করার চেষ্টা করা হয়, অথবা মানুষের জীবনদ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্গতি, বিপত্তি প্রভৃতি তীব্র সংবেদী ঘটনাকে আংশিক দৃষ্টির ফল বলে প্রতিপাদন করে, অখণ্ড মহত্তম সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা হয় তথা তাদের শোচনীয়তাবর্জিত করে তোলা হয়। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, ট্র্যাজেডির জন্য একটি নীতির জগৎ, একটি গভীর মূল্য-চেতনা থাকা আবশ্যক এবং নীতিমূল্যচেতনা ধর্মবোধেরই একটা রূপ। তেমনি একথাও স্বীকার করতে হবে—ট্র্যাজেডির জন্য, জীবন-কেন্দ্রিক দৃষ্টি, জীবনের দ্বন্দ্ব, দুঃখ, বিপত্তি মিথ্যা নয় এমন একটা প্রত্যয়ও আবশ্যক। এই দিক থেকে দেখলে অধ্যাপক উনা এল্লিস্ ফেরমোর যে বলেছেন—"The tragic mood is balanced between the religious and the non-religious interpretations of catastrophe and pain", তা খুবই খাঁটি কথা। রসাস্বাদনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

রসাস্বাদনের সময় আমরা উপস্থাপিত ঘটনাদি 'পরস্য নপরস্যেতি' ...... এমনি মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করে থাকি এবং ঐরূপ মনোভাব ব্যতিরেকে রসাস্বাদ সম্ভব নয়, তেমনি ট্র্যাজেডি-রসের আস্বাদনের সময়েও আমাদের মনে দ্বিকোটিক দোলা থাকে—একক্ষণে মন পরাদর্শনের বা ধর্মদর্শনের কোটিতে উপস্থিত হয় অন্যক্ষণে মানুষের দ্বন্দ্ব-দুঃখ-দুর্দশা বিপত্তির কোটিতে নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের বেদনার কোটিতেই লগ্ন থাকে। যেখানে নাট্যকার শেষোক্ত কোটি থেকে দর্শকের মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে, ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের কোটিতে দর্শকমনকে সংস্থিত করতে চেষ্টা করেন, সেখানেই ট্র্যাজেডি-রসের সঙ্গে ধর্মদর্শনের বিরোধ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়—ট্র্যাজেডি-রস দৈবচেতনার বা দার্শনিক সংস্কারের চাপে লুপ্ত হয়ে যায়। তা যেখানে না যায়, সেখানে ধর্মদর্শনের বা দেবমহিমার সংস্কারের অভিব্যক্তি নাটকে থাকলেও, নাটকে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। অতএব বড় কথা এ নয় যে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে কি না, নাটকে দেবমহিমার বা দেবভক্তির কথা বা কোন দার্শনিক উপলব্ধিকে প্রচার করা হয়েছে কি না, বড় কথা এই যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষের জীবনরহস্যকে —দুঃখ-দ্বন্দ্ব-বেদনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে কি না, মানুষের বেদনার জন্য মানুষের মনে সমবেদনা জাগানোর চেষ্টা মুখ্য হয়ে উঠেছে কি না! তা যদি হয়ে থাকে তবে, পৌরাণিক কাহিনীই হোক আর যে কাহিনীই হোক নাটককে ট্র্যাজেডি-রসাত্মকই বলতে হবে বাস্তবিকই, দৈববাদ বা নিয়তিবাদের সংস্কারের মধ্যে এবং খ্রীষ্টধর্মের সংস্কারের মধ্যে থেকেও যদি বড় বড় ট্র্যাজেডি রচিত ও আস্বাদিত হয়ে থাকে তাহলে এই সিদ্ধান্তই করতে হবে যে, যেহেতু সুখদুঃখাদি 'অনুভূতি প্রবৃত্তি র্বেধো ভূতানাম' প্রাণের সহজ ধর্ম বা আবেগ এবং ধর্মবোধ নিবৃত্তির মহাফল -মনন লব্ধ উপলব্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেগ, সাধারণ মানুষের কাছে (সাধু-সন্নাসী, দার্শনিকদের কথা হয়তো ভিন্ন) সুখ-দুঃখের আবেদনের জোর—অতিবাস্তব

প্রাণাবেগের (Will) জোর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাববন্ধের চেয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবনার (আইডিয়া) চেয়ে অনেক বেশী। এই কারণেই, সব কিছু জেনেশুনেও মানুষ অবোধ প্রাণের কান্নায় সাড়া না দিয়ে পারে না, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের মতোই কাঁদে—জেনেশুনে কাঁদে ও [illegible]। নিবৃত্তির চেয়ে প্রবৃত্তির জোর যে বেশী, মানব সমাজের ইতিহাসই [illegible] সাক্ষী মানুষের কানে বৈরাগ্যের মন্ত্র, অহিংসার মন্ত্র, মৈত্রী-করুণার [illegible], কতকাল আগে থেকেই [illegible] করা হচ্ছে, কিন্তু আজও [illegible] প্রবল প্রতাপে জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং [illegible] বোধ হয় এই কারণে যে জীবন প্রবৃত্তিময়—আনন্দ-বেদনার [illegible]। ধর্মদর্শন বা পরাদর্শন এক অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে সমস্ত [illegible] মেলাতে চেষ্টা করলেও, মানুষের মন থেকে 'নানা'-বুদ্ধি [illegible] এই কারণেই যে 'নানা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করার প্রবণতা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক [illegible] ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান সহজ উপলব্ধি [illegible] অন্যপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক [illegible] নিরপেক্ষ নির্দ্বন্দ্ব সত্তার জ্ঞান - পরিশীলিত বুদ্ধির আয়াসলব্ধ [illegible] জপ তপ দিয়ে মনকে ঐক্যবোধের ভূমিতে তুলে [illegible] জপ তপ বন্ধ বা একটু কম হলেই মন বুদ্ধির ভূমি থেকে নেমে সহজ অনুভবের ভূমিতে এসে দাঁড়ায়। এমনকি, অনেক সময় বোধ ও অনুভবের [illegible] এমন অবস্থাও ঘটে যে, বোধ উপস্থিত থেকেও নিষ্ক্রিয় বা অসাড় [illegible], [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো অনুভবের পায়ের তলায় পড়ে থাকে

এই মনস্তত্ত্ব সত্য বলেই, ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের [illegible] মধ্যে থেকেও মানুষ ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন করে আসছে এবং ট্র্যাজেডি রসাস্বাদনের সময়ে ধর্মীয় বা পরাদার্শনিক সংস্কারকে স্থগিত রাখছে ট্র্যাজেডি রসাস্বাদন কালে শুধু suspension of disbelief"-ই হয় না, "suspension of belief"ও হয় অর্থাৎ দৈববিধানে বিশ্বাস, অদ্বৈত পরম সত্তার বিশ্বাস স্থগিত বা গৌণ হয়ে যায়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সামাজিক যে বিষয়বস্তু নিয়েই

ট্র্যাজেডি রচিত হোক না কেন, ধর্মীয় বা পরাদার্শনিক তত্ত্বকে গুণীভূত না করলে ট্র্যাজেডি-রস ক্ষুণ্ণ হবেই। ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পরিবেশ লৌকিক বলেই ধর্মীয় বা পরাদার্শনিক সংস্কারের অনুপ্রবেশের সুযোগ কম থাকে। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে লৌকিক-অলৌকিক ওত-প্রোতভাবে মিশে থাকে বলে ঐ সব সংস্কারই নাটকের স্বাভাবিক আবহাওয়া হয়ে দাঁড়ায় এবং দাঁড়ায় বলেই, পৌরাণিক নাটকে ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের সংস্কারকে গুণীভূত করে সহজ অনুভব-শোচনাকে মুখ্য করে রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় নাট্যবস্তুর উপস্থাপনায় ধর্মীয় আবেগ এবং জীবনাবেগের মধ্যে, প্রতিস্পর্ধিতা লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ দুটি আবেগ সমকক্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও দেখা যায়, যেখানে ধর্মীয় আবেগকে জীবনাবেগ পরাভূত করে দিয়েছে, যেখানে দর্শকচিত্ত ধর্মতত্ত্বের মাহাত্ম্যের চেয়ে জীবনাবেগের ঐকান্তিক আন্তরিকতার দ্বারা অধিকতর অভিভূত হয়েছে, তত্ত্বভাবনা থাকা সত্ত্বেও দর্শকচিত্ত সহজ সমবেদনায় নায়কের শোচনীয় দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতি এবং পরিণামের জন্য ব্যথাতুর হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে পৌরাণিক নাটকে জীবনাবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ধর্মীয় বা দার্শনিক সংস্কার দিয়ে জীবনদ্বন্দ্বের বেদনাকে আচ্ছন্ন করে তোলা না হয়—সেই নাটককে আমরা ট্র্যাজেডি রসাত্মক পৌরাণিক নাটক বলতে পারি।

সুতরাং পৌরাণিক নাটক ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না তা নির্ধারণ করতে হলে বিচার করে দেখতে হবে যে, ধর্মীয় আবেগকে ছাপিয়ে জীবন-বেদনা বড় হয়ে উঠেছে কি না, আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়া সত্ত্বেও জীবনকে দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত দেখার বেদনা বলবত্তর হয়েছে কি না, এক কথায় জীবনের ক্ষয়ক্ষতি বিনষ্টের জন্য শোচনা স্থায়ী হয়েছে কি না। যেমন বিচারের গোড়াতেই নাট্যকারের অভিপ্রায় তথা নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্যটি আবিষ্কার করে নেওয়া দরকার তেমনি নাটকীয় চরিত্রের ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার রূপগুলি অনুসরণ করে. উপসংহার পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে হিসাবনিকাশ করে দেখা দরকার—নাট্যকার নিজের অভিপ্রায় বজায় রাখতে নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্যটি প্রতিপাদন করতে পেরেছেন কি না। অনেক ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় যে, নাট্যকার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পথ চলতে পারছেন না, নাটকের মধ্যে এমন কিছু উপাদান আমদানী করে বা মিশিয়ে ফেলেছেন যা ধর্মদর্শনের বা পরাদর্শনের সংস্কারকে, দৃষ্টিকে জীবনবোধের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে পরাতত্ত্বের ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। আসংজ্ঞান মনের প্রবলতর প্রেরণার ফলেই এমনি করে সংজ্ঞান সঙ্কল্প পথভ্রষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, একের ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করতে গিয়ে অন্যের ট্র্যাজেডি গড়ে হয়ে উঠে, ট্র্যাজেডি লেখার সঙ্কল্প কমেডি রচনায় পর্যবসিত হয় এবং কমেডিতে ট্র্যাজেডির আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই এতে লেখকের দুর্ব্বলতাই ধরা পড়ে।

জনা নাটকের সমালোচনার মুখবন্ধে এত কথা বলার প্রয়োজন এই কারণেই হলো যে, নাট্যকার নাটকখানিকে পৌরাণিক নাটক বলে আখ্যাত করলেও এবং নাটকে হরিভক্তির ছড়াছড়ি করলেও, যে চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণতি উপস্থাপিত করার জন্য তিনি নাটকখানি রচনা করেছেন এবং যার নামানুসারে নাটকখানির নামকরণ করেছেন, সেই জনা চরিত্রের দুঃখ-দুর্বিপাক (suffering) এবং পরিণামকে আপাত দৃষ্টিতে ট্র্যাজিক বলেই মনে হয়ে থাকে। আসল সমস্যা এই, জনা নাটকে ধর্মীয় আবেগের বা অখণ্ড চেতনার সঙ্গে মানবিক আবেগের বা খণ্ডচেতনার দ্বন্দ্ব, দুই প্রবল প্রতিস্পর্ধীয় দ্বন্দ্বের মতই প্রায় সমান লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পুত্রস্নেহ দুর্বলা ক্ষত্রিয় জননী জনা পুত্রস্নেহে এবং ক্ষত্রিয় অভিমানে অশ্বমেধের অশ্বটি বেঁধে রাখার অনুমতি দেন। ফলে একমাত্র পুত্র প্রবীরকে সমগ্র রাজ্যের নিষেধ সত্ত্বেও ধনঞ্জয়-বাসুদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মহাসঙ্কটের মুখে ঠেলে দেন—অনিবার্য মৃত্যুর কবলে প্রেরণ করেন। মৃত্যু ধনঞ্জয়ের বাণের

মুখে এসে প্রবীরকে গ্রাস করে। জননী জনার বক্ষ শূন্য হয়ে যায়—হাহাকার ছাড়া আর কিছুই সেখানে শোনা যায় না। কিন্তু জনা ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনা। তাঁর শোক বিলাপে-প্রলাপ নিঃশেষ হয় না। পুত্রের মৃত্যুর প্রতিবিধানে তাঁর শোকের স্বাভাবিক সান্ত্বনা। জনা প্রতিবিধানে প্রতিহিংসাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু জনার কাছে পুত্রের চেয়েও মর্মান্তিক হয়, রাজা নীলধ্বজের কাপুরুষতা—পুত্রঘাতীকে দেবতাসম্মানে সমাদর করবার জন্য রাজধানীতে আনন্দোৎসব করবার আদেশ দেওয়া। ক্ষত্রিয় বীরত্বের চেয়ে প্রবীরের আত্মার এত বড় অবমাননা আর কি হতে পারে? যুদ্ধের সঙ্কল্প গ্রহণে জনা ছিলেন নিঃসঙ্গ, প্রতিহিংসা গ্রহণেও তিনি নিঃসঙ্গ! প্রবীরের মৃত্যুর দৃশ্য বুকে নিয়ে মর্মজ্বালা জুড়াবার জন্য জনা শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জন করেন। বাহ্যতঃ দেখলে জনা চরিত্রে ট্র্যাজিক চরিত্রের সব লক্ষণই ফুটে উঠেছে। নিজের সঙ্কল্প বা কার্য দ্বারা দ্বন্দ্বের বা সংকটের সৃষ্টি দ্বন্দ্ব-দুঃখ-দুর্ভোগ এবং শোচনীয় পরিণাম—প্রায় সমস্ত উপাদানই এখানে পাওয়া যায়। এমনকি যাঁরা ট্র্যাজেডি নায়ক নায়িকার নিরীহতা বা ব্যক্তিত্বহীনতা পছন্দ করেন না তারাও, জনার পুরুষোচিত আচরণে সন্তুষ্ট হবেন এবং জনাকে উপযুক্ত ট্র্যাজেডি নায়িকা বলে প্রশংসা করেন। এই কারণে অনেকেই জনাকে ট্র্যাজেডি চরিত্র হিসাবেই দেখেছেন। এই দেখা অমূলক নয়। পৌরাণিক উগ্র আবহাওয়ার মধ্যেও, নাট্যকার জনার মানবী সত্তাটিকে লক্ষণীয় গুরুত্ব দেওয়ায়, গঙ্গাতনয়া রূপে কল্পনা করা সত্ত্বেও জনার মধ্যে ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনা সত্তাকে, বীরজননী সত্তাকে বিশেষতঃ, মাতৃসত্তাকে একেশ্বরী করে তোলায় জনার মধ্যে জীবনাবেগের এমন একটি মহীয়ান রূপ ব্যক্ত হয়েছে, যা ধর্মীয় আবেগের বা দৈব মহিমার প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! একথা ঠিক জনা দেবদ্বেষী নন, কৃষ্ণের নারায়ণত্বে বা ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্বেও অবিশ্বাসী নন, কিন্তু, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মে তথা লোক ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং এত বিশ্বাসী যে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করে, কৃষ্ণকৃপার মতো পরম

পদ লাভ করতে কুণ্ঠিত। ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণকেও শত্রু করতে তিনি ভয় পান না। এই ক্ষত্রিয় ধর্ম তার ধর্মাশ্রমের ধর্ম —সমাজ ধর্ম ; কিন্তু এই ধর্মের উপরেও তাঁর আর একটি ধর্ম আছে সেই ধর্ম তাঁর মূল নারী সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোক স্থিতির মূলীভূত সেই পরম প্রকৃতি—মাতৃসত্তা। জনা চরিত্রে এই মাতৃসত্তা প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাসের ঐকান্তিক তীব্রতা নিয়ে পরিস্ফুরিত হয়েছে। পুত্রের বিজয়গৌরব ছাড়া আর কোন কিছুকেই যেমন সে বড় মনে করে না, তেমনি পুত্রের মৃত্যুর পরে প্রতিহিংসা ছাড়া আরো কোন ভাবাবেগকে সে মনে স্থান দেয় না। বিরোধী শক্তি যত বড় শক্তিই হোক, হোক না ধনঞ্জয়—বাসুদেব রূপ নর-নারায়ণের মিলিত শক্তি সেই শক্তিকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাঁর ঐকান্তিক প্রতিহিংসার জ্বালাকে সে কোন দৈব কৃপার শান্তির প্রলেপ দিয়ে প্রশমিত করতে চায় না। দেবতা, দৈব বিধান, দৈব কৃপা, মাতা জনার কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোন কিছুরই মধ্যে সে শোকের সান্ত্বনা খোজে না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করে। স্বীকার করতেই হবে—এই নাটকে জনা জীবনা-বেগের প্রবল প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং উগ্র পৌরাণিকতার সমুদ্রের মধ্যে জীবন ধর্মের বা মানবতার একটি সমুচ্চ এবং চিত্তাকর্ষক শৈল হয়ে বিরাজ করছে। জনা-চরিত্রটি নিজের মাতৃসত্তার মধ্যে সংবৃত হয়ে থাকায় অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তির বা কৃষ্ণ কৃপা পাওয়ার ব্যাকুলতা সংক্রামিত না হওয়ায় চরিত্রটি মূলত, পৌরাণিক হয়েও অপৌরাণিক বা লৌকিক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনাবেগের উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়েছে এবং দেব মহিমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

'জনা আদ্যবন্তে চ' কেবল মাতা—বীরমাতা। পুত্র শোকাতুরা মাতার এক প্রদীপ্ত আলেখ্য। ~~আগেই আমি বলেছি,~~ জনা-চরিত্রের শোকাবেগ প্রতি-হিংসার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস নিয়ে এমন প্রচণ্ড আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে যে ঔচিত্য

অনৌচিত্যের সমস্ত বোধকে স্থগিত করে দিয়ে তা দর্শকচিত্তকে বিস্ময় স্তম্ভিত করে দেয়, প্রতিহিংসার অগ্নি উদ্গীরণ দেখে এই কথাই মনে হয় এ যেন এক প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ। কিন্তু পুত্রশোকাতুরা মাতার এই জলন্ত প্রতিহিংসাময়ী মূর্তিটিকে নাট্যকার এমন একটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছেন, এমন একটি পরি প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন যে ঐ ফ্রেমের রঙে ঐ পরিপ্রেক্ষিতের আভায়, মূর্তির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। একখানি পৌরাণিক ট্র্যাজেডির সুন্দর সম্ভাবনার তরী তীরে এসে ডুবে গেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নাট্যকার যে ভাবে বরপ্রার্থনা করেছেন তা'তে গোড়াতেই দর্শক মনে একটা নির্দিষ্ট আকাঙ্খা জাগিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রের মনোবাঞ্ছা পূরণ কিভাবে হলো তা দেখার জন্য কৌতূহল জেগেছে। অগ্নি নীলধ্বজের জামাতা এবং কুলদেবতা। তাঁর কাছে সকলেই বর প্রার্থনা করেছেন। নীলধ্বজের প্রার্থনা

—"যেন নটবর নবঘনকায়
বাঁশরী বয়ান ত্রিভঙ্গম ঠাম
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।"

জনার প্রার্থনা "নাহি অন্য বাসনা আমার
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু,
মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।"

প্রবীরের প্রার্থনা— "ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোর অরি,
মরি কিংবা মারি
ঘুচুক সমরবাঞ্ছা মোর।"

উত্তরে অগ্নির এক কথা—"আশা তব অচিরে পুরিবে" অথবা "মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়" অথবা "শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।" এই বর প্রার্থনা ও বর-প্রদান দর্শক মনকে প্রথমেই চরিত্রগুলির পরিণাম বিষয়ে প্রস্তুত করে তোলে; দর্শকরা বুঝতে পারে, রাজা নীলধ্বজ নররূপী নারায়ণকে দর্শন করবেন,

প্রবীরের সমরবাঞ্ছা ঘুচে যাবে এবং জনা তাঁর মা'র কোলে ফিরে যাবে, গঙ্গাজলে প্রাণবায়ু ত্যাগ করবে। যুধিষ্ঠিরকৃত অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বটিকে বেঁধে রেখে প্রবীর নিজের এবং অন্য সকলের বাসনা পরিপূরণের সুযোগটা এনে দিয়েছে। নীলধ্বজ কৃষ্ণদর্শনে ধন্য হয়েছেন, জনা পুত্রহত্যার প্রতিবিধান না করতে পেরে শোকোন্মত্তা হয়ে গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জন করেছেন, প্রবীর অর্জুনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরণালিঙ্গন করে সমরবাঞ্ছা পূরণ করেছে। নাটকের সূচনাতেই এই ভাবে চরিত্রের পরিণাম বেঁধে দেওয়া তথা একটা দৈব পরিকল্পনার বা নিয়ন্ত্রণের আভাষ দেওয়া সত্বেও এবং হরি-মাহাত্ম্য প্রচারের বাড়াবাড়ি করা সত্বেও, পুত্র-শোকার্ত জনার মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকার, আর্তনাদ এবং আত্মবিসর্জন দর্শকমনে ট্র্যাজেডি-রস জাগাতে সমর্থ হ'ত যদি না একটি ক্রোড়-অঙ্ক জুড়ে দিয়ে নাট্যকার দর্শকের দৃষ্টিতে মর্ত্য সংসারের দ্বন্দ্বকে মায়ার প্রপঞ্চ ব'লে প্রতিভাত করতে চেষ্টা করতেন, সংসারের দুঃখ বেদনাকে মায়া প্রতিপন্ন করে, প্রবীর মদনমঞ্জরীকে শিবপূজায় নিযুক্ত এবং জনাকে প্রসন্নবদনে গঙ্গার পাশে বসে চামর ব্যজনে নিযুক্ত না দেখাতেন। দর্শক দেখে প্রবীর মদনমঞ্জরী জনা—কারো মনেই কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ বেদনা নেই। সকলেই সব দ্বন্দ্বের অতীত—শান্ত ও সমাহিত চিত্ত। শ্রীকৃষ্ণ শুধু রাজা নীলধ্বজকেই দিব্যদৃষ্টি দান করেন না, দর্শকরাও দিব্যদৃষ্টি লাভ করে এবং প্রপঞ্চ বুঝে মন স্থির করে। প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিণতির মধ্যে অগ্নির বরকে সফল করে তোলা যেমন নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়েছে, তেমনি শাপভ্রষ্ট বা স্বর্গচ্যুত বা দেবসঙ্গবিচ্যুত চরিত্রকে মর্ত্য বাসের পরের স্ব স্ব স্থানে পৌঁছে দেওয়াও মুখ্য উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠেছে। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি নাট্যকার এমন ভাবে সিদ্ধ করেছেন, যাতে একটি সূঁচের আঘাতে স্ফীতকায় বাষ্পপূর্ণ বেলুনের চুপ্‌সে যাওয়ার মতো জীবনাবেগও দ্বন্দ্ব-জনিত সমস্ত ব্যথা-বেদনার পরিস্ফীত শোচনা দর্শকমন থেকে তিরোহিত হ'য়ে যায়, নিত্যানিত্য বিবেক মনকে পূর্ণ অধিকার করে, নিত্যের আলোকে জনার লৌকিক প্রচণ্ড আবেগ অনিত্যের

লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়—দৈব-পরিকল্পনার কার্য পরিণতি দেখে মন নিত্যালোকে অবস্থান করে। কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচারের বাড়াবাড়ি এবং কৃষ্ণভক্তির ছড়াছড়ি, ট্র্যাজেডি-পরিমণ্ডলে শোচনাবিরোধী বিশ্লেষক উপাদান মারাত্মক মাত্রায় আমদানী করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনার শোকাবেগের ঐকান্তিক তীব্রোচ্ছ্বাসকে 'তা' দাবিয়ে দিতে পারেনি, জনার মাতৃ হৃদয়ের হাহাকারের তলে হরিনামের ধ্বনি আচ্ছন্ন হয়েই ছিল। এবং জনার গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জন এবং কন্যার দুঃখে গঙ্গার ক্রোধ প্রকাশ পর্যন্ত, শতবাধা সত্ত্বেও শোচনাই প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ক্রোড় অঙ্কে এই প্রাধান্যকে শুধু ক্ষুণ্ণই করেনি, শোচনার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে ফেলেছে—শোচনাকে নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় করে তুলেছে। যে জনার জন্য এত শোচনা, যে প্রবীরের অকাল মৃত্যুর জন্য এত বেদনা, যে মদনমঞ্জরীর বালবৈধব্যের বেদনা, দুঃখের জন্য এত সমবেদনা, তারা সকলেই ছায়াবাজির ছায়ায় পরিণত হয়ে, শোচনাকে অহেতুক করে তুলেছে।

কথা উঠতে পারে—নাটকখানির নাম জনা; অতএব জনার ট্র্যাজেডি উপস্থাপনা করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, নাট্যকার জনা চরিত্রটিকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক আবেগ দিয়েই পূর্ণ করে রেখেছেন এবং জনার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির মহিমা প্রদর্শন করাননি অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জনা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে পুত্র-শোকের জ্বালা থেকে মুক্ত হয়েছে—এমন কোন উপসংহার কল্পনা করেননি। এই ভাবে শুধু জনার দিক থেকে দেখলে, জনাকে প্রকরণ থেকে বিমুক্ত করে দেখলে, জনাকে ট্র্যাজিক চরিত্র এবং নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলাই উচিত হবে।)

এই কথার উত্তরে আমরা বলতে পারি নাটকখানির নাম জনা হলেও ট্র্যাজেডি দেখানো নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়নি; নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রথম গর্ভাঙ্কেই স্থাপিত হয়েছে—জনার কাহিনী আশ্রয় ক'রে, নীলধ্বজের প্রবীরের

এবং জনার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণের ভিতর দিয়ে দৈবলীলা মাহাত্ম্যের প্রচার। ক্রোড় অঙ্ক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপরিহার্য উপায় রূপেই দেখা দিয়েছে এবং নাটকখানির রসকে ট্র্যাজেডির স্তর থেকে 'দেবতা-বিষয়া রতি'র অর্থাৎ 'ভাবের' (divine comedy-র) রসের স্তরে উন্নীত করে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা প্রয়োজন—জনা নাটক ট্র্যাজেডি হয়নি এবং জনা করুণ রসের উপযুক্ত আলম্বন ভাবি হওয়া সত্ত্বেও হয়নি এবং দেবতা বিষয়া রতি মর্ত্য বিষয়া রতিকে পরাভূত করে দিয়েছে—এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নয়। ট্র্যাজেডি-রস পিপাসুরা জনা-চরিত্রের 'ট্র্যাজিক' পরিণাম শোচনাকে ক্রোড়-অঙ্কের আঘাতে নষ্ট করে দেওয়ায়, নাট্যকারের প্রতি বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারের দিক থেকে বলবার কথা বোধ হয় এই যে তিনি জনার জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাবার জন্য নাটক লেখেননি, ট্র্যাজেডি-রসেরও ঊর্ধ্বে যে "ভাব" আছে (দেবতা বিষয়া রতির পারিভাষিক নাম—ভাব) সেই ভাবটি, দর্শকমনে সঞ্চারিত করার জন্যই তিনি জনা নাটক লিখেছিলেন। জনা-নাটকের অঙ্গীরস ট্র্যাজেডি-রস বা করুণরস নয়, জনার অঙ্গীরস—'ভাব' (ভক্তিরস)।

এই সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে—জনা কোন্ রসের আলম্বন বিভাব? পূর্বপক্ষ খুব জোরের সঙ্গেই বলবেন—জনা চরিত্রের দ্বারা বাৎসল্য-রস বীররস এবং শেষদিকে উৎসাহ ও ক্রোধের সঞ্চারিভাবের সংযোগের করুণরস নিষ্পন্ন হয়েছে এবং জনার চরিত্রে দেবতা বিষয়া রতি কোন সময়েই অভিব্যক্ত হয়নি। এমতবস্থায় জনা নাটককে 'ভাব' বা ভক্তিরসের নাটক বলা চলে কি করে? নাটকের নাম জনা না হ'লে অবশ্য কোন কথা ছিল না। কিন্তু জনাই যেখানে কেন্দ্রীয় ও প্রধান চরিত্র সেখানে জনা যে রসের আলম্বন বিভাব, সেই রসকেই অঙ্গীরস রূপে স্বীকার করতে হবে এবং সেই দিক থেকে জনা করুণ-রসাত্মক বা ট্র্যাজেডি নাটকই বটে। পূর্বপক্ষের উল্লিখিত আপত্তি খণ্ডন করতে হ'লে, একটি মূল প্রশ্নের আলোচনায় প্রকাশ করতে হবে এবং সেই প্রশ্নটি এই

যে ট্র্যাজেডি-রস আস্বাদন-ব্যাপারে নায়কের বা নায়িকার দুঃখ-দুর্দ্দশা বিপত্তির জন্য দর্শকের বা রসিকের সমবেদনা অপরিহার্য কি না, দর্শকমনে শোচনাকে স্থায়ী করতে হ'লে, শেষ পর্যন্ত বেদনাবোধ থাকা আবশ্যক কি না। এ কথা অবশ্য ঠিক যে রস ভাবের অভিব্যক্তি বা রূপ আস্বাদন করার আনন্দ এবং ভাবের সম্পূর্ণ সার্থকরূপ তৈরি করেই স্রষ্টারা রসসৃষ্টি করে থাকেন, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে সারা পথ দৌড়াদৌড়ি করে এসে খেয়াঘাটে গড়াগড়ি দিলে চলবে না অর্থাৎ কোন ভাবকে সারাপথ ব্যক্ত করে এসে শেষমুহূর্তে প্রবল একটি ভাবের দ্বারা তিরস্কৃত করে দিলে অন্যরসের আস্বাদন প্রধান হয়ে ওঠে এবং আগের ভাবগুলি সঞ্চারিভাবের পর্যায়ে নেমে যায়। সারাপথে শোচনা জাগাতে জাগাতে এসে উপসংহারে যদি শোচনাকে অন্যভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলা হয় তাহলে আমরা একথা নিশ্চয়ই বলতে পারবো না যে শোচনাই স্থায়িভাবে হয়েছে। শোচনাকে স্থায়িভাবে পরিণত করতে হলে শোচনার সঙ্গে এমন কোন ভাব মেশানো চলবে না যাতে শোচনা তার ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই নাটকে নাট্যকার শেষ মুহূর্তে তেমনি একটি শোচনা-নিরোধক ভাবের আমদানী করে করুণরসের বিপুল আয়োজনকে একমুহূর্তে নিরর্থক করে তুলেছেন, বিদ্যুত চমকে নাটকের পরিমণ্ডলে নতুন ভাব সঞ্চারিত করে করুণরসের আবহাওয়াকে অতিলঘু করে ফেলেছেন, ফলে 'জনা'-নাটকে আমরা ট্র্যাজেডির রস অপেক্ষা ভক্তিরসকেই বেশী করে আস্বাদন করে থাকি এবং প্রবীর মদনমঞ্জরীকে শিবের পাশে এবং জনাকে গঙ্গার পাশে প্রসন্নবদনে বসে থাকতে দেখে, আমরা অনেকে প্রসন্নচিত্তে রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে এসে থাকি। "অনেকেই" বলছি এই কারণে যে ক্রোড়-অঙ্কের দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও, দর্শকদের মধ্যে এমন অনেকে থাকতে পারেন যাদের মন থেকে পুত্রশোকাতুর জনার হাহাকার ও আর্তনাদের রেশ মিলিয়ে যাবে না, দিব্য জনার প্রসন্নবদন দেখেও যারা মর্ত্য জনার শোক-কাতর মূর্তিটিকে ভুলতে পারবেন না। এই শ্রেণীর

দর্শকের কাছে জনা অবশ্যই 'ট্র্যাজিক' বলে এবং ক্রোড়-অঙ্কটি নিষ্ফল বলে মনে হবে। কিন্তু নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত খোলা মনে অগ্রসর হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে নাট্যকার এই ভুল বুঝার অবকাশ রাখেননি। প্রবীরের ও জনার জীবনের মূল দিব্যলোকে প্রোথিত রেখেছেন এবং মর্ত্য জীবনের দ্বন্দ্ব-দুঃখ-বেদনাকে প্রপঞ্চ বলে ঘোষণা করে, তাদের বাস্তবতার গোড়া কেটে দিয়ে গুরুত্বশূন্য করে ফেলেছেন। এককথায় যে মানসিকতা অক্ষুন্ন থাকলে দর্শকচিত্তে ট্র্যাজেডিবোধ সম্ভব সেই মানবিকতাকেই বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন—জনাকে ভক্তিরসাত্মক একখানি পৌরাণিক নাটকে পরিণত করেছেন।

বৃত্ত-পর্যালোচনা

নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত ইতিবৃত্তকে নাট্যের শরীর বলে আখ্যাত করেছেন এবং শরীর ও আত্মার উপমার অবতারণা করে এই সত্যেরই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ইতিবৃত্ত রূপে আমরা নাটকের যে স্থূল শরীরটি দেখি তা আসলে প্রতিপাদ্য রূপ কোন কারণ শরীরের বা সূক্ষ্মশরীরেরই ব্যক্ত রূপ এবং সূক্ষ্মশরীরটি যেমন জীবাত্মার বিশিষ্ট ব্যক্তিগ্রহ, তেমনি প্রতিপাদ্য-রূপ সূক্ষ্মশরীরটিও "ভাব"-রূপ আত্মার দেহধারণের প্রাথমিক সম্ভাবনা। নাট্যরচনা বিধি-শাস্ত্রে 'ভাব'-কে বলা হয়, 'থিম' 'আইডিয়া' 'গোল' প্রভৃতি, সূক্ষ্ম শরীরটিকে বলা হয়—প্রেমিজ বা 'প্রপোজিশান' এবং স্থূলশরীরকে বলা হয়—'প্লট'। "আইডিয়া" অশরীরী ধারণা বিশেষ। প্রেমিজ বা প্রপোজিশান অশরীরী ধারণার শরীর ধারণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রেমিজের স্তরেও আইডিয়া নৈর্বক্তিকতার গণ্ডীর মধ্যেই থাকে বটে, কিন্তু লক্ষণীয় মাত্রায় বিশেষীভবনের দিকে অগ্রসর হয়। 'প্লট'—এর পর্যায়ে এই বিশেষীভবন সম্পূর্ণ হয়—ভাব ব্যক্তি জীবনের ঘটনায় পরিণত হয়।

যে শক্তি ইতিবৃত্তরূপী ঘটনাপরম্পরাকে একটি সমন্বিত বৃত্তে পরিণত করে সে হ'চ্ছে ঐ বৃত্তান্তর্গত প্রতিপাদ্যটি বা উদ্দেশ্যটি। এই প্রতিপাদ্য যত পরিচ্ছন্ন হয়, তত বৃত্ত-পরিকল্পনা সুন্দর হয়—নির্দোষ হয়। এই দিকে চেয়েই নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছেন—'Every good play must have a clear-cut premise।' প্রতিপাদ্য পরিচ্ছন্ন না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকার দিশেহারা হয়ে পড়েন, সন্ধি-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন না; আরম্ভ ও উপসংহারের মধ্যে সংগতি রাখতে পারেন না, অবাস্তব বিষয় আমদানী করে বৃত্তের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি ব্যাহত করেন এবং একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যেতে পারেন না।

বাস্তবিকই, বৃত্তের দোষগুণ বিচার করার আগে, নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্যটিকে আবিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক এবং এই কারণেই আবশ্যক যে, গন্তব্য স্থির করতে না পারলে যেমন গতির ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না, তেমনি প্রতিপাদ্য না ধরতে পারলে, প্রতিপাদক ঘটনার উপযোগিতা—অনুপ-যোগিতা বিচার করাও সম্ভব হয় না। বৃত্তটি সুগঠিত হয়েছে কিনা তা বিচার করতে হ'লে, বৃত্তটি যে প্রতিপাদ্যের বা মূল ভাবের শরীর সেই প্রতিপাদ্যটি আগে উদ্ধার করে নিতে হবে এবং নেওয়ার পরে, প্রতিপাদ্যকে প্রতিপাদন করতে যে 'কার্য' পরিকল্পনা করা হয়েছে তার সন্ধি বা পর্বগুলি নির্ধারণ করতে হবে। নাটকে আমরা যে সব অঙ্ক দেখি অথবা গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য দেখি, সেগুলি মূলকার্যের বা কাহিনীর বিভিন্ন পর্ব ও পর্বাঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক কার্যের মধ্যে পাঁচটি পর্যায় কল্পনা করা সম্ভব—এরই ভিত্তিতে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে কার্য্যের মধ্যে পাঁচটি সন্ধি কল্পনা করা হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক বিভাগ অর্থাৎ কার্যকে বড় বড়-পাঁচটি পর্বে ভাগ করার প্রবৃত্তি বা প্রথা থেকেই গড়ে উঠেছে এবং অঙ্কের মধ্যে দৃশ্য বিভাগ গড়ে উঠেছে, অঙ্ক নিষ্পাদ্য কার্য্যাংশকে আরো ছোট ছোট বিভাগে ভাগ করার প্রবণতা থেকে। অতএব কোন দৃশ্য বা অঙ্ক উপযোগী কি না সে বিচার নির্ভর করছে, প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদনের জন্য যে মূল কার্য্যের পরিকল্পনা

করা হয়েছে, সেই কার্য্যের সমুচিত বিভাগ হিসাবে অঙ্কটি বা দৃশ্যটি কতখানি উপযোগ হয়েছে তার উপরে। নাটকের অবয়ব-গঠনে বাস্তবিক, সাংকেতিক, একসপ্রেশানিষ্টিক এ্যাবসার্ড যে নীতিই আলোচনা করা হোক, প্রতিপাদ্য অনুসরণেই কার্য্য, কার্য্যবিভাগ এবং ঘটনা বিন্যাসের সার্থকতা বিচার করতে হবে। এই মূলসূত্র বা নিয়ম সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ বিচার মাত্রেই সূত্রসাপেক্ষ।

জনা নাটকের বৃত্ত পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে, প্রথমেই আমরা প্রশ্ন করতে পারি—নাট্যকার এমন কোন পরিচ্ছন্ন প্রতিপাদ্য সামনে রেখে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কি না এবং যদি হয়ে থাকেন তবে সেই প্রতিপাদ্যটি কি? আমার মনে হয়, পরিচ্ছন্ন প্রতিপাদ্য বলতে যা বুঝায় (ভাবকে এমন একটি বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করা যায় যে বাক্যে মুখ্য চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং পরিণাম অন্তর্নিহিত থাকবে, যেমন ম্যাকবেথ নাটকের প্রতিপাদ্য বাক্য Ruthless ambition reads to destruction) তেমন কোন পরিচ্ছন্ন প্রতিপাদ্য নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না, তবে জনা কাহিনী অবলম্বন করে কৃষ্ণমাহাত্ম্য এবং বিশেষ করে জগতের প্রপঞ্চস্বরূপতা দেখানোর উদ্দেশ্য তাঁর মনে অতি প্রকটভাবেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজকে শেষ মুহূর্তে যে কথা শুনিয়েছেন সেই—"জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি,

মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত লয়ে
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।"

—উক্তিটিকে আমরা জনা নাটকের প্রতিপাদ্য রূপে গ্রহণ করতে পারি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তদ্‌ রচিত 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিয়ে যে কথাটি বলেছেন—"ভারতবর্ষের জাতীয় মর্মে ধর্ম, দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধার্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে

হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণ নাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। **"যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয় কৃষ্ণ নামেই হইবে।"** তাতে নাট্যকারের মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্যকে বড় করে তুললে নাটকের আবেদন সার্বজনিক হবে—এই সংস্কার অবশ্যই জনা কাহিনীকে নাট্যরূপে পরিণত করার সময়ে নাট্যকারের মনে প্রবলভাবে কাজ করেছিল এবং তা যে করেছিল তার বড় প্রমাণ নাটকের শেষে নীলধ্বজের জয় ধ্বনি :

> "অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন
> জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন ॥"

ঐ সংস্কারের সঙ্গে এ বিশ্বাসটুকুও মিশে ছিল :

> "কৃষ্ণার্জ্জুন সনে বাদ নরে না সম্ভবে,
> বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি
> হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে।"

অর্থাৎ দেবতাকে অরি করলে পরাজয় ও পতন অনিবার্য।

বলাবাহুল্য যদিও মহাকালের লীলার দিকে এবং জগতের প্রপঞ্চময়তার শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজের তথা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তবু আমরা দেখতে পাই, নাটকখানির সুর আদ্যন্ত কৃষ্ণগুণগানে বাঁধা। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অগ্নিদেবের হরিগুণগান এবং বিদূষকের ব্যাজস্তুতিতে হরিভক্তি থেকে শুরু করে শেষ মুহূর্তের গুণগান এবং নিত্যনিরঞ্জনের জয়ধ্বনি পর্যন্ত, নাটকখানির আকাশে-বাতাসে হরিনামের ছড়াছড়ি। এই দিক থেকে দেখলে জনা নাটকের প্রতিপাদ্য—জগতের প্রপঞ্চময়তাও একই সঙ্গে হরিভক্তিমাহাত্ম্য। জনা উপলক্ষ, লক্ষ্য—হরিগুণগান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জনার এই জীবন প্রতিপাদ্য প্রতিপাদনের উপযুক্ত বিভাব বা বস্তুরূপটি এস. এলিয়টের ভাষায়—"অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ" হতে পারে বা পেরেছে কি না? আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সকলেরই এই কথা মনে হবে

যে জনাকে যদি কোন ভাবের প্রতিনিধি বা রূপক হিসাবে আমরা দেখতে চাই, তবে দেখব সেই ভাবটি হচ্ছে—ক্ষত্রিয় জননীর পুত্র স্নেহের ভাব এবং পুত্র-শোকক্ষিপ্তা জননীর প্রতিহিংসাপরায়ণতার ভাব। এক কথায় বীর-মাতৃত্ব।

জনা চরিত্রের পরিণাম (ক্রোড়-অঙ্কের অবস্থাটি বাদ দিয়ে) যেমন জগতের প্রপঞ্চময়তা প্রতিপাদন করে না, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণমাহাত্ম্যও প্রচার করে না। জনা কৃষ্ণ-বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে পরাজিত হয়েছে, এমন কি জনার স্বামী পর্যন্ত জনাকে পরিত্যাগ ক'রে, পুত্রশোক ভুলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এতে যতটুকু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে, জনা কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচারে তার একটুও বেশী অংশ গ্রহণ করেনি বা কৃষ্ণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে শান্তি লাভ করেনি। আর একথাও বলা চলে না যে জনাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু পরিকল্পনা করেছেন বরং জনা কৃষ্ণ বিরোধের ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকেই পরিপূরণ করেছে। অগ্নিদেব প্রথম গর্ভাংকে—

"নবরূপী পিতাম্বর আসি এই পুরে
পুরাবেন বাসনা সবার
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি"—

—এই ঘোষণা করা সত্বেও আমরা বলব, কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে জনার কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। নারায়ণকে অরি করার ফলে নারায়ণের কাছে পরাজিত হওয়ার মধ্যে যেটুকু যোগ তা ছাড়া আর কোন যোগ নেই। 'আর কোন বা প্রত্যক্ষ যোগ' বলতে আমি কি বুঝাতে চাই, তা আগেই বলেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন—জনার মনোবাসনাও চরিতার্থ করেছেন—এর বেশী কিছু জনাকে দিয়ে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হ'ত যদি নাট্যকার জনাকে মা'র কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৈব-পরিকল্পনা করতেন, শ্রীহরিকে সেই পরিকল্পনার মূল কর্তারূপে উপস্থাপিত করতেন এবং জনার গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জনকে শ্রীকৃষ্ণপদে আত্ম-

সমর্পণে পরিণত করতেন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—জনা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'লেও দৈবপরিকল্পনার কেন্দ্র হয়েছে প্রবীর অর্থাৎ শিবকিঙ্কর প্রবীর—মদনমঞ্জরীকে শিবলোকে কৈলাসে ফিরিয়ে নেওয়ার কল্পনা নাটকে যতটা হয়েছে, জনাকে গঙ্গার কোলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা ততটা প্রধান হয়ে ওঠেনি, এবং অব্যক্তই রয়ে গেছে। মহাদেব ঘোষণা করেছেন—"কিন্তু পুর্ণ হয়েছে সময়

আনিব দাসে পুনঃ কৈলাসে আলয়ে !"

জনা-নাটকে আমরা নিশ্চয়ই এটাই দেখতে চাইব যে গঙ্গাতনয়া জনাকে মাতা গঙ্গা নিজকোলে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাকুলা হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে চেষ্টা করছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞকে উপলক্ষ্য করে প্রবীরের পতন ঘটিয়ে জনাকে জাহ্নবী জলে প্রাণবিসর্জন করতে বাধ্য করেছেন। এই পরিকল্পনাটি নাট্যকার সচেতনভাবে গ্রহণ বা অনুসরণ করেননি। গঙ্গা-রক্ষকদ্বয় পাগলিনী জনাকে সামলাতে সামলাতে গঙ্গার কোল পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে বটে, কিন্তু এটা কোন মূল পরিকল্পনার অংশ নয় অর্থাৎ গঙ্গার বা শ্রীহরির পরিকল্পনার অংশ হয়ে ওঠেনি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে জনাচরিত্রের পরিণাম প্রবীরের পতনের উপর নির্ভরশীল ; জনার পরিণাম প্রবীরের পরিণাম সাপেক্ষ কিন্তু এ কথাও সত্য ও স্বীকার্য যে জনা-নাটকে মুখ্যতঃ জনাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হবে—সব পরিস্থিতি পরিকল্পিত হবে। জনার বৃত্ত-পরিকল্পনায় জনাকে অধিকতর কেন্দ্রীয়ত্বের মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল—প্রবীরকে কৈলাসে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাকে গৌণ করে জনাকে গঙ্গার কোলে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাকে আরো মুখ্য ও সুপরিব্যক্ত করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। প্রবীরের পতন ঘটাবার জন্য তিনি যে ব্যাপক পরিকল্পনার অবতারণা করেছেন, তার তুলনায় জনার ব্যক্তিত্ব ও পরিণাম প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিস্থিতি কল্পনা করেছেন।

জনার জীবন দেখতে গিয়ে প্রবীরের দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়াতেই,

আমার মনে হয়, এই ত্রুটি ঘটেছে। প্রবীরের জন্য মায়াকানন প্রভৃতি সৃষ্টি করার প্রয়োজন 'প্রবীর পতন' নামক কোন নাটকে থাকতে পারে কিন্তু জনা-নাটকে প্রবীরের পতনটুকুই বোধ হয় যথেষ্ট। মাতৃভক্তির কথা মাতৃনামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক হয়েই নাট্যকার মায়াকাননের কল্পনা করেছেন কি না অথবা মধুসূদনের মেঘনাদবধ মহাকাব্যের অথবা ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড মহাকাব্যের প্রভাবেই মায়াকানন কল্পনায় আগ্রহী হয়েছেন কি না এসব প্রশ্নে আমি প্রবেশ করতে চাইনে। আমি শুধু এই কথাটিই বলতে চাই যে জনা-নাটকে জনার পুত্র মায়াকাননে আবদ্ধ হলে জনার ক্রিয়াতৎপরতা বলেই মোহমুক্ত হবে এবং তাহ'লেই জনা-নাটকে মায়াকানন নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমান নাটকে মায়াকানন জনা-চরিত্র প্রকাশের উপায় হ'য়ে ওঠেনি এবং ওঠেনি বলেই অপরিহার্য নয়।

কেউ হয়তো বলবেন যে নাট্যকার নাটকখানিকে জনা নামে অভিহিত করলেও, জনা-চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণাম দেখানোই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেননি; তিনি নীলধ্বজ, জনা ও প্রবীরের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবলীলা বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাকেই বড় স্থান দিতে চেয়েছেন। এই বলার উত্তরে যা বলার তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে শুধু এই কথাটিই বলার আছে যে বৃত্ত-বিচারের বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে, বলতে হবে বৃত্তটি একাগ্র হয়ে উঠতে পারেনি।

একাগ্র শব্দটি আমি ইংরেজিতে যাকে unifocal বলা হয় সেই অর্থেই এখানে প্রয়োগ করছি এবং প্রয়োগ করছি এই কারণেই যে একমাত্র জনার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ এই নাটকের একক উদ্দেশ্য হয়নি। প্রথম গর্ভাঙ্কে তিনজন বর প্রার্থনা করেছেন দেখতে পাই। ক্রোড়-অঙ্কের আগেই নীলধ্বজ—নারায়ণের দর্শন পেয়েছেন, প্রবীরের সমর-বাঞ্ছা ঘুচে গেছে এবং

ক্রোড়-অঙ্কে দেখতে পাই, প্রবীর মদনমঞ্জরী শিবলোকে শিবের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন এবং জনা মাতৃকোলে ফিরে যেয়ে প্রসন্নচিত্তে চামর ব্যজন করছেন। নীলধ্বজ প্রবীর এবং জনা এই তিন ব্যক্তির তিনটি মনোবাঞ্ছার দিকে নাট্যকার সমান দৃষ্টি রেখেছেন, ফলে একাগ্রতা শিথিল হ'য়ে গেছে।

কেউ হয়তো বলতে পারেন মুখ্যভাবে একের কাহিনী অবলম্বন করে একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারা তো প্রশংসারই কথা। জনার কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার যদি নানা অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে পেরে থাকেন, তাহলে নাট্যকারকে প্রশংসা করাই উচিত। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, একটি কাহিনী থেকে নানা অভিপ্রায় নাট্যকার অবশ্যই মেটাতে পারেন, কিন্তু নাটক যেহেতু একটি শিল্প এবং শিল্প একটি সমন্বিত এবং সুসঙ্গত সমগ্ররূপ, নাটকের গঠনে আমরা অবশ্যই একাগ্রতা দাবী করব, মুখ্য ও গৌণ ঘটনার সম্পর্ক বিচারে একটা বিশেষ নিয়ম মেনে চলব এবং সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখব—গৌণের ও মুখ্যের এমন সমাবেশ না হয় যাতে গৌণের ঔজ্জ্বল্যের চাপে মুখ্য হীনপ্রভ হয়ে পড়ে, মুখ্যের অধিকার অর্থাৎ ফলস্বামিত্ব সঙ্কুচিত হয়। এই-দিকে দৃষ্টি রেখেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এবং প্রতীচ্য নাট্যশাস্ত্রেও কেন্দ্রীয় বা মুখ্য আলম্বন বিভাবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলেছে এবং নায়ক-নায়িকাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ ও কর্মতৎপর করে তোলার জন্য তাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি পরিকল্পনা করার নির্দেশ দিয়েছে। একাধিক অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে গেলে নায়ক-নায়িকার অধিকার সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়, একাগ্রতা বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। আগেই এই নাটকের প্রতিপাদ্য নিরূপণের প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, একটি মাত্র বাক্যে নাটকের প্রতিপাদ্যকে আমরা প্রকাশ করতে পারিনি এবং প্রতিপাদ্যের বৃত্তের মধ্যে প্রপঞ্চতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা-মাহাত্ম্য বা রহস্য, হরিভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ কথাও বলেছি জনা-চরিত্র উক্ত প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদনের যতটা নঙভাবী উপায় হয়েছে ততটা সদ্‌ভাব (পজিটিভ) মাধ্যম হ'তে পারেনি।

জনাকে নঙ্‌ভাবী উপায় বলেছি এই কারণে যে জনার জীবন প্রত্যক্ষভাবে ঐ প্রতিপাদ্যের কোনটিকেই প্রতিপাদন করেনি। ক্রোড়-অঙ্কের আগে পর্যন্ত জনা যে প্রতিপাদ্যকে প্রতিপাদন করেছে—সে এই যে ক্ষত্রিয়জননীর পুত্রশোক পুত্রঘাতীর প্রাণনাশ ছাড়া আর কিছুতেই প্রশমিত হয় না; প্রতিহিংসাগ্রহণ অথবা প্রাণবিসর্জন এই দুই গতি ছাড়া তার আর কোন গতি থাকে না। গঙ্গায় প্রাণবিসর্জনে জনা নাটক সমাপ্ত হ'লে জনা নাটকের উল্লিখিত প্রতিপাদ্যই প্রতিপালিত হ'ত। কিন্তু নাট্যকার এই প্রতিপাদ্যের ঊর্ধ্বে আরো একটি প্রতিপাদ্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, লৌকিক এবং দিব্য এই দুই পরিমণ্ডলের নিগূঢ় সম্পর্কের দিকে, দিব্যরহস্যের পরিমণ্ডলের স্তরে দর্শকমনকে আকৃষ্ট করেছেন। ফলে এই নাটকের বৃত্তে লৌকিক ও দিব্য জীবনের মিশ্রণ এবং বৃত্তের দুই মেরুতে দিব্য আবহাওয়ার প্রাধান্য ঘটেছে। নাটকের প্রথমে অগ্নিদেবের বরপ্রদানের এবং ঐ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্তনের দৃশ্য এবং ক্রোড়-অঙ্কে—দিব্যধামের দৃশ্য—এই দুই দিব্য মেরুর মাঝখানে রয়েছে, জনার কাহিনী।

জনা-নাটকের বৃত্ত পাঁচটি অঙ্কে ও একটি ক্রোড়-অঙ্কে মোট ৬টি অঙ্কে বিভক্ত। এই প্রধান প্রধান বিভাগের বা পূর্বের মধ্যে আবার একাধিক উপবিভাগ কল্পিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই—প্রথম অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে আটটি গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক আছে এবং ক্রোড়-অঙ্কে কোন গর্ভাঙ্ক নেই। এইবার বিচার ক'রে দেখা যাক—মূল কার্য্যকে যে সব পর্বে এবং পর্বাঙ্গে নাট্যকার বিভক্ত করেছেন, সেই বিভাজন-কার্য্যটি অনবদ্য হয়েছে কি না।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—রাজবাটীর কক্ষ।

এই দৃশ্যে নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক উপস্থিত। দেব বৈশ্বানর কল্পতরু হ'য়ে, প্রথমে নীলধ্বজকে, পরে জনাকে ও প্রবীরকে এবং শেষে স্বাহাকে বর দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন সকলেরই মনোবাঞ্ছা অচিরে পূর্ণ হবে। পত্নী স্বাহাকে পূর্ব্বস্মৃতি দান করে ভাবদৃষ্টিতে দেখিয়েছেন—স্বাহা স্বয়ং বসুমতী লক্ষ্মীপাপে "নীলধ্বজ ঝিয়ারী" হয়েছেন। শেষে তাকে সংক্ষেপে বলেছেন—"নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে, পুরাবেন বাসনা সবার।" এবং তিনি নিজেও শ্রীহরিকে দর্শন করে পবিত্র হবেন। সকলে নিজ নিজ কার্যে প্রস্থান করলে বিদূষক ও অগ্নিদেবের মধ্যে কথোপকথন হয় এবং তাতে বিদূষকের স্তবস্তুতির ভিতর দিয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত ও কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। এই দৃশ্য দ্বারা দর্শক মনে শুধু এই ধারণাটুকুই জাগানো হয়েছে যে নররূপী ভগবান কৃষ্ণ এসে সকলের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করবেন এবং শ্রীহরি অচিরেই আসবেন। অর্থাৎ একটি যুদ্ধ আসন্ন এবং সেই যুদ্ধে প্রবীরের সমরবাঞ্ছা ঘুচবে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় জনা গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করবে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য—**উদ্যান**। মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণের গান ও সংলাপের সাহায্যে প্রথমাংশে মদনমঞ্জরীর অহেতুক আশংকার ভিতর দিয়ে ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত ঘটানো হয়েছে। মদনমঞ্জরী রোদনের ধ্বনি শুনে ব্যাকুলা হয়েছে, চোখের জল সংবরণ করতে পারছে না। প্রবীর ফিরে আসার পরেও "কেন হতাশে পরাণ কাঁদে"—বুঝতে পারে না। বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রবীর বলে যে অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব বেঁধে রেখেছে এবং পিতাকে সমাচার দিতে এসেছে। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের কল্পনায় মদনমঞ্জরী আতঙ্কে শিউরে ওঠে—ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিনতি করে। কিন্তু প্রবীর ক্ষত্রবীরোচিত বীরত্বের সঙ্গেই প্রিয়াকে ভৎ‍‌সনা করে এবং ঘোষণা করে—"সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি।

নাহি ডরি নারায়ণে।"

এই দৃশ্যে নাটকের মূল দ্বন্দ্বের কারণটি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবীরের বালিকাবধূ মদনমঞ্জরীর অহেতুক প্রাণের ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে, রমণীর দূরাগত ক্রন্দনধ্বনির ভিতর দিয়ে আসন্ন অমঙ্গলের ইংগিত দেওয়া হয়েছে এবং প্রবীরের নির্ভীকতার সাহায্যে দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবিতা সূচিত হয়েছে।

এই দৃশ্যের স্থান উদ্যান না হ'য়ে রাজবাটীর কক্ষ হ'লে অনুচিত কল্পনা হ'ত বলে মনে হয় না এবং তা' করলে সব চেয়ে বড় লাভ হ'ত এই—দুই গর্ভাঙ্কের স্থলে এক গর্ভাঙ্কেই দুটি দৃশ্যের ঘটনা সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হ'ত এবং প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা দ্বন্দ্বের মুখের সামনে এসে দাঁড়াতাম।

প্রথমাঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের স্থান—পাণ্ডব-শিবির। এই দৃশ্যে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জানিয়েছেন—নীলধ্বজ রাজার পুত্র মহাবীর প্রবীর 'ধরেছে যজ্ঞের বাজী।' এবং প্রবীরের আসল পরিচয় দিয়েছেন—'জাহ্নবীর বরে শিব অংশে জন্মেছে কুমার' এবং "মাতৃভক্তি অপার তাহার"। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন এবং অর্জুনকে বুঝিয়েছেন—'শিবপূজা বিনা কার্য না হবে উদ্ধার'—অতএব ধ্যানযোগে কৈলাসে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই দৃশ্যের যদি বিশেষ উপযোগিতা কিছু থাকে তবে তা এইটুকুই যে এতে পাণ্ডবপক্ষের প্রতিক্রিয়ার সূচনা দেখানো হয়েছে এবং শিবকিঙ্করকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হলে শিবের সম্মতি ও প্রসাদ পেতেই হবে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরে শিব-কীর্তনের তথা দৈবপরিমণ্ডলকে স্পষ্টতর করে তোলার আয়োজন করা হয়েছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে প্রবীর ও জনার সংলাপের ভিতর দিয়ে জনার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ এবং ক্ষত্রবীরাঙ্গনা সত্তাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং জনার "রণ-সাধ যদি তোর রণ পণ মম"—এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা দ্বন্দ্বকে অনিবার্য করা হয়েছে। নীলধ্বজ এবং জনার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে জনার যে সঙ্কল্প ব্যক্ত হয়েছে তা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে এবং নীলধ্বজের কৃষ্ণপদাশ্রয় গ্রহণের সংকল্পের মধ্যে জনার অন্তর্দ্বন্দ্বের (স্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব বই কি!) বীজটি স্থাপিত

করা হয়েছে। শেষাংশে নীলধ্বজ এবং বিদূষকের আলাপে—একজনের স্তুতিতে অপরের ব্যাজস্তুতিতে কৃষ্ণভক্তি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে এবং দৈব-মহিমার আবহাওয়া জমাট। **পঞ্চম গর্ভাঙ্কে** এই আবহাওয়া আরো জমাট বেঁধেছে। প্রমথগণের গীতে, হরি-হরের আলিঙ্গনে, যোগিনীদের হরি হরি বোলে এবং প্রমথগণের হর হর বোলে, হরিহর সমন্বয় বোধের এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। আগের এক দৃশ্যে, জানা গিয়েছে—প্রবীর শিব-অংশে জন্মেছে, এই দৃশ্যে জানা যাচ্ছে—প্রবীর শিবের কিঙ্কর, জাহ্নবীর অনুরোধে শিবকিঙ্করকে জনা পুত্ররূপে লাভ করেছে এবং যেহেতু তার কালপূর্ণ হয়েছে মহাদেব তাকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনবেন। তবে প্রবীর মাতৃভক্ত। মাতৃপদধূলি নিয়ে সমরে প্রবেশ করলে শিবশূলও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। "মাতৃনাম যেদিন না লবে প্রভাতে সেই দিন নাশ তার।" পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকাকে প্রবীরের শক্তি হরণ করার জন্য মহাদেব পাঠাবেন এবং কামদেব সব উপায় করে দেবেন। এই দৃশ্যে আমরা জানতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম—প্রবীরের মৃত্যু আসন্ন, কামদেব পার্ব্বতীর নায়িকা প্রবীরের শক্তিহরণের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রবীর মৃত্যুর পরে শিবলোকে ফিরে যাবে। নাট্যকার ভাবী ঘটনার একটি আমাদের সামনে মোটামুটি তুলে ধরেছেন। কি ঘটনা ঘটে সে কৌতূহল দর্শকের মনে নেই, একমাত্র কৌতূহল কিভাবে ঘটনাগুলি ঘটে এবং দৈবইচ্ছার পরিকল্পনার ক্রীড়নক হ'য়ে চরিত্রগুলি কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তের মধ্য দিয়ে শেষ পরিণতিতে যেয়ে পৌছায়। সংক্ষেপে বললে, এই নাটকের কৌতূহল **কি ঘটে** তার মধ্যে নয় **কিভাবে ঘটে** তারই কৌতূহলের মধ্যে নিহিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—জনা পুত্রের মঙ্গল কামনায় গঙ্গাপূজা করছেন। মন থেকে থেকে কেঁদে উঠেছে, ক্ষত্রিয় জননী সেই কান্নার টুটি চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন। তার রণপণ থেকে তিনি বিরত হবেন না; এমন কি জাহ্নবীর কথাতেও না। স্বাহা ও মদনমঞ্জরী মাকে নিবৃত্ত করতে

এসে তীব্রভাবে ভৎর্সিত হয় এবং অগত্যা তারা পাণ্ডবশিবিরে যেয়ে কৃষ্ণগুণগানে অর্জ্জুনকে তুষ্ট করে রাজ্যের মঙ্গল ভিক্ষা করে নেওয়ার সংকল্প করে। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বা বিস্তার আনবার জন্য নাট্যকার যেমন প্রবীরের শক্তিহরণের পরিস্থিতি-পরিকল্পনার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তেমনি এখানেও মদনমঞ্জরীর এবং স্বাহার পাণ্ডব-শিবিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, নতুন করে পরিস্থিতি কল্পনার সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন। মনে হয় এই দৃশ্যে জনার মধ্যে, শেক্সপীয়রের 'কোরিয়োলেনাস' নাটকের কোরিয়োলেনাসের মাতা ভোলামনিয়ার আত্মাকে এবং মদনমঞ্জরীর মধ্যে কোরিয়োলেনাসের পত্নী ভার্জিলিয়ার আত্মাকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে (কোরিয়োলেনাস নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের মুখে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার—গঙ্গার রক্ষক দিয়ে ঘোড়া চুরি করার ষড়যন্ত্র—বিদূষকের ও রাজপুরীর মঙ্গল কামনায় ঘোড়া চুরি করে পাণ্ডবদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির ভিতর দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির সুযোগ করে নেওয়া।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—দুর্গাভ্যন্তরে—মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনা ও সেনাগণের যুদ্ধসংকল্পের বিরুদ্ধে সমালোচনা—জনা প্রবেশ করে সকলকে ধিক্কার দেন, সকলে জনার উদ্দীপনাময় যুদ্ধ প্ররোচনায় জয়ধ্বনি দিয়ে সম্মতি জানায় ও যুদ্ধযাত্রা করে মাতা-জনা পাষাণে প্রাণ বেঁধে পুত্রকে যুদ্ধসাজে সাজাতে যান, কিন্তু তিনি রাজার মতিগতি বুঝতে না পেরে ক্ষুব্ধ হন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—শ্রীকৃষ্ণ স্বগত ভাষণে ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সংকল্পটি ব্যক্ত করেন এবং এ কথাও বলেন যেহেতু প্রবীরের পতন না হলে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হবে না—সেইহেতু তিনি পরের বা নিজের ব্যথা-বেদনা মনস্তাপে বিচলিত না হয়েই প্রবীরকে বধ করবেন। এই জন্যই তিনি বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ করে রেখে গঙ্গারক্ষকদের বিদূষককে ঘোড়া চুরি করতে দেবেন না,

মদনমঞ্জরীকে ও স্বাহাকে অর্জ্জুনের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না। লক্ষণীয়—প্রবীরের পতন ঘটানোয় শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায়।

এই সংকল্প ব্যক্ত হ'তে না হতে ভিখারিণীবেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্ত প্রবেশ করে। সকলে কৃষ্ণলীলাগান করে। কুলকামিনীদের ভিখারিণী সাজে রাত্রিতে ঘরের বাইরে ভ্রমণ করার জন্য কৃষ্ণ ভর্ৎসনা করেন এবং তাদের সত্যপরিচয় এবং উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত করেন। তারপর অর্জ্জুনের নিষ্ঠুর স্বভাবের নিদর্শনগুলি একে একে তাদের সামনে উপস্থিত করেন এবং বলেন অর্জ্জুনের সঙ্গে দেখা করলে উদ্দেশ্যসিদ্ধ হবে না অথচ অপকীর্তি হবে। জাহ্নবীর দেওয়া উপহার বর্ম, ধনু, যুগ্ম তূন, যুগল কুণ্ডল, উজ্জ্বল কিরীট এবং ক্ষুরধার অসি নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। স্বাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মদনমঞ্জরী ঘরে ফিরে যায়। বিদূষক এসে জানায় রাতকানা হ'য়ে তিনি সারারাত ঘুরে মরেছেন, ঘোড়াচুরি করা সম্ভব হয়নি।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—প্রবীরের শয়নকক্ষে প্রবীর নিদ্রিত। জনা এসে প্রবীরকে জাগিয়ে তোলেন এবং যুদ্ধযাত্রা করতে বলেন। প্রবীর একাই মাতৃনামের বর্মে আবৃত হ'য়ে যুদ্ধে যেতে চায়। এই সময়ে মদনমঞ্জরী প্রবেশ করে (রাত্রে স্বাহার সঙ্গে সে পাণ্ডবশিবিরে গিয়েছিল এবং গিয়েছিল সকলের অজ্ঞাতসারেই এবং প্রবীরের ঘুমিয়ে পড়ার পরেই, মদনমঞ্জরী গঙ্গাপ্রদত্ত অস্ত্রোপহারের কথা সকলকে বলেন, সকলেই উল্লসিত হন। মদনমঞ্জরী প্রবীরকে রণসাজে সাজাবার বাসনা প্রকাশ করেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও গান করেন সখীরা। দূত এসে সংবাদ দেয়—"উপস্থিত শত্রু সৈন্য তোরণসমীপে।" সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর যুদ্ধযাত্রা করে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক—প্রথমাংশে বিদূষকের রাজপ্রীতি এবং কৃষ্ণভক্তি দেখানো হয়েছে—বিদূষক নিজের জীবন দিয়েও রাজার জীবন রক্ষা করতে চায়। শেষাংশে গঙ্গারক্ষক এবং বিদূষকের কথোপকথনে জানা যায়—প্রবীর যুদ্ধে গেছে এবং কেউই ঘোড়া খুঁজে পায়নি। অর্থাৎ যুদ্ধ অনিবার্য এবং পরাজয়ও অনিবার্য।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক—দৃশ্য রণস্থল। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও **অনুশাল্ব**। প্রবীরের হাতে পরাজয়ে ভীমের আক্ষেপোক্তি। কৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন—**মহাদেব** বল হরণ না করা পর্যন্ত প্রবীরকে কেউ বধ করতে পারবে না। রাত্রি **আগত,** রাত্রে কোন যুদ্ধ হবে না। কাল অর্জ্জুনের বাণে প্রবীর নিহত হবে।

অষ্টম গর্ভাঙ্কেও—'রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব দৃশ্য। প্রবীরের মুখেও **একই** সংবাদ—আজিকার মত রণ হ'ল অবসান। কিন্তু প্রবীরের কানে **সুমধুর** যন্ত্রধ্বনি বাজে; চোখে ভুবনমোহিনী নারীমূর্তি বিদ্যুতের ঝলক সম' **প্রতিভাত** হয়। বালিকা বেশে কাম ও রতি প্রবীরকে মুগ্ধ করতে আসেন। **কাম** প্রবীরকে রণক্ষেত্র থেকে মায়াকাননে নিয়ে যান। [সিনেমায় যাকে "ষ্টক" **বলে** এ সেই জাতীয় পরিস্থিতি। পুরাণে এবং মহাকাব্যে এই ধরনের **পরিস্থিতি**-কল্পনার অভাব নেই।]

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক—অতি প্রত্যাশিত মায়াকানন-**দৃশ্য**। এই দৃশ্যটি মোহের ছলনার দৃশ্য হিসাবে আপাততঃ প্রচলিত বটে, কিন্তু **এই** দৃশ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের গীতকার প্রতিভার যে পরিচয় ফুটে **উঠেছে** তা সত্যই প্রশংসনীয়। মোহের ক্রম বৃদ্ধিতে এই গানগুলি অতি **সুন্দরভাবে** প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শেষপর্যন্ত প্রবীরকে ধনুত্যাগে বাধ্য করেছে। **এই** দৃশ্যটির মধ্যে আর একটি দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত করে—মায়াকাননকে **শেষমুহূর্তে** **শ্মশানে** পরিবর্তিত করে নাট্যকার এইসব জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টির ও **সংহারের** মোহের এবং মোহভঙ্গের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—রাত্রি দ্বিপ্রহরে নীলধ্বজ ও জনা পুত্রের **অন্তর্ধানে** দুশ্চিন্তায় আকুল। মদনমঞ্জরীর সঙ্গে জনাও রোদনের ধ্বনি শুনতে **পান**। জামাতা অগ্নিদেব পার্ব্বতীর পূজা করতে বললে জনা 'মায়ের সতিনী'র **পূজা** করতে অস্বীকার করেন এবং গঙ্গাপূজা সাঙ্গ করে "শাবকের অন্বেষণে **সিংহিনী** যাইবে"—বলে ঘোষণা করেন। জনা ও মদনমঞ্জরী চলে গেলে **অগ্নি ও** বিদূষকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। অগ্নি **স্বীকার** করেন তিনি **ভৈরবী**—

মায়ায় আচ্ছন্ন 'দেবদৃষ্টিহীন', ফলে সর্বজ্ঞতা হারিয়ে বসেছেন— প্রবীর কোথায় তা বলতে পারছেন না। বিদূষক তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাজস্তুতি-রীতিতে হরি-হরের একাত্মতার সত্য প্রচার করেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—পাণ্ডব-শিবিরের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ভীম আলাপরত। ভীমের আশংকা দূর করতে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়ে দেন—প্রবীর ললনামোহে মাতৃনাম ভুলেছে, সুতরাং সে আর অসামান্য নয়। শিবদূত এসে মায়াকাননের ঘটনা বর্ণনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বরকে প্রণাম জানান এবং ভীমকে সারথি সাজাতে আজ্ঞা করেন। এই দৃশ্যে হরমহিমাকে বড় করে তোলা হয়েছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দৃশ্য শ্মশান—প্রবীরের মোহ ভেঙ্গে যায়। প্রবীরের সামনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন এবং বৃষকেতু দাঁড়িয়ে। যজ্ঞ-অশ্ব ফিরে দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রবীর যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ায় অর্জ্জুন ও প্রবীর দূরবর্তী রথের দিকে প্রস্থান করেন। বৃক্ষচূড়ায় উঠে বৃষকেতু যুদ্ধের বর্ণনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নানা জিজ্ঞাসা পূরণ করেন। যুদ্ধ করতে করতে প্রবীর ও অর্জ্জুন প্রবেশ করেন এবং প্রবীর যুদ্ধ করতে করতে ধরাশায়ী হয় এবং শঙ্করকে স্মরণ করে।

উন্মাদিনী জনাকে আসতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ও বৃষকেতুকে নিয়ে 'পলায়ন' করেন, কারণ সামনে পড়লে জনার কোপানলে অর্জ্জুন ভস্ম হ'য়ে যাবেন। জনার শোক প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়। মদনমঞ্জরী প্রথমে মূর্চ্ছিত হয়, পরে মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে বিলাপ করতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তার "প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু" হয়। পাগলিনী জনা প্রস্থান করলে—বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাকিনী, প্রভৃতি প্রবেশ করে এবং শিব-শঙ্করীর সংহারমূর্তির জয়গান করে। ভৈরব ঘোষণা করে—

> গঙ্গাজলে তুই দেহ করিয়ে অর্পণ
> কার্য সাঙ্গ চল যাই কৈলাস-সদন।

[কিন্তু প্রশ্ন এখানেই কি কার্য সাঙ্গ? আসল কাজ তো জনাকে মাতৃকোলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রবীর-পতনেই জনা-নাটকের কার্য সাঙ্গ হয় নি। ভাবী অঙ্কের সূচনা অঙ্কান্তে যতখানি রাখা উচিত ছিল ততখানি রাখা হয় নি। জনার দেহ গঙ্গার কোলে পৌঁছে দেওয়ার পরে কার্য শেষ হবে এমন কিছু বলানো উচিত ছিল।]

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে—বৃষকেতু কৃষ্ণের বিষাদ ও ভয়ের কারণ জানতে চেয়ে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন—"নহে জনা সামান্যা রমণী, জাহ্নবীর সহচরী মহাতেজস্বিনী, ভোগলালসায় এসেছে ধরায় কালপূর্ণ, মিশাবে জাহ্নবীজলে।" প্রবীর নিধনে গঙ্গা ব্যথিত ও কুপিত হয়েছেন—"জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।" অর্জুনকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ক্রোধানলকে তিন অংশে ভাগ করে গ্রহণ করা। এক শ্রীকৃষ্ণ, অন্য অংশ অর্জুন গ্রহণ করতে সক্ষম, আর এক অংশ কে গ্রহণ করবে? বৃষকেতু আত্মত্যাগ করে অর্জুনকে রক্ষা করতে চায়। শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতুর আত্মত্যাগের মহিমা দেখে মুগ্ধ হন। এই দৃশ্যটিতে বৃষকেতুর আত্মত্যাগের মহিমা প্রদর্শিত হয়েছে এবং দূতমুখে প্রতিহিংসারূপিণী উন্মাদিনী জনার অনুভাবের এবং তার শ্বাসানলে কিভাবে অশ্বত্থবৃক্ষ শুকিয়ে গেছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে যে মহাভক্ত দ্বিজোত্তমের স্পর্শে শুষ্ক অশ্বত্থবৃক্ষ পল্লবিত হবে বলে কৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন সেই মহা হরিভক্ত বিদূষকের এবং তার ব্রাহ্মণীর কথোপকথনের এবং আচরণের মধ্যমে রাজানুরাগ এবং কৃষ্ণ বিশ্বাসের ঐকান্তিক রূপ দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—রাজবাটীর কক্ষে মন্ত্রী, অগ্নি পারিষদগণ পুত্র-শোককাতর নীলধ্বজকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। অগ্নির উক্তি থেকে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য দূত পাঠিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই জনৈক দূত এসে সংবাদ দিয়েছে—স্বয়ং অর্জুন রাজপুরে উপস্থিত এবং রাজদর্শন ইচ্ছা কচ্ছেন। নীলধ্বজ অর্জুনকে সমাদরে নিয়ে আসতে বলেন। অর্জুন প্রবেশ করলে নীলধ্বজ

বিলাপ করতে থাকেন। অর্জ্জুন ব্যথিতচিতে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং জানান—"ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্যগ্রহণে"; পরম অতিথির সেবা করলে—"শোক তাপ যাবে, যাবে এ ভববন্ধন। রাজা নীলধ্বজ মন্ত্রীকে নগর সজ্জিত করার আদেশ দেন। বিদূষক রাজার আদেশে স্বভাবসিদ্ধ ব্যাজস্তুতিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। বিদূষকের বিশ্বাস দেখে অগ্নি তার পায়ের ধুলো নিতে চান। জনা তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ক'রে নীলধ্বজকে ভৎর্সনা করেন এবং নীলধ্বজের কাজের প্রতি অক্ষত্রিয়োচিত অনুরাগের জন্য ধিক্কার দিয়ে বলেন—"হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।" নীলধ্বজ জনাকে বুঝাতে শত চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। জনা প্রতিহিংসা পূরণ করার অটুট সংকল্প ঘোষণা করে নিষ্ক্রান্ত হন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—বালকগণের কৃষ্ণলীলাগানে কৃষ্ণভক্তি প্রদর্শনের আরম্ভ, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে নীলধ্বজের কৃতার্থতালাভ এবং প্রসন্নচিত্তে পাণ্ডবগণকে গ্রহণ। অবশ্য নাটকের সূচনায় কৃষ্ণের যে বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিমঠাম নররূপী নারায়ণকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সেই রূপ ধারণ করার জন্য কৃষ্ণকে বেশী পীড়াপীড়ি করেন নি বা পত্নী জনার ক্লেশ দূর করার জন্যও শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন প্রার্থনা জানান নি।

পঞ্চম গর্ভাঙ্কে—প্রান্তরে দাঁড়িয়ে জনা শোকাগ্নি উদ্‌গীরণ করেছেন এবং স্বাহা সান্ত্বনা দিতে এলে—রাক্ষসী বলে তাকে দূরে চলে যেতে বলেছেন এবং দূরে—দূরে—আরো দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে— মুখ্যতঃ মহাভক্ত দ্বিজোত্তম বিদূষককে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে এসে কৃপা করেছেন। কুঞ্জকাননে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেখে বিদূষকপত্নী জীবন সার্থক করেছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য রাজবাটীর কক্ষ। নীলধ্বজের কাছ থেকে অগ্নিদেব স্বধামে যাওয়ার জন্য বিদায় নিচ্ছেন। নীলধ্বজের একটি প্রশ্ন ছাড়া আর কোন বাসনা নেই; কারণ 'পরমপুরুষে হেরি পূরেছে বাসনা'। প্রশ্ন এই—

গোবিন্দের পদার্পণে রাজ্য নিরানন্দ হ'ল কেন? প্রশ্নের উত্তরে অগ্নি জানালেন—'যার যেই পথে রতি। সেই সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়। (গীতার উক্তিরই বঙ্গানুবাদ—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্)। জনা গঙ্গার কোল চেয়েছেন, কৃষ্ণ তাঁকে তাই দেবেন। স্বাহাকে নিয়ে অগ্নিদেব নীলধ্বজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—গঙ্গারক্ষকরা পাগলিনী জনাকে সামলাতে সামলাতে গঙ্গার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জনার ভ্রাতা উলূক জনাকে প্রবোধ দিতে এসেছে কিন্তু প্রবোধ দিতে পারে নি। জনা তীব্র প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছেন এবং গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়িয়েছেন। গঙ্গা উত্থিত হয়ে অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা নীলধ্বজকে দেবদৃষ্টি দান করতেই নীলধ্বজ ক্রোড়-অঙ্কে বর্ণিত দৃশ্য দেখে অজ্ঞান মুক্ত হয়েছেন।

বৃত্ত পর্যালোচনার উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে যদিও রোমান্টিক-গঠন "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" সৃষ্টির চেষ্টা করা হ'য়ে থাকে, বৈচিত্র্যের অবতারণা করার জন্য প্রধান প্রধান পার্শ্ব চরিত্রের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখবার এবং বিশেষ পরিমাণে চরিত্রটিকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, তার ফলে রোমান্টিক গঠনে ক্লাসিকাল গ্রীক নাটকের সংহতি থাকে না, তবু দৃশ্যান্তে পরবর্তী দৃশ্যের প্রত্যাশা জাগিয়ে অঙ্কান্তে পরবর্তী অঙ্কের কার্য সূচিত ক'রে বৃত্ত গঠনের মধ্যে ক্রমান্বয়ের বা কার্যকারণ সম্পর্কটিকে জোরালো ক'রে তোলা যায়। জনা নাটকের বৃত্তে দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের, অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের যোগসূত্র সবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এবং যায় না বলেই একান্বয়িত্ব খানিকটা হীন হ'য়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ এতগুলি ছোট ছোট দৃশ্যে ঘটনাগুলিকে ছড়িয়ে না দিয়ে আরো কমসংখ্যক দৃশ্যের মধ্যে কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হ'ত; তৃতীয়তঃ এই নাটকের বৃত্ত-পরিকল্পনায় নাট্যকার আকর্ষণ কেন্দ্রকে ঘটনা কৌতূহলের মধ্যে নিহিত করেন নি, কিভাবে

ঘটনা ঘটে তা দেখার কৌতুহলেরই মধ্যে নিহিত রাখতে চেষ্টা করেছেন। চতুর্থতঃ কেন্দ্রীয়চরিত্রের উপর আলোকপাত করার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে পারেন নি। পঞ্চমতঃ নাটকের নাম জনা হলেও নাটকের প্রতিপাদ্য (প্রতিপাদ্য বিচার দ্রষ্টব্য) জনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—এই সিদ্ধান্তের ব্যাপকতর পরিধিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ষষ্ঠতঃ জনা-নাটকে যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে তা' ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব নয় তা' দুই ভালোরই মধ্যে দ্বন্দ্ব। অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের দ্বন্দ্ব, ক্ষত্রিয় ধর্মাদর্শনিষ্ঠ জনার নরনারায়ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা তাঁর স্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, দুই মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই মূল্যের একটি সামাজিক স্তরের মূল্য অন্যটি আধ্যাত্মিক স্তরের মূল্য। অবশ্য দুটিই কাম্য এবং বহুমূল্যবান। জনার ক্ষত্রিয়ধর্মাদর্শনিষ্ঠা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি প্রশংসনীয় নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণের প্রসন্ন দৃষ্টির কৃপা। দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে, প্রবীরের রণসাধের এবং জনার রণপণের সঙ্গে নীলধ্বজের ও তাঁর অনুগামীদের অক্ষত্রিয়োচিত আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করা। দ্বিতীয় পর্বের দ্বন্দ্ব অধিকতর জটিল—একদিকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প এবং সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে না পারার মর্মজ্বালা অন্যদিকে স্বামীকর্তৃক প্রতিহিংসাগ্রহণে প্রতিকূলতা করায় দ্বিগুণ মর্মান্তিক আঘাত। এই দুই মর্মজ্বালার সন্তাপ শেষপর্যন্ত গঙ্গাজলে প্রশমিত হয়েছে।

চরিত্র-বিশ্লেষণ ও বিচার

লৌকিক কোন ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ বা বিচার করতে আমরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকি। আমরা প্রশ্ন করি—চরিত্রটি ভালো অথবা মন্দ? অর্থাৎ চরিত্র সৎ কি অসৎ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ে

আমরা আমাদের সুনীতি-দুর্নীতিবোধজনিত সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে থাকি। সৎগুণের আধিক্য থাকলে বলি সচ্চরিত, অসৎগুণের বা দোষের আধিক্য থাকলে বলি অসচ্চরিত্র। তেমনি আমরা প্রশ্ন করি—চরিত্রটির আচার-আচরণে সঙ্গতি আছে কিনা? অর্থাৎ চরিত্রের মূলে ভাবসাম্য বা সংযম আছে কি না যা চরিত্রের-আচার-আচরণকে সামঞ্জস্যের বৃত্তের মধ্যে সুসঙ্গত করে রাখতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ে আমরা চরিত্রের আগের আচরণের সঙ্গে পরের আচরণের তুলনা করি এবং আগের মনোভাবের সঙ্গে পরের মনোভাবের সঙ্গতি আছে কি নেই তা বিচার করে থাকি। (এই সঙ্গতিরই সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত চারিত্রিক গুণ—ঔচিত্য। সাহিত্যিক চরিত্রের বিচারে এই গুণটির বিচার করা হয়ে থাকে)। তারপর প্রশ্ন করি—চরিত্রটি সুস্থমনা অথবা অসুস্থমনা? অর্থাৎ ব্যক্তিটির মন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে অথবা বিকৃতিগ্রস্ত হয়েছে?

প্রশ্ন করি—ব্যক্তি চরিত্রে স্থায়িভাব কোনটি? ব্যক্তির মধ্যে কোন ভাব বন্ধটি প্রবল? কিসের প্রবণতা বেশী? এরই সঙ্গে প্রশ্ন হয়—চরিত্রটি একহারা সরল অথবা জটিল? সরল বলি যখন দেখি ব্যক্তির আচরণে একটিমাত্র ভাব একাধিক ভাব প্রাধান্য পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে এবং বহু ভাবের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির আচরণ জটিল হয়ে ওঠে। এ প্রশ্নও করা হয়—ব্যক্তিটি অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী? অর্থাৎ চরিত্রটি পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, নিজের ঘরের কোণে বা নিজন দেশে থেকে, নিজের মনের সাথে খেলা করে জীবন কাটাতে চায় অথবা পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করে, পরিবেশের কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে নিজের কর্মশক্তিকে যুক্ত করে, জীবনসমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দোল খেয়ে জীবন রম্ভোগ করতে চায়? এ প্রশ্নও আমরা করি—চরিত্রটি স্থিতিশীল বা গতিশীল? চরিত্রটির গ্রহণ-বর্জন ক্ষমতা আজও আছে অথবা চরিত্রটির বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে, চরিত্রটি একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গ্রহণ বন্ধ ক

ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে? অনেক সময় আমরা ব্যক্তির বৃত্তির অর্থাৎ জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বৃত্তির সবলতা-দুর্বলতা, বিচার করেও চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকি।

লৌকিক চরিত্রের বিচার এবং সাহিত্যিক বা শৈল্পিক চরিত্রের বিচারের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য থাকলেও, উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য এই যে, সাহিত্যিক চরিত্র যেহেতু শিল্পীর সৃষ্টি, এবং সৃষ্টি যেহেতু প্রকাশন, সাহিত্যে সুন্দর চরিত্র সেই চরিত্রই যা প্রকাশিত—সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত। লৌকিক চরিত্র বিচারের সব সূত্রই সাহিত্যিক বিচারে প্রযোজ্য হতে পারে, এমন কয়েকটি সূত্র আছে যা শুধু সাহিত্যিক চরিত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লৌকিক বিচারে সুন্দর চরিত্র বলতে আমরা নির্দোষ চরিত্রকেই বুঝে থাকি, কিন্তু সাহিত্যে সুন্দর চরিত্র সদোষ-নির্দোষ সব চরিত্রই হ'তে পারে যদি সে চরিত্র সুপ্রকাশিত হয়। লৌকিক দৃষ্টিতে রাম সুন্দর, রাবণ অসুন্দর; সমালোচকের দৃষ্টিতে রাম, রাবণ উভয়েই সুন্দর, কারণ উভয়েই সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত। অভিব্যক্তিগুণের মতো আরো কয়েকটি গুণ আছে যা সাহিত্যিক চরিত্রেই পাওয়া সম্ভব। সেই গুণ—বাস্তবতা-অবাস্তবতা ঔচিত্য-অনৌচিত্য এবং গভীরতা-অগভীরতা বা পূর্ণতা-অপূর্ণতা। চরিত্র সুষ্ঠুভাবে এবং পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হয় তখনই যখন তা' বাস্তবতা ঔচিত্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার সত্তার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে পরিব্যক্ত হয়। 'সত্তার সমস্ত সম্ভাবনা' কথাটি সামান্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এক একটি ব্যক্তির মধ্যে যেমন সংজ্ঞান জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান-জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বর্তমান। আবার প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক হিসাবে যেমন একক, তেমনি পরিবেশের সঙ্গে নানা সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ ব্যক্তির পরিচয় শুধু তার জৈবিকতার বা মনোজৈবিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার পরিধিতেও পরিব্যাপ্ত। চরিত্রের

সবগুলি আয়তন (ডাইমেনশানস্) যেখানে পরিস্ফুট সেখানেই চরিত্র সম্পূর্ণতা এবং চরিত্র গভীরতা লাভ করে।

উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান সূত্র মনে রেখে জনা-নাটকের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। জনা নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র :—(১) জনা (২) নীলধ্বজ (৩) প্রবীর (৪) মদন মঞ্জরী (৫) বিদূষক (৬) অগ্নি এবং (৭) শ্রীকৃষ্ণ! আমি উল্লিখিত চরিত্রগুলির সব কয়টি চরিত্র বিশ্লেষণ বা বিচার করব না। যে চরিত্রগুলি যথার্থ চরিত্র হয়ে উঠেছে, সেই তিনটি চরিত্র নিয়েই আলোচনা করব। এই তিনটি চরিত্র, জনা, নীলধ্বজ এবং বিদূষক।

জনা

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই জনার নিজের মুখে আমরা জানতে পারি—জনা শৈশবে মাতৃহীনা, তার মা ভাগীরথী এবং চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শোনা যায়—

জনা নহে সামান্যা রমণী
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী ;
ভোগ লালসায় এসেছে ধরায়,

জনার পিতৃমাতৃ পরিচয় বেশী কিছু জানানো হয়নি। যেটুকু প্রত্যক্ষ সে এই যে জনা রাজা নীলধ্বজের পত্নী এবং প্রবীরের ও স্বাহার মা। জনা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, ক্ষত্রিয়-জননী। ক্ষত্রিয় ধর্মই জনার ধর্ম এবং জনা স্বধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু জনা ক্ষত্রিয় রমণী বটে কিন্তু জনা জননী। প্রবীরের মতো বীর সন্তানের জননী। জননী-জনার কাছে প্রবীর জীবনাধিক ও নয়ন-আনন্দ। সন্তানের অমঙ্গল আশংকায় জনা ব্যাকুল এবং ব্যাকুল বলেই ক্ষত্রিয়াভিমানকে সংকুচিত করে "বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম / বনস্থলে বীর করে বীরের আদর/

শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয় / লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে / এই সব যুক্তির অবতারণা করে প্রবীরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চান, কিন্তু প্রবীর জনাকে ক্ষত্রিয়ের জননী-ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরে, বিশেষতঃ রণসাধ না মিটিলে চিরতরে বিদায় নেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করার পরে ক্ষত্রিয়-জননী জনা ঘোষণা করেছে—"রণসাধ যদি তোর রণপণ মম।" এবং জনার মধ্যে ক্ষত্রিয় সত্তাই বলবত্তর হয়ে উঠেছে। বলা চলে পুত্রের মঙ্গলকামনাতেই মা মাতৃত্বের সহজ স্নেহ দুর্বলতাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে। পুত্রের শ্রেয়কে নিজের শ্রেয় বলে মনে করেছে। মাতৃত্বই যেন ক্ষত্রিয়াভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু প্রবীরের রণসাধের এবং জনার রণপণের বড় প্রতিবন্ধক নীলধ্বজ। তিনি জানেন "কৃষ্ণার্জুননরনারায়ণ। হরিতে ধরার ভার, । নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোক মাঝে।" জেনে শুনে তিনি নারায়ণকে অরি করবেন না। যে নারায়ণকে অরি করে সেই দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনের মতো সবংশে নিহত হন। জনা স্বামীর এই যুক্তি মানতে পারেন নি। হীনবুদ্ধি নারী বলে স্বামীর সামনে বিনয় প্রকাশ করলেও জনা যুক্তি বা বুদ্ধিশক্তি দিয়ে প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন— জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন এবং নীলধ্বজের প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করেছেন। বিরক্ত হয়ে নীলধ্বজ বলেছেন—তুমি পুত্রকে নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারো, আমি নারায়ণকে অরি করব না। নীলধ্বজের অসম্মতি সত্ত্বেও, জনার শেষ কথা—'রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।"

এক পরে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। জনার মধ্যে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় জননী-সত্তা প্রধান হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জনার মধ্যে আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। মায়ের প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠছে, ক্ষত্রিয় জননী জনা তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং রণসংকল্পকে আঁকড়ে ধরেছে—অন্তর্দ্বন্দ্বের সুন্দর একটি নিদর্শন। এর পরেই ক্ষত্রিয়-জননী জনা কোমলপ্রাণা অমঙ্গলভীতা পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে অক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন

এবং ঐ ভৎর্সনার ভিতর দিয়ে তাঁর ক্ষত্রিয়াভিমান তীব্রভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। এর পর—প্রবীরের পতন পর্যন্ত—জনা ক্ষত্রিয় তেজের এক প্রচণ্ড আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ সেনাপতি ও মন্ত্রীদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে জনা যে প্ররোচনা বাক্য উচ্চারণ করেছেন তার প্রতিটি অক্ষর থেকে ক্ষত্রিয়াভিমানের ফুল্কি ছুটে বেরিয়েছে। এই অভিমান নানা উদ্দীপকের সাহায্যে প্রবর্টিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রবীর যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসায় জনার মাতৃহৃদয়ে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখা যায়। মদনমঞ্জরীর কানে যে রোদন ধ্বনি ভেসে আসে, জনাও তা শুনতে পান। কিন্তু জনা নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন না। রাক্ষসী মায়ার প্রতিবিধান করতে পুত্রবধূকে দেবতা স্মরণ করতে বলেন এবং নিজে গঙ্গাপূজা ক'রে পুত্রের সন্ধানে যাওয়ার সংকল্প করেন। অগ্নি দুর্গার অর্চনা করতে বল্‌লে জনা দুর্গাকে মায়ের সতিনী 'ডাকিনী' ব'লে নিন্দা করেন—পতিতপাবনী গঙ্গাকে এবং ডাকিনীকে একাসন দিতে, অভেদ মনে করতে অস্বীকার করেন। তাঁর দৃষ্টিতে "নারায়ণ ত্রিলোচন ভবানী" সকলেই গঙ্গার কাছে তুচ্ছ। ভৈরবীমায়া ভেদ করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে দৃপ্ত ঘোষণা করেন—

> অগ্রে করি গঙ্গাপূজা,
> পরে দেখিব কে ভৈরব মূরতি
> শূল হস্তে রোধে মোর গতি?
> শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে।"

সিংহিনী শাবকের অন্বেষণে শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে আসেন, দেখেন—মৃত শাবক মৃত্যুর কোলে শায়িত। জনা আর্তনাদ করেন কিন্তু মদনমঞ্জরী স্বামীকে দেখেই মূর্চ্ছিত হয়, জনা ভেঙ্গে পড়েন না। মৃত-শাবকা সিংহিনীর মতোই জনার শোক প্রতিহিংসানলে পরিণত হয়। এখানে বীরাঙ্গনার শোক ক্ষত্রিয়জননীর শোক। তার উপযুক্ত সঞ্চারিভাবের সংযোগে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

পুত্রশোকক্ষিপ্তা জনামূর্তি নাট্যকারের অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। দেখা যায় বিভিন্ন ব্যাভিচারিভাবের দ্বারা স্থায়িভাবে শোচনাকে নাট্যকার কত পরিপাটি ভাবে এবং কত গভীরভাবে ব্যক্ত করেছেন!

প্রবীরের মৃত্যুর পরেই জনার প্রবেশ। পুত্রের সন্ধান এতক্ষণে পেয়েছেন। ওই ওই ওই যে কুমার—তিনটি 'ওই' মায়ের হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়ার ব্যাকুলতাকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে কিন্তু জনা দেখলেন প্রবীর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, কোন মায়াবীর মায়ায় ভুলে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়নি। যুদ্ধে ভূমিশায়ী হয়েছে বলেই তা মাতৃগতপ্রাণ প্রবীর মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। জনার শোক বাৎসল্য-সঞ্চারিভাব আশ্রয়ে যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে—বাপধন পড়েছ সংগ্রামে। তাই যাদুমণি এস নাই মার কাছে?" এই উক্তির মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু শোকাবেগ বীরমাতার সমস্ত সংযমের নিয়ন্ত্রণ বিদীর্ণ করে—'হা পুত্র হা প্রবীর আমার!' আর্তনাদে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সম্মুখে পুত্রবধুকে দেখে পুত্রবধুর অভাগ্যের জন্য সমবেদনা এবং পুত্রহারানোর বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছেন আরে অভাগিনী, দেখ কুমার কি দশায়।" এই উক্তির 'অভাগিনী' শব্দটির এবং 'কুমার কি দশায়' কথাটির দ্বারা জনার হাহাকার সহস্রগুণ সঞ্চারিত হয়েছে। জনার সম্মুখে একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ এবং পুত্রবধু মূর্চ্ছিত। এতক্ষণ জনার শোক মমতার খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল এখন জনা তার বুক থেকে মমতাকে নির্বাসিত করতে হৃদয়ে একমাত্র প্রতিহিংসানল জ্বালিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। পুত্রঘাতী এখনও জীবিত, সুতরাং মমতার বা ক্রন্দনের সময় এ নয়। নয়নকে শাসন করেছেন জনা—বিন্দুবারি ঝরলে নয়ন উৎপাটন করে ফেলবেন। প্রতিহিংসা না নিলে প্রবীরের 'প্রেতাত্মা নিত্য আসি মা বলে ডাকিবে। নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা' জনা তার সমস্ত সত্তাটিকে প্রতিহিংসায় জ্বালাময় করে তোলার কামনায় ঐকান্তিক। তার কামনা শোণিতের সঙ্গে গরল প্রবাহ মিশুক—সমস্ত শোণিত গরলে পরিণত হোক, পুত্রহন্তাকে বিনাশ করতে তার

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অগ্নিময় হয়ে উঠুক, চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল বিক্ষিপ্তহোক, হিংসা-তৃষ্ণায় হৃদয় শুষ্ক হয়ে যাক, সূর্য কক্ষচ্যুত হ'য়ে সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিক, প্রলয়-ধূমে সমস্ত বিশ্ব আবৃত হয়ে যাক। শত্রুর শোণিতে জ্বালা জুড়িয়ে নিয়ে তারপরে জনা পুত্রকোলে নিয়ে শোবেন। শত্রু শাসন করতে যাওয়ার আগে জনার মাতৃহৃদয়ে আবার মমতা দেখা দেয়—'হা পুত্র হা স্বর্গ গিরিচূড়া' ব'লে আক্ষেপ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে বৈরনির্যাতন তো হয়নি; পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতেই যেন বলেন "যাই যাই বৈর-নির্যাতনে।" কিন্তু শেষ দেখা না দেখে মায়ের প্রাণ বিদায় নেবে কেমন ক'রে? শেষবারের মতো দেখতে গিয়েই জনার বুকভাঙা বেদনা 'আহা বাপধন'—সম্বোধনের নিরুদ্ধ ক্রন্দন হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। তৎক্ষণাৎ জনা আবার প্রতিহিংসার সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠে—নিষ্পলকদৃষ্টিতে প্রবীরকে দেখেন, সেই দৃষ্টি তার চিরস্থায়ী হোক এই কামনা করেন, বলেন—"পলক পোড়োনা চোখে নেহারি বাছারে।" [বিঃ দ্রঃ—'চোখে'র পরে"," (কমা) দিলে পংক্তিটির অর্থ দাঁড়াবে, জনা চোখকে পলক ফেলতে নিষেধ করছেন, কারণ পলক পড়লে প্রবীরকে তিনি দেখতে পাবেন না। কোন চিহ্ন না থাকলে অন্য ভাবেই অর্থ করা যেতে পারে এবং আমি মনে করি সেই অর্থটি অধিকতর শক্তিব্যঞ্জক। জনা চোখকে শাসিয়ে বলছেন, প্রবীরকে দেখার পর প্রবীরের যে রক্তাক্ত মূর্তি চোখে প্রতিভাত হয়েছে, সেই মূর্তি যেন পলক পড়ে অন্তর্হিত না হয় অর্থাৎ জনার চোখে পুত্রের মৃত্যুশয্যাশায়ী, মূর্তি ছাড়া আর কিছুই যেন না ভাসে] জনা নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রবীরের দিকে চেয়ে থাকেন। মদনমঞ্জরীর বিলাপ শোনার পরে জনার শোক আবার মমতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, শোক না করতে পারার বেদনার রূপ ধারণা করে। মদনমঞ্জরীকে তিনি শোক করতে বলেন কারণ তার হৃদয়ে শোক নেই; প্রবীরের অস্ত্রানলে দগ্ধ-তনুকে আঁখিবারি দিয়ে শীতল করতে বলেন, কারণ তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পুত্রের জন্য তিনি কাঁদবেন কি করে?—'রুধির তৃষ্ণায় জ্বলে জনার

অন্তর, মৃত পুত্র ও পুত্রবধূকে বনজঙ্গলে রেখে, প্রতিহিংসা পরায়ণা উন্মাদিনী জনা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে করতে রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

এরপর জনাকে দেখি আমরা রাজবাটীর কক্ষে। নরনারায়ণকে সাদর অভ্যর্থনা করবার উদ্দেশ্যে নগর সজ্জিত করার জন্য রাজা নীলধ্বজ আদেশ দেওয়ার পরে, জনা প্রবেশ করে রাজার কাছে আনন্দোৎসবের কারণ জানতে চান—জিজ্ঞাসা করেন—প্রবীর শত্রু জয় করে ফিরে এসেছে বলেই কি উৎসব? অথবা পুত্রবধের প্রতিবিধান করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করার উৎসব? অথবা রাজ-সেনাপতি অর্জুনকে বেঁধে নিয়ে আসছে বলে এই আনন্দ? অথবা পরাজিত হয়ে পাণ্ডবরা হস্তিনায় ফিরে যাচ্ছে বলে এই আনন্দোৎসব? অথবা নূতন কোন রাজ্য অধিকার করার জন্য এত আনন্দ? নিঃসন্দেহেই, এই সমস্ত ঘটনা আনন্দোৎসবের উপযুক্ত কারণ। কিন্তু অনেক সময় বিকারেরও মানুষ উন্মত্ত আনন্দ প্রকাশ করে, পায়ে শিকল পরে পাগলরা যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তেমন আনন্দও হতে পারে। জনা ব্যঙ্গের কশাঘাত দিতে যেয়ে সেই প্রশ্ন থেকেও নিবৃত্ত হন না, প্রশ্ন করেন—"কিংবা উন্মত্তের প্রায় শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উচ্ছ্বাস!" জনা স্পষ্টভাষাতেই রাজাকে ধিক্কার দেন—দাসত্বে আনন্দ তব বন্ধু যার, তার দাস নয়, পুত্রঘাতীর দাস।—কী প্রাণের মমতা। বাঁচার হীন প্রচেষ্টা। সংগ্রাম এড়িয়ে অমরত্ব পাওয়ার লোভ। ব্যঙ্গ ও ধিক্কার শেষ করে জনা রাজাকে যুদ্ধে যাওয়ার এবং সব কিছুর বিনিময়ে বীরত্ব সমুচ্চ করে রাখতে আহ্বান জানান। নীলধ্বজকে নিরুত্তাপ দেখে এবং অর্জ্জুনের সখা সম্বোধনে গর্বিত হতে দেখে জনা আবার ব্যঙ্গের কশাঘাতে নীলধ্বজকে জর্জরিত করতে থাকেন। হস্তিনায় যেয়ে অশ্বমেধযজ্ঞে পরিচারকের কাজ করতে বলেন, ব্রাহ্মণ ভোজনে জল যোগাতে, অথবা দ্বারী হয়ে দ্বারে বসতে, অথবা সিংহাসন নীচে যুধিষ্ঠিরের পদপ্রান্তে বসতে এবং তাকেও দ্রৌপদীর সেবায় নিযুক্ত করে সুখী হতে বলেন। নিদারুণ কশাঘাত কিন্তু তবু রাজা নীলধ্বজ কৃষ্ণদর্শন লোভে যুদ্ধবিমুখ। জনা ভীষ্মের কৃষ্ণভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন

—"হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার"। বার বার আহ্বান সত্ত্বেও যখন নীলধ্বজকে টলানো যায় না, নীলধ্বজ জনাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দেন তখন জনার তীব্র অশান্ত প্রাণের জ্বালা বার বার তীব্র উচ্ছ্বাসে উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। পুত্রশোকাতুরার শান্তি? পৃথিবী রসাতলে প্রবেশ করলেও, গ্রহ-তারা কক্ষচ্যুত হ'লেও, সূর্য নিভে গেলেও বিশ্ব প্রবল অন্ধকারে আবৃত হলেও, সমুদ্রের জল আগুনে জ্বলতে থাকলেও, অষ্টবজ্র চললেও, বিশ্ব পরমাণুতে চূর্ণবিচূর্ণ হলেও, পুত্রশোকাতুরার শান্তি নেই। যেখানে পুত্রঘাতীর পূজা হয় সেস্থান পাপস্থান। জনা সেখানে থাকবে না। প্রতিহিংসাতৃষ্ণা জনা মেটাবেই। জগৎ চেয়ে দেখবে—পুত্রশোকাতুরা নারী কত ভীষণা হতে পারে। সব অসাধ্য জনা সাধন করবেন। প্রয়োজন হলে সিংহিনীর দন্ত কেড়ে নেবেন, ফণিনীর গরল হরণ করবেন, শোকবলে বজ্র অগ্নি আকর্ষণ করে নেবেন। জনা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নেন।

কিন্তু জনার প্রাণে ছাড়া আর কারো প্রাণে প্রতিশোধস্পৃহা নেই। নগরবাসী আনন্দোৎসবে মত্ত, রাজা নীলধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে অবিচলিত হয়ে আছেন। এই জনার প্রতিশোধস্পৃহা, যত প্রবলই তা হোক কোন কর্মের পথে পরিকল্পনা ধরে অগ্রসর হ'তে পারেনি এবং পারেনি বলেই জনাকে আমরা দেখতে পাই—'প্রান্তর'। যেখানে থেকে জনা দূরে দূরে আরো দূরে, ভীষণ প্রান্তরে, মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে, দুর্গম কান্তারে, পর্বত শিখরে চলে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র। পতি যেখানে অরাতির সখা সেই পাপরাজ্য থেকে জনা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান। পুত্রশোকাতুরা মাতার হৃদয় জ্বালাময়ী অনুভূতির তীব্র স্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। জনা বালুময় বেলায় বসে বাড়বানল দেখতে চায়, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদগার দেখতে চায়। ঘোর তমোমধ্যে প্রলয় অনলের লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা দেখতে চায় বাইরের জ্বালার স্পর্শে ভিতরের জ্বালা জুড়াবার অথবা বাইরের উত্তেজনা দিয়ে মর্মজ্বালাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য জনার এক ঐকান্তিক প্রয়াস।

প্রতিহিংসা-গ্রহণের সহজ পথ রুদ্ধ বলেই জনা নিজেকে দূরে দূরে বহুদূরে অন্তর্হিত করতে চান। যাহার মাতৃসম্বোধনে জনার পুত্রশোক আরো জ্বলে ওঠে। প্রবীরের মৃত্যুর সঙ্গেই 'মা' বলা ফুরিয়ে গেছে। যেখানে দিক অন্তে নিশার আলয়, যেখানে প্রলয় হুঙ্কার ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, যেখানে সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুর বিনষ্ট, সূর্য দৃষ্টিহীন, আলোহীন, নিবিড় আঁধারে শুধু পরমাণু ঘোর শব্দে ঘূর্ণ্যমান, জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত, প্রলয়মেঘ থেকে বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে পড়েছে, যেখানে মহারুদ্র শূলকরে ধাবমান, এবং "আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশাণের ভালে, প্রলয় বিষাণ নাদে" সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে জনা আপনাকে নিমজ্জিত করতে চান। এরপর উন্মাদিনী জনাকে দেখা যায় "বনপথে"। মনস্তাপের পর মনস্তাপ—পুত্র প্রবীরের জন্য মাহিষ্মতী পুরীর কোন মানুষ হাহাকার করছে না, অশ্রুপাত করছে না, তাই প্রকৃতির কাছে তিনি শোকের আবেদন করেন—বায়ুকে 'হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস' ছাড়তে বলেন, মেঘকে তিনি গভীর গর্জনে অশ্রুবর্ষণ করতে বলেন। তিনি নিজে শোক করতে পারছেন না, কারণ 'শোক নাই জনার হৃদয়ে', আছে শুধু অনল। জনা নিজ হৃদয়ের প্রতিরূপ দেখার জন্য নিশাকে 'তিমির বসনে বজ্র অগ্নি অভিরণে' ভয়ঙ্কর সজ্জায় সজ্জিত হতে অনুরোধ করেন। ঘনবক্ষে ক্ষণপ্রভা জনার হৃদয়ে থরে থরে সাজানো প্রবীরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতগুলি, জনার হৃদয়—ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান"। সেখানে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ আগুন জনা যতকাল জীবিত থাকবেন ততকাল নিভবে না। জনার সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কিন্তু স্মৃতি জ্বলেই চলেছে—'ভস্ম নাহি হয়"। নিশীথিনী আঁধার বসনে যেমন চামুণ্ডারূপিণী, তাপধূমে জনাও চামুণ্ডা-রূপিনী শত্রুবক্ষ—রুধিরলোলুপা। জনার হৃদয় যেমন আঁধারে মগ্ন, জনা চায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিও তেমনি নিবিড় আঁধারে আবৃত হয়ে যাক। জনার বুকের তাপের কাছে দাবানলের তাপকেও হার মানতে হবে।

এই নির্জন বনপথে জনার ভ্রাতা উলুক সহোদর বলে পরিচয় দিতেই জনা

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এই কথাটিকেই যেন বলতে চান—জনার যে সহোদর হবে, সে নিশ্চয়ই অর্জ্জুনকে বধ করে তবে জনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, পাণ্ডবশোণিতে প্রবীরের তর্পণ করবে, পাণ্ডবদের শকুনি-গৃধিনীর খাদ্যে পরিণত করবে। পাণ্ডবদের মুণ্ড কেটে পিশাচের গেণ্ডুয়া-খেলায় গেণ্ডুয়াতে পরিণত করবে, শত্রুমেদে মেদিনীর কায়া পুষ্ট করে তুলবে, বনভূমির গলায় শত্রু-অস্থি-মালা পরিয়ে দেবে—ধরাকে নিষ্পাণ্ডব করবে। কোথায় সেই সহোদর! আর উলুক যে ঘরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে সেই ঘরই বা কোথায়? যে ঘরে পাণ্ডবদাস পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচার করছে, যে ঘরে পুত্রঘাতী সিংহাসনে বসে আছে সেই ঘর আর যার ঘর হোক জনার ঘর নয়। প্রবীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জনার চোখে সব শূন্যাকার আর চারিদিকে, ভিতরে-বাইরে শুধু হাহাকার। সংসার অসার, গোবিন্দের পাদপদ্ম সার, মৃত্যুর কঠিন দ্বার প্রবলতম শোকও খুলতে পারে না, কুমার ফিরে আসবে না—উলুকের সব কথাই জনা জানেন। কিন্তু উলুক মায়ের প্রাণের কতটুকু জানে? জানে না যে মা যেদিন "তনয়ে জঠরে ধরে, সেই দিন হতে, দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতিমাঝে"। শিশুর অসহায় অবস্থা থেকে সাবালক অবস্থা পর্যন্ত যত অবস্থা বা পর্যায় আছে, প্রতিটি অবস্থার স্মৃতি স্তরে স্তরে মার মনে সাজানো রয়েছে। উলুক তার কতটুকু জানে? অবশ্য উলুকের শেষের কথাটি মিথ্যা নয়—উন্মাদিনী বেশে অরণ্যের মধ্যে একাকিনী বিচরণ করলে তো বেদনা দূর হবে না পুত্রহন্তা শত্রু তাতে বেদনা পাবে না। পুত্রবধের কোন প্রতিশোধ হবে না। এই শেষ পংক্তিটি জনার মনে নতুন সংকল্প জাগায়—'তবে পাপ প্রাণ কি কারণে রাখি! পুত্রকে রণস্থলে ফেলে রেখেই, গঙ্গার কোলে জ্বালা জুড়াবার জন্য ছুটে যান এবং গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আমি জনা-চরিত্রটি এতো বিস্তারিত আলোচনা করলাম এই উদ্দেশ্যেই যে জনচরিটি ভাবনা-কল্পনায় এবং ইচ্ছার দৃঢ়তায় কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার সম্যক পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং বলতে চাই যে, জনা

চরিত্র-সৃষ্টি সর্বতোভাবে সুন্দর না হলেও, চরিত্রটিকে নাট্যকার সন্তোষজনক মাত্রায় গভীর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। একথা ঠিক যে নাট্যকার জনার মধ্যে 'ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানিঞ্চ'—অবোধপূর্ব স্মরণের কোন স্থান রাখেন নি—দৈবলোকবাসের স্মৃতির আকর্ষণ দেখাননি এবং দেখাননি বলেই একটি প্রত্যাশিত আচরণের অবকাশ—নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান মনের দ্বন্দ্বের অবকাশ, নষ্ট করেছেন, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, নাট্যকার জনার ক্ষত্রিয়-জননী সত্তাটিকে সাধ্যমত গভীর করেই তুলেছেন। পরিস্থিতি পরিকল্পনার সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উঠতে না পারে এমন নয়, জনার কর্মোদ্যম সম্পর্কেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি না এমন নয়, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণা পুত্রশোকাতুরা ক্ষত্রিয়জননীর ভাবনা-কল্পনার রূপটি যে জনার মধ্যে অতি পরিপাটি অনুভাবের ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এও সত্য যে ভাবনা-কল্পনায় জনা যতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে কর্মশক্তিতে ততখানি সমৃদ্ধ হতে পারেনি। যিনি এতবড় বীরাঙ্গনা, যিনি একগোটা পদাতিক সঙ্গে না নিয়েই প্রবীরকে রথী করে এবং নিজেকে সারথি করে যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন, যিনি স্বামীর এবং অন্যান্য সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পে অবিচলিত থেকে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্টই, তিনি শুধু হা-হুতাশ করতে করতে নিজেকে দূরে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবেন এটা প্রত্যাশিত নয়। নীলধ্বজের প্রতিবন্ধকতার আঘাত জনার বুকে মর্মান্তিকতম আঘাত দিয়ে জনার ইচ্ছাকে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে--এ যুক্তি দিয়ে আমরা জনার নিষ্ক্রিয়তাকে একভাবে ব্যাখা করতে পারি বটে, কিন্তু, এ ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক হবে না এই কারণেই যে জনা নীলধ্বজকে আগে থেকেই জানতেন, জানতেন স্বামী অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলেই জানেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কিছুতেই অস্ত্রধারণ করবেন না। সুতরাং প্রতিশোধ নিতে হলে একা তাঁকেই নিতে হবে। প্রতিবিধিৎসা নিয়েই তিনি নীলধ্বজকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণের

আবেগ কর্মখাতে প্রবাহিত না হয়ে পরিকল্পনাহীন ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে।

মনে হয়, নাট্যকার জনার এই নিষ্ক্রিয় পরিণাম কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন বিশেষ একটি কারণে এবং সেই কারণটি এই যে অগ্নিদেবের-দেওয়া বরকে সত্য করে তুলতে হলে জনাকে রণক্ষেত্রে নেওয়া সম্ভব হবে না, জনাকে গঙ্গাজলে প্রাণবিসর্জন দিতে বাধ্য করতে হবে। রণক্ষেত্রে নিয়েও অন্তিম মুহূর্তে গঙ্গার কোলে প্রাণত্যাগ করানো সম্ভব কি না ভাববার বিষয়, কিন্তু নাট্যকার সে পরিকল্পনার দিকে যেতে চাননি এবং তা চাননি বলে জনার মধ্যে যুদ্ধস্পৃহা জাগাননি, শুধু হাহাকারে হাহাকারে জনার শোককে উৎক্ষিপ্ত করেছেন এবং শেষপর্যন্ত নৈরাশ্যের তাড়না দিয়ে এবং গঙ্গারক্ষকদের তত্ত্বাবধানে জনাকে গঙ্গার কোলে পৌঁছে দিয়েছেন। কাব্যসংসারের প্রজাপতিরা নিশ্চয়ই যা খুসী পরিণাম কল্পনা করতে পারেন কিন্তু আমরা দেখতে চাই সেই পরিণাম যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না। যুক্তিসম্মত হলে আমাদের কোন আপত্তিই টিকবে না। সুতরাং প্রশ্ন—জনার এই কর্মহীনতা যুক্তিযুক্ত করে তুলতে পেরেছেন কি না? নাট্যকার যুক্তি দেখিয়েছেন কিন্তু আমরা সেই যুক্তিকে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারছিনে।

সে যাই হোক, যেহেতু চরিত্রের সমগ্র আয়তন (ডাইমেনশান) উপস্থাপিত করার শক্তি এ পর্যন্ত কোন প্রতিভারই মধ্যে (এমন কি শেক্‌সপীয়ারের মধ্যেও) দেখা যায়নি, গিরিশচন্দ্রের দুর্ব্বলতার উপরে বেশী জোর না দিয়ে তার শক্তিমত্তার দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং তা' করলেই দেখা যাবে, জনা চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট শক্তি দেখিয়েছেন। জনাচরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের কোন্ কবির কতটুকু ভাব বা কল্পনা গ্রহণ করেছেন বা আদৌ করেছেন কি না এটা খুব বড় প্রশ্ন নয়, কারণ এ প্রবাদবাক্য সকলেই জানেন যে 'যিনি যত বড় কবি তিনি তত বেশী ঋণী', বড় কথা এই যে, নাট্যকার কবিচিত্তফুলবনমধু সংগ্রহ করে মধুচক্র রচনা করতে

পেরেছেন কি না, সব কিছুর সংশ্লেষ ঘটিয়ে ভাবের নতুনতর, সুন্দরতর রূপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি না। এই অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতাকেই শাস্ত্রে প্রতিভা বলা হয়েছে এবং এই ক্ষমতার পরিচয় জনাচরিত্র সৃষ্টিতে সন্তোষজনক মাত্রাতেই পাওয়া যায়।

নীল ধ্বজ

জনা-কাহিনীর পরিমণ্ডল থেকে আমরা যদি পৌরাণিক আবহাওয়া বাদ দিয়ে লৌকিক বা সামাজিক আবহাওয়া সঞ্চার করতে চেষ্টা করি, অর্থাৎ জনাকে 'গঙ্গার তনয়া' প্রবীরকে "মহাদেব-কিঙ্কর" অগ্নিদেবকে নীলধ্বজের জামাতা, ধনঞ্জয়-বাসুদেবকে "নারায়ণ" বলে, বিশেষতঃ জনা ও প্রবীরকে দেবপরিবারভুক্ত বলে উপস্থাপিত না করি এবং নাটক থেকে ক্রোড় অঙ্কটি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে জনা নাটক একখানি সুন্দর ট্র্যাজেডিতে পরিণত হতে পারে। সেই ট্র্যাজেডি হবে (এক পুত্র স্নেহপ্রবণা ক্ষত্রিয়-জননীর ট্র্যাজেডি এবং তাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে থাকবে একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের বলয় এবং একটি বহির্দ্বন্দ্বের বলয় এবং দুই বলয়ের চাপে জনার ট্র্যাজেডি হবে। জনা-নাটক-খানির গঠনেও এই দ্বিবলয়ী দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্বলয়ের ভিতরে আছে—প্রবীর, জনা এবং নীলধ্বজের অন্তর্বিরোধ বা দ্বন্দ্ব এবং বহির্বলয়ে আছে—প্রবীর এবং পাণ্ডবশক্তির দ্বন্দ্ব। এই দুই দুই দ্বন্দ্বই একটি ঘটনার উৎস থেকে জন্মেছে এবং সেই ঘটনাটি—অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বটি বেঁধে রাখার জন্য প্রবীরের সংকল্প। এই সংকল্প যেমন প্রবীরের তেমনি জনারও বটে। এই সংকল্পের বিরোধী সংকল্প নীলধ্বজের এবং সেই সংকল্পের মূলে রয়েছে—নীলধ্বজের ধর্মবুদ্ধি—আশ্রমধর্মের অতীত যে ধর্ম সেই ধর্মের বোধ; যে বোধে—

কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ
অবতার হরিতে ধরার ভার
নরশ্রেষ্ঠ পূজা লোকমাঝে
দুষ্টবুদ্ধি নাহি হবে যার
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে…।

এই বোধ থেকেই নীলধ্বজ বলেন—"জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি" এবং সিদ্ধান্ত করেন—"কৃষ্ণের রাজীব পায় লইব আশ্রয়"। এইভাবে একদিকে জনার ক্ষাত্রিয়ধর্মনিষ্ঠার বা ধর্মাদর্শের সঙ্গে নীলধ্বজের ধর্মাদর্শের সংঘর্ষ ঘটেছে, অন্যদিকে পাণ্ডবশক্তির সঙ্গে প্রবীরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নীলধ্বজ যেমন জনার শত প্ররোচনা সত্ত্বেও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, জনাও তেমনি নীলধ্বজের শত অনুরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ করেননি। নাট্যকার, নাট্যরচনাশাস্ত্রে পরিভাষায় বলা যেতে পারে সুন্দর 'Unity of opposites'—সংঘটিত করেছেন *[The real unity of opposites is one in which compromise impossible] দুজনেই অবিচলিত। তাই দেখা যায়—প্রবীর যখন যুদ্ধযাত্রা করছে নীলধ্বজের মতিগতি একই আছে। জনাকে বলতে শোনা যায়—"বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার, রাজাকে না হেরি।" সম্পূর্ণ অসহযোগেরই পরিচয় !

নীলধ্বজ কৃষ্ণভক্ত হলেও পিতার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতা তাঁর মধ্যে মরে যায় নি। প্রবীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে না-আসায় তিনি অমঙ্গল আশংকায় খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং পুত্রের অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ করেছেন। তারপর প্রবীর প্রাণত্যাগ করার পরে, নীলধ্বজের পিতৃহৃদয়ে আর্তনাদ উঠেছে, শোকাতুর পিতা কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে—এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত কল্লেন ?…হা প্রবীর, হা প্রবীর বলে আর্তনাদ করেছে, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে পুত্রশোকের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছে। কিন্তু ঐ শোকে কৃষ্ণভক্তির বা

অর্জুনপ্রীতির গায়ে একটি আঁচড়ও পড়েনি। তাই দেখা যায় 'স্বয়ং অর্জুন রাজপুরে উপস্থিত, শুনেই, যুদ্ধে যাবার সংকল্পাদি ভুলে "সমাদরে নিয়ে এস" আদেশ দিয়েছেন, এবং অর্জুনের কাছে মনস্তাপ নিবেদন করে এবং অর্জুনের মুখে 'সখা' সম্বোধন পেয়ে পুত্রশোক ভুলে গেছেন এবং পরম অতিথি শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য নগর সজ্জিত করার আদেশ দিয়েছেন। ভক্ত-নীলধ্বজ স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এই সময়ে নীলধ্বজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন—অর্থাৎ শোকাবস্থা থেকে কৃষ্ণানুরাগের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উদ্‌বর্তন, অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ঘটেছে, এ কথা সকলেরই মনে হবে এবং যাঁরা মেঘনাদবধ-মহাকাব্য পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে পড়বে ইন্দ্রজিতের বধের পর বিভীষণের শোক-বিলাপকে। এই বিলাপে আন্তরিক অনুভূতি সঞ্চারিত হতে পারেনি এবং পারেনি বলেই— "চল যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতী পুরী আজ ধ্বংস হোক, আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিভেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস করছ? আমার প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও ধনু, অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই—আন্তরিকতাশূন্য উক্তি বলে মনে হয়। জনার ব্যঙ্গোক্তি-দংশনে জর্জরিত নীলধ্বজ এক কথাই বার বার বলেছেন— 'আসিছেন পতিত পাবন···কৃষ্ণদরশন পাব পাণ্ডবকৃপায়, নরদেহ পবিত্র হইবে।" এই অবিচলিত কৃষ্ণভক্তির বদ্ধ দুয়ারে মাথা কুটে কুটে ক্ষত্রিয়জননী জনা রক্তাক্ত হয়ে ফিরে গেছে। রণক্ষেত্রে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর চেয়েও পুত্রঘাতীকে নীলধ্বজের সখা বলে সম্বোধন, প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে অরাতিকে দেবজ্ঞানে সাদর সমভ্যর্থনা জনার জীবনে সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, শোকের চেয়েও বড় আঘাত। এই আঘাত দিয়েছেন স্বামী নীলধ্বজ,—হীনতার জন্য নয় শক্তিহীনতার জন্যও নয়, একমাত্র কৃষ্ণানুরক্তিতেই, যাঁকে পেলে সবকিছু পাওয়া হয়, চাওয়া-পাওয়ার সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায় তাকে পাওয়ার জন্যই। কৃষ্ণদর্শনে রাজা ধন্য হয়েছেন, রাজ্যের সকলে, এমন কি পশু পাখী কীট পতঙ্গ সকলেই ধন্য হয়েছে

"পরমপুরুষে হেরি পুরেছে বাসনা। নাহি আর অপর কামনা।" কি জনাকে তিনি ভুলবেন কেমন করে? "শোকাকুলা ত্যজি গেল হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী। পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনী। স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে। রাণী হয়ে কাঙালিনী।" কাঙালিনী জনার জন্য তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তলে ব্যথা বাজে। পুত্রশোকের কঠিন বেদনাও তো মন থেকে মুছবে না—তাঁর—"বুঝেও না বুঝে মন"। তিনি এখন—বজ্রাহত তরু দগ্ধ যত আশার পল্লব। তার দগ্ধকায়ে আছে মাত্র প্রাণ। কোনদিন তিনি শান্তি পাবেন কি? এই তার একমাত্র জিজ্ঞাসা, শান্তিই তার একমাত্র কামনা। শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজকে এই শান্তি দেন। নীলধ্বজ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দৈবলীলা উপলব্ধি করেন—দেখেন "কৈলাসশিখরে হরপার্বতী আসীন! পদপ্রান্তে প্রবীর ও মদনমঞ্জরী! সম্মুখে গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত, তন্মধ্যে মকর-বাহিনী গঙ্গামূর্তি, চামরব্যজনে জনা নিযুক্ত।" সকলেই তৃপ্ত শান্ত এবং আনন্দিত। অজ্ঞানমুক্ত নীলধ্বজ অজ্ঞানতিমিরবিনাশন নিত্য নিরঞ্জনের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

চরিত্রটি বিশ্লেষণ করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি—চরিত্রটির মধ্যে রাজ-সত্তা, পিতৃ-সত্তা, স্বামী-সত্তা এবং ভক্ত-সত্তা এই এতগুলি সত্তার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে বটে কিন্তু এক ভক্ত-সত্তা ছাড়া কোন সত্তাই লক্ষণীয় মাত্রায় ব্যক্ত হ'তে পারেনি এবং সত্তাগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে চরিত্রটির মধ্যে যতখানি জটিলতা এবং গভীরতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনার সদব্যবহার নাট্যকার করতে পারেননি। ফলে চরিত্রটি যতটা ভাবের বাহন হয়েছে ততটা রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হতে পারেনি, গোটা ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। উল্লিখিত সব কয়টি সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারলে তবেই জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক আবেগের সমন্বয়ে নীলধ্বজ যথার্থ একটি ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারতেন।

রাজা নীলধ্বজের মধ্যে জৈবিক ও আধ্যাত্মিকের যে সমন্বয় ঘটেনি, রাজা

আর বিদূষকের মধ্যে তা' অনেক পরিমাণে ঘটেছে। বিদূষকের হরিভক্তি নীলধ্বজের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। হরি এবং হরিনাম তাঁর কাছে পৃথক নয়। তার দৃঢ় প্রত্যয়—'কৃষ্ণ দয়াময় নাম কল্লেই হন উদয়।' কিন্তু রাজার প্রতি বড় মমতায় এই ভক্তি কৃষ্ণনিন্দার রূপ ধরেছে—ব্যাজস্তুতি হয়ে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে। রাজা তার অন্নদাতা বাপ। রাজার মধ্যে এখনই যদি কৃষ্ণভক্তি জেগে যায় তা হলে রাজার আর রাজ্যভোগ করা হবে না, রাজা বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন। দিন কতক মহারাজের যেন রাজ্য ভোগ হয়—এই তার ঐকান্তিক কামনা। কিন্তু অগ্নিকে 'হরি নিয়ে ছড়াছড়ি' করতে দেখে তার প্রাণে ভয় জেগেছে—হরি এসে রাজাকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে না দেন।

'মায়ে পোয়ে একটি হয়েছেন' দেখেই বিদূষক বুঝতে পেরেছেন—অগ্নিদেবতার বর বৃথা হবে না দামোদর আসছেন। সকাল থেকেই যখন পুরীতে হরি হরি রব শোনা গেছে তখনই বুঝা গেছে—হরি এলেন বলে। রাজা নীলধ্বজ শ্রীহরি স্মরণ করতেই বিদূষক বাধা দেন, কারণ কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। তিনি নিজে কখন হরিনাম মুখে আনেন না—এমন কি সাতদিন মণ্ডা খেতে না পাওয়ার মতো মহা দুর্দিনেও হরিনাম মনে আসলেও মুখে উচ্চারণ করেন না। কারণ হরিনাম করলেই বৈকুণ্ঠ থেকে রথ এসে হাজির হবে আর মোণ্ডা খাওয়ার আনন্দ ঘুচে যাবে।

বিদূষকের রাজহিতৈষা শুধু কথায় নিঃশেষ হয়নি। রাজাকে রক্ষা করার একমাত্র যে উপায়টি সেই ঘোড়া-ফিরিয়ে-দেওয়ার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন—চোর দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে চেষ্টা করেছেন। গঙ্গারক্ষকের সঙ্গে বিদূষক যে রসিকতা করেছেন তা যেমন খুবই উপভোগ্য হয়েছে, তেমনি তাতে বিদূষকের রসিক সত্তাটিরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেছে। রাজার হিতকামনায় বিদূষক শুধু ঘোড়াচুরির পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। পাণ্ডবদের হরি হরি করতে দেখে মনে ভয়সাও হয়েছে। দয়াময় হরিকে

পাণ্ডবকুলে চেপে থাকতে বলেছেন। তাঁর একমাত্র ভয়—রাজাটা হয়। তার প্রাণ যায় যাক, প্রাণের চেয়েও প্রিয় মোণ্ডা খাওয়া যদি না নাই হোক, তাঁর প্রাণের বিনিময়ে রাজার প্রাণ রক্ষা হোক।

এমন কি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সব চেয়ে ভয়ঙ্কর যে কাজ—রাণীকে বুঝাতে যাওয়া—সেই ভয়ঙ্কর কাজ করতেও বিদূষক চেষ্টা করেন। রাজপরিবারের মঙ্গলের জন্য তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। প্রবীর নিখোঁজ হলে, খোঁজ দেওয়ার জন্য অগ্নিকে নরমে গরমে অনেক কথা শুনিয়েছেন এবং বড় ছোট সব দেবতারই উপরে বীতরাগ হয়ে নিজেই প্রবীরের সন্ধানে বেরিয়েছেন। বিদূষক গভীর কৃষ্ণানুরাগে কৃষ্ণদ্বেষী—দেবদ্বেষী আচরণ করেন। বিদূষক বুঝে নিয়েছেন—"ঠাকুরের ছোট বড় নেই, সর্বনাশ করতে কেউ কসুর কর না।"

দেবদ্বেষী আচরণের প্রথম ধাক্কা গিয়ে পড়ে ব্রাহ্মণীর ইতুভাডগুলির উপরে। ব্রাহ্মণী তেড়ে আসতেই বিদূষক বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন—দুদিন বাঁচতে চান বলেই দেবাদীদের বিদায় দিতে চান। দেবতা মানেন না তা সত্য নয়, দেবতা তিনি খুবই মানেন তবে দেবতারা কাজ ভালো করেন একথাটা মানেন না। ইতুভাড় জলে ফেলতে এসেছিলেন তিনি, রাজার সংকট দূর করবার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক কাজ করবার অভিপ্রায়ে—ইতুর ভাড় জলে ফেলা; সমস্ত শালগ্রামকে দীঘিসই করা, বিদূষকের কাছে মাঙ্গলিক কাজ, কারণ ওরা ডাঙ্গায় থাকতে রাজার বড় ভাল হবে না।

এর পর বিদূষক কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে কৃষ্ণের ব্যাজস্তুতি করতে করতে রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন।

পালিয়ে ঘর ছেড়ে প্রান্তরে—ডাইনেথেগো গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। কৃষ্ণনিন্দা মুখে লেগেই আছে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের আতঙ্কে বিদূষক শেষপর্যন্ত 'বস্ত্র দিয়া চক্ষু বন্ধন' করেছেন পাছে কৃষ্ণকে দেখে মুক্তি পেয়ে যেতে হয়। ব্রাহ্মণী বিশ্বাস করতে চায় না—নাম নিলেই কৃষ্ণ এসে কৃপা

করেন। কিন্তু বিদূষক 'নামের ঠেলা' কি তা জানেন। নামমাহাত্ম্যে তাঁর অটুট বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসবলেই কৃষ্ণকে তিনি আকর্ষণ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কৃষ্ণ উপস্থিত। বিদূষকের বিশ্বাসদৃঢ়তা দেখে আনন্দিত হন, বিদূষক কৃষ্ণরাধার যুগলমূর্তি দেখে চিরধন্য হন।

এই বিদূষকের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মোণ্ডালোভী আশ্রয়দাতার বা অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং রাজবয়স্য বিদূষকের সংস্কার বা পূর্বানুস্মৃতি থাকলেও, এই বিদূষক—এই ব্যাজস্তুতিময় ভক্ত বিদূষক নাট্যকারেরই সৃষ্টি এবং প্রশংসনীয় সৃষ্টি। নিছক ব্যাজস্তুতি দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে চরিত্রটির একঘেঁয়ে হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে নাট্যকার সরস রসিকতার এবং নানা অনুভাবের অবতারণা করে চরিত্রটিকে সর্বক্ষণেই চিত্তাকর্ষক করে রেখেছেন। চরিত্রটির মধ্যে যে কৃষ্ণভক্তির বা নামমাহাত্ম্য বিশ্বাস দেখানো হয়েছে তার মাত্রা একটি বিশেষ বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের ঐকান্তিকতার মাত্রাও বেড়েছে।

এক কথায় চরিত্রটির মধ্যে 'Progression'ও রয়েছে। কোন ভাবকে সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে যে সৃষ্টি-নৈপুণ্য আছে তা খুব সুলভ নয়। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নির্বোধ (ফুল) এবং ভাড়চরিত্রে (কোটজেষ্টার) এই দুই জাতীয় সৃষ্টির কিছু কিছু নিদর্শন আমরা অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি কি করে অতিলঘু হাস্যোদ্দীপক ভাবের সাহায্যে গভীর ভাবকে ব্যঞ্জিত করা যায়। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র শেক্সপীয়র পড়েছিলেন, অনুবাদও করেছিলেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে শেক্সপীয়রের ঐসব নির্বোধকল্প ভাঁড় চরিত্রদের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা শেক্সপীয়রের ঐ ধরনের হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের সঙ্গে বিদূষকের তুলনামূলক আলোচনা করবেন তাঁরা নিশ্চয়ই গিরীশচন্দ্রের

মৌলিকতা দেখে মুগ্ধ হবেন, দেখবেন—'রাজালীয়র' নাটকের 'বিজ্ঞতম বোকা'—"ফুল" এবং 'চতুর্থ হেনরি' (১ম ২য়) নাটকের সুরসিক 'ফলষ্টাফ' 'দি টেম্পেষ্ট' নাটকের ভাঁড় 'ট্রিনকিউলো', 'লাভস্ লেবারস্ লষ্ট' নাটকের ভাঁড়—কোষ্টার্ড, 'মারচ্যাণ্ট অফ ভেনিস' নাটকের ভাঁড় 'ল্যানসলট গোব্‌বো, 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'—নাটকের ভাঁড়—'ট্যাচটোন' প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে বিশেষতঃ 'রাজালীয়রের'-এর 'ফুল' এবং চতুর্থ হেনরির ফলষ্টাফ-এর সঙ্গে জনা-নাটকের বিদূষকের বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। এ কথা হয়তো মিথ্যা নয় যে শেক্‌সপীয়র পড়েই নাট্যকার বুঝেছিলেন, হাস্যোদ্দীপক চরিত্রেও হৃদবৃত্তির এবং চিদ্‌বৃত্তির সংযোগ ঘটিয়ে আপাত লঘুর মধ্যে গুরুত্বারোপ করা সম্ভব, কিন্তু এ কথা সত্য নয় শেকস্‌পীয়রের কোন নাটকে বিদূষকের মতো এই ধরনের আপাত-লঘু অথচ গুরুভাব-প্রতিপাদক চরিত্র আছে এবং সেই চরিত্রের অনুকরণে তিনি বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'গুরুভাব-প্রতিপাদক' কথাটি ব্যাখ্যা করে না বললে ভুল বুঝার আশংকা আছে। শেক্‌স্‌পীয়রের বোকা 'ফুল' অনেক বিজ্ঞোক্তি করেছে একথা ঠিক কিন্তু কোন 'আইডিয়া'র প্রতিপাদক হয়নি। বিদূষকের সঙ্গে 'ফুল'-চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। বিদূষক 'ফুল'-এর মতোই হৃদয়বান, রসিক এবং বক্রোক্তিপটু এবং তার চেয়েও বেশী—পরমার্থপ্রবণ এবং পরমবৈষ্ণব হরিনামমাহাত্ম্যে-বিশ্বাসী। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র এই হিসাবে শেক্‌সপীয়র থেকেও একধাপ এগিয়ে গেছেন—প্রচলিত বিদূষক চরিত্রে নতুন এক আয়তন (ডাইমেনশান) যোজনা করেছেন।

প্রবীর

নীলধ্বজ-জনার একমাত্র পুত্র প্রবীর—প্রবীরের এ আপাতপরিচয় বা লৌকিকপরিচয় তার আসল পরিচয় এই যে প্রবীর মহাদেবের কিঙ্কর, জাহ্নবীর

অনুরোধে গুণবতী জনা শিবকিঙ্করকে পুত্ররূপে লাভ করেছেন। একমাত্র পুত্র অবশ্যই পিতামাতার 'নয়নের মণি' হবে প্রবীরও নীলধ্বজ-জনার 'নয়নের মণি'। প্রবীর শুধু মহাশক্তিই নয়, একমাত্র পুত্রের মতোই অসাধারণ মাতৃভক্ত। সুযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তানের মতো তার একটিমাত্র সাধ—"যোগ্য বীর সনে সদা রণ-সাধ—ভুবনবিজয়ী রথীকে অরিরূপে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, শত্রুকে মেরে অথবা শত্রুর হাতে মরে সমর-বাঞ্ছা পূরণ করা।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ এই বাঞ্ছাপূরণের মহাসুযোগ এনে দিল। প্রবীর যজ্ঞাশ্ব বেঁধে রেখে পিতার অনুমতি নিতে গিয়ে অনুমতি পেল না। রাজা যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। প্রবীরের ক্ষত্রিয়-প্রাণে দারুণ অভিমান উথলে উঠল। পিতার বিরুদ্ধাচরণ না করে সে মায়ের কাছে লোকালয় ত্যাগ করে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। পুত্রের অকল্যাণের কথা ভেবে মা পুত্রকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু প্রবীরের অণুপরমাণু ক্ষত্রিয়াভিমানে গঠিত; প্রবীর মাকে যোগ্য উত্তর দিল—"রণমৃত্যু হতে কিবা আছে মা কল্যাণ? কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে? কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী, ক্ষত্রিয় নন্দিনী কার ভীরুপুত্র সাধ?" সে পিতার নিষেধ অমান্য করবে না, কিন্তু কলঙ্কময় জীবনও রাখবে না। প্রবীরের কথা শুনে জনার হৃদয়েও ক্ষত্রিয়াভিমান জাগে, জনাও ঘোষণা করেন—"রণসাধ যদি তোর, রণ পণ মম।" রাজা নীলধ্বজ আর একবার প্রবীরকে নিষেধ করলে প্রবীর বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে পিতাকে বলে—আপনার আজ্ঞা অবশ্যই পালন করব কিন্তু একটি নিবেদন আছে—'কলঙ্ক কালিমা মাখা কুৎসিৎ বদন লোকে কভু না দেখাব আর।

এই ক্ষত্রিয়বীর প্রবীরকে আমরা মদনমঞ্জরীর সঙ্গে কথোপকথনের সময়েও দেখেছি। প্রবীর-পত্নী মদনমঞ্জরী স্বামীর অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা। তার প্রাণ কেন কাঁদছে সে তা জানে না, হৃদয় তার শূন্য মনে হচ্ছে, দূর রোদনধ্বনি কানে এসে প্রবেশ করছে, কঙ্কন খসে খসে পড়ছে, মাথার সিন্দুর মলিন বলে

মনে হচ্ছে, কোন শোকাতুরা রমণীর কান্নার সঙ্গে এক স্বরে তার প্রাণ কাঁদছে। প্রবীর এসে পত্নীর বিষণ্ণ মূর্তি দেখে মনে করল—মদনমঞ্জরী মান করেছে—তাই "পায়ে ধরি, মান ভিক্ষা দাও" বলে মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করল এবং বিলম্বের কারণ—যজ্ঞাশ্ব ধরার ব্যাপারটি প্রকাশ করল। মদনমঞ্জরীর অকল্যাণ-আতঙ্ক ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং সেও ঘোড়া ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মিনতি জানাতে লাগল। অর্জুনের সঙ্গে স্বামী যুদ্ধ করতে চায়—এ কথা শোনার পরে তার বিস্ময়ের ও আতঙ্কের শেষ নেই। প্রবীর তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল—যে যথার্থ ক্ষত্রিয় "রণ তার চির-আকিঞ্চন", ক্ষত্রিয়ের সমান উচ্চ-অধিকার আর কারো নেই,—"সম মান জীবনে মরণে"। যুদ্ধে জয় হলে লোকময় সুখ্যাতি আর মৃত্যু হলে সদম্ভে স্বর্গেপুরে গমন। ক্ষত্রিয়কুমারীর যুদ্ধের ভয় থাকবে কেন? বীরাঙ্গনা পতিকে রণসাজে সাজিয়ে দেয়, হাসিমুখে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়।—প্রতিযোদ্ধা ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয় হোন আর নারায়ণই হোন, কিছুই যায় আসে না। যিনিই যুদ্ধে আহ্বান করবেন, ক্ষত্রিয় তার আহ্বানেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। নিজ কর্তব্য করলে জনার্দন কখনই রুষ্ট হবেন না, আর তা' যদি হনই তবে তিনি নারায়ণ নন। কারণ—

"নিজ ধর্মে রুচি আছে যার
তার প্রতি বহু প্রীতি ভার।"

প্রবীর ক্ষত্রিয়ধর্মে দীক্ষিত এবং জানে নিজ ধর্ম পালন করলে নারায়ণ রুষ্ট হতে পারেন না।

কিন্তু, নগরের আর সকলের মধ্যে এ উৎসাহ নেই, সকলেই হাহুতাশ করছে যুদ্ধের আশংকায়। তাই, প্রবীর একাই যুদ্ধে যাবেন—মায়ের কাছে সংকল্প ব্যক্ত করেন। তাঁর মনের গভীরতর প্রদেশে পিতার বিরুদ্ধে যে অভিমান জমেছে শত সাবধানতা সত্ত্বেও "রলুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে" কথাটির মধ্যে যেন উছলে উঠেছে। এই উক্তিটিতে চাপা ধিক্কার ও পিতার নিরাপত্তাচিন্তা এমনভাবে মিশে আছে যে উক্তিটি দ্ব্যর্থক হয়ে পড়েছে।

এর পর, আমরা যে প্রবীরকে পাই, সে প্রবীর দৈবমায়াবলে মোহগ্রস্ত—মায়াকাননের নায়িকার মোহে মুগ্ধ প্রবীর। প্রবীরের মুখে নায়িকার যে রূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে প্রচলিত উপমাগুলিই সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু প্রবীরের মোহের আবেশ ও আবেশের ক্রমবৃদ্ধির রূপটি লক্ষণীয় হয়ে না উঠলেও অসার্থক হয়নি। মোহভঙ্গের পরে আবার আমরা ক্ষত্রিয়াভিমানী বীর প্রবীরকেই দেখতে পাই। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের কথার উত্তরে প্রবীর যে-সব কথা বলেছে তা ক্ষত্রিয়তেজে দ্যুতিমান। কিন্তু প্রবীর মোহগ্রস্ত হয়েছে, বেশ্যাদাস হয়ে কর্তব্য ভুলেছে—এ কলঙ্কের মোচন একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর দ্বারা হতে পারে না। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও প্রবীর আর ঘরে ফিরে যাবে না—অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তাতে প্রবেশ করবে। এ কাজ প্রবীরকে করতে হয়নি। যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। মৃত্যুমুখে প্রবীরের আত্মবিস্মৃতি ঘুচে গেছে। প্রবীর শঙ্করকে স্মরণ করে বলেছে—

হে শঙ্কর। এতদিনে
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে
ভোলানাথ! ভুলেছিলে কতদিন?

বলাবাহুল্য, প্রবীর-চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার গভীর জীবনবোধের কোন পরিচয় দিতে পারেননি। আত্মবিস্মৃত শিবকিঙ্করের সত্তাটি যেমন এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তেমনি চরিত্রটি নানা দিক দিয়ে অপরিণত হয়ে রয়েছে। যে ব্যক্তিত্ব অশ্বমেধের অশ্ব বেঁধে রাখতে পারে, সেই ব্যক্তিত্ব পিতার সম্মুখে নিজেকে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ভাবনা-কল্পনায় প্রকাশ করতে পারে। প্রবীর-চরিত্রে পরিণত ব্যক্তিত্বের অভাব সুপরিস্ফুট।

এখানেই আমি চরিত্রবিশ্লেষণ শেষ করছি এবং উপসংহারে জনা-নাটকের অন্যতম লক্ষণীয় উপাদান "গান"—সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য করছি।

নাটকের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে, জনৈক বিখ্যাত সমালোচক লিখেছিলেন—নাটকের ক্রমবিকাশ হচ্ছে, সংলাপের দ্বারা সংগীতের পরাভবের

ইতিহাস। মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে আদিম নাটক ছিল সংগীতময় রচনা, ক্রমে সংগীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয়েছিল এবং ক্রমশ সংগীতকে হটিয়ে দিয়ে সংলাপ প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সংগীতের আবেগসঞ্চার করার ক্ষমতা এতই অধিক যে, নাট্যাভিনয়ে, যেখানে জীবনা-বেগকে দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য, সংগীতকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আধুনিক নাট্যকাররা নাটক থেকে সংগীতকে নির্বাসিত করলেও নাট্যপ্রযোজককারী সংগীতের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, সংগীতকে নেপথ্য উদ্দীপন হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি নাট্যকাররাও কেউ কেউ সংগীতের জন্য কষ্টকল্পিত পরিস্থিতি উদ্ভাবন করে থাকেন এবং সংগীতকে কখনও বৈচিত্র্যবিধায়ক কখনও বা আবেগোদ্দীপক এবং কখনও বা ভাববিশ্লেষক উপাদান হিসাবে প্রয়োগ করে থাকেন। যে সংগীতকে নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টির বা দর্শক চিত্তরঞ্জনের জন্য যোজনা করা হয়—নাটকীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যে সংগীতের কোন অন্তরঙ্গ যোগ নেই, সেই সংগীত নাটকে হেয়, কারণ অনাটকীয়। পরিস্থিতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ যুক্ত হয়ে পরিস্থিতির অবিচ্ছেদ স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে যে সংগীত নাটকে স্থান পায় সেই সংগীতই নাটকীয় ; কারণ নাটকে সেই উপাদান বা উপাদানাংশই অনাটকীয় যা নাট্যবৃত্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত থাকে না।

এই মূলসূত্রটি সামনে রেখে আমরা জনা-নাটকের 'গান'গুলির নাটকীয়তা, উপযোগিতা এবং উৎকর্ষ বিচার করতে অগ্রসর হচ্ছি।

জনা-নাটকের গান

১ম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—

(ক) সখিগণ—১

(খ) বসন্তকুমারীর—৩

১ম অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—

(ক) প্রমথগণ—১

(খ) যোগিনী—প্রমথগণ—২

২য় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক—

(ক) জনা—১

২য় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

(ক) মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্ত—১

২য় অঙ্ক—অষ্টম গর্ভাঙ্ক—

কাম ও রতি—২

৩য় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক—

(ক) নায়িকা ও সখিগণ—২

(খ) নায়িকা—৩ ? (১টি গীত, ২টি আবৃত্তি ?)

(গ) সখিগণ—১

৩য় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

(ক) ভৈরব-ভৈরবী—১

৪র্থ অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

(ক) বালকগণ (কৃষ্ণলীলা গান)—২

৫ম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক—

গোপিনীগণ—

ক্রোড়-অঙ্কে—

(ক) ভৈরব—১

নায়িকার দুটি সুরে আবৃত্তি বাদ দিলে গানের সংখ্যা মোট—২০।

এখন বিচার করে দেখা যাক গানগুলি পরিস্থিতির সঙ্গে অন্তরঙ্গযোগে যুক্ত হয়েছে কি না।

জনা নাটকে প্রথম গান গেয়েছে মদনমঞ্জরীর সখীরা। উদ্যানে সখীরা রাজপুত্রবধূর মনোরঞ্জন করতে গান গাইবে—এর মধ্যে অনুচিত কিছুই নেই। বসন্তকুমারীর গানগুলিও এই কারণে অনুপযোগী হয়নি। তারপর কৈলাসপর্বত উপত্যকায় প্রমথগণও যোগিনীগণ মহাদেবের স্তবস্তুতি করবে এও স্বাভাবিক সুতরাং প্রমথগণের ও যোগিনীগণের গানেও আপত্তি করার কারণ নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জনার পূজাগৃহে জনা যে স্তব পাঠ করেছেন তা স্বাভাবিক হলেও স্তবের পরেই—প্রবীরের যুদ্ধায়োজনের বা যুদ্ধের মুখেই জনার গান স্বাভাবিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে বলেই অনাটকীয় হয়ে উঠেছে এবং যাত্রা নাটকের অবহাওয়া এনে দিয়েছে। তারপর শিবিরের পথে শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য মদনমঞ্জরী-স্বাহা-বসন্তের সমবেত গীত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন হিসাবে উপভোগ্য হলেও খুবই কষ্ট কল্পিত। বালক বালিকা বেশে কাম ও রতি যে গান দু'টি করেছেন তার ঔচিত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না এ কথা ঠিক কিন্তু এ কথা মিথ্যা নয় যে বালকবালিকাবেশী কাম ও রতি কৃষ্ণযাত্রার বালক-বালিকা-বেশী কৃষ্ণ-রাধারই লুপ্তাবশেষ। যে গানগুলি সত্যিই অপরিহার্য এবং সুলিখিত, সেগুলি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের মায়াকাননের গান। আগেই এ দৃশ্যটি সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করেছি এবং এখানে এই কথাই বলতে চাই যে এই দৃশ্যে হাফ-আখড়াইয়ের গান রচয়িতা গিরিশচন্দ্র যেন নিজের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র কত সুন্দর গীতিকার ছিলেন এবং গানকে কি করে নাটকীয় করতে হয়—এই দৃশ্যে তার সুন্দর একটি উদাহরণ। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কের শেষাংশে ভৈরব-ভৈরবীদের গীতটি যেমন নাটকের পৌরাণিক পরিমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে তুলছে তেমনি প্রলয়ের বা সংহারের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি

ক'রে জনার দ্বারা উৎপন্ন রৌদ্র-রসকে আরো তীব্রভাবে সঞ্চারিত হ'তে সাহায্য করেছে। তবে চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে "রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথে" শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতে—'বালকগণ' যে কৃষ্ণলীলা গান করেছে তা গান হিসাবে খুবই উপভোগ্য বটে কিন্তু বালকগণ এই পরিস্থিতির কতখানি স্বাভাবিক অঙ্গ হ'তে পারে তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগবেই। এই বালকদের দেখে অনেকেরই যাত্রাদলের বালকদলের সমবেত সংগীতের কথা মনে পড়বে এবং এই কথাই মনে হবে—গান-নির্বাচন ঠিক হ'লেও গায়ক নির্বাচন ঠিক হয়নি অথবা ঐ পরিস্থিতিতে গান বাদ দিলেই ভাল হ'ত এবং হ'ত এই কারণেই যে তাতে নাটকের গায়ে যতখানি যাত্রাগন্ধ জড়িয়ে আছে তা অনেকটা কমে যেতো। এ কথা হয়তো ঠিক যে নীলধ্বজ কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করার জন্য আনন্দোৎসব করার জন্য আগেই আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর আদেশানুসারে কৃষ্ণের স্তবস্তুতি মহিমাকীর্তন নিশ্চয়ই হবে, এবং বাল্যলীলার কীর্তনের জন্য বালকগণই উপযুক্ত পাত্র কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে, কোন অভ্যর্থনা সমিতির দ্বারা এই গীত আয়োজিত হয়নি এবং বালকদের দিয়ে কৃষ্ণলীলা কীর্তন না করলে, দৃশ্যের গাম্ভীর্য আরো বৃদ্ধি পেতো।

যা হোক, আসল কথা এই যে এই জাতীয় পৌরাণিক নাটকে, নাট্যকার যাত্রারুচির গীতপ্রবণতা এবং থিয়েটার রুচির সমুচিত সংলাপ প্রবণতা—এই দুই প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় করার একটা সুন্দর সুযোগ করে নিয়েছেন। যে জাতি গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পযন্ত যত অনুষ্ঠান আছে সব অনুষ্ঠানেই গান করে সেই জাতির নাটকে গানের আদর যে একটু বেশী পরিমাণেই থাকবে এবং সেই জাতির সাধারণ লোকে গান শুনতে ভালবাসবে—এটা সহজেই অনুমান করা যায়। গিরীশচন্দ্র সহজে যাত্রা বোধ থেকেই এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর নাটকে জনরুচির অনুবর্তন করে দুই রুচির (যাত্রা ও থিয়েটার) সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই দুই রুচির দ্বন্দ্বের ও সমন্বয়ের দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটকের গান যোজনা আলোচনা করা দরকার। এখানে তার কোন অবকাশ নেই। এখানে, শুধু কি ভাবে সেই আলোচনা করা হবে, তারই দিগ্‌দর্শন করা হ'ল।

॥ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥

॥ নর-নারায়ণ ॥

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

কোন শিল্পী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে, শিল্পীর সমগ্র রচনার শৈল্পিক মূল্য, বিশেষভাবে নির্ধারণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী এবং অসম্পূর্ণ, এক কথায় ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। কিন্তু "শৈল্পিক মূল্য" কথাটি শুনিতে বা বলিতে যত সহজ, নির্ধারণ ব্যাপারটি তত সহজ তো নয়ই, বরং সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য। সমালোচক মাত্রই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে যে পরিশ্রম প্রয়োজন তাহা অনেক সমালোচনার মধ্যেই পাওয়া যায় না। লেখকের প্রত্যেকটি রচনার ভাব বস্তু (content) ও রূপ (form) বিচার করিয়া, রচনাটিকে পূর্ববর্তী শিল্পীদের অনুরূপ রচনার সহিত তুলনা করিয়া ভাবের ও রূপের মৌলিকতার মাত্রা নিরূপণ করিয়া, কাহিনী-ভাব-চরিত্র-ভাষা-কল্পনা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হিসাব-নিকাশ করিয়া জীবন-সমালোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ধারণ করিয়া সমালোচনা করা খুবই দুর্লভ শক্তির কাজ। বাস্তবিক, এই জাতীয় সমালোচনা—একাধারে ঐতিহাসিক-সমালোচনা, তুলনামূলক-সমালোচনা, রস-সমালোচনা, আলঙ্কারিক সমালোচনা, সমালোচনা-সাহিত্যে দুর্লভ বস্তু। ইহার জন্য চাই যেমন ব্যাপক অধ্যয়ন ও শাস্ত্রানুশীলন, তেমনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বিশ্লেষণ-শক্তি।

বলা দরকার এইরূপ আদর্শ-সমালোচনা, এই সংকীর্ণ অবসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পরিচয় দেওয়া ছাড়া অনুরূপ কিছু করার অবকাশ নাই এবং নাই বলিয়াই, আমি প্রথমে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-রচনার **অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়** দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এবং সেই চেষ্টার মধ্য দিয়াই সাধারণভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যের বিষয়বস্তু, রস, শৈল্পিক সার্থকতার মাত্রা প্রভৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি। সাধারণ সমালোচনার ত্রুটি হইতে

আমার এই সমালোচনা যে মুক্ত নয়—সেকথা গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যখন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বাংলা নাট্য সাহিত্যের বয়ঃক্রম [(১৮৫২ -- ১৮৯৪) = ৪২] একচল্লিশ বৎসর। অখ্যাত বিখ্যাত বহু নাট্যকারের সাধনার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্য তখন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্ব অর্জন করিয়াছে। মোটকথা, গণনায় এবং গুণে বাংলা নাটকের মর্যাদা তখন একেবার নগণ্য বলা চলে না।

(১) তারাচরণ শিকদার, (২) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, (৩) রামনারায়ণ, (৪) হরচন্দ্র ঘোষ, * (৫) কালীপ্রসন্ন সিংহ, (৬) নন্দককুমার রায়, (৭) উমেশচন্দ্র মিত্র, (৮) উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, (৯) রাধামাধব মিত্র, (১০) যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, (১১ নারায়ণ চট্টরাজ, (১২) শ্রীশিমুএল পীর বক্স, (১৩) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৪) যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৫) মণিমোহন সরকার (১৬) সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (১৭) * **মধুসূদন দত্ত**, (১৮) হরিশ্চন্দ্র মিত্র, (১৯) সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, (২০) * **দীনবন্ধু মিত্র** প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন। **জ্যোতিরিন্দ্র নাথ**—কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), এমন কর্ম আর করবনা (১৮৭৭), অশ্রুমতী (১৮৭৯), মানময়ী (১৮৮০) স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২), হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) পর্যন্ত মোট ৮খানি লিখিয়াছেন… (আরো ২৫ খানি লেখা বাকী); **অমৃতলাল বসু**—হীরবচুর্ণ নাটক (১৮৭৫), চোরের উপরে বাটপড়ি (১৮৭৬), তিলতর্পণ নাটক (১৮৮১), ব্রজলীলা (১৮৮২), ডিসমিস (১৮৮৩), চাটুজ্যে ও বাড়ুয্যে (১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), তরুবালা (১৮৯১), রাজা বাহাদুর (১৮৯১), কালাপাণি (১৮৯২, বিমাতা (১৮৯৩), বাবু (১৮৯৪)—মোট ১২ খানি লিখিয়াছেন—(আরো ৩৮।৩৯ খানি বাকী); **রাজকৃষ্ণ রায়**—অনলে বিজলী (১৮৭৮), দ্বাদশ গোপাল (১৮৭৮), লৌহ কারাগার (১৮৮০), তারক সংহার (১৮৬০), হরধনু ভঙ্গ (১৮৮১), রামের বনবাস (১৮৮২), যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪), তরণীসেন বধ (১৮৮৪), রাজা বিক্রমাদিত্য

(১৮৮৪), প্রহ্লাদ চারত্র (১৮৮৪), চন্দ্রহাস (১৮৮৮), হরিদাস ঠাকুর (১৮৬৮), কলির প্রহ্লাদ (১৮৮৮), মীরাবাঈ (১৮৮৯), চমৎকার (১৮৮৯ ?), খোকাবাবু (১৮৯০), বেলুনে বাঙালী বিবি (১৮৯০), ডাক্তারবাবু (১৮৯০), সত্যমঙ্গল (১৮৯০), চতুরালী (১৮৯০), চন্দ্রাবলী (১৮৯০), টোটকা-টাটকা (১৮৯০), জগা পাগলা বা জ্যান্ত মরা (১৮৯০), লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০), জুজু (১৮৯০), রাজা বংশধ্বজ (১৮৯১) লক্ষহীরা (১৮৯১), প্রহ্লাদ মহিমা (১৮৯১), লায়লা মজনু (১৮৯১), বনবীর (১৮৯২), ঋষ্যশৃঙ্গ (১৮৯২). বেনজীর বদনে মুনীর (১৮৯১)…মোট ৩৩ খানি ছোট বড় নাটক-নাটিকা রচনা শেষ করিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। মনোমোহন বসু—রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭), প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯), সতী নাটক (১৮৬৯), নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ পরাজন নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় (১৮৯০) ৮ খানি নাটক লিখিয়াছেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য (১৮৭৮), আচভূয়ার বোম্বাচাক (১৮৮০), অহল্যাহরণ (১৮৮১), রাবণ বধ (১৮৮২), দ্রৌপদীর সয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫), প্রভাস-মিলন (১৮৮৭), সীতা স্বয়ম্বর (১৮৮৮), নন্দবিদায় (১৮৮৮), জন্মাষ্টমী (১৮৮৯), পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯), মোহশেল (১৮৯২) খণ্ডপ্রলয় (১৮৯৩) ১৩ খানি লঘু-গুরু নাটক-নাটিকা রচনা করিয়াছেন—(আরো ৮ খানি তখনও বাকী) ***নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃঃ আরম্ভ করিয়া ৪৫।৪৬ খানি নাটক-নাটিকা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ—বাল্মীকি প্রতিভা, রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) কালমৃগয়া (১৮৮২) প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) নলিনী (১৮৮৪), মায়ার খেলা (১৮৮৮), *রাজা ও রাণী (১৮৮৯), *বিসর্জন (১৮৯০), গোড়ায় গলদ (১৮৯২) রচনা শেষ করিয়াছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(১) ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক—**ফুলশয্যা** (১৮৯৪) পঞ্চাঙ্ক—(দৃশ্য সংখ্যা ৪+৪+৫+৫+৬=২৪) রাজপুত-কাহিনী অবলম্বনে—"বিয়োগান্ত

দৃশ্য কাব্য"। নির্বাসিত তুদাপতি শূরতান সিংহের কন্যাদ্বয় তারা ও বীণার··· বিশেষতঃ তারার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের ঐকান্তিক সঙ্কল্প—(তুদারাজ্যোদ্ধার মোর জীবনের ব্রত) সেই সঙ্কল্পের বা দেশব্রতের সঙ্গে প্রেমের ঐকান্তিক দ্বন্দ্ব এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। একদিকে অটল সঙ্কল্প, অন্যদিকে চিতোরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পৃথ্বীরাজের প্রতি তারার প্রেম—এই দুই ভাববন্ধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান ঘটে দেশপ্রেমের অগ্নি-শিখায় রচিত প্রিয়তমের চিতা শয্যায় তারার ফুলশয্যা রচনায়। *দেশোদ্ধার-ব্রতকে সমস্ত শ্রেয়-প্রেয়ের ঊর্ধে স্থান দেওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং গৌণ উদ্দেশ্য নারীর বীরাঙ্গনা সত্তাকে উদ্বোধিত করা—দেশোদ্ধারের জন্য নারী-শক্তিকে দেহে-মনে প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দেওয়া। নাটকখানির পরিণামে বিয়োগান্ত এবং রসের দিক দিয়া ট্র্যাডেজি-রসাত্মক বটে কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে অবাস্তবতার স্পর্শ বেশী মাত্রায় থাকায় রসের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই বাস্তবতার আবহাওয়া লঘু হইয়া যাওয়ায় নাটকখানি রোমান্স জাতীয় রচনায় পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় নাট্যরচনা—**প্রেমাঞ্জলি** (১৮৯৬)—চতুরঙ্ক পৌরাণিক প্রহসন। নাটকের বিষয়বস্তু—নাট্যকারের নিজের ভাষায়—"শান্তিপর্বের এক স্থানে নারদের দুর্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূলসূত্র ধরিয়া মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি।" মামা নারদ এবং ভাগ্নে পর্বতের স্থূল রসিকতার সহিত শেষ দিকে যথাসম্ভব প্রেমতত্ত্ব-প্রকৃতিতত্ত্বের সামান্য মাত্রা মিশাইয়া হাল্‌কা ধরনের হাস্যরস পরিবেষণ করা হইয়াছে।

(৩) তৃতীয়—**আলিবাবা** (১৮৯৭)—তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য। আলিবাবা ও দস্যুদল—কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাচ-গান ও রসিকতা এবং গল্প-রসের মধ্যে এই রঙ্গনাট্যের প্রাণশক্তি নিহিত। নাটকখানি বহু অভিনীত এবং রঙ্গনাট্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) **প্রমোদরঞ্জন**—(১৮৯৮) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য। কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীর

সাহায্যে, “মানুষের ওপর রাগ করা আর ভগবানের ওপর রাগ করা একই কথা” এই তত্ত্বটিকে ব্যক্ত করা নাটকের উদ্দেশ্য।

এই নাটকের আসল উদ্দেশ্য—“জয়ন্তী” বুড়ীর—“দে রামা মানুষ দে” ধুয়োটির মধ্যেই আছে—মানুষের মত মানুষ চাই—যে প্রত্যুপকারের কামনা না রেখেই মানুষের উপকার করবে—মানুষকে ভালবাসবে। দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসে মুক্তি নেই, সন্ন্যাসে ‘শান্তি’ নেই—বিশ্ব প্রেমেই শান্তি, তাহাতেই মুক্তি। তবে এতবড় তত্ত্বকে এত হালকা পাত্রে পরিবেষণ করায় তত্ত্বের গুরুত্ব, একেবারে নষ্ট হইয়া না গেলেও, খুবই কমিয়া গিয়াছে।

(৫) **কুমারী** (১৮৯৯) তিনাঙ্ক—কাল্পনিক নাটক (গ্রন্থাবলীতে “নাট্য-কাব্য”—বলিয়া চিহ্নিত)। ‘কুমারী’ পুজার প্রথা বা ব্রতকথা অবলম্বনে লিখিত আনন্দ-পরিণাম নাটক। শাস্ত্রবিহিত ধর্মের উপর মর্মবিহিত ধর্মের স্থান এবং ধর্ম সাধনায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকল জীবেরই সমান অধিকার—এই ভাবটিই নাটকের আত্মা।

(৬) **জুলিয়া** (১৯০০) তিনাঙ্ক—আনন্দ-পরিণাম নাটক। বোগদাদের কালিফ হারুণ-অল-রসিদের আত্মত্যাগ-মহত্ত্বের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। জুলিয়া ও গানেমের ঐকান্তিক প্রেমের পরিচয় পাইয়া, জুলিয়ার রূপে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, কালিফ গানেমের হস্তে জুলিয়াকে অর্পণ করেন; তিনি প্রেমের মর্ম অনুভব করেন—বুঝেন—“প্রেমের তুলনায় রাজ্য ঐশ্বর্য মহাশক্তি পরমাণু হ'তেও তুচ্ছ…যেখানে প্রেম সেখানে মহাদান আত্মত্যাগ…” নাটকখানির অন্য ফলশ্রুতি —‘ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।’

(৭) **বভ্রুবাহন** (১৯০০) পৌরাণিক নাটক। চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বভ্রুবাহনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গাণ্ডীবী অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—ক্ষত্রিয় অভিমানের ধর্মক্ষেত্রে পিতার সহিত পুত্রের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠে। এই দ্বন্দ্বেরই রূপ ও পরিণতি এই নাটকে প্রকাশিত।

সাবিত্রী—(১৯০২) চতুরঙ্ক **পৌরাণিক** নাটক—পাতিব্রত্যের তথা প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির মহিমা প্রদর্শন—এই নাটকের উদ্দেশ্য। কাহিনীর স্বকীয় রসমূল্য চিরন্তন। নাট্যকার রসের অভিব্যঞ্জনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

(৯) **সপ্তম প্রতিমা** (১৯০২)

(১০) **বেদৌরা** (১৯০৩)—পঞ্চাঙ্ক **গীতি-নাট্য**—উপকথাশ্রয়ী 'প্রেম'-রসাত্মক নাটক। চীন রাজকন্যা বেদৌরা ও খালেদানের রাজকুমার কমরল-জমানের 'স্বপ্নময় প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত'। জুলিয়া নাটকের মধ্যেই এই নাটকের জন্ম-বীজ পাওয়া যায়—"এই রকম রাত্রিকালেই চীনরাজকুমারী বেদৌরা বাগানের মর্মর বেদীর উপর বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর ঘুমচোখে নিজের পাশে ঘুমন্ত রাজকুমার কমরলজমানকে দেখতে পেয়েছিল।" শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকখানির মূল্য খুব সামান্যই।

(১১) **বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য**—(১৯০৩) পঞ্চাঙ্ক **ঐতিহাসিক** নাটক। বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্যের জীবনকে ট্র্যাজেডি-রস-পরিণতি দান করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে কাল্পনিকতা এত প্রশ্রয় পাইয়াছে, চরিত্র সৃষ্টিতে চমৎকার অপেক্ষা চমক সৃষ্টির প্রবণতা এত প্রকাশ পাইয়াছে যে নাটকখানি মেলোড্রামার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাটকখানি বহু অভিনীত এবং হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে ভারতে নব জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য নাটকখানির প্রচার উল্লেখযোগ্য।

(১২) **রঘুবীর** (১৯০৩) পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত কল্প-ঐতিহাসিক নাটক—একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আবরণ দিয়া অনৈতিহাসিক বিষয়কে নাটকে রূপদান করা হইয়াছে—এবং রূপ ও অতি নাটকীয় ঘটনা বিন্যাসে ও চরিত্র-আচরণে গভীর ও গম্ভীর জীবন-সমালোচনা হইতে পারে নাই।

রঘুবীর ভীলের কুমার—অনন্তরাও তাহাকে সন্তানস্নেহে ঋষিতুল্য করিয়া তুলিয়াছেন—'পুণ্যময় জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ জীবন' দান করিয়াছেন—'নিষ্কাম

কামনা' শিখাইয়াছেন। ফলে ভীলের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। রঘুবীর দ্বিজত্বে দ্বিজকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। অনন্ত ব্রাণ্ডয়ের এবং জন্মভূমির দারুণ দুর্যোগেও সে শান্ত ও অহিংস থাকিতে সঙ্কল্পিত—অদৃষ্টের উপর অস্বাভাবিক অটুট আস্থা রাখিয়াছে। রঘুবীরের জীবনে দ্বন্দ্ব—

সদা ভয়— কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর -কঠোরতা— জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপন ছায়ায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা— জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজদত্ত
জ্ঞান-আচরণে অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত পড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ তো হোলনা তাহার।

* * * *

হৃদয়ের নিভৃত গুহায়—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা
প্রবৃত্তি আমার সেই মত তুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার।

শেষ পর্যন্ত রক্তের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে নবজাত সংস্কার ভাসিয়া গিয়াছে—'রঘুবীর' 'রঘুয়া'য় পরিণত হইয়াছে।

নাটকখানি বহু অভিনীত। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় প্রতিভার স্পর্শে 'রঘুবীর' দীর্ঘায়ুলাভ করিয়াছে।

(১৩) **বৃন্দাবন-বিলাস** (১৯০৪)—গীতিনাট্য। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য……বালক মূর্তিতে গোকুলে যে লীলা করিয়াছিলেন সেই লীলা এইখানে উপস্থিত।

(১৩) **রত্নাবতী** (১৯০৩)—ঐতিহাসিক-কল্প। ধর্মমাহাত্ম্য-মূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অতিপ্রাকৃত-ঘটনার সংযোগে ধর্মের মাহাত্ম্য যতই বৃদ্ধি পা'ক নাটকের প্রাণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত চরিত্র আছে যেমন একাধিক, তেমনি তাহাতে অবাস্তবতার দৈন্যও আছে যথেষ্ট। নাটকখানি উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

(১৫) **উলুপী** (১৯০৬)—পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। এই নাটকে "ত্রিলোক বিশ্রুতা ধর্ম্মজ্ঞা।—প্রধানা পতিব্রতা "উপুপীর পতিভক্তিকে পুত্র-বাৎসল্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করাইয়া শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে। উলুপী অর্জুন-পত্নী—নাগরাজনন্দিনী—ইলাবন্তের জননী। স্বামীর কার্যহানি হওয়ার ভয়ে সে ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা করে স্বামী যাহাতে তাকে ভুলে যান। কিন্তু নারদ হাত দেখিয়া বলিয়াছেন—তার ভাগ্যে 'পুত্রশোক' আছে, আরো বলেন—'নাগনন্দিনি, তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ।" নারদের দেওয়া 'সঞ্জীবন-মণি' পিতার কাছে রাখিয়া উলুপী অদৃষ্টের গতিরোধ করিতে ছুটিয়া যায় এবং পুত্রকে বলিরা যায়,—'তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোব পিতার কখনও জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে প্রাণরক্ষা করিস। আমা হতেও যদি তোর পিতার মৃত্যুভয় অনুমান করিস, আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'স নি।' আত্মহত্যা মহাপাপ অথচ স্বামিঘাতিনী হওয়ার পরিণাম এড়ানোর উপায়ই বা কি? এই সময় গঙ্গা ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে অভিশাপ দেন—"সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।" উলুপীর ঐকান্তির পতিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া গঙ্গা অর্জুনকে শাপমুক্ত করিবার উপায় জানাইয়া দেন—"পুত্রহস্তে যদি কখনও অর্জুনের বিনাশ হয়, তবেই তার মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় নেই'—উলুপী স্বামিভক্তির প্রেরণাতেই স্বামি-বিনাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন—পুত্রবভ্রুবাহনের হস্তে অর্জুনের বিনাশ ঘটাইবার জন্য……সব শক্তি নিয়োজিত করেন। এমন কি ইলাবন্তের

মৃত্যু ঘটাইতে ইতস্ততঃ করেন না। শেষ পর্যন্ত···সঞ্জীবন-মণি স্পর্শ করাইয়া অর্জুনের প্রাণরক্ষা করেন—স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা আদর্শ স্থাপন করেন। ইলাবন্তের মত দেশের জন্য ধর্মের জন্য আত্মবলি দেওয়ার উদার আহ্বানে নাটক শেষ হইয়াছে। নাটকখানির পরিণাম বিয়োগান্ত বা শুধু মিলনান্ত বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না।

(১৬) **শিরী-ফরিদ** (১৯০৬) (নাটিকা)।

(১৭) **পদ্মিনী** (১৯০৬)—পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নী—বীরাঙ্গনা পদ্মিনী সতীত্ব রক্ষার জন্য ধর্মানলে আত্মাহুতি দিয়া ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন; সেই ইতিহাস-বিখ্যাত বীরাঙ্গনার কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। দিল্লীর বাদশাহের বেগম নসীবনের উপকথা বুনিয়া নাট্যকার যে কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে রোমান্সের কল্পনা-বিলাস এবং জটিল কাহিনী রচনার শক্তি যতই প্রকটিত হউক, উৎকটভাবে ইতিহাসের ভাবগাম্ভীর্যের হানি ঘটিয়াছে। তবু নাটকখানির ভাবগৌরব উল্লেখযোগ্য—হিন্দুভারতের দুর্বলতার কারণ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—অনৈক্যই যে পরাধীনতার মূল কারণ 'সবারই কর্তৃত্বাভিমান' যে একতা-সম্পাদনের পরিপন্থী, তাহা উচ্চ কণ্ঠেই ঘোষণা করা হইয়াছে—"এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ষোল আনার বুদ্ধি একত্র হ'য়েছে যে সমধর্মী তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারো কাছে অবস্থিতি করতে পারে না।" গোরার মুখে ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে—"আমরা হ'লে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম, আর সকলে মিলে **এক জনকে কর্তা করে, তার আদেশে অস্ত্র ধরে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ-বিগ্রহ নাশের, নগরকোট ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্মীরা মিলতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম।**" রাজনীতিতে নীতির স্থান সম্পর্কেও আলোচনা করা

হইয়াছে। যেখানে লক্ষ্মণসিংহের কাছে—'মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের' একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার, তখন এরূপ মহৎকার্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি? পুরোহিত এবং ভীমসিংহ—নীতি-ধর্মকেই বড় স্থান দিয়াছেন, নীতি-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্বর্গসুখও পাইতে চাহেন না। ভীমসিংহের দৃঢ় অভিমত—"ভারত-সন্তান নীতিবর্জিত হ'লে স্থির জানবে, আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না"। (মহাত্মা গান্ধী ভীমসিংহেরই অহিংস সংস্করণ) ধর্মগৌরবকেই ভারতবাসী বড় গৌরব বলিয়া মনে করে। (আলাউদ্দিন চরিত্রটিকে দিগ্বীজয়ী নাটকের নাদিরশাহের পূর্ব সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।)

(১৮) **পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত** (১৯০৭)—ঐতিহাসিক নাটক।

(১৯) **রক্ষঃ ও রমণী** (১৯০৭)—তিনটি অঙ্কে এবং একটি ক্রোড় অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত। কাল্পনিক প্রেমমূলক নাটক—রাক্ষস শৈলেশ্বরের প্রতি মানবী সর্বানীর ভালবাসা—করুণার সেতুবন্ধে দুইটি হৃদয়ের মিলন—এই নাটকের উপস্থাপ্য। বিশেষ প্রচার্য—"করুণায় সংসারের শোভা—শান্তির অস্তিত্ব; জীব করুণা কর—করুণাকর—"। নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

(২০) **চাঁদবিবি** (১৯০৭)—পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। বীরাঙ্গনা—চাঁদবিবির শৌর্য বীর্যময় জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিষাদ পরিণাম, রোমান্টিক-রীতিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের উপযুক্ত বাস্তবিকতার আবহাওয়া কাহিনী-পরিকল্পনার দোষে অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহ। তবে এ নাটকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ—"মাতৃমন্দিরে আত্মবলি'র প্রেরণা সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন…'যে মরতে জানে তাকে মারে কে?"—এই উক্তির উত্তরে মল্লজীর উত্তর—যে মাতৃমন্দিরে আত্মবলি দিতে এসেছে সে নিজে না মরে গেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরাবে কে? যে সয়তান সরাতে চাইবে

সে মায়ের চারধারে হাজার প্রাণের বেড়া সৃষ্টি করবে—দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করার উদাত্ত আহ্বান। চাঁদবিবির আহ্বান—(পঞ্চম অঙ্কের ৬ষ্ঠ দৃশ্যে) "কে কোথায় আছ তরুতলবাসী চলে এস। জীবন তুচ্ছ করে সম্ভোগ-সম্পদ্ তুচ্ছ করে —মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চিরদিবসের জন্য আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ চলে এস"—পরাধীন ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করারই আহ্বান।

(২১) **নন্দকুমার** (১৯০৮ সাল) মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপার লইয়া রচিত ঐতিহাসিক নাটক। ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করা তথা দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা এই নাটকখানির উদ্দেশ্য।

(২২) **দাদা ও দিদি** (১৯০৮ সাল) রঙ্গনাট্য।

(২৩) **অশোক** (১৯০৮ সাল) ঐতিহাসিক ব্যক্তি—ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোকের জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকখানি রচিত। ইতিহাস কিংবদন্তী এবং অতি-প্রাকৃত ঘটনার সংযোগে নাটকখানি গঠিত। কেবল গল্পরসের দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নাটকখানি চরিত্র-সৃষ্টির এবং ভাবের দিক্ দিয়া তেমন গভীর হইয়া উঠে নাই।

(২৪) **বাসন্তী** (১৯০৮ সাল) প্রস্তাবনা-সহ একটিমাত্র অঙ্কে (৮ম দৃশ্য-যুক্ত) কাল্পনিক গীতিনাট্যখানি সমাপ্ত। 'নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন'-রাজ্য (মিড্-সামার নাইটস্ ড্রিম)—একদিকে কৃপণ বৃদ্ধের বিবাহবাতিক, অন্যদিকে যুবক-যুবতীর হৃদয় ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্ব-সমাবেশে প্রহসনাত্মক গীতিনাট্য।

(২৫) **বরুণা** (১৯০৮ সাল) তিন অঙ্কের গীতিনাট্য—রোমান্স-সুলভ কল্পলোকের জীবন—কিরাতপালিতা রাজনন্দিনী বরুণার সহিত কঙ্কণরাজপুত্র পুণ্ডরীকের প্রেম ও বিবাহ রূপায়িত।

(২৬) **ভূতের বেগার** (১৯০৮ সাল) দুই অঙ্কের রঙ্গনাট্য। চাকরির মোহ ও শহুরেপণা লইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ। আসল বক্তব্য :—ভাই সব, যাদের দেশ আছে, যাদের চাকরি থাকা-না-থাকা উভয়ই তুল্য, তারা দেশে যাও। মান-অভিমান

বিসর্জ্জন দিয়ে ভগ্নদেহে নগ্নপদে মা বসুমতীর সেবা কর—মা ভারে ভারে ধনধান্যের ডালা নিয়ে তোমাদের তৃপ্তিসাধন করবেন।

(২৭) **দৌলতে দুনিয়া** (১৯০৯ সাল) চতুরঙ্ক নাটক। (সপ্তম প্রতিমারই সংস্করণবিশেষ) উপকথামূলক কাল্পনিক রোমাণ্টিক কমেডি।

(২৮) **বাংলার মস্‌নদ** (১৯১০ সাল) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরফরাজ খাঁকে হত্যা করাইয়া আলিবর্দ্দী বাংলার মস্‌নদ অধিকার করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই রোমাণ্টিক রীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছে। নাটকখানি বিষাদান্ত বটে কিন্তু ট্র্যাজেডির মর্য্যাদায় উন্নীত হয় নাই।

(২৯) **পলিন** (২রা মার্চ্চ, ১৯১১ সাল)—তুরস্কের সুলতান 'আলমামুনে'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনাঙ্ক কমেডি। উৎকল্পনার আতিশয্যে কাহিনীটি রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় পরিত্যক্তা আলমামুনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে পলিনের জন্ম। সিস্তানের রাণী আইরিন কর্তৃক পলিন পুরুষবেশে পালিতা। নিরুদ্দেশ পত্নীর জন্য সম্রাট্ আলমামুনের ব্যাকুল অনুসন্ধান। শেষ পর্য্যন্ত আলমামুনের কন্যা রেবেকা পুরুষবেশী পলিনের রূপে পাগলিনী। আলমামুনের মহাসমস্যা (৩০) উপসংহারে আলমামুনের সমস্ত সমস্যার সমাধান।

মিডিয়া (১৪ই জুলাই, ১৯১২ সাল)—কল্পনামূলক তিনাঙ্ক কমেডি। ইজিয়াসের কন্যা মিডিয়া। আলমনসুর ইজিয়াসের রাজ্য অধিকার করিলে ইজিয়াস বনে বাস করেন এবং মরণের সময় কন্যাকে বলিয়া যান 'আমার গুরু ছাড়া আর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না।" গুরু জিবার জ্ঞানীর শিরোমণি মিডিয়ার কাছে উপস্থিত হন, পরিচয়ও দেন এবং ইজিয়াসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করেন তথা বিজ্ঞান ও পাশব বলের প্রভেদ দেখাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রকৃতির পরিহাসে মিডিয়া অজ্ঞাতসারে সেই আলমনসুরকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসেন যাঁহার প্রাণ লইবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক সঙ্কল্প ছিল। শেষ পর্য্যন্ত প্রেম জয়ী হয়। গুরু জিবারও জড়প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা দেখেন। প্রেমের কাছে শক্তির পরাজয় ঘটে। জিবারের শেষ প্রার্থনা—

জাগো মা চৈতন্যরূপিনী—জড়বিজ্ঞানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর।

(—বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্বে নাট্যকারের নিজেরই সিদ্ধান্ত।)

(৩১) **খাঁজাহান** (২৫শে জুলাই, ১৯১২ সাল) ঐতিহাসিক নাটক—দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্‌জাহান এবং মালবের সুবাদার খাঁজাহান লোদীর বিবাদ—খাঁজাহানের পরাজয় ও শোচনীয় পরিণতি নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য; গৌণ উপস্থাপ্য—মহাবৎ কন্যা 'সোফিয়া' ও নারায়ণ রাও-এর প্রণয় কাহিনী—অর্থাৎ ইতিহাস ও রোমান্স (প্রহেলিকাময়) সংযোগে রোমান্টিক নাটকখানি পরিকল্পিত। সোফিয়া ও নারায়ণ রাও-এর চিতাশয্যায় ফুলশয্যা শয়নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন-কামনা ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩২) **ভীষ্ম** (১৯১৩ সাল) পঞ্চাঙ্ক—(প্রস্তাবনা ১+৩+৭+৫+৫+৭ পট-পরিবর্তন মোট ৩০টি দৃশ্য)—পৌরাণিক নাটক। জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যু পর্যন্ত—ভীষ্মের বিরাট জীবনের নাট্যরূপ। নারী-চরিত্রের মধ্যে 'অম্বা'র এবং পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে ভীষ্মের চরিত্রের দ্বন্দ্ব চিত্তাকর্ষক। ভীষ্মের মত বীরের পতনে শোচনীয় পতনের তথা ট্র্যাজেডির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, কৃষ্ণভক্তি-রসে সমস্ত বিষাদ ও বেদনা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

(৩৩) **রূপের ডালি** (১৯১৩ সাল, ২৩শে অক্টোবর) তিনাঙ্ক রঙ্গনাট্য—বোখারার নবাব প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনায়—'আগাগোড়া ... হাঁকের গান'—রোমান্সময় রঙ্গনাট্য।

(৩৪) **নিয়তি** (১৯১৪ সাল, ৯ই এপ্রিল) তিনাঙ্ক উপকথামূলক বা কল্প-ঐতিহাসিক নাটিকা। কৌশাম্বীরাজ উদয়নকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া কয়েকটি কল্পিত পরিস্থিতির সাহায্যে **জীবনে নিয়তির প্রভাব** প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ভাড়ুদত্ত লোভবশে নিজের জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছে—ভাড়ুদত্তের পত্নী মাগন্ধী লেডী ম্যাক্‌বেথের মতই কার্য্য করিয়াছে ... লেডী ম্যাক্‌বেথের মতই হাতের রক্তের দাগ তুলিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পালিত-

পুত্র ঘোষককে মারিতে গিয়া ভাড়ুদত্ত—উদয়নের কথায় বলা যাউক—"পুত্রকে মেরেছ, তার জন্য স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভাগনীকে ··· নিজের কুল নির্মূল করেছ।" নাটকখানি অবশ্য ট্র্যাজেডি পরিণাম হয় নাই ; ঘোষক ও শ্যামাবতীর মিলনে ও উৎসবে নাটিকা শেষ হইয়াছে। *ঘটনা-বিন্যাসের তথা পরিস্থিতি-কল্পনার দুর্ব্বলতার বা অনৌচিত্যের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিও লঘু হইয়া পড়ে।

(৩৫) **আহেরিয়া** (২০শে জানুয়ারী, ১৯১৫ সাল) 'ঐতিহাসিক নাটক না বলিয়া ঐতিহাসিক-কল্প বা ইতিহাস-বলম্বিত রোমান্টিক নাটক (পত্রাঙ্ক)। আহেরিয়া উৎসব উপলক্ষ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই পক্ষের—(বারাহা-লাঙ্গাই এবং ভট্টি বংশের) তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে—বারাহাপতি মুলরাজের অধীশ্বর মুলরাজের কন্যা কেতু ভট্টিবংশ-জাত তনোটেশ্বর তনুরায়ের পুত্র দেবরায়ের বীরত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া বসেন। উভয়ের মিলনের পথে অন্তরায় দাঁড়ায়—দেবরায়ের মাতার প্রতিশোধ-কামনা—কেতুর প্রতি নির্দ্দেশ—"তোমার শ্বশুরহন্তার মুণ্ড আমাকে উপহার হিসাবে প্রদান কর।" কেতু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—ক্ষাত্রয়-নন্দিনীত্ব প্রতিষ্ঠিত করে—মূলরাজের মুণ্ড লইয়া কমলার কাছে উপস্থিত হন। নাটকখানির প্রাণশক্তি উল্লেখযোগ্য।

(৩৬) **বাদশা জাদী** (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল) কল্পনামূলক নাটক।

*(৩৭) **রামানুজ** (৩০শে জুলাই, ১৯১৬ সাল) পত্রাঙ্ক (দৃশ্যসংখ্যা=প্রস্তাবনা ১+৩+৭+৬+৮+১০=৩৫)—ধর্ম্মমূলক চরিত-নাটক—(নামে চরিত-নাটক স্বরূপতঃ অতি-পৌরাণিক—অর্থাৎ অতি-প্রাকৃত ঘটনাপূর্ণ নাটক। কোন চরিত্রই ঔচিত্যের গণ্ডীর মধ্যে নাই। না জীবনের রূপ ও দ্বন্দ্ব, না তত্ত্বালোচনা—কোনটিই উল্লেখযোগ্য হয় নাই।

(৩৮) **রঙ্গে রাঠোর** (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল) পত্রাঙ্ক, 'ঐতিহাসিক নাটক' নামে পরিচিত ইতিহাস-পটভূমিক, কাল্পনিক, রোমান্টিক এবং বিষাদাঙ্ক নাটক। হিন্দু-বীর রঙ্গলালের প্রতি পাঠান উজীর সুলেমানের কন্যা কলিবেগমের

অনুরাগ এবং উভয়ের প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী রূপায়িত। নাট্যে রোমান্স বলিলেই এই জাতীয় নাটকের স্বরূপ ভাল ব্যাখ্যা করা হয়।

(৩৯) **কিন্নরী** (১৭ই আগস্ট, ১৯১৮ সাল) তিনাঙ্ক গীতিনাট্য। কিন্নর রাজ-কন্যা ভদ্রা (কিন্নরী), বিন্ধ্যরাজপুত্র সুধন (মানুষ)—এই উভয়ের প্রণয়-কথা লইয়া এই নাটকের কাহিনী কল্পিত। সুধন অদ্ভুত করুণাময় করুণাবতার শাক্যসিংহের পূর্ব্ব রূপ, আর কিন্নরী শাক্যসিংহের প্রিয়তমা মহিষী গোপা। প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে **করুণা তত্ত্ব প্রচার** এই নাটকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৪০) **মন্দাকিনী** (১৪ই এপ্রিল, ১৯২১ সাল) তিনাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—গঙ্গা ও শান্তনুর পরিণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। (অভিশপ্ত অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিয়া মুক্তি দেওয়ার জন্য গঙ্গা শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন ··· ভীষ্ম অষ্টবসুর মর্ত্ত্য দেহ।)

*(৪১) **আলমগীর** (৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল) পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। নাটকখানিতে ঔরংজেবের, ১৬৭৮ হইতে ১৬৮০ সাল পর্যান্ত—এই দুই বৎসরের রাজনৈতিক জীবনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার উপর রূপকুমারী কাহিনী, ভীমসিংহ, জয়সিংহ কাহিনী এবং উদিপুরী কাহিনী মিশাইয়া নাট্যকাহিনীর কাঠামো গঠন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর এখানে নিম্নলিখিত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন :—

(১) পারিবারিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী—তাঁহারাই মোহিনী প্রেয়সী উদিপুরী, (২) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজপুত-গৌরব মহারাণা রাজসিংহ, (৩) অন্তরের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত আলমগীর সত্তা এবং ভিতরকার মানব-সত্তা (দেবদূত)। সমস্ত ক্ষেত্রেই আলমগীর পর্য্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার আলমগীরকে অপরাজেয় রূপে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। এই দিক দিয়া নাটকখানি ট্র্যাজি-কমেডির পরিণতি লাভ করিয়াছে। কল্পনাতিরেক এবং গঠনগত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকখানির মঞ্চ সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

বিশেষতঃ নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয়ে নাটকখানির খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৪২) **রত্নেশ্বরের মন্দিরে** (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২২ সাল) তিনাঙ্ক সামাজিক-কল্প নাটক। শিবরাত্রির পটভূমিতে বীরনগরের জমিদার পুত্র বীর 'রত্নেশ্বর' এবং রায় নগরের ভূম্যধিকারী রাজা কৃত্তিবাসের ভগিনীপতি মথুর মোহনের কন্যা— সুরমার রোমান্টিক প্রেম কাহিনী ও মিলন—তৎসহ—(১) ইংরেজী শিক্ষিত মেয়েলি স্বভাব পুরুষ 'রমণীচরণ ধলে'র এবং 'কাপুড়ে সভ্যতা'র সমালোচনা। (২) মন্দির প্রবেশে জাতিভেদ প্রভৃতি কুসংস্কারের নিন্দা—"যদি জাত হিসাব করে মন্দিরে ঢুকতে হয়, তাহা হলে বুঝবো, হয় সে জড়ের জড় পাথর, না-হয় সে ধনীর খোসামদ করা দেবতা।

(৪৩) **বিদূরথ** (১০ই মার্চ্চ, ১৯২৩ সাল) পঞ্চাঙ্ক বৌদ্ধমাহাত্ম্যমূলক নাটক—যদিও নাট্যকার লিখিয়াছেন—"বুদ্ধের উপাখ্যানে নাগপতি কন্যা চিত্র ও বিদূরথের কাহিনী পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানের ঐতিহাসিক অংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি রচিত''—তবু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না, বরং এই কথাই বলা চলে যে সমগ্র নাটকের মধ্যে একটা পৌরাণিক নাটক-সুলভ অতি-প্রাকৃত আবহাওয়া বর্ত্তমান।

(৪৪) **গোলকুণ্ডা** (২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সাল) ইতিহাসের মলাটের মধ্যে প্রেমের উপাখ্যান—ঔরংজেবের গোলকুণ্ডা জয়ের ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর, ঔরংজেব পুত্র মহম্মদের সহিত গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব শাহের জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিজার বিবাহের কাহিনী—শেষদিকে অস্ত্রবল এবং অহিংসা ও সত্যবলের দ্বন্দ্বে সত্যের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে—ঔরংজেব স্বীকার করিয়াছেন —"ছলনায় নির্ম্মিত অস্ত্র দিয়ে সত্যকে ধ্বংস করা যায় না।"

(৪৫) **জয়শ্রী** (২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ সাল) তিনাঙ্ক উপকথামূলক (উদয়ন-কথা বিষয়ক) নাটক। অবন্তীর রাজা চণ্ডদেবের কন্যা 'জয়শ্রী' এবং কৌশাম্বীরাজ উদয়নের প্রেম কাহিনী নাটকে উপস্থাপিত—তৎসহ স্থাপিত এই তত্ত্বটুকু—

"মানুষী শক্তি দৈবশক্তি অপেক্ষা হীন নয়; বরং অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম সত্য" : সত্যের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছুই নাই।

(৪৬) **রাধা-কৃষ্ণ** (১৯২৬ সাল) পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক গীতিনাট্য। রাধা-কৃষ্ণের লীলা (আদ্য হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত) রূপায়িত।

*(৪৭) **নর-নারায়ণ** (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ইং ১৯২৬ সাল) পৌরাণিক নাটক। (অভিনীত—১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬ সাল) নিয়তি-বিড়ম্বিত পুরুষকার অবতার কর্ণের জীবনের নাট্য রূপ—কর্ণের জীবনের মাধ্যমে **শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠা** এই নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ-রচিত উল্লিখিত নাটক-নাটিকাসমূহ (৪৭ খানি) সম্মুখে রাখিয়া একথা অবশ্যই বলা যায় যে নাট্যকারের দানের পরিমাণ যথেষ্ট প্রচুর। তবে দানের **গুণগত মহিমার** হিসাব করিতে গিয়া, প্রথমেই যাহা মনে আসে তাহা এই যে সাতচল্লিশখানি নাটক-নাটিকার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির সংখ্যা খুবই কম—আলিবাবা (রঙ্গনাট্য), বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (ঐতিহাসিক), রঘুবীর (কল্প-ঐতিহাসিক), ভীষ্ম (পৌরাণিক), আলমগীর (ঐতিহাসিক) এবং নর-নারায়ণ (পৌরাণিক)—এই কয়েকখানি ছাড়া অন্যগুলির জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ যে ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু অভিনীত হইল প্রতাপাদিত্য, আলমগীর এবং রঘুবীর। (নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অমর অভিনয় প্রতিভার স্পর্শে আলমগীর ও রঘুবীর সঞ্জীবিত।)

এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে নাট্যকারের রোমান্স-রহস্য সৃষ্টির প্রবণতা খুব বেশী। এই কারণে কাহিনী-কল্পনা ও চরিত্র-সৃষ্টিতে, বাস্তবতার পরিবর্ত্তে, অতি-কল্পনা ও উৎকল্পনার মাত্রা এত বেশী পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে যে সৃষ্টিগুলি মহৎ বা বৃহৎ শিল্পের পর্য্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। উপকথাশ্রয়ী কাহিনীর কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। 'ঐতিহাসিক' নাটক নামে চিহ্নিত নাটকগুলিও রোমান্স-সুলভ চমকপ্রদ ঘটনা ও চরিত্র-কল্পনা হইতে মুক্ত হইতে

পারে নাই। ফলে ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে যে-বাস্তবতার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য অপরিহার্য্য, তাহার অভাবে নাটকগুলি রোমান্স-জাতীয় রচনায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার জীবনের যে-মাধ্যমে 'জীবন-সমালোচনা' করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা জীবনের ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং কাল্পনিক রূপ। (সামাজিক নাটক তিনি লেখেন নাই) কাল্পনিক-কল্প কাহিনীর সাহায্যে এবং অবাস্তব-কল্প চরিত্রের মাধ্যমে যে-সকল **গুরুভাব** তিনি পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন, বাহনের লঘুত্বে সেই সব ভাব-সঞ্চারের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে জীবনের রূপ আছে, জীবন-সমালোচনা আছে এবং ইতস্ততঃ বড় বড় তত্ত্বের প্রচারও আছে কিন্তু নাই ঘটনা, চরিত্র, ভাব, ভাবনা প্রভৃতি উপাদানের মাত্রাসমতা-জনিত সেই সর্ব্ববয়বব্যাপী মহাসঙ্গতি, বাস্তবিকতার মায়াঘোর—যে-মায়াঘোর স্থষ্টির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যের জন্য একান্ত-ভাবেই অপেক্ষিত। এমনকি ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্ব্ব প্রশংসিত 'আলমগীর' নাটকেও উল্লিখিত সঙ্গতি বহুস্থলে ব্যাহত হইয়াছে। এই জাতীয় ব্যাঘাতের ফলে সাধারণীকৃতির মাত্রা তথা রসনিষ্পত্তির মাত্রাও কমিয়া যাইতে বাধ্য। 'কাহিনী-রস'—অর্থাৎ ঘটনা-কৌতূহলের প্রতি অধিক মাত্রায় ঝোঁক থাকায় 'ক্ষীরোদপ্রসাদের কাহিনী-কল্পনা রোমান্স-সুলভ হইয়াছে।'

তারপর **চরিত্র-স্থষ্টির** কথা। ৪৭ খানি নাটকে বহু রসের বহু পাত্র-পাত্রী আছে বটে, 'চরিত্র-স্থষ্টি' বলিতে বিশেষভাবে যে-বাস্তবকল্প রূপাদর্শ-রচনা বুঝায়, কায়মনোবাক্যের আচরণের মধ্য দিয়া জীবনের যে-রূপ অভিব্যক্ত হয় সেই রূপটিকে যথাযথভাবে ব্যক্তি-দর্পণে প্রতিফলিত করা বুঝায়, সেইরূপ 'চরিত্র-স্থষ্টি' ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকে খুব বেশী নাই। বাহ্য-আবেষ্টনীর সহিত দ্বন্দ্ব—ইংরেজীতে যাহাকে 'physical conflict' বলা হয়, তাহা আছে; কারণ তাহা না থাকিলেই নয়, কিন্তু গভীর ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব কম চরিত্রেই আছে। **ভীষ্মে** 'ভীষ্ম', **নর-নারায়ণে** 'কর্ণ', **রঘুবীরে** 'রঘুবীর',

আলমগীরে 'আলমগীর', এইরূপ কয়েকটি চরিত্র ছাড়া অন্তর্দ্বন্দ্ব-গভীর চরিত্র নাই বলিলেও চলে ; আর যদিও বা দুই-একটি চরিত্রে, যেমন আহেরিয়ায় 'কেতু'তে, মিডিয়ায় মিডিয়া'তে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় সেখানে কাল্পনিকতার সংস্পর্শে দ্বন্দ্বের তীব্রতা শিথিল হইয়া গিয়াছে ; দ্বন্দ্ব চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। রঘুবীর-চরিত্রে রক্তের সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার সংস্কারের দ্বন্দ্ব পরিকল্পিত, আলমগীর-চরিত্রে অবচেতন ও চেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জটিল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হইয়াছে ; ভীষ্মের চরিত্রেও প্রাক্তন বা নির্জ্ঞানের সহিত সজ্ঞান মনের দ্বন্দ্বের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কর্ণের চরিত্রে ধর্ম্মবোধ ও হৃদয়ধর্ম্মের দ্বন্দ্বের রূপ অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ; উল্লিখিত চরিত্রগুলি চরিত্র-সৃষ্টি নৈপুণ্যের বিচারে প্রতিনিধিস্থানীয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদের **বাক্‌শক্তির** দৈন্য তেমন নাই। সঙ্গে আছে কবিত্বমোহ ; সুতরাং কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ তিনি একটাও হারান নাই। বরং অনেক স্থলে কবিত্বের আতিশয্য মাত্রাবোধের দৈন্যই সূচিত করিয়াছে। রচনা-শক্তির দৃষ্টান্ত তুলিয়া দেওয়ার অবকাশ এখানে নাই। (নাটকসমূহ দ্রষ্টব্য।)

এইসব দোষ সত্ত্বেও, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক—মূল্যবান ভাবসম্পদ দেশবাসীর মনের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া, দেশোদ্ধার করিবার প্রেরণা যোগাইয়া, সত্য-প্রেম-করুণা ধর্ম্মকে পশুবলের উপরে স্থান করিয়া দিয়া এবং মনুষ্যত্বের মহিমাকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকরাজি, জাতির জীবনের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। রূপের ও রসের গৌরব কম থাকিলেও ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার ভাব-গৌরব প্রশংসনীয়।

কর্ণের কাহিনী

ব্যাসকৃত মহাভারতে কর্ণ

আদি-পর্ব্বে ঃ—১১১ অধ্যায় (কুন্তীচরিত, কৌমার্য্যাবস্থায় কর্ণোৎপত্তি)
১৩২ ,, (দ্রোণসমীপে পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রদিগের **অস্ত্রশিক্ষা**)
১৩৬ ,, (রঙ্গভূমিতে কর্ণের প্রবেশ)
১৩৭ ,, (অঙ্গরাজ্যে অভিষেক)
১৮৭ ,, (দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর)
১৯০ ,, (অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ)

সভা-পর্ব্বে ঃ—৩৩ অধ্যায় (রাজসূয় যজ্ঞে কর্ণের নিমন্ত্রণ)
৬৩ ,, (দ্যূতক্রীড়া)
৬৬ ,, (বিকর্ণের প্রতিবাদে কর্ণের প্রতিক্রিয়া)
৬৯ ,, (দ্রৌপদীর প্রতি শ্লেষোক্তি)
৭০ ,, (পাণ্ডবগণের প্রতি শ্লেষোক্তি)

বন-পর্ব্বে ঃ—১৪৬ ,, (ঘোষ যাত্রা পর্ব্বাধ্যায়)
১৪৮ ,, " ")
১৪৯ ,, (" ")
১৫২ ,, (কর্ণের দিগ্বিজয়)
* ২৯৯ ,, (কুণ্ডলাহরণ পর্ব্বাধ্যায়)

বিরাট-পর্ব্বে ঃ—২৬ অধ্যায় (কর্ণের মন্ত্রণা)
৩০ ,, (" ")
৩৯ ,, (গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়)
৪৮ ,, (কর্ণের আত্মশ্লাঘা)

৫৪ „ (অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে কর্ণের পলায়ন)

৫৯ „ (পুনর্ব্বার যুদ্ধ)

৬০ „ (কর্ণের পলায়ন)

উদ্যোগ-পর্ব্বে ঃ—৬১ অধ্যায় (যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়)

* [ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়—৭২—১৪৯]

১৪০ অধ্যায়—ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়
(কর্ণ-কৃষ্ণ)

১৪৩ অধ্যায়
১৪৪ „ } (কর্ণ-কুন্তী)

ভীষ্ম-পর্ব্বে ঃ—১২৪ অধ্যায় (ভীষ্ম কর্ণ সাক্ষাৎকার)

দ্রোণ-পর্ব্বে ঃ—২য় অধ্যায় (কর্ণ-নির্য্যান)

৪০ „
৪১ „ } (অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ)

৪৭ „
৪৮ „ } (অভিমন্যু বধ)

১৩২ „
১৩৩ „
১৩৫ „
১৩৯ „ } (ভীম-কর্ণ)

১৪৫ অধ্যায় (জয়দ্রথ বধের আগে দুর্য্যোধন-কর্ণ)

১৫২ „ („)

১৫৮ „ (ঘটোৎকচ বধ)

১৫৯ „ (কর্ণ-কৃপ-অশ্বত্থামা)

কর্ণ-পর্ব্বে ঃ—২২ অধ্যায়

৩২ „ (শল্যের সারথ্য)

৩৭ „ (কর্ণ-শল্য)

৪০-৪৭ অধ্যায় (কর্ণ-শল্য)
৮১ " "
৯১ " "

-২—(কর্ণ বধ)

৯৭—

স্ত্রী-পর্ব্বে ঃ—২৭ অধ্যায়—কুন্তী কর্ত্তৃক কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কথন)

শান্তি-পর্ব্বে ঃ—(১-৭) অধ্যায়
নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ
কর্ণের জীবনে অভিশাপ
কর্ণের অস্ত্র প্রাপ্তি
কর্ণের পরাক্রম প্রকাশ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কর্ণের জন্ম
আদি বন-পর্ব্ব ১১১
উদ্যোগ-পর্ব্ব ১৪০
স্ত্রী-পর্ব্বে ১৪৩
শান্তি-পর্ব্বে ১০

যদুবংশাবতংস শূরের কন্যা পৃথা; পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে শূর নিঃসন্তান পিতৃস্বসপুত্র কুন্তিভোজকে প্রথম সন্তান পৃথাকে দান করেন। কুন্তিভোজ-পালিতা পৃথার নাম হয়—'কুন্তী'। মহর্ষি দুর্ব্বাসা একদিন কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন, কুন্তী পরিচর্য্যা দ্বারা দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট করেন এবং তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা কুন্তীকে একটি মহামন্ত্র দেন—'এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক পুত্র হইবে'। বালিকা কুন্তী কৌতূহল বশে সূর্য্যকে আহ্বান করেন। "সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা কবচ-কুণ্ডলধারী ...... এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন...ভগবান সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন।" কুন্তী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুকে নিক্ষেপ

করেন। রাধাভর্ত্তা অধিরথ ভাসমান শিশুকে তুলিয়া লইয়া গৃহে আনয়ন করেন এবং নামকরণ করেন—'বসুষেণ।' [বন-পর্ব্বের বিবরণ :—

কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধূচ্ছিষ্টবিলিপ্ত অতি-বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জুষামধ্যে সেই পুত্রকে স্থাপন-পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে 'অশ্ব নদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যকাকালে গর্ভধারণ অতিগর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর ...... এদিকে মঞ্জুষা অশ্ব নদী ...... হইতে স্বর্ম্মন্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল, পরে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিল ... ।]

কর্ণ বাল্যকালে সুতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।" "ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম (তোমার) বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং অস্ত্রশিক্ষা তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন" (ভীষ্মের উক্তি)। মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি আমারে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। ...... দ্রোণাচার্য্য .... কহিলেন—কর্ণ। নিত্য ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও অধিকার নাই।" (শান্তি-পর্ব্ব)

প্রত্যাখ্যাত হইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করেন এবং প্রণাম করিয়া, নিজের পরিচয় গোপন করিয়া, নিজেকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পরশুরাম কর্ণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাদান করেন।

কর্ণ "আশ্রমের অতি-দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ ...... ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক বিনয় সহকারে ...... কহিলেন—ভগবান্! আমি মোহবশত আপনার হোম-ধেনু বিনষ্ট করিয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" দ্বিজবর কোপাবিষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন—"*দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ! তোমারে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। **তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন।** চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।" কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গোদান দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কোন ফলই হয় না।

প্রথম অভিশাপ ব্রাহ্মণের গোবধ-জনিত

এদিকে পরশুরাম কর্ণকে সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করান। কর্ণও অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্ব্বেদ আলোচনায় মগ্ন থাকেন। "একদা উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক ...... মেদমাংস লোলুপ দারুণ কীট কর্ণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার ঊরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না ...... দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ...... কর্ণের ঊরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ...... জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন—হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে-কষ্ট সহ্য করিয়াছ ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ

দ্বিতীয় অভিশাপ পরশুরামের (শান্তি-পর্ব্ব)

সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট তোমার সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া ...... কহিলেন—ব্রাহ্মণ! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা। আমার নাম কর্ণ।...... বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশ-সম্ভূত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া ..... ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে ক্রোধভরে ...... কহিলেন * 'সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব **এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ-কালে বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না**। এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় তথা গমন কর॥''

* [কানীনত্ব এবং এই দুই ব্রহ্মশাপ লইয়া কর্ণের জীবনারম্ভ।]

পরশুরামের নিকট অভিশপ্ত হইয়া কর্ণ দুর্য্যোধনের কাছে ফিরিয়া আসেন এবং দুর্য্যোধনের মন্ত্রণাদাতা হইয়া সুখে কাল যাপন করেন। কিছুদিন পরে কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদেবের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করেন এবং বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনকে দান করেন। তারপর মগধ-দেশাধিপতি জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ হয়। জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া কর্ণকে মালিনী নগরী প্রদান করেন।

জন্মই যে কর্ণের জীবনের বড় অভিশাপ—প্রথম তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—অস্ত্র পরীক্ষা-সভায় কৃপ যখন কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়—স্বয়ম্বর সভায়, যখন "দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"। দ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়া "কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।" এখানেই অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের একবার শক্তিপরীক্ষা হয়—তবে, কর্ণ "অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রহ্মতেজ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন।"

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ

সভা পর্ব্বের জীবনই কর্ণের জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় বিকর্ণ দ্রৌপদীকে 'অজিত' প্রমাণ করিবার জন্য সভায় যে-বক্তৃতা দেন তাহার উত্তর দিতে উঠিয়া কর্ণ যে-সকল কথা বলেন তাহা যে-কোন মহাত্মার পক্ষেই অনুচিত—কর্ণ বলেন—

কর্ণ
সভা-পর্ব্বে

"……দেবতারা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তখন ইনি **বারস্ত্রী**, তাহার সন্দেহ নাই।

সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কর্ণ বলিয়াছেন …… দাসের পত্নী ও তাঁহার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারে অনুগত হও। হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু পাণ্ডুনন্দনেরা নহে। …… "ঐ পরাজিত পঞ্চভ্রাতা তোমার পতি নহেন." তারপর যখন "ঐশ্বর্য্যমত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় সব্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন" —তখন "কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন।"

পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়াও শকুনি ও কর্ণের গায়ের জ্বালা প্রশমিত হয় না। দুর্য্যোধনকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহার 'ঘোষ যাত্রা'র আয়োজন করেন; দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পাণ্ডবদিগের মনে দুঃখ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। একদিন মৃগয়া করিতে করিতে তাঁহারা দ্বৈতবনে উপস্থিত হন এবং সেখানে ঘটনাক্রমে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কর্ণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত **পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান**। দুর্য্যোধন অসম-সাহসিকতা দেখাইতে গিয়া সপরিবারে বন্দী হন এবং শেষে পাণ্ডবদের দয়ায় মুক্ত হন। এই মুক্তি দুর্য্যোধনের পক্ষে মৃত্যুর অধিক। আত্মগ্লানিতে তিনি প্রায়োপবেশন

বন-পর্ব্বে
কর্ণ

করিয়া, জীবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কর্ণ তাঁহাকে অনেক ভাবে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দুর্য্যোধন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কর্ণের দিগ্বিজয়

ইহার পর কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত দিগবর্ত্তী রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করেন।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস সময়ে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বিরাট রাজ্য আক্রমণের মন্ত্রণা দান করিলে, কর্ণ তাহা সমর্থন করেন এবং সকলে মিলিয়া বিরাটের গো-ধন আক্রমণ করেন। এই সংঘর্ষেই

বিরাট-পর্ব্বে কর্ণ

বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের আর একবার সম্মুখ সমর হয়। কর্ণ স্বভাব-সুলভ বাগদর্প প্রকাশ করেন যথেষ্ট। কৃপাচার্য্যের ও অশ্বত্থামার সঙ্গে বেশ খানিকটা বাগযুদ্ধও হয়। কিন্তু যুদ্ধকালে—ঘোরতর যুদ্ধের পরে—'গজ যেমন অন্য গজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক **পলায়ন করিলেন**।"

উদ্যোগ-পর্ব্বে ঃ—ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত সঞ্জয় পাণ্ডবদের সংবাদ বহন করিয়া হস্তিনানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবরা কে কি বলিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সঞ্জয় একে একে সকলের কথাই জ্ঞাপন করান। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন সময় কর্ণ আত্মশ্লাঘায় মুখর হইয়া উঠেন—পরশুরামের প্রসাদে তিনি এক নিমিষেই সব জয় করিবেন—এমন স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করেন। ভীষ্ম কর্ণের দম্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন—"হে কালহতবুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? ...... মহাত্মা মহেন্দ্র তোমারে যে-শক্তি-প্রদান করিয়াছেন তুমি তাহা সমর সময়ে বাসুদেবের চক্রে প্রতিহত, বিশীর্ণ ও ভস্মীভূত অবলোকন করিবে ... ..।" ভীষ্মের তীব্র ভৎর্সনার বাক্য শুনিয়া কর্ণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন

কর্ণের অস্ত্র-ত্যাগ

* "আমি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; আপনি আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে বা সভামধ্যে দেখিতে পাইবেন না; আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে পর ভূমিপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন।" কর্ণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ করেন।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ে কর্ণ

যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরুসভায় আগমন করেন। শান্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে উদ্যোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ 'বিশ্বরূপ' প্রদর্শন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। সভা হইতে ফিরিবার সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণকে আপনার রথে আরোহণ করাইয়া বাহিরে লইয়া যান এবং তাঁহাকে তাঁহার জন্মরহস্য শুনাইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিতে আহ্বান জানান। বাসুদেব কর্ণকে বলেন—'হে রাধেয়! তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার কানীন ও সহোঢ় পুত্রের পিতা। হে কর্ণ তুমিও তোমার জননীর কন্যাকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ। সেই হেতু তুমি ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্র, অতএব চল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও, তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে আরও অনেক কিছুর লোভ দেখান এবং পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধের উত্তরে কর্ণ বলেন—"হে কৃষ্ণ তুমি সৌহৃদ্য, প্রণয়, সখ্য বা হিতৈষিতাবশত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাহা মনে করিতেছ, তাহা আমি নিশ্চয় অবগত হইলাম এবং আমি যে-ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডুর পুত্র তাহারও সন্দেহ নাই।…… কিন্তু কুন্তী আমাকে অমঙ্গল উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া … রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন, আমার প্রতি স্নেহবশত তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরীষ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব,

মাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার পিণ্ডলোপ করিবে। ... .. অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত স্বর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।" কর্ণ আরও বলেন—দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি রাজ্য ভোগ করিতেছেন—সূতজাতির সহিত বহু বার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—সূতজাতির সহিত বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাঁহারই ভরসায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছেন। সুতরাং "বধ-বন্ধন, ভয় বা লোভ-বশত ধীমান্ দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে" তিনি পারিবেন না। তুমি যে আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকেই প্রদান করিব, অতএব ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন ...... ।"

"হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কটু-বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে সেই অপকর্ম্মনিবন্ধন অনুতাপ হইতেছে।

"হে মধুসূদন! তুমি আমাকে অবগত হইয়াও কি মুগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এই যে পৃথিবীর প্রলয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন এই চারিজন ইহার মূল কারণ। ...... ভূরি ভূরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সকল যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ শেষ হইলে, কর্ণ কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করেন।

কর্ণের সহিত কুন্তীর সাক্ষাৎকার

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হইলে, বিদুর কুন্তীর নিকটে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম লইয়া অনেক কথা বলেন। কুন্তীও জ্ঞাতি-যুদ্ধকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না; বিশেষতঃ "বৃথা-

দৃষ্টি মোহানুবর্ত্তী অনর্থনিরত বলবান কর্ণ দুরাত্মা ও পাপমতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া কুন্তীর মন সতত দগ্ধ হয়। কুন্তী সঙ্কল্প করেন—'আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব।" গঙ্গাতীরে কুন্তী কর্ণের সহিত দেখা করেন এবং জন্মবৃত্তান্ত শুনাইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বানও জানান। কিন্তু কর্ণ বলেন—"ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে।* দেখুন আপনা হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্ত্তিলোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংকার প্রাপ্ত হই নাই। অতএব, আর কোন্ শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে। ...... আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিত চেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমারে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।" কর্ণ কুন্তীকে বুঝাইয়া দেন—ধৃতরাষ্ট্র তনয়দের পরিত্যাগ করা অধর্ম্মের কার্য্য হইবে। সুতরাং তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিতে পারিবেন না। তবে বলিয়া দেন—"আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না। ...... কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে ...... পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না।" ...

ভীষ্মের শরশয্যার পার্শ্বে ভীষ্ম ও কর্ণের শেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত দেখিয়া "মহাদ্যুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়ন পথে অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।" রক্ষিগণকে অপসারিত করিয়া "ভীষ্ম কর্ণকে এক হস্তে আলিঙ্গন করেন এবং সস্নেহ বচনে কর্ণকে আবার তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলেন এবং কেন তিনি তাঁহাকে

ভীষ্ম-পর্ব্বে কর্ণ

.রুষ বাক্য বলিতেন, তাহা ব্যক্ত করেন। ভীষ্ম কর্ণকে শতমুখে প্রশংসা করেন—উপদেশও দেন—"পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়" এবং পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইতেও অনুরোধ জানান।

কর্ণ ভীষ্মকে বুঝাইয়া বলেন—কেন তখন মিলন সম্ভব নয়; যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন এবং ভীষ্মের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাও করেন;

দ্রোণ-পর্ব্বে কর্ণ

দ্রোণ-পর্ব্বে কর্ণের যোদ্ধসত্তাটিই প্রকটিত হইয়াছে। (১) কর্ণ অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করেন এবং সপ্তরথী মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করেন। (২) ভীমসেনের সহিত কর্ণের তুমুল সংগ্রাম হয়, ভীমসেনের "শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন" করেন। কর্ণের এই পরাজয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিয়া সঞ্জয়কে বলেন—"কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই, আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি—কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে?" (৩) অগত্যা 'একঘাতী' বাণ দ্বারা ঘটোৎকচকে বধ করেন।

কর্ণ-পর্ব্বে কর্ণ

কর্ণ-পর্ব্বের উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই—(ক) নকুলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ, (খ) কর্ণ দুর্য্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—"আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না" ... কিন্তু মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ, (গ) শল্য সারথ্য স্বীকার করেন—একটি শর্ত্তে—"আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।" (ঘ) শল্য কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া, কর্ণের মুখের উপরেই অপ্রিয় সত্য বলিতে আরম্ভ করেন এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ত বাগযুদ্ধ হইয়া যায়। কর্ণ শল্যকে বলেন—"মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বলবিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। ... সমস্ত বৃষ্ণিবীর

মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহ পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর।" পরশুরামের অভিশাপের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কর্ণ শল্যের কাছে অনুশোচনা করেন। তারপর ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথা মনে পড়ে এবং তাঁহার মনে ভয় উপস্থিত হয়, তবু স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না—"কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিজের বিক্রম প্রকাশ ও যশ লাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন।" (ঘ) ভীমের সহিত প্রথম যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়—কর্ণের শরাঘাতে যুধিষ্ঠিরের পলায়ন। (চ) ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ—**কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ রথচক্রগ্রাস**—"সুতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম-প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে সুতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও ··· ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।"

কর্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিহ্বল হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন; রথচক্র উদ্ধার করিতে চেষ্টাও করেন কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। বাসুদেব কর্ণকে তাঁহার অধর্ম্ম কার্য্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেন, কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন। সেই অবস্থায় থাকিয়াও কর্ণ ভীষণ ও প্রাণপণ সংগ্রাম করেন; শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত **অঞ্জলিক** বাণের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, বাসুদেব এবং পাণ্ডবপক্ষে সকলেই আনন্দিত হন। যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে প্রশংসা করিতে থাকেন—বলেন—"আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ।" যুধিষ্ঠির সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর-

ভূমি পর্য্যন্ত যান এবং কর্ণকে নিহত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন—নিজেকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করেন।

[**বিঃ দ্রষ্টব্যঃ**—কর্ণের মৃত্যু শয্যাপাশে অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠির কেহই উপস্থিত হন নাই। কর্ণের মৃত্যুতে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। শুধু তর্পণের সময় কুন্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাইবার পরে, যুধিষ্ঠির শোকপ্রকাশ করেন।]

(খ) সংস্কৃত নাটকে—কর্ণ

মহাকবি ভাসের নামে প্রচলিত নাটকগুলির মধ্যে (১) পঞ্চরাত্র, (২) দূতবাক্য, (৩) মধ্যমব্যায়োগ, (৪) দূত ঘটোৎকচ, (৫) কর্ণভার, (৬) উরুভঙ্গ—এই ছয়খানি নাটক মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকগুলির মধ্যে, 'পঞ্চরাত্র' 'দূতবাক্য' 'কর্ণভার' এই তিনখানিতে কর্ণের চরিত্র পাওয়া যায় এবং বিশেষভাবে পাওয়া যায় পঞ্চরাত্র এবং কর্ণভার নাটকেই—দূতবাক্যে কর্ণ উল্লেখমাত্র।

(ক) **পঞ্চরাত্রে** কর্ণ দুর্য্যোধনের সখা—হিতবাদী এবং ধীরবুদ্ধি। দুর্য্যোধন পরামর্শ চাহিলে কর্ণ বলেন—

রামেণ ভুক্তাং পরিপালিতাং চ
স্ব ভ্রাতৃতাং ন প্রতিষেধয়ামি
ক্ষমাক্ষমত্বে তু ভবান প্রমাণং
সংগ্রামকালেষু বয়ং সহায়াঃ ॥

তারপর অভিমন্যু অপহৃত হইলে দুর্য্যোধন যখন বলেন—"সতি চ কুল—বিরোধে নাপরাধ্যন্তি বালাঃ"—কর্ণও সমর্থন করেন—বলেন—"অতিস্নিগ্ধমনুরূপং চাভিহিতম্"।

** (খ) **কর্ণভার** নাটকে কৌরব সেনাপতি কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয় ছদ্মবেশী ইন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ। কর্ণ কৌরব সেনাপতি—যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সূত শল্যরাজের সহিত নিস্ক্রান্ত। কিন্তু অগ্রগণ্য বীর কর্ণের সে দীপ্তি নাই—নিদাঘ সময়ে

ঘনরাশিরুদ্ধ সূর্য্যের মত কর্ণ শোকাচ্ছন্ন। শোকের কারণ—কর্ণ জানিয়াছেন—কুন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, পাণ্ডবগণ তাঁহার ভ্রাতা এবং

নিরর্থমস্ত্রং চ ময়া হি শিক্ষিতং
পুনশ্চ মাতৃবচনেন বারিতঃ।

কর্ণ শল্যের কাছে নিরর্থ অস্ত্রের বৃত্তান্ত বলেন ··· পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথ্যা ভাষণ এবং শেষকালে পরশুরামের অভিশাপের কাহিনী বিবৃত করেন। তিনি দেখেন—সব অস্ত্রই যেন নিবীর্য্য হইয়া গিয়াছে। তবু কর্ণের সান্ত্বনা—

হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ···

অগ্রসর হইতে যাইবেন এমন সময় নৈপথ্য হইতে আহ্বান আসে—হে কর্ণ! মহত্তর ভিক্ষা চাই। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'দীর্ঘায়ুর্ভব' না বলিয়া বলেন—সূর্য্যের মত, চন্দ্রের মত, হিমালয়ের মত, সাগরের মত তোমার যশ অক্ষয় হোক। কর্ণ গো, অশ্ব, গজ, সুবর্ণ, পৃথিবীর আধিপত্য, অগ্নিষ্টোম ফল নিজ মস্তক সব কিছু দিতে চাহেন কিন্তু ব্রাহ্মণ উল্লিখিত দানের কোনটিই লইতে চাহেন না। শেষ পর্য্যন্ত কর্ণ—সহজাত কবচ-কুণ্ডল দান করেন। শল্য বারণ করিলে কর্ণ বলেন :—

শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপর্য্যয়াৎ
সুবদ্ধমূলা নিপতন্তি পাদপাঃ
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি
হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি॥

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং 'বিমলা' নামক শক্তি গ্রহণ করিবার জন্য কর্ণকে অনুরোধ করেন। কর্ণ প্রথমে প্রতিদান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, শেষে ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গ্রহণ করেন।

* বিশেষ লক্ষ্যণীয় এখানে এই যে ··· ভাসের নাটকে—'কর্ণভার' নাটকে পরশুরামের অভিশাপের কথা নাটকের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং

কর্ণের জীবনের 'দ্বন্দ্ব', সামান্তভাবে হইলেও, কর্ণের শোকের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর 'দূতবাক্য' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য এবং বিশ্বরূপ পরিগ্রহে নর-নারায়ণত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

মহাকবি ভাসের পরেই উল্লেখযোগ্য—অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি। কুরু-পাণ্ডব কাহিনী লইয়া ইঁহারা কোন নাটক রচনা করেন নাই। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যকার—কবি ভট্টনারায়ণ। তৎপ্রণীত 'বেণী সংহার' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কর্ণের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। এখানে কর্ণ দুর্য্যোধনের-সখা বটে কিন্তু কুমন্ত্রণাদাতা রণদর্পী। শোকার্ত্ত অশ্বত্থামাকে কটাক্ষ করিয়া কথা বলিতে তাঁহার বাধে না—পৌরষের আস্ফালনেও কুণ্ঠা নাই—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যে বা কো বা ভবাম্যহম
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম ॥

দেখা যাইতেছে সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে এক মহাকবি ভাসই কর্ণের নিয়তি-বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণ কর্ণের বলদর্পের দিকটি ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ণের কর্ণত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ব্যক্ত করেন নাই।

(গ) কাশীদাসের মহাভারতে কর্ণ

আদি-পর্ব্বে—(ক) দ্রোণাচার্য্যের নিকটে রাজকুমারদের শিক্ষা
(দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা)।

(খ) রঙ্গভূমিস্থলে কর্ণের আগমন।

(গ) সকলকে লক্ষ্য বিন্ধনে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি
(দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ)।

(ঘ) কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

সভা-পর্ব্বে—(ক) পঞ্চপাণ্ডবকে সভাতলস্থকরণ।

(খ) সভাজনের প্রতি বিকর্ণের উত্তর (কর্ণের প্রত্যুত্তর)।

(গ) যুধিষ্ঠিরদের দাসত্ব মোচন (কর্ণের শ্লেষ বচন)।

বিরাট-পর্ব্বে—কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ
(গো-হরণ ব্যাপারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ)।

উদ্যোগ-পর্ব্বে—(ক) কৌরবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন (৫৩১)।
(খ) উলুকের প্রতি পাণ্ডবের কথা।
** (গ) **কর্ণের জন্ম-বিবরণ**।

ভীষ্ম-পর্ব্বে—কর্ণ, দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দ্রোণ-পর্ব্বে—(ক) দ্রোণকে সেনাপতি করিবার মন্ত্রণা।
(খ) কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ
(**এক-বিঘাতিনী** অস্ত্র ব্যবহার)।
(গ) কর্ণের নিকট কপটে ইন্দ্রের কবচগ্রহণোপাখ্যান
(**দাতাকর্ণ**)।

কর্ণ পর্ব্বে—কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।
* কর্ণবধ।

বিঃ দ্রঃ * কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর সবই ব্যাস-কৃত মহাভারত অনুসারী।

* কাশীদাসের মহাভারতে কয়েকটি ব্যতিক্রম :—

(ক) ব্যাসের মহাভারতে আছে—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করিতে দাঁড়াইলে দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—'সূতপুত্রে বরিব না কভু'—এই কথা শুনিয়া কর্ণ ধনু ত্যাগ করেন। কাশীদাসের মহাভারতে দেখা যায়:—কর্ণের বাণ—'**সুদর্শন চক্রে ঠেকি 'চূর্ণ হৈয়া গেল**'; কর্ণ লজ্জা পাইয়া সভায় অধোমুখ হইয়া বসিয়া থাকেন।

(খ) 'কুণ্ডলাহরণ' ব্যাসের মহাভারতে বন-পর্ব্বের ঘটনা—দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসের পরেই এই ঘটনা ঘটে। কাশীদাসের মহাভারতে ইহা দ্রোণ-পর্ব্বের ঘটনা।

বাংলা নাট্যে 'কর্ণ'—

কর্ণের সমগ্র জীবন লইয়া অথবা জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা লইয়া খুব কম নাটকই রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে শুধু মহাকবি ভাস কর্ণের জীবনের বিশেষ একটি ঘটনা—'কর্ণভার' নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার' নাটকে কর্ণ দুর্য্যোধনের সখা রূপে অন্যতম পারিপার্শ্বিক চরিত্র মাত্র। বাংলা সাহিত্যেও কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে বহুবার উপস্থাপিত হন নাই। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কর্ণ পার্শ্বচরিত্র রূপেই উপস্থিত হইয়াছেন এবং খুব সম্ভব গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধ' নাটকেই (১৮৮০ সাল) প্রথম উপস্থিতি। মতিলাল রায়ের যাত্রা-নাটক 'কর্ণবধে' কর্ণের প্রথম কেন্দ্রীয়ত্ব। গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' (১৮৮৪ সাল) কর্ণ-পরিবারকেন্দ্রিক প্রথম নাটক। পাণ্ডব গৌরবে (১৯০০ সাল) কর্ণ অপ্রধান রূপেই আছেন। *রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৫ই ফাল্গুন ১৩০৬, ইং ১৮৯৯ সাল)—কর্ণের জীবনের একটি চরম আধ্যাত্মিক সঙ্কট মুহূর্ত্তের কবিত্বময় নাট্যরূপ। ইহার পরে কর্ণকে অপ্রধান চরিত্র রূপে—হরিশ সান্যালের 'ভীষ্মে', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্মে' এবং আরও দুই-একখানি নাটকে দেখা যায়। * ১৯২৩ সালে—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় **কর্ণার্জ্জুন** নাটকে, কর্ণকে প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেন। কর্ণের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই নাটকে স্থান দেওয়া হইয়াছে—অবশ্য ক্রম সর্ব্বত্র রক্ষা করা হয় নাই। **জন্ম অভিশপ্ত কর্ণ, ব্রহ্ম-অভিশপ্ত কর্ণ, দাতাকর্ণ, কৃষ্ণপরায়ণ কর্ণ** সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়া নিয়তির হস্তে পুরুষাকারের পরাজয়, কর্ণার্জ্জুন নাটকের কর্ণ-চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। * ইহার পরেই ১৯২৬ সালে **নর-নারায়ণ** নাটকে—["দৈব নিগৃহীত পূর্ণশক্তিক্রেয় মহাপুরুষের জীবনকাহিনী"] কর্ণকে একটু নূতন আলোকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। এই নাটকেও কর্ণ **জন্ম-অভিশপ্ত**—কানীনত্বের অভিশাপ তাঁহার জীবনে সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতই সহজাত।

এই অভিশাপের উপরে আরও **দুইটি অভিশাপ** (একটি গো-বধ-জনিত, অন্যটি মিথ্যা পরিচয়দান-জনিত) যুক্ত হয় এবং তিনটি অভিশাপ মাথায় লইয়া কর্ণের জীবন আরম্ভ হয়। এখানেও কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয় এবং তাঁহাকে সমরে নিহত করাই কর্ণের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানেও দাতাকর্ণ স্বমহিমায় বর্ত্তমান, কিন্তু 'নর-নারায়ণে'র কর্ণের বিলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এই যে কর্ণ সমস্ত অন্তর দিয়া একথা বিশ্বাস করেন না—"নর-নারায়ণ নরদেহধারী দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর সর্ব্বত্রগ, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন .... সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর পিঞ্জরে।" কর্ণের কাছে ভীষ্মের উক্তি—"ধনঞ্জয়-বাসুদেব—মায়াতিমানব। পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ"—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন'—'প্রলাপবাক্য।' কিন্তু অবিশ্বাস জ্ঞাপক এই সব উক্তির পিছনে একটি সন্দেহের সুরও আছে—কর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে।—বাসুদেব নারায়ণ কিনা এই সত্য আবিষ্কারেই কর্ণ বাসুদেব সখা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহেন। কর্ণ স্পষ্টভাবেই বলেন—**যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে ...... সেই মৃত্যু মুখে তোমারে বলিব নারায়ণ।** এই নররূপী নারায়ণকে পাওয়ার ঐকান্তিকতাই যেন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করার বাসনা হইয়া ব্যক্ত হয়। এই যুদ্ধেই যেন শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণত্ব প্রমাণিত হইবে, তাই কর্ণের ঘোষণা—**সত্য যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব বাসুদেবে।** অন্তিমে কর্ণ বাসুদেবকে—'নর-নারায়ণ' স্বীকার করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—কর্ণের জীবনে পরিচয় জানিবার পরে যে-দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সেই সম্ভাবনাকে করুণ-মধুর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" বাদ দিয়া 'কৃষ্ণ-কর্ণ' সংবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত কথোপকথনে নাট্যকার কর্ণের দ্বন্দ্ব অভিব্যক্তির একটি সুন্দর অবকাশ লাভ করিয়াছেন—অবকাশের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। নর-নারায়ণের কর্ণ

নিঃসন্দেহে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ণের অপেক্ষা দ্বন্দ্বের দিক দিয়া অধিক অভিব্যক্ত। এই দ্বন্দ্বের বীজ মহাভারতে আছে, তবে আছে বীজাকারেই। নাট্যকার সেই বীজকেই অঙ্কুরিত-পল্লবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তবে কর্ণের পত্নীর ও পুত্রের কৃষ্ণপরায়ণতা—এতখানি কৃষ্ণানুরাগ অমহাভারতীয়—অবশ্য সম্পূর্ণ কবির নিজের কল্পিত নয়। কর্ণের ভ্রাতৃপ্রেমও মহাভারতে এত অভিব্যক্ত হয় নাই। কার্ম্মুকের অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ করিয়া কর্ণ—চারি ভ্রাতাকে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে ছাড়িয়া দেন—এই পর্যন্তই সত্য, গণ্ডদেশে চুম্বনাদি ব্যাপারে কল্পনার চমৎকারিত্ব যতই থাক, সত্য নাই। তারপর, কর্ণের মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের উপস্থিতিও অ-মহাভারতীয় কিন্তু চমৎকার-জনক কল্পনা।

* **নর-নারায়ণ কে ?**

'নর-নারায়ণ' কথাটি শুনিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে যে-অর্থবোধ হয় তাহাতে 'নররূপী নারায়ণ' নরদেহধারী নারায়ণ—অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ'ই মনের সামনে আসিয়া দাঁড়ান—সাধারণতঃ মধ্যপদলোপী সমাসের সরল পথে অগ্রসর হইয়াই বিচার-বুদ্ধি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু কথাটি মধ্যপদলোপীর অন্তর্গত নয়; দ্বন্দ্বের এলাকার অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ নর-নারায়ণ—নররূপী নারায়ণ 'শ্রীকৃষ্ণ' নহেন, নর-নারায়ণ=নর+নারায়ণ=ধনঞ্জয়-বাসুদেব। 'নর-নারায়ণ' কে ? এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবার আগে,—এই কারণেই, পৌরাণিক বার্ত্তা জানিয়া লওয়া ভাল।

ব্যাসকৃত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

উদ্যোগ-পর্ব্বে—ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ে জামদগ্নের সদৃষ্টান্ত বাক্যে ও দম্ভোদ্ভব রাজার কাহিনী প্রসঙ্গে নর-নারায়ণের কথা পাওয়া যায়। নর ও নারায়ণ—দুই মহাপুরুষ। "গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য তপস্যায় নিমগ্ন"—অবস্থায়, দম্ভোদ্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, জামদগ্ন্য বলেন—'পূর্ব্বে যে নর ও নারায়ণের কথা কীর্ত্তিত হইল, অর্জ্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ।'

ভীষ্ম-পর্ব্বে—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম "অর্জ্জুনকে পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু! একার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, নারদ তোমাকে **পূর্ব্বতন ঋষি** বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কর্ণ-পর্ব্বে—কর্ণবধের পরে যুধিষ্ঠির নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বার বার বলিয়াছেন যে তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ।

শান্তি-পর্ব্বে—মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে নারায়ণ-নারদ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'সত্য যুগে সায়ম্ভু মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া **নর, নারায়ণ, হরি** ও **কৃষ্ণ** এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়ে বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। নারদের এই বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে এবং বার্ত্তালাপ হয়। নারায়ণ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন ...... "অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে—দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে ..... পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব ...... জরাসন্ধ বিনাশের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপাল সমাগত হইলে আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। * **এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতাগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। "তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন।"** নারদের স্তব স্তুতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—নর-নারায়ণ, ঋষিরূপে অবস্থান করিলেও **নররূপী নারায়ণ**। 'নর-নারায়ণ' স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই শুধু 'নারায়ণ' শব্দটিও প্রযুক্ত হইয়াছে।

নর-নারায়ণ নাটকেও শব্দটিকে কখনও একক, কখনও বা দ্বৈত তাৎপর্য্যে, ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে ভীষ্ম রহস্য কথা শুনাইয়াছেন —"ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব। পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।" কিন্তু সূচনা'তে কর্ণ যেখানে বলেন 'নারায়ণ নরদেহ-ধারী। "দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর।" 'সেখানে নর-নারায়ণ একক তাৎপর্য্যে—অর্থাৎ নররূপী নারায়ণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছেন। অর্জ্জুনও যে অবতার—এ-ধারণা কর্ণের নাই।

তারপর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে—কর্ণের স্বগতোক্তির উদ্দেশ্য—'শ্রীকৃষ্ণ' —'বাসুদেব'। অর্জ্জুন এখানেও শ্রীকৃষ্ণের সখা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণই—"মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ" ··· "নররূপে বিভু নারায়ণ" আর অর্জ্জুন—"বাসুদেব-সখা'। চতুর্থ দৃশ্যে কর্ণের উক্তি—যদুপতি! এ-সাহস যার—কি বলিব—হয় সে নিতান্ত জড়, না-হয় নর-নারায়ণ!"—একক শ্রীকৃষ্ণেরই নর-নারায়ণত্ব প্রমাণ করে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণ যদিও নিজ মুখে বলেন—'পদ্মাবতী! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ। বিশ্বাস না করি"। কিন্তু ধনঞ্জয়ের 'নরত্ব' স্থাপনে নাট্যকার তেমন সচেতন হন নাই। কারণ, শেষ দৃশ্যে—কর্ণের অন্তিম উক্তির মধ্যেও শুধু বাসুদেবকেই সম্বোধন করিয়া কর্ণকে বলিতে শোনা যায়—"বাসুদেব! বাসুদেব, একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর! সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।" 'ধনঞ্জয়-বাসুদেব' যেখানে নর-নারায়ণ সেখানে—'সম্মুখে দাঁড়াও নর" ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়াই বলা উচিত ছিল।

রচনা-নামকরণ-অভিনয়

নাটকের 'নিবেদনে' শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাটক রচনার ইতিহাসে যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—"১৯১২-১৩ সালে ৺কাশীধামে তিনি 'ভীষ্ম' নাটক লেখা শেষ করেন ··· তাহার পর 'দ্রোণ' ও 'কৃপ' লেখা আরম্ভ করেন। কিছু কিছু লেখার পর মহাভারতের 'কর্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য তাঁহাকে অভিভূত করায় 'কর্ণ' লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন রঙ্গালয়ের তাগিদে 'কিন্নরী' প্রভৃতি ২-৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য কর্ণ লেখা বন্ধ রয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নব-গঠিত আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জ্জুন' নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে 'কর্ণ' লেখা বন্ধ রাখিয়া 'আলমগীর' প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হন" ··· ।

পরে নাট্যকলা ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধ ও আনুকুল্যে ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্র-ভাবে 'কর্ণ' লেখা আরম্ভ করেন ··· মহেন্দ্রবাবুর কাছে নাট্যকার এক পত্রে লিখিয়াছেন—'কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। ***এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ-শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী**। ...

১৯২৫ সালে কর্ণ লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বনামধন্য প্রথিতযশা নট-নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌজন্যে, শ্রীযুক্ত শিশির-কুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা ও নামভূমিকা-অভিনয়ে **নর-নারায়ণ নামে** ইহা (১লা ডিসেম্বর ১৯২৬ সাল) নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।'

এখানেই প্রশ্ন উঠিতেছে—'এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী'র দৃশ্য রূপটিকে—'নর-নারায়ণ' নামে অভিহিত করা হইল কেন এবং সেই অভিধান কি পরিমাণেই বা সার্থক হইয়াছে? প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে—'নিবেদন' হইতে জানা যায় যে 'কর্ণাজ্জুন' নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে 'কর্ণ' লেখা বন্ধ হয়, কারণ 'কর্ণ' অভিনয় করিবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়।' এই কারণেই বোধ হয়, কর্ণাজ্জুনের কর্ণের স্পর্শ এড়াইবার জন্য নামকরণ করা হয়—'নর-নারায়ণ।' ইহা অনুমান মাত্র। তবে একেবারে মিথ্যা অনুমান নাও হইতে পারে। অবশ্য এই অনুমানকে প্রশ্রয় না দিলেও প্রশ্ন উঠিবে—বর্ত্তমান গঠনে নর-নারায়ণ নামকরণ সার্থক হইয়াছে কি না, হইলে কোন্ দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে?

নাটকের প্রস্তাবনা, সূচনা ও ঘটনাযোজনা লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়—নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ণের জীবনকে রূপ দেওয়া। সুতরাং আলম্বন বিভাবের দিক্ দিয়া, উপস্থাপ্য বিষয়ের দিক্ দিয়া হিসাব করিলে নাটকের নাম 'কর্ণ' রাখাই যুক্তিযুক্ত। সেখানে 'কর্ণ' না রাখিয়া 'নর-নারায়ণ' রাখায়—কর্ণের প্রতিপক্ষ 'ধনঞ্জয়-বাসুদেবের দিকেই নাটকের উদ্দেশ্য-বিন্দু সরিয়া গিয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্য-বিন্দু সরিয়া যাওয়ার অর্থ কেন্দ্রীয়ত্বের পরিবর্ত্তন ঘটা আর কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ঘটার অর্থ গঠনেরও পরিবর্ত্তন ঘটা। 'কর্ণ'-কেন্দ্রিক গঠন এবং 'নর-নারায়ণ'-কেন্দ্রিক গঠন নিশ্চয়ই একরূপ হইতে পারে না। এই কারণেই অনেকে 'নর-নারায়ণ' নামকরণের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পান নাই।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে স্থূল উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া 'কর্ণ' নামকরণই যথার্থ এবং সার্থক নামকরণ। কিন্তু একথা বলা চলে না যে 'নর-নারায়ণ' নামের কোনরূপ সার্থকতাই নাই। সত্য বটে নাটকখানি—এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের (কর্ণের) জীবন-কাহিনী, কিন্তু ইহাও মিথ্যা নয় যে নাট্যকার কর্ণের জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব

প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই নর-নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠাকে নাটকের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য বা উপস্থাপ্য বলিয়া স্বীকার করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যানুসারে নামকরণের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলে নর-নারায়ণ নামকরণের সার্থকতা অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে—**এই নাটকের বাহিরে কর্ণ ভিতরে নর-নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন।** কর্ণের জীবনের সমস্যা ও নিয়তির নিগ্রহ দেখানো যেমন ইহার উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যতম উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে অবিশ্বাসী কর্ণের মুখে বাসুদেবকে নরদেহধারী নারায়ণ বলিয়া প্রমাণ করা—অর্জুন-কৃষ্ণের নর-নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

জাতি-পরিচয়

'মহাভারত' পুরাণ হইতে কাহিনীটি গৃহীত। সুতরাং সূত্রানুসারে কাহিনীর উৎসের ভিত্তিতে, 'নর-নারায়ণ' নাটকের 'পৌরাণিক' আখ্যা অবশ্যই প্রাপ্য। তবে একথাও এই সঙ্গে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ইহা শুধু 'জাত্যাব্রাহ্মণ'ই নয়—অর্থাৎ নামেই পৌরাণিক নয়, স্বধর্মেও পৌরাণিক। বরং বলা চলে পৌরাণিকের উপর পৌরাণিক। বাস্তবিক, দৈব-লীলায় বিশ্বাস, মানুষের সংসারে মানুষের দেহ ধারণ করিয়া দেবতাদের অবতরণে বিশ্বাস, নিয়তির অমোঘ নিয়মে বিশ্বাস এবং মন্ত্রতন্ত্রের শক্তিতে, অভিশাপ-অভিচারে বিশ্বাস, যদি পৌরাণিক জীবনে তথা **পৌরাণিকতার লক্ষণ** বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তির মত শোনাইলেও একথা সত্য যে কর্ণ-চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার মহাকবি ব্যাসেরও অপেক্ষা অধিক পৌরাণিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন—কর্ণকে অধিকতর অধ্যাত্মপরায়ণ করিয়া রূপ দিয়াছেন। কর্ণের 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ কর্ণ'—রূপটি কল্পনা করিয়া নাট্যকার আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। নাটকে দৈবলীলা, ব্রহ্মশাপ, নিয়তি (অবশ্য সাকার নহে) প্রভৃতি অতি-প্রাকৃত তো আছেই উপরন্তু আছে কৃষ্ণভক্তির আধিক্য। (মহাভারতে কৃষ্ণভক্তি আছে কিন্তু মহিমা প্রদর্শনের আতিশয্য নাই।)

তারপর, **রস-বৈশিষ্ট্যের** ভিত্তিতে নাটকখানিকে 'ট্র্যাজেডি' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পূর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের দৈবহস্তে শোচনীয় নিগ্রহ—দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের নিস্ফল সংগ্রাম ও শোচনীয় দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ ও পরাজয় যেখানে উপস্থাপ্য, সেখানে ট্র্যাজেডির রূপাদর্শেই যে-কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য এইসব ব্যাপারে পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডি-রস উপযুক্ত পরিমাণে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না—অর্থাৎ নায়কের আচরণে (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) দর্শক ও পাঠকের মনে ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression) জাগাইবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ট্র্যাজেডি-সংবিদ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। যেখানে পাত্র-পাত্রীর ভিতরে বাহিরে অতি-প্রাকৃতের প্রভাব বা দৈবের অস্তিত্ব বিরাজ করে—ভিতরে থাকে দৈবের অমোঘ নিয়মে বিশ্বাস আর বাহিরে থাকে দৈব-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা-রাজি—নিয়তির স্থূল হস্তক্ষেপ, মন্ত্রতন্ত্র—অভিশাপ—আশীর্ব্বাদের অব্যর্থ ক্রিয়া-কারিত্ব—সেখানে ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগাইবার পথে বড় বাধা অতি-প্রাকৃতের —অর্থাৎ-দৈব প্রকৃতির সত্যস্বরূপতা ও মঙ্গলস্বরূপতা—দেবতা কৃপালাভে পরম পুরুষার্থতা। যে-পরিমণ্ডলে দুঃখ-দুর্গতির বেদনা, মহত্তর কোন উপলব্ধির দ্বারা শোষিত হইয়া যায়, সেখানে ট্র্যাজেডির সংবেদনা তীব্র হইতে পারে না। মৃত্যু যেখানে অমৃত বহন করিয়া আনে—সব হারানোর বেদনাকে ছাড়াইয়া পরমার্থ পাওয়ার আনন্দ যেখানে বেশী হয়, সেখানে ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কমেডির রসই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি করিতে হইলে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকে যথাসম্ভব লৌকিকবৎ করিতে হইবে—নাটকের সমগ্র আবহাওয়ায় **মানবিকতার প্রাধান্য** রাখিতে হইবে। কারণ, ট্র্যাজেডি-সংবিদ মানবের প্রতি মানবের সহজ সহানুভূতির উৎস হইতেই জন্মে এবং ঐ ভাবে জন্মে বলিয়াই দেবতাকেও ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে হইলে মানবের মত বেদনা বোধ লইয়া দুঃখ-দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে।

পৌরাণিক পরিমণ্ডলে দৈব বিশ্বাসের একাধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, ট্র্যাজেডির অবকাশ সৃষ্টি হয় সেখানেই যেখানে ব্যক্তির অহংপুরুষ (ego) প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, বাসনা চরিতার্থ করিতে তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অহঙ্কারবশে অন্যায় বা পাপ করিয়া বসে অথবা অনুচিত কর্ম্মারম্ভ করে অথবা নিয়তির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পুরুষকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল সংগ্রাম করিতে করিতে শোচনীয়ভাবে, অকালে, নিজেকে ক্ষয় করিয়া দেয়। **অহং মুক্তের জীবনে ট্র্যাজেডিও নাই—অহং মুক্তের ট্র্যাজেডি বোধও নাই।** 'অহং'ই ট্র্যাজেডির জনক—'অহং'ই ট্র্যাজেডি রসের আস্বাদক। নিয়তিকে মনে মনে স্বীকার করিয়াও কার্য্যে অস্বীকার করিয়া 'অহং' ট্র্যাজেডি ঘটায়; তেমনি ট্র্যাজেডির আস্বাদনকালেও 'অহং' দৈব আনুগত্য স্বীকার করিয়াও সহানুভূতিবশে নিগৃহীত মানবের পক্ষে যোগদান করে। এইরূপ অবস্থাতেই ট্র্যাজেডি সম্ভব হয় এবং এই জাতীয় ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্য্যন্ত দৈবের হস্তে পুরুষকারের পরাজয় ঘটে বটে, কিন্তু দৈবের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াও পুরুষকার বিশ্ব রহস্যের বিরাট পটভূমিকায় জীবন রহস্য ও মানব মহিমার স্বাক্ষর রাখিয়া যায়।

('নর-নারায়ণ' নাটকের নায়ক দেবতার ঔরসজাত হইলেও, সহজাত কবচ-কুণ্ডল লইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও সামান্য একজন মানুষের মতই মর্ত্তের মানুষ। এমন কোন অবতার বা স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা নহেন যিনি দুই-চার দিনের জন্য লীলা করিতে বা পাপক্ষয় করিতে পৃথিবীতে আসিয়া স্বর্গের সন্তান স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া স্বস্তি পাইবেন। কর্ণে যে-পরিমাণে **মানবিকতা** সেই পরিমাণেই কর্ণের বেদনায় আমরা ব্যথিত; আর সেই পরিমাণেই কর্ণের শোচনীয় দ্বন্দ্ব ও পরিণতি ট্র্যাজেডি রসাত্মক হইয়াছে। কর্ণের মৃত্যু সময়ে নর-নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন বটে কিন্তু বেদনা-বিষাদের চাপ তাহাতে সামান্যই লঘু হইয়াছে। নিয়তির নিগ্রহ, জন্ম-অভিশাপের লাঞ্ছনা, নিরুপায় দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ শোচনীয় করুণ পরিণতি, সব কিছু মিলিয়া নাটকখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মকই হইয়াছে।

কর্ণের জীবন অবশ্যই ট্র্যাজেডি-রসের উপযুক্ত আলম্বন বিভাব। কর্ণ কানীন পুত্র। এই কানীনত্বের অভিশাপে কর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা ও সংস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন—সূত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই অভিশাপই যেন তাঁহার জীবনকে দুষ্ট গ্রহের মত তাড়না করিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই অভিশাপের ফলেই কৌন্তেয় হওয়া সত্ত্বেও রাধেয় কর্ণ কৌন্তেয়-অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছেন, অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিবার জন্য অস্ত্রশিক্ষা করিতে পরশুরামের নিকট গিয়াছেন এবং দুই-দুইটি মারাত্মক ব্রহ্মশাপ শিরে বহন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই অভিশাপের সম্মুখে তাঁহার পুরুষকার বার বার যেন বিপর্য্যস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। অস্ত্র পরীক্ষাকালে কৃপাচার্য্যের প্রশ্নে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর—'সূতপুত্রে বরিব না কভু" ঘোষণায় ইহা কর্ণের মর্ম্মে তীব্রতম দংশন করিয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির নিত্য গঞ্জনায় কর্ণের 'অঙ্গরাজত্বে'র দীপ্তিও যেন বার বার ম্লান হইয়া গিয়াছে। অপরিমেয় পৌরুষ ও অদ্বিতীয় দান-বীরত্ব, জন্মের গ্লানি হইতে কর্ণকে মুক্ত করিতে পারে নাই। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম—কর্ণের মুখ রক্ষা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কর্ণের মর্ম্মদাহ দূর করিতে পারে নাই। বাস্তবিক দেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে যাঁহার জন্ম দেবত্ব ক্ষত্রিয়ত্বের সহজ অধিকার তো তাঁহার জন্ম সূত্রেই পাওয়া। তবে যে-সমাজ বিধান নিয়তি বিধানেরই অন্যতম ব্যক্ত রূপ, নিয়তি বিধানের মতই দুর্নিবার, তাহার কাছে দ্রুত ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা পাইতে পারে না এমনকি ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ থাকিলেও না। প্রথমতঃ, এই দিক দিয়া কর্ণের ট্র্যাজেডি—প্রধানতও বটে, জন্ম-অভিশপ্ত ব্যক্তিরই—অনিবার্য্য অথচ নিষ্ফল আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রামের ট্র্যাজেডি। আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কর্ণ গোবধ পাপে লিপ্ত এবং তজ্জন্য অভিশপ্ত হন—গুরু অভিশাপের বজ্র বুক পাতিয়া গ্রহণ করেন—কর্ণের বহু কালের সাধনা—শতাব্দীর রচনা এক নিমিষে ধূলিসাৎ হওয়ার মতই অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক সাধনার এইরূপ নিষ্ফলতা অবশ্যই শোচনীয়।

জন্ম-অভিশপ্তের জীবনে আসল ট্র্যাজেডি আরম্ভ হয় সেখানেই যেখানে তাঁহার জন্ম রহস্য আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় এবং অভিশপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে চরমতম উভয়সঙ্কট—মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়—কর্ণের জীবনেও সেই চরম সঙ্কট আসে যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে তাঁহার জন্ম রহস্য প্রকাশ করেন তথা কর্ণের অখণ্ড 'রাধেয়'-সত্তা ভাঙিয়া দিয়া 'রাধেয়' ও 'কৌন্তেয়' দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া দেন। একদিকে ধর্ম্মের প্রেরণা—রাধার ও অধিরথের স্নেহের ঋণ—দুর্য্যোধনের প্রীতির ঋণ, অন্য দিকে সহোদর-স্নেহের সহজ আবেগ ; দুই পক্ষই সমান প্রবল—সমান অপরিহার্য্য। সুতরাং দ্বন্দ্বও খুব তীব্র। আর সঙ্কটের চরম অবস্থা সেখানেই যেখানে কর্ণের সেই চিরকালের সমকক্ষ ও শত্রু, যাঁহাকে সমরে নিহত করিবার জন্য কর্ণ অতন্দ্র সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাকে বধ করিতে তিনি সখা দুর্য্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই অর্জ্জুন শেষ পর্য্যন্ত সহোদর ভ্রাতায় পরিণত হইয়া যান। **রাধেয়ের সহিত কৌন্তেয়ের সংগ্রাম শেষে কৌন্তেয়ের সহিত কৌন্তেয়ের সংগ্রামে পরিণত হয়।** কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ—কর্ণের নিজের ভাষায়—

"মর্ম্ম চায় পরাজয়, ধর্ম্ম চায় জয়—মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা" এই দ্বন্দ্বকে অবশ্যই 'ট্র্যাজেডি-করুণ' বলিতে হইবে। পরিপূর্ণ শক্তিধর অতুলনীয় বীর, অদ্বিতীয় উদার দাতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ কর্ণের দৈবশক্তির বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম ও শোচনীয় পতন নিঃসন্দেহে ট্র্যাজেডি রসাত্মক।

আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া 'জাতি-পরিচয়' আলোচনা শেষ করা যাউক। নর-নারায়ণ গদ্য-পদ্যময় রচনা—(চম্পু নাট্য বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে যে-জাতীয় নাটককে 'Poetic drama' বলে ইহা অনেক পরিমাণে সেই জাতীয় নাটক) এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা ভাল—এ-শ্রেণীর নাটকের উৎকর্ষ—বিচারে, কবিত্ব ও নাটকত্বের সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছে কি না, বিশেষভাবে তাহা প্রণিধানযোগ্য, কারণ এই জাতীয় রচনায় বচনের বাস্তবিকতা অপেক্ষা কবিত্বময় বিস্তারের দিকে অধিকতর প্রবণতা থাকে।

গঠন

গঠনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিবার মুখে গঠন সম্পর্কিত মূল সূত্রটি স্মরণ করিয়া লওয়া ভাল। এ-সম্পর্কে মনীষী এ্যারিস্টটল যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"So in poetry the story, as an imitation of action must represent one action a complete whole, with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole" (Ingram Bywater) ইহা কিন্তু সেই আদর্শ রূপেরই কথা যাহাতে কোনরূপ অবাস্তবেরই স্থান নাই—যাহাতে প্রত্যেকটি 'অঙ্গ' নিখুঁতভাবে 'অঙ্গী'র স্বরূপকেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। বড় বড় শিল্পীরা এইরূপ পরা-আদর্শে পৌঁছিতে পারেন বা পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অবশ্য এখানকার ঐ 'অঙ্গীর স্বরূপ' কথাটি (complete whole) সঙ্কীর্ণ—অর্থাৎ কাহিনীর মোটামুটি কাঠামো অর্থে প্রয়োগ করিলে চলিবে না। 'অঙ্গীর স্বরূপ' বলিতে বুঝিতে হইবে **কবির ধ্যানটি—কবির মানস নেত্রে প্রতিভাত বিষয়ের স্বরূপটি**। এই স্বরূপ-ধ্যানের বৈশিষ্ট্যের বা পার্থক্যের ফলেই, একের 'অঙ্গী' অন্যের অঙ্গী হইতে ভিন্ন হয় এবং অঙ্গ-বিন্যাসের ছাঁদেও পার্থক্য আসিয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আদর্শ গঠন বা রূপ সেইটিই যাহা পরিপাটি অথচ সুষ্ঠুভাবে 'অঙ্গী'কে—অর্থাৎ মূল পরিকল্পনাটিকে ব্যক্ত করিয়া থাকে।

এই নাটকের মূল পরিকল্পনা বাহ্যত—দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর এক মহাপুরুষের জীবনী বটে কিন্তু নাট্যকার এই 'বাহ্য'কে অতিক্রম করিয়া আরও একটু—বেশ একটু, আগে বাড়িয়া গিয়াছেন। কর্ণের জীবনের অন্তরতম

প্রদেশে তিনি একটি **ভাবকেন্দ্র** স্থাপিত করিয়াছেন এবং সেই কেন্দ্রের অভিমুখী করিয়াই কর্ণের আচরণসমূহ সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই 'ভাবকেন্দ্র'টি নাট্যকার নিজের প্রতিভালোকের শক্তিকেই মহাভারতের কর্ণের চরিত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। কর্ণের ধনঞ্জয় বিদ্বেষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নাট্যকার নর-নারায়ণ তত্ত্বের গহনে নামিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব 'নারায়ণ নর দেহধারী' কি না এই সত্য পরীক্ষা করিবার প্রবল বাসনাই যেন কর্ণকে বাসুদেব-সখা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কর্ণের চাইই চাই। কারণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ না ঘটিলে, বাসুদেব-সখা তথা বাসুদেবের নারায়ণত্ব পরীক্ষা করা সম্ভব হইবে না। মোট কথা, কর্ণের যুদ্ধ কামনার এবং যুদ্ধ বাধাইবার কুমন্ত্রণাদির উৎস রহিয়াছে নর-নারায়ণকে পরীক্ষা করার তথা পাওয়ার কামনারই মধ্যে। কর্ণ যে-পরিমাণে অন্তরে কৃষ্ণপরায়ণ, বাহিরে সেই পরিমাণেই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বিরোধী। ইহা কর্ণ-চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যাই বটে এবং মহাভারতের কর্ণের যথাযথ প্রতিরূপ নয়—আরোপিত রূপ।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে মহাভারতে কর্ণের রাধেয় কৌন্তেয় সত্তার দ্বন্দ্ব খুব পরিস্ফুটাকারে ব্যক্ত করা হয় নাই সেখানে নাট্যকার সেই দ্বন্দ্বের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট আকার দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারতে কর্ণের 'ধর্ম্ম' ও মনুষ্যত্ব যে-পরিমাণে সংলক্ষ্য রূপ পাইয়াছে, 'মর্ম্ম' তাহা পায় নাই। নর-নারায়ণ নাটকে নাট্যকার কর্ণের মধ্যে **মর্ম্ম, ধর্ম্ম** এবং **মনুষ্যত্বের** দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়াছেন। (কর্ণের উক্তি স্মরণীয়—'মর্ম্ম চায় পরাজয়, ধর্ম্ম চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা'।)

সুতরাং এখানকার মূল কল্পনাটি, কর্ণের জীবনের প্রচলিত ঘটনার সহিত উল্লিখিত ভাব-বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই নব-গঠিত কাহিনীই নর-নারায়ণ নাটকের উপস্থাপ্য বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুকে কত সুষ্ঠুভাবে নাট্যকার রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাই এখন বিচার্য্য বিষয়। অর্থাৎ,

বিচার্য্য এখন—সন্ধি বিভাগ—অঙ্ক দৃশ্যাদি বিভাগের সামর্থ্য ও সৌষ্ঠব—এক কথায় উৎকর্ষ—অপকর্ষ। আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে বলা যাইতে পারে—অঙ্ক এবং দৃশ্যাদি বিভাগ এমন হইয়াছে কি না যাহাতে কাহিনীর ক্রমাভিব্যক্তিতে ঘটনাপরম্পরায় কার্য্যকারণ নিয়ম-নিয়তি এবং কেন্দ্রাভি-মুখিতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং সব কিছুর মধ্য দিয়া মুখ্য উপস্থাপ্য—ভাব বা রস চমৎকারজনক রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অঙ্ক বা দৃশ্য কেহই নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র নয়। 'দৃশ্য' যেমন অঙ্কসাপেক্ষ, 'অঙ্ক' তেমনি সমগ্র পরিকল্পনা বা অংশী-সাপেক্ষ। একটি বাক্য যতই অলঙ্কারবহুল হউক না কেন সে যেমন একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের বা বক্তব্যেরই অংশ, তেমনি দৃশ্য অঙ্কের এবং অঙ্ক সমগ্র পরিকল্পনারই অংশ। প্রত্যেকের স্বকীয় রূপ ও রসের সৌষ্ঠব বা চমৎকারিত্ব আছে বটে, কিন্তু সমগ্রের রূপ-রসের তাৎপর্য্য তাহাতে না থাকিলে তাহা সার্থক বলিয়া মনে করা যায় না।

গঠনে বা কাহিনী পরিকল্পনায় সমর্থ ঘটনার নির্ব্বাচনই খুব বড় কথা এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোন্‌টি পরিহার্য্য কোন্‌টি অপরিহার্য্য তাহা স্থির করা এবং স্থির করার পরে নির্ব্বাচিত ঘটনারাজিকে কেন্দ্রাভিমুখী করিয়া অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত করিয়া যোজনা করা—যোজনার মধ্য দিয়া চরিত্রের রূপ ও রস পরিণতি ব্যক্ত করা নির্ম্মাণক্ষমতার প্রথম ও প্রধান পরিচয়।

এইবার দেখা যাক্ নর-নারায়ণ নাটকে এই ক্ষমতা কিভাবে এবং কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য হইলেও বলা ভাল—নাট্যকার, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কর্ণের জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্ত ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করেন নাই। উদ্যোগ-পর্ব্বের ঘটনা লইয়াই তিনি মূল নাটক আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি আনিয়াছেন স্বগতোক্তি বা বিবৃতির সাহায্যে, আর কয়েকটি আনিয়াছেন—'সূচনা' দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়া। কর্ণের জীবন দৈব-নিগৃহীত। দৈব-নিগ্রহ দেখাইতে হইলে অবশ্যই কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত, গোবধ-জনিত ঋষিশাপ এবং মিথ্যাচার-জনিত গুরু-

অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা ভিত্তি রচনা করিতে হইবে। অবশ্যই এই ঘটনাগুলি কর্ণের প্রথম জীবনের ঘটনা এবং উদ্যোগ-পর্ব্বে ঘটনা হইতে ব্যবহিত। ব্যবহিত ঘটনাকে যোজনা করার রীতি—তিনটি। এক রীতি—নির্ব্বাচিত ঘটনাগুলি পর পর কালক্রম অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনা করা—(পাত্রপাত্রীর রূপসজ্জা এবং ঘোষণা দ্বারা কালের গতি বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া ব্যবধান পূরণের কোন উপায় নাই) অন্য রীতি—অতীত ঘটনাকে পাত্রপাত্রীর স্মৃতি বা সংস্কারের মধ্য দিয়া—অর্থাৎ চরিত্রেরই মানসিক ক্রিয়া হিসাবে প্রয়োগ করা আর অগত্যা—অতীত ঘটনাকে নাটকের মূল দেহ হইতে বিযুক্ত রাখিয়া 'সূচনা' দৃশ্যে স্থান করিয়া দেওয়া। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ অগতির গতিই অবলম্বন করিয়াছেন—'সূচনা' দৃশ্যে তাপসের অভিশাপ এবং পরশুরামের অভিশাপ প্রত্যক্ষভাবে রূপ দিয়াছেন। কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্তটি উহ্যই রাখিয়াছেন। যাঁহারা কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত না জানেন তাঁহাদের কাছে কর্ণের নিরুপায় অবস্থাটি সম্যকভাবে ধরা পড়ে বলিয়া মনে হয় না। তবে সূচনা দৃশ্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে একথাও ভাবিয়া দেখা দরকার ঐ দুইটি ঘটনাকে পরোক্ষভাবে রূপ দিলে ঘটনার কার্য্যকরিতা এক কথায় রস প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার সমান হইবে কি না। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে এবং নাটকের ঘটনার আরম্ভ ঐ স্থান হইতে করিতে হইবে। যদি পরবর্ত্তী ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ না করিয়া ডিঙাইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য 'সূচনা' দৃশ্যে স্থান দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যাহা হউক, নাট্যকার সূচনা দৃশ্যে একই কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটিত দুইটি ঘটনার সংশ্লেষণ করিয়াছেন—দুইটি অভিশাপ একই দৃশ্যে রূপান্বিত করিয়াছেন। সংশ্লেষণের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে সংশ্লেষণ যে নির্দ্দোষ হয় নাই—একথা বলা যাইতে পারে। তাপসের আশ্রম-সান্নিধ্যে পরশুরামের উপস্থিতি অসম্ভব ঘটনা নয় বটে, কিন্তু অপ্রস্তুতভাবে

পরশুরামের কর্ণের জানুতে শয়ন এবং নাটকীয় (?) নিদ্রা, ঔচিত্যবাধক। রসের দিক্ দিয়াও যে দৃশ্যটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অভিশাপ দেওয়ার আগেই তাপসের ও পরশুরামের ক্রোধের উত্তেজনা অনুচিত মাত্রায় প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। তবে পরশুরামের চরিত্রকে নাট্যকার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভাব-গভীর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে, 'সূচনা' দৃশ্যে নাটকের 'ভাব-বীজটি'কে—নর-নারায়ণের প্রতি কর্ণের মনোভাবকে নাট্যকার সুন্দরভাবেই স্থাপনা করিয়াছেন এবং পরশুরামের অভিশাপে, "সত্যই যদি হীন সূতপুত্রের শোণিতে অশুচি হইয়া থাকি আমি এ-পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।"—এইটুকু অ-মহাভারতীয় আরোপ মিশাইয়া ভাবী একটি দ্বন্দ্বের জন্য সুন্দর অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাপসের অভিশাপ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে, বলা যাইতে পারে দুইটি অভিশাপেরই সদ্ব্যবহার হইত।

এইবার, অঙ্ক ও দৃশ্য-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—হস্তিনার সভামণ্ডপ। এখানে সঞ্জয়ের বার্তাকে কেন্দ্র করিয়া ভীষ্ম ও কর্ণের বাগযুদ্ধ, কর্ণের বীরদর্প, অভিমানে অস্ত্র পরিহার এবং দানব্রতগ্রহণ উপস্থাপিত হইয়াছে। ভাবে ও ভাষায় দৃশ্যটি মহাভারত-অনুসারী। তবে কর্ণের আত্মপক্ষ সমর্থনটুকু অকাট্য যুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই এবং কর্ণের 'নর-নারায়ণ'-বিরাগ কবি-কল্পিত—অবশ্য ভাব-বীজের স্বাভাবিক বিকাশেরই নিদর্শন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পাণ্ডব শিবির। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য এই দৃশ্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইলেও প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য (যুধিষ্ঠিরের শান্তি-অভিলাষ, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলের যুধিষ্ঠির ভক্তি, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা ও কৃষ্ণপ্রীতি) প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দৃশ্যের প্রথম প্রয়োজন—কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতি। দ্বিতীয় প্রয়োজন—কৌরবের অধর্ম্মাচার ও পাণ্ডবদের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রদর্শন তথা পাণ্ডব শিবিরকে ধর্ম্মের শিবির রূপে

প্রতিষ্ঠিত করা। তৃতীয় প্রয়োজন—কৃষ্ণকে দূত রূপে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের—নারায়ণ-মহিমা প্রদর্শনের—অবকাশ সৃষ্টি করা এবং 'কর্ণ-কৃষ্ণ সংবাদ'কে প্রয়োগ করিয়া কর্ণের অন্তর্বিক্ষোভ দেখাইবার আয়োজন করা। অবশ্য দৃশ্যটির বিস্তার এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে না পারে এমন নয়।* তবে এখানেই উল্লেখ করা দরকার নাটকখানির নাম 'নর-নারায়ণ' এবং কর্ণের জীবন যেমন উপস্থাপ্য তেমনি ধনঞ্জয়-বাসুদেবের নর-নারায়ণত্বও অন্যতম উপস্থাপ্য। মোট কথা; নাটকখানির উদ্দেশ্য সরল নহে—যৌগিক। এই কারণেই নাট্যকার কর্ণের দিকে এক চক্ষু এবং নর-নারায়ণের দিকে আর এক চক্ষু রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

তৃতীয় দৃশ্য—'কর্ণভবন—বিশ্রাম কক্ষ। দৃশ্যের আরম্ভে 'বৃষকেতু'র 'গীতি'টি বৃষকেতুর কৃষ্ণানুরাগ যতই অভিব্যক্ত করুক, শিল্পের দিক্ দিয়া গীতিনাট্যিক বা অপেরাধর্মী হইয়াছে। কর্ণের স্বগতোক্তিতে; কর্ণের—(নাটকেরও) কেন্দ্র-ভাবটি—কৃষ্ণের নর-নারায়ণত্ব লইয়া কর্ণের দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব (বিশ্বাস-কোটির দিকেই মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে) ব্যক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দ্বন্দ্বের জোর বেশ কমিয়া গিয়াছে এবং অবিশ্বাসের মাত্রা অপেক্ষা বিশ্বাসের মাত্রাই বেশী হইয়াছে। তবে নারায়ণত্ব যাচাই করিতে কর্ণ কৃতসঙ্কল্প এবং একটিমাত্র প্রমাণ দ্বারা তিনি যাচাই করিতে চাহেন—"যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে ...... সেই মৃত্যুমুখে বাসুদেব তোমারে বলিব নারায়ণ।" তারপর কর্ণের ও পদ্মাবতীর কল্পিত কথোপকথন সাহায্যে নাট্যকার কর্ণের অতীত জীবনের ইতিহাস—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় কর্ণের গ্লানি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ব্যাপারে কর্ণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ, ধনঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি কর্ণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি বোধ প্রভৃতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণ পদ্মাবতীর কাছে যে-মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পদ্মাবতীর কাছে প্রকাশ করার জন্য অ-মহাভারতীয় বটে, কিন্তু কৃতকর্ম্মের জন্য কর্ণের মনস্তাপ প্রকাশ (কৃষ্ণের কাছে) মহাভারত-সমর্থিত। এই দৃশ্যে নাট্যকার কর্ণের অর্জ্জুন-বিদ্বেষের

মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে লিখিয়াছেন—

"দেবেরও অবধ্য আমি। জ্বলন্ত সঙ্কল্প
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত
যুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয়-সনে।'

অর্থাৎ, নাট্যকার দেখাইতে চাহেন—কর্ণের ধনঞ্জয়-বিদ্বেষ বা যুদ্ধকামনা—দুর্য্যোধনকে কুমন্ত্রণা দিয়া কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার পরম্পরা, চিত্তের গভীরতম প্রদেশের নর-নারায়ণ—কামনারই যেন ব্যক্ত রূপ। ধনঞ্জয়-বাসুদেবকে নর-নারায়ণ বলিয়া কর্ণ মনে মনে স্বীকার করেন বলিয়াই, নিজের 'দেবের অবধ্যত্ব'—পরীক্ষা করিতে নর-নারায়ণকেই সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতে চাহেন। একটি কেন্দ্রীয় 'ভাব'কে সমস্ত আচরণের হেতু রূপে দেখাইবার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এই কর্ণকে যথাযথ মহাভারতের কর্ণ বলা না গেলেও একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই কর্ণের আধ্যাত্মিক গভীরতা ও জটিলতা অনেক বেশী ও অনেক প্রশংসনীয়।

চতুর্থ দৃশ্য—'কর্ণভবন—কক্ষান্তর।' এই দৃশ্যে নাট্যকার মোট চারিটি ব্যাপার একসঙ্গে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাপার—শ্রীকৃষ্ণের আগমন বিষয়ে কর্ণের সহিত দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শ। প্রথমাংশে এই ঘটনাটি রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং কর্ণের ঐকান্তিক যুদ্ধকামনার রূপটিও বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু 'দারুণ সমস্যা'র মধ্যে শকুনির স্থূল রসিকতা, এক কথায় 'বাচালতা' অনুচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাপার—কর্ণের অন্তরতম সত্তাটিকে স্বপ্নের সাহায্যে প্রদর্শিত করা এবং কৃষ্ণকে কর্ণ যে নারায়ণ বলিয়াই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন ইহা ব্যক্ত করা। নাট্যকার স্বপ্নের সাহায্যে কর্ণের অবচেতন মনটি দেখাইবার—জাগ্রত-চৈতন্যে অহঙ্কারের বাধায় যে-সত্য প্রতিভাত হয় না সেই সত্যকে নিদ্রা অবকাশে দেখাইবার যে-পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অ-মহাভারতীয় হইলেও প্রশংসনীয় যোজনা। এক নিদ্রার ঢিলে নাট্যকার দুই কাজের পাখী মারিয়াছেন—

যে-নিদ্রায় কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেই নিদ্রাবস্থাতেই স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য প্রবেশ করিয়া কর্ণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তারপর সূর্য্যের সতর্কীকরণ এবং ইন্দ্র কর্তৃক কবচ-কুণ্ডল হরণ—এই দুইটি ঘটনাকে সংশ্লেষণ করিয়াছেন। মোট কথা, নাট্যকার এই দৃশ্য-কল্পনায় প্রশংসনীয় গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষার স্থলে, পদ্মাবতীর ছুরিকা আনিতে প্রস্থান এবং ছুরিকা লইয়া প্রবেশের মধ্যে যথেষ্ট কালব্যবধান রক্ষিত হয় নাই। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভাসের 'কর্ণভার' নাটকে প্রতিদান গ্রহণে অনিচ্ছুক দাতাকর্ণের যেরূপ মহিমোজ্জল মূর্ত্তি দেখা যায় এখানে সেই মূর্ত্তি পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—'উদ্যান'। উদ্যানে চারণীগণের 'গীত' ঘটনার স্বাভাবিক বা অপরিহার্য্য পরিণতি হিসাবে সংযোজিত হয় নাই! 'উদ্যান' ও 'চারণী' উভয়ই যেন অনাবশ্যক আগন্তুক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—(বার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দৃশ্যে) কৃষ্ণের বিশ্বরূপ তথা নারায়ণত্ব প্রমাণিত করা হইয়াছে। কর্ণ-চরিত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় বলিয়া ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি দৃশ্যে উক্ত ঘটনাটিকে রূপ দিতে যাওয়া অমিতব্যয় বলিয়াই মনে হয়। কর্ণ ও নর-নারায়ণকে যুগপৎ লক্ষ্যস্থলে স্থাপন করিতে চেষ্টা করায় এই ত্রুটি দেখা দিয়াছে। এই দৃশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার প্রয়োজনকে অপরিহার্য্য বলা যায় না।

তৃতীয় দৃশ্য—গান্ধারী ও দুর্য্যোধনের কথোপকথনে উভয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। তারপর ভীষ্মের সৈনাপত্য গ্রহণ এবং শিখণ্ডীর মধ্যেই যে ভীষ্মের মৃত্যুবাণ নিহিত সেই বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে—কর্ণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। প্রথমাংশে—দুঃশাসনের সহিত সংলাপে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যাপারে কর্ণের সংশয় এবং ঐকান্তিক যুদ্ধকামনা ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে পদ্মাবতীর সহিত সংলাপে, কর্ণের 'রাধেয়' সত্তাটির তাৎপর্য্য বা গুরুত্ব

প্রকাশিত হইয়াছে। কবচ-কুণ্ডলহীন কর্ণের অভেদ্য বলিতে এখন শুধু 'রাধেয়' পরিচয়টুকু অবশিষ্ট। যে-পর্য্যন্ত কর্ণ 'রাধেয়' সে-পর্য্যন্ত তিনি অজেয়। কর্ণ প্রাণপণে যেন 'রাধেয়'-সত্তাটিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন। পদ্মাবতীর মনের আকাশে সংশয়ের মেঘ বার বার হানা দিয়া বিষাদের অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে; তাঁহার ভয় হয় যে দৈব-দুর্বিপাকে 'রাধেয়' পরিচয় ভাঙিয়া গেলে কর্ণের পতন অনিবার্য্য। পদ্মাবতীর সংশয় এবং আতঙ্ক একটু বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণের জয়-অভিলাষী আত্মপ্রত্যয় এবং পদ্মাবতীর মৃত্যু-আতঙ্কিত সংশয়ের মিশ্রণটুকু চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে।* তৃতীয়াংশে—কৃষ্ণের সহিত কর্ণের সংলাপ এবং কৃষ্ণের মুখে জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ। এই অংশ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে মহাভারতে কৃষ্ণ কর্ণের গৃহে আসেন নাই; কৌরব সভা হইতে ফিরিবার সময় কর্ণকে রথে তুলিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া নির্জ্জনে জন্মরহস্য জানাইয়াছেন। এখানে কর্ণের গৃহেই কৃষ্ণ আসিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, অন্তর্নিহিত কৃষ্ণভক্তি, রাধেয়-সত্তা এবং নবাবিষ্কৃত কৌন্তেয়-সত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংযোগে এই অংশে যে-ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কর্ণে যে-দ্বন্দ্বকরুণ মনঃক্ষোভের রূপটি ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক। এখান হইতেই কর্ণের জীবনে নূতন ও মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের রূপ—কর্ণের ভাষায়—**"মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা**। ধর্ম্ম ও মর্ম্মের দ্বন্দ্বে কর্ণ-চরিত্র খুবই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের কর্ণে ধর্ম্মনিষ্ঠাই প্রবল, 'নর-নারায়ণে'র কর্ণে ধর্ম্ম ও মর্ম্ম উভয়ই প্রতিস্পর্দ্ধার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

তবে যদিও এই দৃশ্যটিকে নাটকের মধ্যমণি বলা যাইতে পারে, তবু কর্ণের জন্ম-পরিচয় আবিষ্কার মুহূর্ত্তে 'রাধেয়'-সত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরও তীব্রভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলে কর্ণ-চরিত্রের প্রাণবত্তা তথা দৃশ্যটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইত।

তৃতীয় অঙ্কের—প্রথম দৃশ্যটি কর্ণের জীবনকে মুখ্য উপস্থাপ্য হিসাবে দেখিলে, অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করা চলে না; যদিও ইহাতে কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা—নারায়ণত্বের মহিমা দ্রৌপদীর মুখে আর একবার কীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-মাহাত্ম্যের ও পরোক্ষভাবে কর্ণের বীরত্বের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। তবু একথা সত্য যে এই দৃশ্য বাদ দিলে নাটকের তেমন কোন অঙ্গহানি ঘটে না।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্ণ যুদ্ধ শিবিরে; স্বগতোক্তিতে যুদ্ধের অগ্রগতি এবং কর্ণের দ্বন্দ্ব বিবৃত হইয়াছে। পদ্মাবতীর সহিত সংলাপে—প্রথমতঃ, জয়দ্রথবধের কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গেই কর্ণের মনে বাসুদেবের নারায়ণত্ব লইয়া যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব আছে তাহা আবার ব্যক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাসন্ন দ্বৈরথ-যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে, পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার স্থলে, কর্ণের মধ্যে মর্ম্মের ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব চমৎকার আবেগের সহিত রূপ দেওয়া হইয়াছে—কর্ণ পদ্মাবতীকে যখন নিজের পরিচয় দিয়াছেন তখন যেন নিজের নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদই দিয়াছেন। কল্পনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তবে শেষ অংশে পদ্মাবতী ও বৃষকেতুর কৃষ্ণভক্তি মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তাহাতে বাসুদেবের নারায়ণত্ব এবং নাটকের পৌরাণিকত্ব যতই বৃদ্ধি লাভ করুক, আতিশয্য দোষের স্পর্শ এড়ানো যায় নাই।

তৃতীয় দৃশ্যে—কর্ণের ট্র্যাজেডি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। কবচ-কুণ্ডলহীন এবং 'রাধেয়'-বর্ম্মহীন কর্ণের অবশিষ্ট রক্ষাকবচ—'একবিঘাতিনী'ও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়—ধনঞ্জয় বধের জন্য সযত্নে রক্ষিত 'একঘ্নী' বাণ, ঘটোৎকচ বধের জন্য প্রযুক্ত হয়। এই দৃশ্যের শেষাংশে বিকর্ণ ও শকুনির আলাপ-প্রলাপ লঘু হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে—কর্ণ বধের আয়োজন করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে কর্ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে ঘটোৎকচের আলাপ-আচরণ হাস্যরসজনক হইয়া পড়ায় পরিস্থিতির গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্যে—পরাজিত যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের সহিত বিজয়ী কর্ণের

সস্নেহ আচরণে, কর্ণের ধর্ম্মের ও মর্ম্মের দ্বন্দ্বটিকেই—দুঃসহ অন্তর্বিক্ষোভকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে এইরূপ পরিস্থিতি আছে বটে কিন্তু সেখানে যুধিষ্ঠিরাদি যেমন উপবিষ্ট নহেন তেমনি কর্ণও ভীষ্মের গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করেন নাই। **দৃশ্যান্তরে**—'একবিঘাতিনীর' জন্য কর্ণের অপেক্ষা—নিগূঢ় দ্বন্দ্ব-ক্ষোভের অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। ঘটোৎকচ বধে দুঃশাসন ও শকুনির উল্লাস হাস্যোদ্দীপক, অর্জ্জুনের শোকাবেগ এবং কৃষ্ণের উল্লাসে দুই বিপরীত ভাব-রসের যে-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। আর অর্জ্জুনের ও কৃষ্ণের সংলাপ দ্বারা কর্ণের অপরাজেয়, বীরত্ব ও খ্যাতি প্রতিফলিত করায়—যথাসময়ে নেতৃ-চরিত্রের মহত্বের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—"অর্জ্জুনকে শোধন করিবার জন্য এত সময় বা স্থান দেওয়ার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। দ্রৌপদীর মুখে বাসুদেবের নারায়ণত্ব এবং কৃষ্ণের মুখে কর্ণের অজেয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে—এবং সমাধিস্থ কৃষ্ণের উক্তিতে কৃষ্ণের পদ্মাবতী প্রীতিও ব্যক্ত হইয়াছে; শেষাংশ নাটকীয় বটে কিন্তু অ-মহাভারতীয়। **দ্বিতীয় দৃশ্যে**—বৃষকেতুর ও পদ্মাবতীর দিব্যোন্মাদ-সদৃশ কৃষ্ণার্তিতে অতি-নাটকীয় উদ্দীপনা ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কল্পনা-প্রসূত। কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধের অবকাশ এই দৃশ্য দ্বারা পূরণ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা বিচার্য্য বিষয়। রণস্থলে রথচক্রগ্রাস এবং ব্রহ্মাস্ত্রের বিস্মরণ—কর্ণের জীবনোপস্থাপনায় প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার দাবি অবশ্যই করিতে পারে, কারণ নিয়তির অনিবার্য্য গতি এবং পুরুষকারের নিষ্ফল সংগ্রামের রূপ ঐ দুইটি ঘটনায় চমৎকাররূপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। 'মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ' ততখানি উদ্ভাসিত করিতে পারে না। **তৃতীয় দৃশ্যে**—'মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণে'র মৃত্যু মুখে আত্ম-বিশ্লেষণ, মহাশূন্যতার জন্য মনঃক্ষোভ, শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ-প্রশস্তি—কর্ণের জন্য বেদনাবোধ—কর্ণের কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার—শেষ মুহূর্তে ভীমের কর্ণ-পরিচয় লাভ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কর্ণের পাদমূলে উপবেশন এবং কর্ণের ভীমের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ

আত্ম-বিবরণ প্রদান প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে। ঘটনার মূলটুকু মহাভারতীয়, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ প্রশস্তি' হইতে আত্ম-বিবরণ দান পর্য্যন্ত—সবই কবি-কল্পিত। তবে ভাব-বিরোধী হয় নাই এই কারণে যে—পাণ্ডবগণ তর্পণকালে কুন্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাইয়া খুবই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চরিত্র বিশ্লেষণ ও বিচার

নর-নারায়ণ নাটকে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা মোট ৩০ (পুরুষ—২৬ ; নারী—৪)। সুতরাং চরিত্রের সংখ্যাও, সাধারণ নিয়ম অনুসারে—অর্থাৎ যেখানেই 'ব্যক্তিত্ব' সেখানেই 'চরিত্র' (ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিও বিশেষ ধরনের চরিত্র) এই নিয়ম অনুসারে সমান বলা যাইতে পারে, যদিও চরিত্র-বিচারে সমালোচকরা সাধারণতঃ উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিরই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। মনে রাখা দরকার চরিত্র-বিচার প্রথমতঃ চরিত্রের **সাধারণ পরিকল্পনার** বিচার এবং দ্বিতীয়তঃ **পরিকল্পনার রূপায়ণের** বিচার। অর্থাৎ, যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাটিকে সার্থকভাবে ব্যক্তি-জীবনের আকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহার বিচার। "কাহিনী যেখানে সামাজিক সেখানে চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা" এবং বিশেষ রূপ সবই কবির নিজের করা ; আর কাহিনী যেখানে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক সেখানে পাত্র-পাত্রীদের সাধারণ পরিকল্পনার রেখা-রূপটি দেওয়া থাকে বটে কিন্তু সেখানেও কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে—অর্থাৎ অনভিব্যক্ত 'সম্ভাবা'কে আবিষ্কার করায়। 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে ...' কবির এই কথাই সেখানে সত্য—বাল্মীকির মনোভূমি যেমন রামের জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যার চেয়েও সত্য তেমনি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক চরিত্রেরও শৈল্পিক জন্মভূমি কবি-মনোভূমি। যে কবির **সংস্কৃতি** (জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা) যত বড় তিনি তত বড় আকারে বা প্রকারে চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপদান

করিতে পারেন। স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল সেই পরিকল্পনাতেই—সেই সুষ্ঠু রূপদানের মধ্যেই অভিব্যক্ত।

কর্ণ (ক) নর-নারায়ণ নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র—'কর্ণ'। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক কর্ণ-চরিত্রকে এখানে নূতন রূপাদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের কর্ণের বাহ্য রূপটি—অর্থাৎ কর্ণের জীবনের তথ্যাদি মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ণের **হৃদয়-মন** গঠনে অনেক পরিমাণে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকে **কর্ণ-চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনা** নিম্নলিখিতরূপ :—

(ক) কর্ণ 'দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষ'। সহজাত কবচ-কুণ্ডল, জ্যোতির্ময় সুন্দর দেহধারী, সত্যবাদী নির্ভীক দেবতারূপী নর হইয়াও **জন্ম-অভিশপ্ত**—'কৌন্তেয়' হওয়া সত্ত্বেও 'রাধেয়' অবশ্য 'কৌন্তেয়' পরিচয় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়কে সমরে বিনাশ করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া 'গো-বধ' জনিত **ঋষি-শাপে** এবং মিথ্যা পরিচয়-জনিত **গুরু-শাপে** অভিশপ্ত।

*(গ) "নারায়ণ নরদেহধারী!—দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর।"—একথা কর্ণ বিশ্বাস করেন না, ইহা তাঁহার কাছে 'অশ্রদ্ধেয় ও মূল্যহীন'।

(ঘ) ধনঞ্জয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম কারণ যাহাই হউক দ্বিতীয় এবং পরবর্তী কারণ—কর্ণের ভাষায়—'দেবেরও অবধ্য আমি'। "জ্বলন্ত সঙ্কল্প সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত, যুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে।" অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধই তাঁহার একমাত্র কামনা, এই যুদ্ধের বিনিময়ে বিশ্বের কর্তৃত্বও তিনি চাহেন না। *সুতরাং কর্ণের যুদ্ধ কামনার বাহিরে আছে ধনঞ্জয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বটে কিন্তু মূলে আছে 'নর-নারায়ণ' বলিয়া কথিত ধনঞ্জয়-বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের 'দেবের অবধ্যত্ব' পরীক্ষা

করার প্রেরণা এবং আরও গভীরে আছে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব, যাচাই করিয়া লইবার নিগূঢ় বাসনা—এক কথায় অন্তরতম প্রদেশে নারায়ণকে পাইবার কামনা। (কর্ণ বাসুদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—তুমি যদি সেই নারায়ণ ... এ-অন্তরে কি আছে আমার সমস্ত অবশ্য জান তুমি, এই যে আমার দেহ আবরণ ... এ তো পারিবে না—কোন মতে পারিবে না, এ-হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য করেছি সর্বস্ব দানপণ। আর এই সত্য আবিষ্কারে আমি জীবন-মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়" (প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য)।

কর্ণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আছে—কৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রবল বিশ্বাস কিন্তু বুদ্ধির স্তরে আছে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বই যুদ্ধ কামনার রূপে—ধনঞ্জয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দুর্যোধনকে কুমন্ত্রণাদান প্রভৃতি আচরণও এই যুদ্ধ কামনার—অর্থাৎ 'নর-নারায়ণ'কে লাভ করিবার গোপন কামনা হইতেই প্রেরিত হইয়াছে। এইভাবে—প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম্ম—অধিকারে ব্যক্তিত্বের যে-দ্বন্দ্ব ও জটিল রূপ, কর্ণে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

(ঙ) 'রাধেয়'—সত্তাটি কর্ণের—'ধর্ম-সত্তা' এবং তদপেক্ষা আরও কিছু বেশী। গুরু-অভিশাপেই, কর্ণ যতক্ষণ 'রাধেয়' ততক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী এবং ততক্ষণ অপরাজেয়। কবচ-কুণ্ডলহীন—'একঘ্নী' হীন কর্ণের শেষ বর্ম রাধেয়ত্ব। একে একে কবচ-কুণ্ডল, 'একঘ্নী' এবং রাধেয়ত্ব সবই অপহৃত হইয়াছে। 'রাধেয়-পরিচয়' যাইবার সময় কর্ণের মর্ম জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে—'রাধেয়'-কর্ণকে কৌন্তেয়-কর্ণে পরিণত করিয়াছে—কর্ণকে ভাঙিয়া 'রাধেয়' ও 'কৌন্তেয়' দুইখণ্ড করিয়া দিয়াছে। একদিকে ধর্ম আর অপর দিকে মর্ম এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কর্ণের জীবনও এক মহা কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

বাস্তবিকই, কর্ণ-চরিত্রের সাধারণ পরিকল্পনাটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এইবার দেখা যাক নাট্যকার চরিত্র-রূপায়ণে কিরূপ দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

'সূচনা'তে দেখা যায়—কর্ণ তাপসের উদ্যত অভিশাপের সম্মুখে নির্ভীকভাবে মাথা পাতিয়া দিয়াছেন, নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিয়াছেন—"মৃগভ্রমে বধিয়াছি ধেনু।" সত্যই প্রাণভয়ে কর্ণ সত্য গোপন করেন নাই—অভিশাপ-ভয়েও তিনি ভীত ন'ন। বাহিরের পরিচয়ে কর্ণ হস্তিনা নগরবাসী এবং কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও এবং ভগবান্ পরশুরামের শিষ্য হইলেও কর্ণের আসল পরিচয় তাঁহার আবির্ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে; তাপসের বিস্মিত বচনেই প্রকাশিত হইয়াছে—"দেহধারী অংশুমালী, সম স্বতেজে স্বরূপ সুপ্রকাশ" অস্তিও সবিস্ময়ে কর্ণের বিস্ময়কর এবং রহস্যময় রূপটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছে—"সহজাত কবচ-কুণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময় সুঠামসুন্দর দেহধারী, সত্যবাদী, নির্ভীক দেবতারূপী নর"। তাপস যেন নিয়তির মত সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টি লইয়াই দেখেন—"এই বিশ্বমাঝে কোন্ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে, পরাজিত করিতে সমরে" কর্ণ গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং "সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তাঁর রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ" কিন্তু কর্ণকে তিনি অভিশাপ দিতে কুণ্ঠিত হন না—অভিশাপ দেন—**তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী**। কর্ণ নির্ব্বেদের সহিত অভিশাপ গ্রহণ করেন। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,—অভিমান করিবেন তিনি কাহার উপর? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে হয়—ব্রাহ্মণ গাভীশোকে আত্মহারা ও মোহাচ্ছন্ন। সুতরাং মোহাচ্ছন্নের অভিশাপে—'বিন্দু-মাত্র ক্ষতি নাহি হবে।' পুরুষকার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মূর্খ ব্রাহ্মণের শাপের প্রলাপে তাঁহার শিক্ষা নিষ্ফল হইবে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন না। শুধু ভাবিতে পারেন না তাহা নহে ব্রাহ্মণের—**সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তাঁর রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ**—এই কথাটিকে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিয়া তিনি উপেক্ষা করেন। কারণ, 'সর্ব্বত্রগ, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন ... সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে' —এই কথা যে বলে সে 'মূর্খ, মুগ্ধ ও ক্ষিপ্ত' ছাড়া আর কি!

ভগবান্ পরশুরাম কর্ণকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার উদ্বেগের কারণ ব্যক্ত করেন—শব্দভেদী বাণ-শিক্ষায় কোন ক্ষত্রিয় যে সুফল লাভ করে নাই তাহার ইতিহাস শোনান।

কর্ণ সেই সব কাহিনী শুনিয়া মলিন ও বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক চেষ্টায় আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ হন। পরশুরাম আনন্দিত চিত্তে কর্ণকে প্রশংসা করেন—বলেন—"কর্ণ! সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্য্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই-শিক্ষা। এ-ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর কেহ হয়নি, হবে না, হ'তে পারে না।" কর্ণ বার বার গুরুকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির আনন্দ ব্যক্ত করেন।

এই পূর্ণ সিদ্ধির মুহূর্তে, নিয়তির চক্র পরশুরামের নিদ্রাবেশ এবং বজ্র-কীটের মূর্তি ধরিয়া আপন গতিপথে অগ্রসর হয়। পরশুরাম কর্ণের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে বজ্রকীট জানুভেদ করিতে থাকে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ যাহাতে না হয় এই জন্য কর্ণ শত বৃশ্চিকের একসঙ্গে দংশন' অচঞ্চল হইয়া সহ্য করেন। কিন্তু রক্তের স্পর্শে পরশুরাম অশুচি বোধ করেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া কর্ণের সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কারণ, ব্রাহ্মণের এত ধৈর্য্য অসম্ভব। কর্ণ সত্য পরিচয় দিয়া বলেন—'আমি সূতপুত্র' এবং 'ভার্গব' পরিচয় দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন। পরশুরামও (তাপসের মতই) কর্ণের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন—"সহজাত কবচ-কুণ্ডল, বিমল আদিত্য-জ্যোতি মুখে, নয়নে গায়ত্রী দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—দেবতার আকাঙ্খিত সৌন্দর্য্য সম্পদ দেহে ধরে জীবন প্রারম্ভ পথে সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন!" কর্ণ করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করেন—সূতপুত্র অপেক্ষা অধিক হীনতা যেন তাঁহার না হয়। পরশুরাম কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করেন না 'কর্ণ' সূতপুত্র। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস 'সূতপুত্র কভু নহ তুমি' (বিঃ দ্রঃ—নাটক হইতে কর্ণের আসল পরিচয় কর্ণ বা পাঠক এ-পর্য্যন্ত কেহই জানেন না, সুতরাং পরশুরামের দৃঢ় ঘোষণা—কৌতূহল জাগায় বটে কিন্তু ইহাতে পরিচয় যিনি জানেন তাঁহার মধ্যে রসাস্বাদন

ঘটিবার যেরূপ সম্ভাবনা, যিনি না জানেন তাঁহার মধ্যে তেমন সম্ভাবনা নাই।)
শেষ পর্য্যন্ত পরশুরামের অভিশাপও বর্ষিত হয়—

সত্যই যদি হীন সূতপুত্রের শোণিতে
অশুচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে
নহে—দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগৎ কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে
তোমারে করেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কটকালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।"

ইহাও কম তীব্র অভিশাপ নহে। তবে কর্ণের বিষাদ বিপুল হর্ষে পরিণত হয়, কারণ কর্ণ জানেন—'সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।' *(কিন্তু এখানেও বক্তব্য এই যে কর্ণ যে আসলে সূতপুত্র ন'ন—এই জ্ঞান পাঠক ও দর্শকের থাকা দরকার; না থাকিলে—অভিশাপের শোচনা তেমন জন্মিতে পারে না। নাট্যকার কর্ণের জন্ম-রহস্য ব্যক্ত করিবার সুযোগ পান নাই বা সুযোগ করিয়া লইতে চাহেন নাই। কারণ, তিনি রহস্যটি পরে 'আবিষ্কার' করিতে তথা 'discovery of the unknown' জনিত আনন্দ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন! এইরূপ ক্ষেত্রে এই রীতি কতখানি সফল হয় বা হইয়াছে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।)

দেখা যাইতেছে কর্ণের 'পশ্চাতের আমি'তে আছে—(ক) ধনঞ্জয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (খ) 'নারায়ণ নরদেহধারী দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর'—এই সত্যের প্রতি অবিশ্বাস, (গ) সহজ কবচ-কুণ্ডলধারী; সুতরাং দেবতারও অজেয়—এই অভিমান, (ঘ) 'গো-বধ' জনিত অভিশাপের স্মৃতি, (ঙ) গুরু-অভিশাপের স্মৃতি এবং তদনুপাতী 'রাধেয়'—পরিচয়ের প্রতি প্রসক্তি।

এই 'পশ্চাতের-আমি'-যুক্ত কর্ণকে প্রথমেই হস্তিনার সভামণ্ডপে—

'দুর্য্যোধন-সখা' রূপে দেখা যায়। নর-নারায়ণত্বে-অবিশ্বাসী কর্ণ ভীষ্মের উক্তি—"ধনঞ্জয়-বাসুদেব —মায়াভিমানব

পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ

এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে"—শুনিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করেন : "নর-নারায়ণ—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন ... প্রলাপবাক্য।" ভীষ্ম কর্ণকে—'হীনজাতি সূতপুত্র' বলিয়া তিরস্কার করেন বটে কিন্তু কর্ণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচনা দান করেন।

'দুর্ম্মতি সূতপুত্র'... কর্ণের আত্মশ্লাঘাকে ভীষ্ম আঘাত করেন—পাণ্ডবদের শক্তির প্রশংসা করিয়া এবং (গো-গ্রহণে ও ঘোষ যাত্রা পূর্ব্বঅধ্যায়ে বর্ণিত)কর্ণের কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া। বাক্‌যুদ্ধে কর্ণও পশ্চাৎপদ হন না। নাট্যকার কর্ণের কাপুরুষতাকে অ-মহাভারতীয় যুক্তির দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন গো-গ্রহণের ব্যাপারে কর্ণ নারীবেশী বৃহন্নলার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, আর ঘোষ যাত্রায় গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করেন নাই—'নারীহত্যা'র ভয়ে—অর্থাৎ গো-হত্যার উপর নারীহত্যা করিয়া কর্ণ আর পাপবৃদ্ধি করিতে চাহেন নাই। কর্ণের যুদ্ধ কামনা যেন আত্মশ্লাঘারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দুর্য্যোধন যখন বলেন 'বিনা যুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে', কর্ণ তখন "সাধুবাদ দ্বারা দুর্য্যোধনকে উৎসাহ তথা যুদ্ধের প্ররোচনা দান করেন'। বীরদর্পে কর্ণ মুখর—'সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে। অর্জ্জুনের বধের ভার লইলাম আমি।" অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বীর কীর্ত্তি লাভ করিতে উৎসাহিত কিন্তু ভীষ্মের তিরস্কারে—"ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। ওরে হীন সূতপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কার কাছে? (কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ?—মহাভারত), কর্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিহার করেন—প্রতিজ্ঞা করেন—'যতদিন জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়, কেহ না দেখিবে, দাঁড়াইতে রণাঙ্গণে। যেদিন সমরে পড়িবে

পিতামহ। সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ ॥" এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া—দানব্রত গ্রহণ করেন।—"দেব, নর, দ্বিজ, দ্বিজেতর—যে কেহ প্রার্থী আসিয়া আমার বাসে, যে বস্তু করিবে ভিক্ষা থাকিতে আমার দেয়, না করিব নিরস্ত তাহারে ॥" (মহাভারতে এখানে কোন ব্রত গ্রহণের কথা নাই এবং কর্ণের দানব্রতের সহিত অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্পেরও কোন যোগ নাই। কর্ণ স্বভাব-দাতা এবং তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব) গুরু-অভিশাপের স্মৃতি জাগিয়া যায়—রাধেয়-পরিচয়ই যে কর্ণের অন্যতম রক্ষা-কবচ। যতক্ষণ তিনি 'রায়েয়' ততক্ষণ তিনি অপরাজেয়—ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী তাই কর্ণ 'সূতপুত্র' তিরস্কারে গর্ব্ব অনুভবই করেন এবং সেই অভিমানেই 'সর্ব্ব-সভাস্থ মণ্ডলী'কে জানাইয়া দেন—'সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন। সত্য যদি অধিরথ পিতা ...... এই সূতপুত্র-কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই ॥ তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ ॥" [**নর-নারায়ণে—অবিশ্বাস + অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা + 'গুরু-অভিশাপ'—স্মৃতির প্রেরণায় 'রাধেয়'-অভিমান ও আত্মশ্লাঘা**—এই তিন প্রবণতা প্রদর্শিত হইয়াছে।]

বাসুদেব—নারায়ণ,—'ধনঞ্জয়-বাসুদেব—নর-নারায়ণ'—কর্ণ একথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ দূত হইয়া হস্তিনায় আসিতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া কর্ণের মধ্যে, অন্তরাত্মার বা মর্ম্মের নারায়ণ-প্রবণতা—'বিশ্বাস' এবং বুদ্ধির 'অবিশ্বাস' মিলিয়া একটি মহান্দোলন উপস্থিত হয়। 'বুদ্ধির 'যদি' যদিও লোপ পায় না—"বাসুদেব! তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়—ওই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে বিরাট পশিয়া করে লীলা"—তবু কর্ণের হৃদয় কিন্তু নারায়ণদর্শন-পরায়ণ। কর্ণের স্থির বিশ্বাস কোন দেহ-আবরণই, হৃদয়ে নারায়ণ দর্শনে বাধা দিতে পারিবে না। কর্ণের গভীর ও গোপন বাসনা প্রকাশ পায়—এখানেই তাঁহার **'দানব্রত' গ্রহণের এবং অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিগূঢ় কারণটি** জানা যায়। কর্ণ ব্যক্ত করেন—**এই সত্য আবিষ্কারের জন্য করেছি সর্ব্বস্ব দানপণ। এই সত্য আবিষ্কারে**

আমি জীবন-মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়। অর্থাৎ, কর্ণ অন্তরের নারায়ণপরায়ণতা বশেই যেন অর্জ্জুনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন (বিঃ দ্রঃ—আগের অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণা হইতে ; এখনকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎস আরও গভীরে—নর-নারায়ণের সাক্ষাৎকারের আবেগই ইহার উৎস।) যুদ্ধ দ্বারাই তিনি সত্য আবিষ্কার করিতে চাহেন। কর্ণ 'দেবেরও অবধ্য'। সুতরাং মায়া-মনুষ্য-নারায়ণেরও অবধ্য। সেই 'কবচ-কুণ্ডলধারী রাধার নন্দন' কর্ণ যদি বাসুদেব সখা অর্জ্জুনের বাণে মরেন, তবেই তিনি বুঝিবেন বাসুদেব নারায়ণ॥ যুদ্ধ দ্বারাই তিনি ধনঞ্জয় বাসুদেবের নর-নারায়ণত্ব যাচাই করিয়া লইতে চাহেন। [নারায়ণ কামনাই ধনঞ্জয় তথা বাসুদেব-বিরোধিতা রূপে প্রকাশিত।]

কৃষ্ণের আগমন-পরীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত। এই আনন্দ, স্ত্রী পদ্মাবতীর কাছে ব্যক্ত করিতে করিতে কর্ণ 'নিরুত্তর' ও শূন্যদৃষ্টি 'অন্যমনা' হইয়া পড়েন। কর্ণ পদ্মাবতীকে আজ সব গোপন কথা শুনাইতে প্রস্তুত।

পদ্মাবতীর একটি কৌতূহল অতুল শক্তিধর কর্ণ বর্ত্তমানে দীন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয় পাঞ্চালীকে কিভাবে লাভ করিল। কর্ণ পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সভার ঘটনা—সঙ্গে জন্ম-অভিশাপ-জনিত বেদনাও ব্যক্ত করেন॥ পদ্মাবতীর দ্বিতীয় কৌতূহল সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা বিষয়ে। কর্ণ স্বীকার করেন—"সমগ্র জগৎবাসী কভু করিবে না আমার সে কার্য্য সমর্থন—করিবে না—করিতে পারে না" সে এক অশুভ দিন। কর্ণ অন্যায় কাজের জন্য অনুতাপ (মহত্ত্বও বটে) প্রকাশ করেন। কিন্তু পদ্মাবতীর কাছে কর্ণের মন্তব্য অত্যন্ত নিগূঢ় ... অন্তরের কথা। এবং "সেই অন্তরের কথা—যেদিন দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিধন করিব আমি তৃতীয় পাণ্ডবে, সেদিন জানিব পদ্মাবতী অস্ত্রশিক্ষা সফল আমার।" পদ্মাবতী কর্ণের এই অর্জ্জুন-বিদ্বেষের নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারেন না. প্রশ্ন করেন—'কি হেতু জন্মিল প্রভু এমন বিদ্বেষ।' কর্ণ জানান—বিদ্বেষ কিছুই নাই, ধনঞ্জয়কে অন্তরে অন্তরে তিনি বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করেন। শুধু শ্রদ্ধাই নয়, ধনঞ্জয়কে

দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে প্রীতি জাগে। কৌন্তেয়-সত্তা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু তবু অর্জ্জুনের সহিত শক্তি-পরীক্ষা তাঁহাকে করিতেই হইবে—'দেবেরও অবধ্য'—ইহা সত্য কিনা সে পরীক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে—যুদ্ধ কামনার কারণ কর্ণ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"দেবেরও অবধ্য আমি। জ্বলন্ত সঙ্কল্প সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত বুঝিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে॥" ইহার অধিক ভাগ্য তিনি চাহেন না—এই শক্তি পরীক্ষার বিনিময়ে তিনি বিশ্বের কর্তৃত্বও কামনা করেন না। যুদ্ধের প্রলোভন তাঁহার ঐকান্তিক। সেইজন্য কর্ণ দুর্যোধনকে যুদ্ধের প্ররোচনা দেন—জীবিত থাকিতে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও দিতে দিবেন না। ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ তাঁহার অবশ্যই চাই—কারণ 'পশ্চাতে তাঁহার'—বাসুদেব।—'অতি-অশ্রদ্ধেয় বাণী' বলিয়া কর্ণ হাসিয়া উড়াইতে চাহেন বটে, কিন্তু পদ্মাবতী যে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, সত্যবাদী পিতামহ এবং সর্ব্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়ের নিকট ঐ বার্ত্তা শুনিয়াছেন! অবিশ্বাসের কোটি হইতে মন বিশ্বাসের কোটির দিকে অগ্রসর হয়। কর্ণের নিগূঢ় কামনাটুকু ব্যক্ত হয়—"দ্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে ...... বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধে করিব আহ্বান।" কারণ, 'ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ' ইহা কর্ণ সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া বিশ্বাস করেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহার মন দ্বিধাগ্রস্ত; তাঁহারা নর-নারায়ণ কিনা যুদ্ধ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে জাগে পরশুরামের অভিশাপের স্মৃতি—যতক্ষণ তিনি রাধেয় ততক্ষণ 'দেবেরও অবধ্য' তিনি। ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ হইলেও কর্ণ নর-নারায়ণকেও পরাস্ত করিবার আশা রাখেন। অবচেতন মন হইতে তাই বার বার সন্দেহের বুদ্‌বুদ্ জাগে—"সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন।" [পদ্মাবতী কর্ণের এই উক্তিকে 'সহসা জাগিয়া ওঠা' ...... সন্দেহ বলিলেও ইহাকে 'সন্দেহ' না বলিয়া অভিশাপের স্মৃতি হইতে উদ্গত—, অবধ্যত্বের অভিমান বলাই যেন ঠিক। কারণ, 'রাধেয়'-পরিচয় লইয়া সন্দেহ তাঁহার মনে এ-পর্য্যন্ত জাগে নাই।]

কর্ণ বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ের সহিত জীবন-মরণ যুদ্ধ কামনা করেন। সুতরাং সন্ধির প্রস্তাবকে তিনি আশঙ্কার চোখেই দেখেন। তাই তাঁহার ভবনে 'দুর্যোধন-দুঃশাসন-শকুনি'র আগমন সংবাদ শুনিয়া কর্ণ ভাবিত হইয়া পড়েন— "বাধা কি পড়িল যুদ্ধে?—অন্ধরাজা মোর অসাক্ষাতে পাণ্ডবে কি তবে অর্দ্ধ-রাজ্য দান করিল স্বীকার।" এই শঙ্কিত প্রশ্নই মনে জাগে। দুর্যোধন সমর-সঙ্কল্পে অটল জানিয়া কর্ণ নিশ্চিত হন এবং কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া হস্তিনার কারাগারে আবদ্ধ করিবার তথা যুদ্ধকে অনিবার্য করিবার পরামর্শ দেন। দুর্যোধন আগেই বন্ধনের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন,—কর্ণের পরামর্শ একরূপ লুফিয়াই ল'ন আর কর্ণও চিরকাম্য যুদ্ধের পথ প্রস্তুত করিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হন॥ কিন্তু অন্য চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া বসে—কৃষ্ণের এ কী দুঃসাহস! দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি তদুপরি দুর্মতি। এ-সমস্ত জানিয়াও কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে একাকী আসিয়াছেন। "এ-সাহস যার—হয় সে নিতান্তই জড় না-হয় নর-নারায়ণ॥" ইহারও গভীরে—কৃষ্ণের বাণী শুনিতে পাইবেন না—কৃষ্ণের রূপ দেখিতে পারিবেন না—এজন্য কর্ণের মনে আক্ষেপ জন্মে; তবে সান্ত্বনা লাভ করেন এই মনে করিয়া যে বাসুদেব যদি অন্তর্য্যামী হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা তিনি অবগত হইবেন।—বলিতে বলিতে কর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করেন। দেখেন তাঁহার "চারিদিকে—জ্যোতির উৎসব" চলিতেছে; তাঁহার মধ্যে বাসুদেবের নবীন-নীরোদ শ্যাম আয়তলোচন কিশোর মূর্ত্তি। এখন কর্ণের অন্তরতম সত্তা—কৃষ্ণপরায়ণ-সত্তাটি জাগ্রত। সজ্ঞান মন-বুদ্ধির নিদ্রাবকাশে, অন্তরতম বিশ্বাসী সত্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"কে বাঁধিবে? কে বেঁধেছে কবে?" কর্ণ 'বুদ্ধি' অধিকারে স্বীকার না করিলেও, 'মর্ম্ম'-অধিকারে বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন। (কৃষ্ণ দর্শনের কালব্যাপ্তিখুবই সামান্য) তবে কর্ণ শুধু বাসুদেবকেই দেখেন না; এ-স্বপ্নালোকে, স্বপ্নচোখে সূর্য্যকেও দেখেন—স্বপ্নকর্ণে সূর্য্যের কথাও শোনেন—স্বপ্নমুখে সূর্য্যের সহিত কথাবার্তাও বলেন। সূর্য্য কর্ণকে স্নেহ ও মায়াবশে সাবধান করিতে

আবির্ভূত হন—সাবধান করিয়া বলেন—"যদি জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ-সমরে, প্রতিযোদ্ধা অর্জ্জুনে করিতে পরাজয় ...... দিয়ো না বাসবে ওই কবচ-কুণ্ডল।" কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ণের কাছে—দাতাকর্ণের কাছে—প্রাণের ও মানের অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। ব্রতভঙ্গ করিয়া, সত্যের আশ্রয়চ্যুত হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে চাহেন না—এমনকি অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার চিরবাঞ্ছিত গৌরব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কর্ণ মনে করেন ইষ্ট সবিতা স্নেহবশেই বোধ হয় সতর্ক করিতে আসিয়াছেন কিন্তু সূর্য্য যখন বলেন—"হে সন্তান, মায়াবশে", কর্ণের বিস্ময় ও কৌতূহলের অবধি থাকে না! কর্ণ 'দৈবকৃত রহস্য' জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। কিন্তু রহস্য শুনানো হয় না; কর্ণ জাগিয়া উঠেন—পদ্মাবতীকে 'বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ'কে খুঁজিয়া দেখিতে বলেন—তাঁহার ব্যাকুলতা যায় না। দ্বিজবেশী সবিতার উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনা জানান—"হে সবিতা রহস্য শুনায়ে যাও মোরে॥" পদ্মাবতী দ্বিজবেশী ইন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করেন (পূর্ব্বের কৌতূহল অকস্মাৎ প্রশমিত)। ইন্দ্র কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করেন—কর্ণ কবচ-কুণ্ডলের বিনিময়ে সুবর্ণ, প্রমদা, ধেনু, সাম্রাজ্য পৃথিবী সব দিতে চাহেন। কিন্তু ইন্দ্র কবচ-কুণ্ডল ছাড়া আর কিছুই লইবেন না। অগত্যা কর্ণ 'ছুরিকাযোগে কবচ-কুণ্ডল ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান' করেন। ইন্দ্র দাতাকর্ণের মহত্ত্ব দেখিয়া শ্রদ্ধায় অবনত হন এবং 'একঘ্ন' অস্ত্র দান করিয়া প্রস্থান করেন। * [কর্ণ-চরিত্র-চিত্রণে এইখানে যে ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা এই যে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে পরিক্রমণের সন্ধিস্থল যেরূপ মানসিক অবস্থা প্রত্যাশিত তাহা পাওয়া যায় না। স্বপ্নের আরম্ভ বাসুদেব-দর্শনে, সামান্য একটু ক্ষণের বাসুদেব-দর্শনের পরেই সূর্য্য-দর্শন আর সূর্য্য-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বাসুদেব-দর্শনের প্রতিক্রিয়া শুরু; আবার সূর্য্য-দর্শনের পরেই জাগ্রত অবস্থায় দ্বিজবেশী ইন্দ্রের সহিত কথোপকথন এবং স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া অস্তমিত। পরেও ইহা লইয়া তেমন কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় নাই।]

শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া নারায়ণের অলৌকিক মহিমা

দেখাইয়া সভা হইতে বিদায় লইলে দুর্য্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং ভীষ্মকে সেনাপতি-পদে বরণ করেন। প্রশ্ন উঠে কে কতদিনে পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী নাশ করিতে পারিবেন? ভীষ্মের উত্তর—একমাসে, দ্রোণেরও একই উত্তর। কৃপাচার্য্য পারিবেন—দুই মাসে, অশ্বত্থামা পারিবেন—দশদিনে। কর্ণ বলেন—তিনি পারিবেন পাঁচদিনে। কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনিয়া ভীষ্ম উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং কর্ণকে তিরস্কার করেন—অবশ্য কর্ণের আত্মশ্লাঘা বন্ধ হয় না—'একঘ্ন' বাণের সংহার-শক্তির দম্ভে, কর্ণ মুখর হইয়া উঠেন।

ওদিকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পরে সকলেই চিন্তিত। চিন্তিত দুঃশাসনকে কর্ণ বুঝাইয়া দেন—বিশ্বরূপ প্রদর্শন নিপুণ বাজীকরের মোহিনী-মায়ামাত্র;—ভীষ্ম ও বিদুর পূর্ব হইতেই সম্মোহিত; কৃষ্ণ যাহা দেখিতে বলিয়াছিলেন তাহাই দেখিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ—'যা শুনেছেন কানে' অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাই করেছেন দর্শন। কর্ণের ভয়—অদর্শন অবকাশে যদি সন্ধি করে ফেলে রাজা।

দুঃশাসন চলিয়া গেলে কর্ণ বিষণ্ণা পদ্মাবতীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন এবং দেবেন্দ্রকে ধিক্কার দিতে নিষেধ করেন, কারণ দেবেন্দ্র কবচ-কুণ্ডল হরণ করিয়া কর্ণকে একরূপ দয়াই করিয়াছেন—একটি মর্ম্মপীড়ক অশান্তি হরণ করিয়া লইয়াছেন—'নিভৃত চিন্তার এক নিষ্ঠুর প্রহার' হইতে কর্ণকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এই নিভৃত চিন্তা—'সেই চিরঘৃণ্য রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু ... দেবতাদুর্লভ এই দান?' সহজাত কবচ-কুণ্ডল লইয়া অর্জ্জুনকে বধ করিলে অভিজাতেরা চীৎকার করিত—"হীন সূতপুত্র বধেনি অর্জ্জুনে। বধেছে তাহার ঐ কবচ-কুণ্ডল?" এখন আর সে-কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কর্ণ এখন পুরুষকার-সর্বস্ব। যতক্ষণ 'রাধেয়' উপাধির অধিকারী—পরশুরাম-শিষ্য কর্ণকে পরাজিত করিবে কে? পদ্মাবতীকে কর্ণ উল্লাস করিতে বলেন, কর্ণের গৃহিনীর মুখে বিষাদ মানায় না। কিন্তু পদ্মাবতীর মনের সংশয় কাটে না। পরাজয়ের সংশয়? পরাজয় হইবে—কর্ণ সে-কথা ভাবিতেই পারেন না। সুতরাং পদ্মাবতীর সংশয়ের কারণ খুঁজিয়া পান না। মনে সংশয় আসিলে পদ্মাবতী যেন তখনই শুনাইয়

দেন ... "স্বামী মোর মহীয়সী রাধার নন্দন।" পদ্মাবতী খুলিয়াই বলেন, অনেকটা দিব্য-দৃষ্টি লইয়াই বলেন—'মনে হয় সংশয়ের মূল যেন নিহিত রয়েছে ... তোমার **রাধেয় পরিচয়ে**। মনে হয় ওই পরিচয়-গর্ভে তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিহিত।' কর্ণ পদ্মাবতীর কথা স্বীকার করেন আর স্বীকার করেন "যত কিছু শক্তি মোর সমস্ত ওই 'রাধেয়' সংজ্ঞায়।" পদ্মাবতীর মনে 'তবে কি'—অর্থাৎ তবে কি তুমি 'রাধেয়' নও—এই প্রশ্ন জাগিতেই কর্ণের মাতৃস্নেহাতুর রাধার অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের কথা মনে জাগে—পদ্মাবতীকে রাধেয়-পরিচয়ে সন্দেহ—মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে বলেন—বলেন—'নারীশিরোমণি রাধা জননী আমার।'

এই সময়েই অন্তর্য্যামী নারায়ণ কৃষ্ণ কর্ণের সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হন, পরোক্ষভাবে কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াই সম্বোধন করেন—বৃষকেতুকে পাঠাইয়া পদ্মাবতীকে সংবাদ দিতে বলেন—'বল তারে এসেছে তাহার ঘরে। বিনা নিমন্ত্রণে **তার নারায়ণ**'। কর্ণ মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণকে 'দিব্য' পুরুষ বলিয়াই মানেন কিন্তু কৃষ্ণ কর্ণকে 'আর্য্য' সম্বোধন করিয়া নমস্কার জানাইলে কর্ণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং মনে করেন—ঐন্দ্রজালিক কৃষ্ণ তাঁহাকে ঐভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে চাহেন! তাই তিনি দৃঢ়ভাবেই তাঁহার 'রাধেয়' পরিচয় ঘোষণা করেন।

কৃষ্ণ জানাইয়া দেন—কর্ণ রাধার নন্দন নহেন। এই কথা শুনিয়াই কর্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু অবিশ্বাস যে করিবেন তাহারও উপায় নাই—কথা যে 'সত্য-আবির্ভাব' কৃষ্ণের কথা। আর সে-কথা ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি লইয়া কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—কর্ণকে সকলের বধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কথা শুনিয়া কর্ণ বসিয়া পড়েন, কৃষ্ণের মুখ হইতে আর একবার তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহেন; কৃষ্ণ জন্ম-রহস্য ব্যক্ত করিতেই কর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহল-কাতর প্রশ্ন করেন—আর্ত্তনাদের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন—'জানিয়া পরম শত্রু মোরে বধিতে কি এলে কৃষ্ণ?' গাণ্ডীবীর বাণের চেয়েও যে এই পরিচয়-কথা সুতীক্ষ্ণ ও মর্ম্মান্তিক। কৃষ্ণ কর্ণের সম্মুখে—সিংহাসনের এবং

পাণ্ডবদের সেবার প্রলোভন তুলিয়া ধরেন। প্রতিদানে কর্ণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, স্নেহবশে শ্রীঅধর চুম্বন করেন এবং নরোত্তম কৃষ্ণকে তাঁহার প্রকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন—একটি অনুরোধও জানান—'যতদিন নাহি মরি আমি, এ-নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তাঁরে', কারণ যুধিষ্ঠির একথা শুনিলেই গলবস্ত্রে পূজা করিতে ছুটিয়া আসিবেন—যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। আর তাহা না হইলে কর্ণের সঙ্কল্প চূর্ণ হইয়া যাইবে।' কর্ণের মধ্যে আবার 'রাধেয়' অভিমান প্রবল হয়। 'কৌন্তেয়' বলিয়া আহ্বান করিতে কৃষ্ণকে নিষেধ করেন। অভিমানের ক্ষোভে কর্ণের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—পৃথিবী রসাতলে চলিয়া গেলেও তাঁহার কোন চিন্তা নাই। বরং তাহাই তিনি চাহেন। কৃষ্ণ মনঃক্ষোভের কথা বলিলে কর্ণ কৃষ্ণের কাছে সেই মনঃক্ষোভের স্বরূপটি এবং ক্ষোভের তীব্রতার মাত্রা জানিতে চাহেন তারপর বুঝাইতে চাহেন তাঁহার মনঃক্ষোভের সহিত তুলনা হইতে পারে এমন মনঃক্ষোভ কোথাও নাই। এমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন কে কবে হইয়াছে 'স্বর্গ-মূল্যহীন করা' কৃষ্ণের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি অশক্ত ; যে অর্জ্জুনকে প্রতিযোদ্ধাজ্ঞানে এতকাল নিধন করিতে চাহিয়াছেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই অর্জ্জুন তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। মুগ্ধ আলিঙ্গনে যাহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন সেই প্রাণাধিক ধনঞ্জয়ে মর্ম্মহীন শরে বিঁধিতে হইবে। কর্ণের জীবনে মর্ম্মের, সত্যের এবং মনুষ্যত্বের জটিল দ্বন্দ্ব উপস্থিত।—"**মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।**

*   *   *   *

অজেয় মহাবীর ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইয়াছেন। কর্ণের মনে চিন্তা—"ভীষ্ম যাহা পারিলেন না, দ্রোণ যাহা পারিবেন না, সেই কার্য্য—অর্জ্জুন-বিনাশ—আমি কি পারিব ?" রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বুঝাপড়া চলে। কৌন্তেয়ের যত দুর্ব্বলতা, রাধেয়ের তত সঙ্কল্প—অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের রক্তের সম্পর্ক—তবু তিনি অর্জ্জুন-বিনাশে সমর্থ

হইবেন। তিনি যে হীন সূতপুত্র—রাধেয়। বালক অভিমন্যুকে—পুত্রকে, যদি তিনি বধ করিতে পারিয়া থাকেন—অভিমন্যুর পিতা অর্জ্জুনকেও পারিবেন। কর্ণ কৌন্তেয়ের দুর্ব্বলতা জয় করিবার জন্য রাধেয় সত্তাটিকে উত্তেজিত রাখিতে চেষ্টা করেন—অর্জ্জুনকে অভিজাত রাজপুত্র বলিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক মুছিয়া ফেলেন এবং অর্জ্জুন বধের জন্য সংকল্পকে একাগ্র করিয়া তুলেন।

এই চিন্তা ছাড়া আর একটা ঘটনাও কর্ণের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনাটি "জয়দ্রথ-বধ"। আশ্চর্য্যকর এবং অলৌকিক ব্যাপার—বাসুদেবের নারায়ণত্ব-জ্ঞাপক ঘটনাই বটে—'সূর্য্য ঢেকেছিল সুদর্শন।' এই কারণেই কর্ণের মুখ "বড়ই গম্ভীর হইয়াছিল।" কিন্তু তবু কর্ণ কেশবকে নর বলিয়াই মনে করেন এবং বলেন—"**সত্য যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি ক'রি ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব বাসুদেবে।**" তবে স্বীকার করেন—'আসে নাই আর—**এই পূর্ণ মানবত্ব**"। স্ত্রীর সহিত পরিহাস ছলে কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করেন—(বুদ্ধির বাধা এবং মর্ম্মের সহজ প্রবণতার মধ্যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের চমৎকার নিদর্শন)।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন হইতে কৌরবের মরণ চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করে—কর্ণ বুঝিতে পারেন—জয়দ্রথকে বধ করিয়া অর্জ্জুন কর্ণকেই অনুসন্ধান করিতেছেন। পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে নিজের গোপন আকাঙ্খাও ব্যক্ত করেন,—'তোমার সেই ইষ্ট নারায়ণে—যদি আজ প্রাণ মোর দিই উপহার ......।' কর্ণের পরাজয় পদ্মাবতী যেমন কল্পনা করিতে পারেন না, কর্ণ নিজেও পারেন না। কিন্তু—সকলের উপরে—যে নিয়তি, "**নিয়তির কার্য্য কোন কালে হয় নাই, মানবের কল্পনা-চালিত।**"

এদিকে নিজের মৃত্যু যেমন অকল্পনীয়, তেমনি অন্যদিকে ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর কল্পনা কর্ণের কাছে বেদনাদায়ক। প্রহেলিকার মত শুনাইলেও—তিনি পদ্মাবতীকে অজস্র অশ্রুর ধারায় কৌন্তেয়ের তর্পণ করিতে বলেন। প্রহেলিকা কি শুধু ইহাই? এক-বিঘাতিনী শক্তি লাভ করিবার দিন হইতেই কর্ণ

রাত্রিকালে মনে করেন—'এই অস্ত্র সঙ্গে ল'য়ে যাব রণস্থলে' কিন্তু আশ্চর্য্যেরই ব্যাপার—শয্যাত্যাগকালে যেই তিনি ইষ্টকে স্মরণ করেন, অমনি কেশব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ান এবং সঙ্কল্প হারাইয়া যায়—"অস্ত্র-কথা মুছে যায় স্মৃতি হ'তে।" এই কারণে আজ কর্ণ আগে হইতেই বক্ষের পঞ্জরের সঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অর্জ্জুন-বধ—অনিবার্য্য। এক-বিঘাতিনী থাকিতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার সাধ্য কেশবেরও নাই। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে কর্ণের মুখেও হাসি দেখা দেয়—যাঁহার বিরুদ্ধে এত আয়োজন সেই ধনঞ্জয় যে তাঁহার সোদর! পদ্মাবতীকে তিনি জানাইয়া দেন—'ধনঞ্জয় দেবর তোমার'—তিনি 'রাধেয়' ন'ন--'কৌন্তেয়'।

পত্নীর নিকট হইতে কর্ণ বিদায় গ্রহণ করেন—ধনঞ্জয়-বধের সঙ্কল্প লইয়া। কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে—দুর্য্যোধনের অনুরোধে 'ঘটোৎকচ'কে বধ করিতেই একঘ্ন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। কৃষ্ণের চক্রান্তে কর্ণের শেষ সম্বলটুকুও এইভাবে হাতছাড়া হইয়া যায়।

এদিকে কুরুক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে—কর্ণের জীবনে সুখ-দুঃখের নূতন এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ণ যুধিষ্ঠির—ভীম—নকুল—সহদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে চারিভ্রাতা নতমস্তকে উপবিষ্ট। চারিভ্রাতাকে কাছে পাইয়া কৌন্তেয়-কর্ণ মনে মনে আনন্দিত। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহাদবকে একে একে স্নেহগর্ভ তিরস্কারে বিদায় দিয়া বৃথাগর্বী ভীমকে পূর্ব্বের দুর্বাক্যের কথা স্মরণ করাইয়া ভীমের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ করেন এবং ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা দেন এবং শেষ-পর্য্যন্ত স্নেহবশে—ভীমের গণ্ডে চুম্বন করেন। নত মস্তকে ভীম প্রস্থান করিলে —কর্ণের হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হইতে থাকে। কর্ণ 'মা! মা!' বলিয়া আর্তনাদ করেন—রাধাকে স্মরণ করিয়া 'কৌন্তেয়-সত্তাকে' বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু রাধার স্থলে কুন্তী-মূর্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—নিয়তিরূপা—মৃত্যুরূপা কুন্তী মাতার স্থান অধিকার করে।

ঘটোৎকচকে বধ করিতে কর্ণ 'এক-বিঘাতিনী' প্রয়োগ করিয়াছেন—'শৈল-বিদারণ-শক্তিধারী' এক-বিঘাতিনীকে তিনি বল্মীকের পিণ্ড চূর্ণ করিতে নিয়োগ করিয়াছেন। কর্ণের সম্মুখে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার। কর্ণের মনে হয়—দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুন হাসিতেছে—ঘটোৎকচের মত তৃণ উৎপাটিত করিতে বজ্রবাহু ক্ষত করিতে, দেখিয়া হাসিতেছে। কর্ণের অজ্ঞাতসারে চোখ সজল হয়। এ-অশ্রু বিষাদের অশ্রু নয়—আনন্দেরই অশ্রু। কর্ণ অর্জ্জুনের অন্তরালে অপূর্ব্ব দুইটি করুণাপূর্ণ আঁখি—যুগযুগান্তের আত্মীয়তা-উদ্ভাসক আঁখি—মধুভরা সম্পর্কের ইতিহাস-বলা আঁখি দেখিতে পান—বুঝিতে পারেন, তাঁহারই 'কাঁদানো পরশ' তাহাকে বিকল করিয়াছে। কর্ণ উল্লসিত হইতে চেষ্টা করেন।

কর্ণের জীবন সমাপ্তির শেষ রেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অর্জ্জুনের ইত যুদ্ধের—কর্ণের রথ মগ্ন হইয়াছে—নাগাস্ত্র সহ। শক্তি-অর্জ্জুনকে বধ করিবার যত উদ্যম—সব ব্যর্থ হইয়াছে,—'মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ' মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন।—কর্ণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বাসুদেবের কীর্তি স্মরণ করেন। কপিধ্বজ রথকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া বাসুদেব সখার জীবন রক্ষা করিয়াছেন—কর্ণের সমস্ত শর-শক্তি নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন ; **আর তো বাসুদেবকে মানব বলা চলে না।** কর্ণের মনে প্রশ্ন জাগে—কে আমি ? কিরূপ আমি ?···কেন ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া আমারে করিল মৃত্যুগ্রাস ? কর্ণ বুঝিতে পারেন—জন্ম—জন্ম—'একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল ওইখানে।' মৃত্যু আসিয়াও কর্ণের 'জন্মের লাঞ্ছনা-স্মৃতি' মুছাইতে পারিতেছে না। কর্ণের চারিদিকে—বিরাট শূন্য। এই বিরাট অসহ স্তব্ধ শূন্যকে দূর করিবার জন্য বাসুদেবের জন্য কাতর আহ্বান জানান।

কর্ণের অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণের চোখেও জল আসে। এই চোখের জল বীরত্বের অভিমানী কর্ণের মরণের জন্য নয়—"পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে আঁখি" ; কারণ "আজি দাতাকর্ণ চলে যায় নিঃস্ব ক'রে তারে।" কর্ণ একদিকে

কৃষ্ণের 'ভগবান' বলিয়া সম্বোধন করেন। কৃষ্ণ স্নেহাকাঙ্খী ভ্রাতা হইতে চাহিলেও—কর্ণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—**'তুমি ভগবান'**........ **"ভগবান হয় ভগবান"**। কর্ণ ভীমকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণের **কাছে আত্মসমর্পণ** করেন এবং সমাধিস্থ হন।

এই সমাধির পরে—যুধিষ্ঠিরাদি কর্ণের পদমূলে বসিলে—কর্ণ 'ব্যথিত' হন এবং ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া—আত্মকাহিনী বিবৃত করেন; শেষ পর্যন্ত বাসুদেবের সম্মুখে—**নরনারায়ণের** সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ এই পর্যন্ত। এইবার বিচার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কর্ণ-চরিত্রের 'সাধারণ পরিকল্পনা'র মধ্যে নাট্যকার প্রশংসনীয় মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং কিছু কিছু অ-মহাভারতীয় উপাদান যোজনা করিলেও মহাভারতের সংস্কার অক্ষুণ্ণই আছে। রূপায়ণের বিচার মুখেও, আমরা গোড়াতেই কর্ণ চরিত্রের সৃষ্টির জন্য নাট্যকারকে প্রশংসা করিতে পারি। **এষণায়—ভাবে ও ভাবনায়** চরিত্রটি সর্ব্বত্র নিখুঁত হইয়াছে—এ কথা বলা না গেলেও, চরিত্রটিতে নানা ব্যক্তিত্বের—**আত্মা—মন ও প্রাণের,** জটিল দ্বন্দ্বের যে রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে এ কথা অবশ্যই বলা যায়—বাংলা নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে কর্ণ-চরিত্রে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিবার অধিকারী। তবে চরিত্রটি যে সর্ব্বতোভাবে অনবদ্য হয় নাই—ইহাও বলা দরকার। **প্রথমতঃ** জন্ম রহস্যকে গোড়ার দিকে পাঠক-দর্শকের কাছে ব্যক্ত না করায়—জন্ম-অভিশাপের রূপ ও ক্রিয়াটি খুব পরিস্ফুট হইতে পারে নাই এবং তজ্জনিত সম্ভাব্য রস-সৃষ্টিও যথেষ্টমাত্রায় ঘটে নাই। **দ্বিতীয়তঃ**—'ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ' এই সত্যে কর্ণের যে **অবিশ্বাস** তাহা বিশেষ তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে পাইতে, বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই। **মর্ম্মের বিশ্বাস এবং বুদ্ধির অবিশ্বাস,—** এই দুইয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণরূপে রূপায়িত হয় নাই। **তৃতীয়তঃ**—কৌন্তেয়-সত্তায় ভ্রাতৃস্নেহের যে অভিব্যক্তি দেওয়া

হইয়াছে তাহা কোন কোন স্থলে একটু মাত্রাতিরিক্তই হইয়াছে। **চতুর্থতঃ**—চরিত্র অনেক স্থলে নিজেই নিজের ভাষ্যকার হইয়া পড়িয়াছে। **পঞ্চমতঃ**—ভাব-কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া নাট্যকার সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—অর্জ্জুন-বিদ্বেষের কারণ গোড়ার দিকে একরূপ—শেষ দিকে অন্যরূপ। নাট্যকার—প্রথম দিকের কারণটি ব্যক্ত করেন নাই এবং শেষ দিকে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রথম দিকের কর্ণ-চরিত্রে তাহার আভাস দেন নাই। যাহা হউক এইরূপ ত্রুটি থাকা সত্তেও, **কর্ণ-চরিত্র**' চরিত্র-সৃষ্টি হিসাবে প্রশংসনীয়।

কর্ণের পরে—উল্লেখযোগ্য চরিত্র, পুরুষদিগের মধ্যে—"যুধিষ্ঠির" এবং নারীদিগের মধ্যে—"দ্রৌপদী" ও "পদ্মাবতী।"

যুধিষ্ঠির: 'যুধিষ্ঠির' চরিত্রটি কর্ণের মত অত বিরাট ব্যাপ্তি লইয়া নাটকে প্রকাশিত হয় নাই বটে কিন্তু চরিত্রটির অকৃতি ছোট হইলেও প্রকৃতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যুধিষ্ঠির বাহিরের পরিচয়ে "ক্ষত্রিয়"; সেই হিসাবে ক্ষাত্রধর্ম তাঁহার ধর্মকায়ার অন্যতম অঙ্গ। এই ধর্ম্মের প্রেরণাতেই—নষ্টরাজ্য উদ্ধাকরিতে ধুধিষ্ঠির ব্যবসিন—এই ক্ষাত্রধর্মই তাঁহাকে—"নষ্টরাজ্য করিতে উদ্ধার পলে পলে……করিছে উত্তেজিত" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভিতরের পরিচয় এই যে যুধিষ্ঠির—"প্রকট ধর্মের মূর্তি"—যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন সেই ধর্ম্মেরই—নরবিগ্রহ। সমস্ত লোকধর্ম্মের—বর্ণাশ্রম ধর্মের উর্দ্ধে এই ধর্মের অধিষ্ঠান। করুণা—ক্ষমা শান্তি দ্বারা এই আত্মা গঠিত। এই ধর্মগুণেই যুধিষ্ঠির—'প্রকট ধর্মের মূর্তি'—পরম ধার্মিক। যুধিষ্ঠির বহিরঙ্গে 'ক্ষত্রিয়', অন্তরঙ্গে—'ধার্মিক।' 'ক্ষত্রিয়' যুদ্ধ করিতে চায় কিন্তু "ধার্মিক" যুদ্ধের কল্পনায় শিশুহত্যা, গুরুহত্যা, বান্ধবহত্যার কল্পনায় শিহরিয়া উঠে—মহাভয়ে তাঁহার হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পিত হয়। কেশবের কাছে তাঁহার প্রার্থনা—'তোমার প্রসাদে ভাই, কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন বরহে যাপন"। যুধিষ্ঠির প্রতীক এবং শান্তরসের আশ্রয়

হিসাব। তাই বলিয়া যুধিষ্ঠির দুর্বল বা অক্ষম নহেন। যুধিষ্ঠিরের শক্তি—ধর্মের শক্তি—শম-দম-তিতিক্ষার শক্তি—শান্ত করুণার শক্তি। যুধিষ্ঠিরের 'শান্ত করুণ দর্শনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তি কোথায়?' কর্ণ কৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে সমর্থ হইলেও—বাসুদেবকে বলিয়াছেন—"ঠেলিলাম বাসুদেব তব অনুরোধ—পারিনা উপেক্ষা করিতে তাঁর। চির লোভনীয় সঙ্গ যাঁর……।" দুর্যোধনের মত দুর্মতিও যুধিষ্ঠিরের প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প মনে আনিতে চাহেন না। শকুনি পর্যন্ত এই ধর্মমহিমা উপলব্ধি করে—বলিতে বাধ্য হয়—"ধর্মরাজই বটে তুমি যুধিষ্ঠির—একটি বারের তরে দুর্যোধন—মুখ হতে বহির্গত হ'ল না তোমার নিধন-কথা।" তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে—চরিত্রটি যত পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তত প্রত্যক্ষভাবে রূপ পায় নাই।

দ্রৌপদী :—অল্প অবসরে অধিক চিন্তাকর্ষক চরিত্রের তালিকায় যুধিষ্ঠিরের পরেই দ্রৌপদীর স্থান। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী—অগ্নিশিখা শিকে তাঁহার জন্ম।—'দীপ্ত বহ্নিশিখা সম' তেজস্বিনী। সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার নিজের মুখেই শোনা যায়—"দ্রুপদনন্দিনী আমি, দীপ্ত বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী—বাসুদেব প্রিয়সখা পাণ্ডুরাজ স্নুষা—ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী…"। কিন্তু এত সৌভাগ্য থাকা সত্ত্বেও—'ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে একবস্ত্রা' দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হইয়াছেন। দুঃশাসনের কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ, দুর্যোধনের উরু-প্রদর্শন—এত অসহ্য লাঞ্ছনা সবই সহ্য করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া প্রতিপলে দ্রৌপদী—"অগ্নিজিহ্বা সহস্র ফণার বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন" সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—আর, আসিয়াছেন ভীমের প্রতিজ্ঞার, অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মুখের দিকে চাহিয়া—কিন্তু সেই ভীম-অর্জুনাদি প্রায় সকলকেই (সহদেব ছাড়া) শান্তির প্রস্তাব করিতে দেখিয়া দ্রৌপদীর তীব্র অভিমান শ্লেষ বক্রোক্তির সঞ্চারিভাবে, দৃঢ় তীব্র ভঙ্গিমায় উৎক্ষিপ্ত হয়। দ্রৌপদী স্বামীদের মুখের দিকে না চাহিয়া নিজের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইতে

সঙ্কল্প করেন—যাজ্ঞসেনী জ্বলিয়া উঠেন—"অগ্নিশিখা শিরে যদি জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি কেন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?"……কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।'

কিন্তু এই বহ্নিশিখা রূপ দ্রৌপদীর সবটুকু নহে। দ্রৌপদী 'বাসুদেব-প্রিয়সখী' 'পাণ্ডব-সখা'-রূপী কৃষ্ণের কৃপালাভ ধন্যা। এই কৃষ্ণার নিঃশ্বাসেই "সন্ধির সকল চেষ্টা করেছে নিষ্ফল", কারণ বিধাতা সব সহিতে পারেন—শুধু "অনাথ ক্রন্দন অনশনে জাতির মরণ" আর 'কার্য্যে বাক্যে লাঞ্ছনায় নারীর লাঞ্ছনা'—সহিতে পারেন না।

দ্রৌপদী প্রতিহিংসা কামনায়—লাঞ্ছনার জ্বালায় যুধিষ্ঠিরকে তীব্র গঞ্জনাবাক্য বলিলেও যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া বিমুগ্ধ এবং যত বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তত গঞ্জনা দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। ক্ষাত্রতেজ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার মহিমা মিশিয়া দ্রৌপদী-চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্মাবতী :—পদ্মাবতী কর্ণের জীবন-সঙ্গিনী—বীরশ্রেষ্ঠের যোগ্য সহধর্ম্মিনী কিন্তু এক স্থানে কর্ণের সহিত তাঁহার মত পার্থক্য আছে। যেখানে কর্ণ ধনঞ্জয় বাসুদেবকে নর-নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন পদ্মাবতী সেখানে বাসুদেবকে শুধু নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—পদ্মাবতী কৃষ্ণ পরায়ণা। (কর্ণেরই আস্তিক সত্তা যেন! এই ·কৃষ্ণপরায়ণতার ফলেই পদ্মাবতী যতটা 'ভাবে ভরা' হইয়াছেন ততটা রক্তমাংসের দেহ হইতে পারেন নাই। স্বামীর জন্য তাঁহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সবই আছে বটে, কিন্তু সকলের উপরে আছে তাঁহার কৃষ্ণপ্রাণতা। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে—পদ্মাবতীর আচরণ দিব্যোন্মাদিনীরই মত। বৃষকেতুকে তিনি বলেন—"পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ —সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর মহাত্মা পিতার।" বৃষকেতুকে তিনি "বাসুদেব! রক্ষা কর তোমার পাণ্ডবে।"—এই প্রার্থনায় যোগ দিতে বলেন—বলেন—"পাণ্ডব-উল্লাস-সঙ্গে উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।…… আমি তোকে আগে হতে করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ।" পদ্মাবতীর এই দিব্যোন্মা-

দিনী—মূর্তি, কৃষ্ণ ভাবুকতার যত পরিপূর্ণই হউক বাস্তবিক চরিত্র হিসাবে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মাবতী—অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক যোগিনী—(কৃষ্ণযোগিনী)।

অন্যান্য চরিত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন জটিলতা নাই।

দুর্য্যোধনকে—'অহঙ্কাররজ্জু-মূর্তি' রূপে **ধৃতরাষ্ট্রকে**—'পুত্র মোহ-গ্রস্ত' রূপে **ভীষ্মকে**—'কৃষ্ণভক্ত, পাণ্ডবানুরাগী, কর্ণ-ভর্ৎসনাকারী' রূপে, **গান্ধারীকে**—ধর্মানুরাগিনী" রূপে, **ভীমার্জ্জুন**—প্রভৃতিকে "ইষ্টসম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী" রূপে এবং **শকুনিকে**—'বাকচপল লঘু হাস্যরসিক" রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

রস-বিচার

নর-নারায়ণ নাটকে প্রধান রস—বীর-ভক্তি সম্বলিত 'করুণ'। 'কর্ণ' এই রসের অবলম্বন বিভাব। কর্ণে বীরত্ব আছে, কৃষ্ণের প্রতি আপাত অবিশ্বাসের তলে ভক্তির ফল্গুধারা আছে এবং সব কিছুর ভিতর দিয়া আছে জন্ম-অভিশপ্তের মর্মবেদনা—নিয়তির হস্তের দারুণ নিগ্রহ,—অভিশাপের উপর অভিশাপ—সমস্ত সাধনা ব্যর্থ করা অভিশাপ, নিজেরই এক সত্তার সহিত অন্য সত্তার করুণ দ্বন্দ্ব—অবশ্যম্ভাবী নিয়তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি। কর্ণের বীরত্বে ও নির্ভীকতায় বীররসের উদ্দীপনা ঘটিয়াছে এবং কৃষ্ণরতির মধ্যে ভক্তিরসের নিষ্পত্তি হইয়াছে বটে কিন্তু কর্ণের বীরত্ব, নির্ভীকতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণপরায়ণতা কর্ণকে যত মহিমান্বিত করিয়াছে নিয়তির সহিত কর্ণের নিষ্ফল সংগ্রামের শোচনাও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বীর ও ভক্তিরসের ধারা শেষ পর্য্যন্ত করুণরসের ধারাটিকেই পরিপোষণ করিয়াছে—করুণরসের সহায়ক হিসাবেই উহারা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কর্ণ যে পরিমাণে বীর ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াছেন সেই পরিমাণেই আমাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং সেই পরিমাণেই কর্ণের মর্মবেদনা পাঠক-দর্শকের কাছে শোচনীয় হইয়াছে।

কর্ণ যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন—কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই পরিমাণে কর্ণের শোচনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে—কর্ণের তীব্র মনঃক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে—'স্বর্গ-মূল্যহীন করা উপহার—ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি।" এই সব কারণেই কর্ণ—অবলম্বনে বীর ও ভক্তিরসের সংযোগে করুণ রসই প্রধানভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অন্যান্য রসের মধ্যে, তাপস অবলম্বন রৌদ্র-রস (জমে নাই), পরশুরাম অবলম্বনে করুণ,—মিশ্র রৌদ্র—দ্রৌপদী-অবলম্বনে বীররস, দুর্যোধন অবলম্বনে বীররস, ভীম-অর্জ্জুন-নকুল-সহদেব-সাহায্যে বীররস ও ভ্রাতৃভক্তি; ভীষ্ম দ্রোণ অবলম্বনে শক্তিবীর ও ধর্মবীর রস, ধৃতরাষ্ট্র-বিভাবে বাৎসল্য, গান্ধারী বিভাবে ধর্মবীর-রস, বৃষকেতু, পদ্মাবতী অবলম্বনে ভক্তিরস ও শকুনির অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রায় ক্ষেত্রেই রসোদ্রেকের মাত্রা সন্তোষজনক হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে রস আভাসিত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অল্লাধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে—নাটকে একটি মাত্র চরিত্রই পরিকল্পিত হইয়াছে—সে "শকুনি"। ঘটোৎকচের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ঘটোৎকচ তাহার রাক্ষস ভাষার ভঙ্গিমা দ্বারা হাস্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছে। শকুনি যে হাসি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আকার বা চেষ্টার বিকৃতি-জনিত হাসি নয়, এই হাসি বাক-বিকৃতি জনিত হাসির অন্তর্গত—লঘু বক্তব্যকে গুরু-গম্ভীর ভাষার আড়ম্বরে প্রকাশ করিবার, লঘু আচরণকে গুরু-গম্ভীর-ভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত করার চেষ্টা হইতে যে হাসির উদ্রেক হয়, ইহা সেই হাসি। এই হাস্য-রস সৃষ্টির চেষ্টা সব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হয় নাই—বিশেষতঃ এ কথা বলা যায়—গুরুতর পরিস্থিতিতে শকুনির বাক্‌চাপল্য ও স্থূল রসিকতা, রসদোষেরই নিদর্শন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উপসংহার। 'প্রস্তাবনা'য় নাট্যকার প্রশ্ন তুলিতেছেন—"দৈব কিংবা পুরুষকার—বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার? কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট। কাহার

প্রকাশ—সঙ্গোপন"। "নিবেদনে"—পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছেন—"এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনী"—এবং নাটকে ঐ প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন—উক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে। পুরুষকারের অবতার কর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন—"নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই মানবের কল্পনা-চালিত" অর্থাৎ এই বিশ্বরাজ্য দৈবরই অধীন। অবিশ্বাসী কর্ণ শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—"ভগবান হয় ভগবান।' এবং.... 'ভগবান ইচ্ছা যদি করে'—নরদেহ ধারণ করিতে পারেন—নর-নারায়ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন।

এই উত্তর দিতে গিয়া নাট্যকার কর্ণের জীবনে 'প্রাণ-বুদ্ধি ধর্ম-অধিকারের যে জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন—আধ্যাত্মিক ও জৈবিক সংস্কারের যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মানবের গভীর হৃদয়াবেগই আবেদন করে এবং সেই আবেদনেই 'নর-নারায়ণ' নাটকের শৈল্পিক সার্থকতা।

॥ দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ॥

॥ মেবার পতন ॥

বাংলা সাহিত্যে 'রোমান্টিক' ঐতিহ্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল

'রোমান্টিক ঐতিহ্য' কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজি "Romantic Tradition" কথাটারই আংশিক অনুবাদ—অর্থাৎ 'রোমান্টিক' শব্দটাকে অপরিভাষিত রেখে যতটুকু অনুবাদ সম্ভব ততটুকুই। সাহিত্যসমালোচনায় বহু ব্যবহৃত এই 'রোমান্টিক' ও 'রোমান্টিসিজিম্' শব্দ দু'টি বাংলা পরিভাষার অভাবে, অবিকৃতরূপেই বাংলায় পাংক্তেয় হয়ে গেছে—"রোমান্টিক" কবির ও কাব্যের বিশেষণ রূপে এবং "রোমন্টিজিসিম্" অন্যান্য "ইজমের" মতো একটা সাহিত্যিক "ইজ্‌মের" নাম রূপে। কিন্তু আসল সমস্যা উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করায় বা পাংক্তেয় করে নেওয়ায় নয়; আসল সমস্যা সেখানেই যেখানে শব্দ দু'টি বহু ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অনির্দিষ্টার্থক। রোমান্টিসিজিম্ ব'লতে যেমন একটিমাত্র এবং নির্দিষ্ট প্রবণতা বুঝায় না, তেমনি 'রোমান্টিক' বলতেও সুনির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য বুঝায় না। দেখা যায়, সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থে রোমান্টিসিজিমের আগে পরস্পরবিরোধি নানা বিশেষণ বসেছে:—যেমন, national romanticism, reactionary romanticism, imitative romanticism এবং 'রোমান্টিক' শব্দটিকেও নানা তাৎপর্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন, romantic tradition, romantic subjectiveness, romantically conceived Romantic, Historical Romantic plays ইত্যাদি। এমনি অর্থবৈচিত্র্য দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন—'the word has been so tumbled about, battered out of shape and generally misused that the heart sinks at the very name of it.' (Psychology and Literature—F. L. Lucas)। উক্ত গ্রন্থেই

সমালোচক শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং নিজে নতুন একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত এই সংজ্ঞাগুলি তিনি উদ্ধৃত করেছেন :—

'The revolt of Emotion against Reason'—

"Romanticism is the grotesque" (Hugo)

Reawakening of the Middle ages (Heine)

Addition of "strangeness" to beauty (Pater)

"A withdrawal from outer experience to concentrate on inner experience"—(Lascelles Abercombie)

এবং এই সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করে সমালোচক দেখিয়েছেন—এদের কোনটিই অব্যাপ্তিদোষ এড়াতে পারেনি। প্রথমতঃ, বুদ্ধির উপর আবেগের প্রাধান্যকে, লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করলে, প্রায় সকল কবিকেই রোমাণ্টিক বলতে হবে, কারণ আবেগ বেশী কম সকলের মধ্যেই আছে। দ্বিতীয়তঃ গেটের কথা অর্থাৎ Romanticism-কে 'deseased' ব'লে স্বীকার করলে 'Ancient Mariner' এর কী দশা হবে? তৃতীয়তঃ "grotesque" যদি লক্ষণ হয়, তবে "La Belle Dame sans Merci" অবশ্যই বাদ পড়ে যাবে। চতুর্থতঃ মধ্য যুগের পুনর্জাগরণ' যদি লক্ষণ হয় তা' হ'লে 'werther' প্রভৃতিকে বাদ দিতে হয়।

পঞ্চমতঃ, 'সুন্দর রহস্যময় করে তোলা'ই যদি রোমাণ্টিসিজিমের লক্ষণ হয়, তাহ'লেও সব ক্ষেত্রে লক্ষণটি উপযুক্ত হবে না। ষষ্ঠতঃ, ক্রনেতিয়ের যে রোমাণ্টিসিজিমকে 'সাহিত্যিক অহমিকার অন্ধ উচ্ছ্বাস' বলেছেন তাও সম্পূর্ণ মানা যায় না, কারণ Ancient Mariner-কে ঠিক 'অহমিকার উচ্ছ্বাস' বলার চলে না। সপ্তমতঃ এবারকোম্বি মহাশয় 'রোমাণ্টিসিজিম'কে যেভাবে বাস্তব-অপ্রধান চরিত্রগুলির বাস্তবতা খুবই লক্ষণীয়; তারপর রোমাণ্টিসিজিম ও রিয়েলিজিমের অদ্ভুত সংমিশ্রণ পাওয়া যায় বালজাকে, ডিকেন্স প্রভৃতির মধ্যে।

অষ্টমতঃ, সমালোচক অধ্যাপক লাভজয়ের আলোচনার অবতারণা করেছেন। অধ্যাপক এ. ও. লাভজয় [তাঁর এসেস্ ইন দি হিষ্ট্রী অফ্ আইডিয়াস গ্রন্থের (১৯৪৮] প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—রোমান্টিসিজিম বলতে একটি মাত্র অর্থ বা প্রবণতা বুঝায় না, সুতরাং শব্দটি বর্জন করাই উচিত। ইংল্যাণ্ডে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম টেম্পল্ চৈনিক উদ্যানের "মনোহর আসামঞ্জস্যে'—মুগ্ধ হয়ে এবং ১৭৪০ খৃঃ বেটি ল্যাঙ্লে ও স্যাণ্ডারসন মিলার "গথিক স্থাপত্য" পুনঃপ্রবর্তন করতে চেষ্টা করে রোমান্টিসিজিমের যে প্রবণতা সৃষ্টি করেন, শেকস্পীয়রের প্রভাব থেকে আসে তা' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবণতা, জে. ওয়ার্টন যাকে বলেছেন—প্রকৃতিসুলভ বন্যতা (wildness) অন্যদিকে জার্মানীর রোমান্টিক এফ, শ্লেগেল অন্যভাবে এগিয়েছেন। তিনি irregularity বা 'wildness'-এর উপাসক নন, তাঁর মতে—প্রাচীন শিল্পকতা স্থিতিধর্মী (static) এবং সংকীর্ণ, আধুনিক শিল্প গতিধর্মী, বিবর্তনকামী, প্রগতিশীল এবং সর্বজনীনতা-অভিলাষী। মোট কথা—জটিলতার অন্ত নেই। জটিলতা আরো বেড়েছে "প্রকৃতি"-পূজা বা অনুরাগ কথাটি নিয়ে। অধ্যাপক লাভজয় "প্রকৃতি"-পূজার ৬১ রকম অর্থ বা ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। এই অর্থ-অরাজকতার মধ্যে লুকাস নতুন ব্যাখ্যা যোজনা করতে চান—বলতে চান "there is a common factor is all Romaticism—and this factor is psychological"। তাঁর মতে অহম্ (ইগো) তিনটি শক্তির অধীন: এক—প্রবৃত্তি (id) অর্থাৎ আদিম আবেগময় সত্তা—যার মুখে শুধু 'চাই চাই'রব; দুই নিবৃত্তি (সুপার-ইগো বা ইগো-আইডিয়াল) অর্থাৎ বিবেক যে শুধু পেয়েই তুষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাধর্ম বিচার করে এবং তিন—বাস্তব-বৃত্তি (রিয়েলিটি-প্রিন্সিপিল)—যে আমাদের সতর্ক করে দিতে বলে—দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু মায়া—ভ্রান্তিমাত্র। লুকাস বলতে চেয়েছেন—It seems possible to suggest that in literature Realism corrseponds to a dominance of the 'reality principle,' classicism, very

roughly, to a dominance of the "Super-Ego," Romanticism, also very roughly to a dominance of impulses from the " id."

লুকাসের এই সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ অব্যাপ্তিদোষমুক্ত কি না বলা শক্ত, কারণ 'dominance of impulses' এবং 'the revolution of Emotion against Reason'—মূলতঃ প্রায় একই কথা।

বিখ্যাত নাট্যতত্ত্বজ্ঞ এবং সমালোচক জন হাউয়ার্ডলসন মহাশয় 'রোমাণ্টি-সিজম্' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—শব্দটি 'রোমান্স" কথাটি থেকে ব্যুৎপন্ন এবং একাধিক অর্থে বা "aggregate of mood" বুঝাতে ব্যবহৃত। যেমন—

(১) যেহেতু ক্লাসিসিজিমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রোমাণ্টিসিজিম্ দেখা দিয়েছিল 'রোমাণ্টিসিজিম্ বলতে—প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—বিধিসম্মত রূপের বা গঠনের প্রতি বিরাগ—freedorm form rigid conventions," "disregard of form"—বুঝায়।

(২) আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে, অর্থাৎ জটিল ও কৃত্রিম রীতির রচনা। বুঝাতে—(to describe an elaborate and artificial style as opposed to a simple mode of expression—) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

(৩) তারপর, যে রচনায় কায়িক ক্রিয়ার ও অদ্ভুত ঘটনার বাহুল্য থাকে —'work's which abound in physical action and picaresque incident—সেই জাতের রচনা বুঝায়।

(৪) বাস্তব পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি—মনগড়া ভাবের সাধনা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় (escapism turning away from physical reality, se eking after romantic illusion)।

(৫) স্বাধীন কল্পনাপ্রবণতা ও সৃষ্টি-কামনা প্রভৃতি (imagination

creativeness as opposed to a pedestrian or pedantic quality)
—বুঝাতে প্রযুক্ত হয়।

(৬) দার্শনিক তাৎপর্যে—পরাদর্শন-রহস্যের প্রতি প্রবণতা এবং বস্তুবাদ-বিমুখতা।

(৭) মনস্তাত্ত্বিক অর্থে—আত্মাভিমুখিতা—আত্মসংসক্ততা (subjectiveness) বুঝায়—"subjective as opposed to an objective approach" বুঝায়,—emphasis upon emotion rather than upon commonplace activity—বুঝায়।

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি নির্ধারণ করে লসন্ বলেছেন—সমালোচকরা শব্দটির পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেননি এবং করেননি এই কারণেই যে তাঁরা 'has inherited the system of thought which constitutes romanticism" এর চিন্তাতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দুটি; এক—ব্যক্তি-আত্মার নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস (idea of the uniqueness the individual soul) দুই ব্যক্তিত্বের—আবেগময়তার বিশ্বাস (idea of personality as a final emotional entity)। এই ধরনের চিন্তায় যারা অভ্যস্ত তাঁরা অবশ্যই শিল্পকলাকে—"subjective and metaphysical" বলে গণ্য করবেন এবং এই বিশ্বাসেই আস্থা রাখবেন—'art is woven of the staff of imagination which is distinct from the staff of life, এবং এই সিদ্ধান্তই করবেন—art is necessarily a sublimation—seeking after illusion······free action can exist only in a dream world···since art is irrational it must escape from conventional forms···অধিকন্তু, সমালোচক লসন রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বৈত প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা' বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ক্লাসিসিজিমের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা'কে "রোমান্টিক" আখ্যা দেওয়ার কারণ এই

যে রোমান্স-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল লাতিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই—"This is important; because it indicates the dual nature of tho romantic movemant: it wished to break away from stuffy tradition to find a fuller and more natural life; it suggested comparison with the medieval poets who baroke away from Latin and spoke in the language of the people. But the fact that the romautic school was based on such a comparison also shows its regressive character, it looked for it in the past. Iustead of facing the problem of man in relation to his environment it turned to the metaphysical question of man in relation to tothe universe,—

এই দ্বৈতপ্রকৃতিকতাকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝাতে গিয়ে লসন্ যে আলোচনার অবতারণা করেছেন, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তা যথেষ্ট আলোকপাত করে। জার্মান রোমান্টিসিজমের প্রবণতা নিরূপণ করিতে, তিনি লিখেছেন—একদিকে রয়েছে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণবিকাশের আকাঙ্ক্ষা, বস্তুবিশ্বের সমস্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার কামনা; অন্যদিকে রয়েছে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা—নিত্য সনাতন চিরস্থায়ী সত্তার-সন্ধান। *(Combining a desire for a richer personal life, a desire to explore the possibilities of the real world with a tendency to seek a safe refuge, to find a principle of permanence) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে রোমান্টিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে যেমন ছিল এই দো-টানা ভাব, তেমনি ছিল, আগেই যা' বলা হয়েছে, একটা অতীতানির্ভরতা—অতীত-মুখাপেক্ষিতা। George Brandes (তাঁর Main Currents in Nineteenth Century Litera-

ture ১৯০৬) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদের এবং রোমান্টিকতার মধ্যে অতীতনির্ভরতা ছিল। তাঁর মন্তব্য—The patriotism which in 1813 had driven the enemy out of the Country contained two radically difserent elements—a histotical retrospective tendency which soon developed into romanticism, and a liberal minded progressive tendence, which developed tnto the new liberalism" অর্থাৎ তখনকার রোমান্টিকতায় দুটি প্রবণতা ছিল—একটি পুরাতন ইতিহাস স্মরণ অর্থাৎ ঐতিহ্য স্মরণ ক'রে আত্মসংবিদ জাগানোর চেষ্টা অন্যটি—উদার-মনা প্রগতিকামিতা—নব মানবতার চেতনা।

সমালোচক জন হাউয়ার্ড লসন মহাশয়ের আলোচনার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে রোমান্টিকতার মধ্যে প্রগতিশীল উদার চিন্তাভাবনা যতই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, রোমান্টিক দৃষ্টি 'Iestead of facing the problem of man in relatian to his environment' মানুষের সমস্যাকে পরিবেশ-সাপেক্ষ ক'রে না দেখে, সমস্যা সমাধানে পরিবেশের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার না ক'রে, আত্মার অনির্বচনীয় স্বরূপের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের অনির্দেশ্য প্রকৃতির মধ্যে জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পেতে চায়। লসনের মতে প্রকৃত রিয়েলিষ্ট তিনিই যিনি মানুষের জীবন সমস্যাকে ব্যক্তির আচরণকে "in relation to his environment" রূপ দিতে চান। অন্যভাবে বললে বলা যায় যিনি মানুষের "uniqueness of soul" আত্মার অনির্বচনীয় স্বরূপ স্বীকার করেন না, ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মহিমা স্বীকার ও প্রচার করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সব বাস্তববাদী লেখক এসে-ছিলেন তাঁরাও—লসন বলেন—"did not achieve a cleao break with romanticism—it was a new phase of the same system of

thought." এ কথা সত্য যে বাস্তববাদীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-পীড়িত জীবনের রূপ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু—"they evolved no integratted Conceptton which would explain and solve these problems" এমন কি বাস্তববাদীদের অগ্রণী যে ইবসেন তিনি "Master Builder" নাটকে রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি। লসনের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে প্রকৃত বাস্তববাদিতা তখনই সম্ভব যখন রোমাণ্টিসিজিমের সঙ্গে "clean break" অর্থাৎ পরিষ্কার বিচ্ছেদ ঘটে—সুসমঞ্জস বাস্তববাদী জীবন দর্শনের আলোকে জীবন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়! বলা বাহুল্য, এই ধরনের প্রকৃত বাস্তববাদিতার সঙ্গে কৃত্রিম বাস্তবাদিতার অর্থাৎ সাধারণ বাস্তব-প্রবণতার লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। লুকাস যখন বলেন—"Sometimes Romontics have called in Realism as an ally against the unreal Conventions of classicism ; sometimes classicists have appealed to Realism against the fantastic dreams of Romonticism—তখন 'realism' শব্দে সাধারণ বাস্তবপ্রবণতার কথাই বলেন—বাস্তবিক রূপ দেখার বা আঁকার প্রবণতাই বুঝাতে চান।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝতে পেরেছি যে রোমাসিজম্‌কে দু'এক কথায় বুঝানো সম্ভব নয় এবং নানা মতে এ ক্ষেত্রেও কণ্টকিত। আমরা দেখলাম—মূল লক্ষণ নিধারণে, এফ. এল, লুকাস এগিয়েছেন মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে এবং জন হাউয়ার্ড লসন ভিত্তি করেছেন—দর্শনকে। কিন্তু পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়ার দিকে আমরা যে খুব একটা এগিয়ে এসেছি এ কথা বলা চলে না। অতএব আমরা এখানে সূত্রগুলি গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

'রোমাণ্টিক' ও 'রোমাণ্টসিজম' শব্দ দু'টি যদি 'রোমান্স কথাটা থেকে ব্যুৎপন্ন হয়ে থাকে, তা'হলে রোমান্সের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে 'রোমাণ্টিকতা'র

—বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা দরকার, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন। "রোমান্টিক' ব'লতে, গোড়াতে নিশ্চয়ই 'রোমান্স সুলভ' বা 'রোমান্সের মতো' —এই অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে রচনার গঠনরীতি রোমান্সের মতো তাকে বলা হয়েছে—রোমান্টিক। যার ঘটনাবিন্যাস, পরিস্থিতিকল্পনা, চরিত্রের আচরণ রোমান্সের মতো তাকে বলা হয়েছে—রোমান্টিক; যার বিষয়বস্তু রোমান্সের বিষয়বস্তুর মতো তাকে বলা হয়েছে 'রোমান্টিক' এবং যে কবির মন রোমান্স-স্রষ্টার মনের মতো, তাঁকে বলা হয়েছে রোমান্টিক। প্রথমতঃ, রোমান্সের গঠন-রীতি প্রাচীন গঠন-রীতি থেকে স্বতন্ত্র, রোমান্সের —"many actions of many men" উপস্থাপিত এবং প্রাচীন ঐক্য-বিধি — স্থান-কাল-কার্য-ঐক্য লঙ্ঘিত। এখানে প্রাচীন রূপ-রীতির [লাতিন ভাষা ও ঐক্যবিধি] বিরুদ্ধে লক্ষণীয় বিদ্রোহ দেখা গেছে। অতএব বিদ্রোহপ্রবণতা রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, রোমান্সের বিষয়বস্তু নাইটদের প্রেমবীরত্বের কাহিনী। এই বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য থেকে রোমান্টিকতার অন্য দু'টি লক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে। নাইটদের 'প্রেম বীরত্বের কাহিনীতে ঘটনাবিন্যাস, পরিস্থিতিকল্পনা এবং চরিত্রের আচরণ অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ, অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক। এই কারণে যে রচনার ঘটনাবিন্যাসে চমক সৃষ্টির চেষ্টা থাকে, পরিস্থিতি কল্পনায় অসাধারণ স্থান-কাল ব্যবহার করার ঝোঁক দেখা যায়, এবং চরিত্রের আচরণে রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষের রীতি-নীতি প্রকাশ না পেয়ে ভাবাবেগ বা আদর্শনিষ্ঠার ঐকান্তিক আতিশয্য প্রকাশ পায়, সেই রচনাকে—'রোমান্টিক' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার-সমালোচক—দেনিস বিদোরা 'রামান্টিক' নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"A play is romantic when the marvelous is caused by coincidence, if we see Gods or men too malignant, if events and characters differ too greatly from what experience and history lead us

to expect and above all if the relation of cause and effect is too complicated or extraordinary" অর্থাৎ নাটক রোমান্টিক আখ্যা পাবে তখনই যখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা দ্বারা চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে, দেবতাকে বা মানুষকে অতিনিষ্ঠুর দেখান হবে, ইতিহাসে এবং অভিজ্ঞতায় ঘটনা ও চরিত্রকে যে ভাবে পাওয়া যায়, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চরিত্র এবং ঘটনা উপস্থাপিত করা হবে এবং ঘটনাবিন্যাসে কার্যকারণের সম্পর্ক যেখানে অতিজটিল বা অস্বাভাবিক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে—ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্র সৃষ্টিতে পরিপাটি বৈচিত্র্যের তথা বাস্তবতার অভাব এবং চমৎকারিত্বসৃষ্টির জন্য আবেগাতিশয্য—যেখানে থাকে, সেখানেই সৃষ্টি 'রোমান্টিক' অর্থাৎ রোমান্সধর্মী হয়ে ওঠে। রোমান্স কাহিনীর বাহ্য প্রকৃতি থেকে যেমন উপরোক্ত লক্ষণটি এসেছে, তেমনি, বিষয়বস্তু আন্তর প্রকৃতি থেকে আর একটি লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে। এই লক্ষণটিকে সংক্ষেপে বলা চলে প্রেম ও সৌন্দর্যের অনির্দেশ্য পরাদর্শের জন্য, পরম সত্তার জন্য আর্তি। প্লেটোর ভাববাদের এবং খৃষ্টধর্মের নৈতিক বিধির প্রভাবে, মধ্যযুগে নাইটদের প্রেম-বীরত্ব-গাথায়, কামগন্ধহীন প্রেমের ও সৌন্দর্যের ভাবমূর্তির আরাধনার আবেগ প্রকাশিত হয়। দান্তে পেত্রার্ক, প্রভৃতির প্রেমে ও সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি আরাধনার খাত বেয়ে তা' ক্রমে ক্রমে অনির্দেশ্য ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সত্তার এবং পরম-সত্তার অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। ফলে অনির্দেশ্য ও অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাকে—সেই সত্তা স্বরূপে সত্য-শিব-সুন্দর বা সচ্চিদানন্দ যাই হোন না কেন;—পাওয়ার ব্যাকুলতা রোমান্টিক মনোভাব বলে গণ্য হয়। আত্মার রহস্যময় স্বরূপে—ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তজ্জনিত আবেগ, এই মনোভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বলে, উক্ত বিশ্বাস ও আবেগও রোমান্টিক নামে অভিহিত।

এইভাবে, রোমান্সের প্রকৃতি থেকে যেমন রোমানন্টিকতার লক্ষণগুলি নিরূপিত করা সম্ভব, তেমনি রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বৈতপ্রকৃতিকতাও ব্যাখ্যা

করা সম্ভব। মুক্তিকামনা অর্থাৎ স্থিতাবস্থার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কামনা, রোমান্টিকের স্বাভাবিক মনোভাব বটে, কিন্তু তাই বলে সকল রোমান্টিকই যে মুক্তির আবেগে, সামনে এগিয়ে যেতে চান বর্তমান অবস্থার বাধা অতিক্রম ক'রে, উজ্জ্বল ও মুক্ত উদার ভবিষ্যতের ধ্যান করেন, তা' নয়. কোন কোন রোমান্টিক চারিদিকের পাষাণ কারা ভেঙ্গে ফেলতে অসমর্থ হয়ে, অতীত অবস্থার মধ্যে অথবা আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে মুক্তির কল্পলোক সৃষ্টি করে মুক্তির আবেগ চরিতার্থ করে থাকেন। এই ধরনের অতীতাসক্তি বা আধ্যাত্মিক মুক্তিবিলাসী মনোভাবকেই প্রতিক্রিয়াশীল রোমান্টিসিজম্ বলা হয়েছে। আর যে মুক্তিকামনা, জাতিগত ও ব্যক্তিগত পরাধীনতার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই মুক্তির-আবেগকে বলা যেতে পারে "প্রগতিশীল রোমান্টিসিজম্"। National Romanticism-এ প্রগতিমূলক মনোভাব অর্থাৎ জাতির মুক্তির আবেগ প্রকাশিত হয় বলে, ন্যাশনাল রোমান্টিসিজম্ প্রগতিশীল রোমান্টিসিজমের একটা বিশেষ রূপ।

তবে এই ন্যাশন্যাল রোমান্টিসিজম অনেক ক্ষেত্রে অতীত কীর্তি কাহিনীকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে বলে কারো হয়ত একথা মনে আসতে পারে যে, যেহেতু এর মধ্যেও অতীতাসক্তি রয়েছে সেই হেতু তা' প্রতিক্রিয়াশীল। অতীতাসক্ত হওয়া এবং অতীতাশ্রয়ী হওয়া অর্থাৎ historical instrospective tendency থাকা যে এক কথা নয়, এ কথাটা একটু তলিয়ে বুঝতে পারলেই, ঐ ধরণের কোন কথা আর মনে আসবে না। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই পলায়নী মনোবৃত্তি—কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজনে অতীতকে ব্যবহার করা—অতীত কাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানের প্রগতিকামনার চাহিদা রূপ দেওয়া অবশ্যই প্রগতিশীল মনোভাব। "Historical introspective tendency" —জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বাধীন জাতি

অতীতকে স্মরণ করে আত্মগৌরব ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে—জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনাকে আরো উদ্দীপিত করার জন্য, আর পরাধীন জাতি অতীত কীর্তিকাহিনী স্মরণ করে—আত্মসংবিদ ফিরে পাওয়ার জন্য, স্বাধীনতা কামনাকে জাতির চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়ার জন্য—জাতির মানসিক দুর্বলতা দূর ক'রে, পরোক্ষভাবে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। পরাধীন জাতির চিত্তে যখন নবজাগরণের সাড়া জাগে, যখন বন্ধন অসহিষ্ণুতার চাঞ্চল্যে জাতি মুক্তির জন্য চেষ্টিত হয় অথচ সম্মুখের বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চার করতে পারে না, তখনই জাতির মনে historical introspective tendency বেশী করে দেখা দেয়।

"এই introspective tendency" রই অনিবার্য পরিণতি ঐতিহাসিক কাহিনীর—রোমান্টিক উপস্থাপনা। অর্থাৎ ইতিহাসের বাস্তবানুগ উপস্থাপনার পরিবর্তে, ভাবাবেগ-উচ্ছ্বসিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয়চেতনাসঞ্চারী উপস্থাপনা। জাতির নবজাগরণের সঙ্গে—জাতির মুক্তি সংগ্রামের আবেগের সঙ্গে, ইতিহাস স্মরণের সম্পর্কে কি এবং ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমে ইতিহাস পুনঃস্মরণ কেন হয়, নিশ্চয়ই তা' বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। 'রোমান্টিসিজম' এবং 'রোমান্টিক' সম্বন্ধে যেটুকু সংস্কার থাকলে মেবার পতন নাটকের রোমান্টিকত্ব এবং নাট্যকারের রোমান্টিক মনোভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে, আশাকরি সেটুকু সংস্কার এই আলোচনার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে।

* * *

এবারে বাংলা সাহিত্যের 'রোমান্টিক ঐতিহ্য' এবং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে সামান্যভাবে দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক। বলা বাহুল্য, এই আলোচনায় আমি বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি

ঘটেছিল সেই অভিব্যক্তিরই বিশেষ প্রকৃতি বা বিশেষ রূপটি নির্দেশ করতে চেষ্টা করব। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়—রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের—কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকারদের রোমাণ্টিক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করব। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার যে-সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে তাকেই আমি বলছি—বাংলার রোমাণ্টিক ঐতিহ্য এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চেষ্টা করছি এই ঐতিহ্যের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল নতুন কোন ভাব বা লক্ষণ যোগ করতে পেরেছেন কি না, পুরাতন ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন কি না অথবা রোমাণ্টিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছেন কি না, এই সব প্রশ্ন। আগেই বলেছি এই সব প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। দিগ্‌দর্শনের জন্য যতটুকু বলা দরকার ততটু বলা হবে।

নবম দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত, বাংলায় সংস্কৃতি ইতিহাস; বিশেষ ক'রে সাহিত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, যে কথাটা বিশেষভাবে মনে জাগে, সে এই যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকে আশ্রয় করে এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির আবেগের রূপ ধরে বাংলার গণমানসে মুক্তির একটা সর্বতোমুখী প্রবল আকূতি আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু যেহেতু এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অতিজাগতিক বা অতিপ্রাকৃত সত্তার—অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ—এবং আন্দোলনের প্রকৃতিতে বৈরাগ্য সন্ন্যাস প্রভৃতি ইহবিমুখ আচরণের প্রশ্রয় ছিল, সেইহেতু ঐ মুক্তির আন্দোলন অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারেনি—এক কৃষ্ণভক্তি-সূত্রে সমস্ত জাতিকে, সমস্ত বর্ণকে গেঁথে নিয়ে সাম্য-স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ প্রেমময় আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারেনি। তা না পারলেও—বর্ণাশ্রম ধর্মশাসিত এবং জাতিবিদ্বেষ-সংকীর্ণ সমাজে যিনি মানুষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং বিশ্বজনীন প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে

তুলে, ব্যক্তিবৈষম্যের ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে, গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার আন্দোলন এবং তাঁকে ঘিরে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে প্রগতিশীল রোমাণ্টিকতার উপাদান ছিল—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যদেবের এই বৈষ্ণব আন্দোলন ছাড়া, এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যেটুকু রোমাণ্টিকতার উপাদান পাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় বাংলার লোক-সাহিত্য (পূর্ববঙ্গগীতিকা—মৈমনসিংহ-গীতিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নানা কাহিনীর মধ্যে)। এই সকল কাহিনীর মধ্যে—জীবনকে যে রূপে ও যে রীতিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে সংক্ষেপে 'রোমান্সসুলভ' অর্থাৎ রোমাণ্টিকই বলা যেতে পারে। এদের নায়ক-নারিকারা 'পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়' সেই রঙ্গেই, জীবনাবেগের তীব্র তাড়নায়, ধেয়ে চলেছে, বর্ণের বাধার—জাতির—বাধার, Ego Ideal-গণ্ডী ভেঙ্গে, তাদের হৃদয়াবেগ উদ্দাম ও স্বচ্ছন্দ গতিতে একমাত্র কামনার প্রেরণা মেনেই অন্ধবেগে ছুটে চলেছে। তাদের কাছে সমাজ সংসার মিছে সব। জীবনাবেগের সহজ প্রবৃত্তির বিধি ছাড়া মানুষের গড়া কোন বিধিনিষেধ তারা মানতে চায় না। তারা যেন স্বচ্ছন্দচারী মুক্ত প্রেমের—মুক্ত জীবনের—শরীরী আকাঙ্ক্ষা; গতানুগতিক বিধিরুদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে মূর্ত বিদ্রোহ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য—সাম্য ও মৈত্রীর জন্য আন্দোলনে এবং লোকসাহিত্যের নায়ক নায়িকাদের জতিকুলবিচারহীন প্রেমের ঐকান্তিক আবেগে—'মনের মানুষের' জন্য জাতিকুলমান—সর্বস্বত্যাগে, বন্ধন-অসহিষ্ণু জীবনের জীবনসম্ভোগেরই ঐকান্তিক আবেগ লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিক স্থিতিশীল জীবনযাত্রার মাঝখানে জীবন আবেগের দ্বীপ দুটি যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই, ইংরাজি শাসনের চাপ, ইংরেজ জীবনের আদর্শ এবং ইংরেজী শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রভাবে, বাঙালীর জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছার

মধ্যে পারবর্তন দেখা দিতে থকে—বাংলার বুকে নবজীবনের সাড়া জাগে—জাগ্রত বাঙালীর মনে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হাওয়ার সঙ্কল্প জাগে—এক কথায়, জাগ্রত বাঙালীর জীবনের অঙ্গনে মুক্তভাবে বিচরণ করতে চায়। কিন্তু ভিতরে-বাইরে সহস্র বন্ধনে সে তখন আবদ্ধ। বাইরে ব্রিটিশের অধিপত্য, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার বেষ্টনী; ভিতরে সহস্র সংকীর্ণ বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা অচলায়তন—কুসংস্কারের অপ্রতিহত প্রভাব। সিপাহীবিদ্রোহের অগ্নুচ্ছ্বাসে ভারতের সাময়িক শক্তি নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো একবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে; ভারতবাসী মহারাণীর প্রজায় পরিণত হয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আগুন থেকে পরিবেশে যে তাপ সঞ্চারিত হয় তাতে অনেকেরই মনে তাপ সঞ্চিত হয়। এই আগুনের উত্তাপেই বাংলায় "ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমের" সূত্রপাত হয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'—বিশেষতঃ "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ?"—গানটি, ঐ নির্বাপিত বিদ্রোহাগ্নিত উত্তাপে উত্তপ্ত। এখান থেকেই, historical introspective tendency-এর সূচনা—ঐতিহাসিক কাহিনীর আধারে—ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীকে মুখপাত্র ক'রে স্বাধীনজীবনের মহিমাকে প্রচার করার চেষ্টা, পরাধীনতা-অসহিষ্ণুতার চাঞ্চল্য, আরম্ভ হয়েছে। রঙ্গলালের সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদনের জীবন এবং কাব্য সমান মাত্রায় রোমান্টিক। যেমন অদম্য তাঁর প্রাণাবেগ—জীবন সম্ভোগের বাসনা, তেমনি তীব্র ঘৃণা স্থিতিধর্মী বদ্ধজীবনের জড়ত্বের উপরে। ঐ অস্থির অসহিষ্ণু প্রাণাবেগেরই অনিবার্য পরিণতি—খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ, সমাজের সীমা, দেশের সীমা লঙ্ঘন করে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ছুটে বেড়ান, যে পরশপাথরের স্পর্শে জীবন অবাধমুক্তির সোনায় পরিণত হবে, সেই পরশপাথরের জন্য ক্ষ্যাপার মতো দেশ-বিদেশে বিচরণ—এককথায় সমস্ত রকম প্রথার (সাহিত্যিক ও সামাজিক) বাধার বাঁধ ভেঙে জীবনকে মুক্ত করার আবেগ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের

প্রবর্তন করে ভাষার শৃঙ্খল মোচন করা, বিষয়-নির্বাচনে ও উপস্থাপনে প্রচলিত প্রথাকে অমান্য করে কল্পনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, মাতৃভাষার দৈন্য তথা আত্মদৈন্য, জাতীয় অবমাননা দূর করার জন্য অপূর্ব কাব্য নাটক কবিতাবলী রচনা করা, দুর্বলতা-বিরোধী বন্ধন অসহিষ্ণু ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী প্রাণাবেগেরই অভিব্যক্তি। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সংকেত আশ্রয় করে মধুসূদন নতুন জীবনাদর্শেরই আবাহন করেছেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রশস্তি—এবং পরাধীনতার মনস্তাপ—"King porus"-কে উপলক্ষ্য ক'রে অতি তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা পুরুর উদ্দেশ্য কবি লিখেছেন—

And where the noble hearts that bled
For freedom – with the heroic glow
In patriot bosoms nourished—
Hearts eagle-like that recked not death
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou fair freedom !

.. ..

The crown that once did deck thy brow
Is trampled down—and thou sunk low,
Thy pearls, the diamond and thy mine.
of glistening gold no more is thine !
Alas—each conquering tyrant's lust
Has rodded thee of thy very dust !

পরাধীনতার জন্য এই অন্তর্দাহ, কৃষ্ণকুমারী-নাটকেও হিন্দুমহিমা-স্মরণের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহত্তর গৌরব বীরের

পক্ষে যে আর কিছু হতে পারে না—এ কথা, মেঘনাদবধ-কাব্যে মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেছেন।

"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী"—

অথবা

—বীরমাতা তুমি,
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ?—প্রভৃতি উক্তির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক—

ইন্দ্রজিৎ চরিত্র পরিকল্পনার বাহ্য প্রেরণা, হেকটরের মতো একটি বীরের পতন দেখে দেবপ্রতিকূল পৌরুষের পরাজয় দেখানো হলেও, আভ্যন্তরিক প্রেরণা, কিন্তু, পৌরুষেরই তথা দেশপ্রীতিরই মহিমা প্রতিষ্ঠা করা। ইন্দ্রজিৎ ধাত্রীর মুখে সংবাদ শুনে যে ভাষায় নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল তা' লক্ষণীয়—

—হা ধিক মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননত্মজ—
আমি ইন্দ্রজিৎ।
'ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"

এই ধিক্কার মাতৃভূমির বৈরিদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য যুবশক্তিকে উদ্দীপিত করে না কি? বিভীষণের উক্তির প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রজিতের স্মরণীয় উক্তিতেও স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক ইন্দ্রজিতের প্রদীপ্ত তেজস্বিতাই বিকিম্বিত হয়েছে। ইন্দ্রজিতের অভিষেকে নবজাগ্রত জাতীয় চেতনারই অভিষেক হয়েছে এবং ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় বীরত্বেরই মহিমা ঘোষিত হয়েছে। ইন্দ্রজিত মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে এসেছিল, মরণে সেই মৃত্যুহীন প্রাণকেই সে দান করে গেছে। মহৎ আদর্শের

জন্য যার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, মৃত্যু শুধু তার দেহটাকেই অধিকার করে ইন্দ্রজিতের মধ্যে মধুসূদন এমনি একটি "মৃত্যুহীন প্রাণ"কেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে 'মৃত্যুহীন প্রাণে'র গুণেই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে নায়ক—"turn death itself into a triumph", সেই গুণেই ইন্দ্রজিত মৃত্যুকে জয় করেছে। কেন মধুসূদন মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন, তা নির্দেশ করতে গিয়ে ড: শীতাংশু মৈত্র মহাশয় লিখেছেন—"পৌরুষের এই অহেতুক পরাজয়ে মধুসূদনের চিত্ত আলোড়িত হইল, কেন না এই পরাজয়, এই ব্যর্থতা ও মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের নয়, তৎকালীন সমাজজীবনের অন্তর্গূঢ় সত্য। এবং এই ব্যর্থতার বেদনাকে রূপ দিয়াছেন বলিয়াই মধুসূদন যুগন্ধর—যুগ সত্যটিকে কাব্যে যথাযথ ধারণ করিয়াছেন। কবিত্তে হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতেই এই যুগসত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং রাবণের মাধ্যমে প্রচণ্ড পৌরুষের অহেতুক বিনাশে মর্মভেদী বিলাপ করিয়াছেন"

"বাঙালী মানস-মুকুল আগুনে ভাজিল। ইহারই প্রতিফলন মেঘনাদ বধে'......মেঘনাদ—"রেনেসাঁর ব্যর্থতার চিত্র।" ("যুগন্ধ মধুসূদন") মেঘনাদকে রেনেসাঁ'র ব্যর্থতার চিত্র না বলে—যদি শক্তি উদ্বোধনের বা রোমান্টিক প্রাণাবেগের প্রতীক ব'লে মনে করা যায়, তা'হলেই বোধ হয়, ঠিক ব্যাখ্যা করা হয়। সে যাই হোক মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে ন্যাশানাল রোমান্টিসিজমের সব লক্ষণই বেশী কম পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায়—historical introspective tendency", তেমনি পাওয়া যায়—"liberal-minded progressive tendency which developed into toe new liberalism"। আমরা দেখতে পাব, পরাধিন অবস্থার চাপে—"historical introspective tendency" বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত চলে এসেছে এবং "liberal-minded progressive tendency"—মানবতাবোধের

গভীরতা বৃদ্ধির ধারা ধরে বিশ্বমানববোধে—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতায় গভীরতর চেষ্টায় পরিণত হয়েছে।

রঙ্গলাল-মধুসূদনের পরে কবি বিহারীলালের মধ্যে, রোমান্টিক প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট আকারে দেখা যায়। (ক) Romantic subjectiveness"—আত্মোপলব্ধিকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা—আত্মভাব-বিভোরতা। (খ) কল্পনাপরায়ণতা—কল্পনার পাখা মেলে, রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শের রাজ্যে অবাধ মানসপরিক্রমা। (গ) অপরূপ পরম সত্তার লীলা-রহস্য উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুলতা—ইহবিমুখতা বা অধ্যাত্মকেন্দ্রিকতা এবং অনির্বাণ অতৃপ্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে, রোমান্টিক প্রবৃত্তি রোমান্স-রচনার খাত ধরে এগিয়ে অতীত ইতিহাস আশ্রয় ক'রে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে প্রবণায়িত হয়েছে। হেমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যে প্রধানতঃ জাতির আত্মসংবিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় স্বাধীন মহাভারতের প্রতিষ্ঠার ধ্যানে ও সঙ্কল্পে রোমান্টিক আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহার' মহাকাব্যে, দেব-দানবের সংগ্রামের কাহিনীর রূপকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কামনাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র রৈবতক প্রভাস রচনার মধ্যে স্বাধীনতালাভের, জাতিধর্ম নির্বিশেষে 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার আবেগই ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আবেগোচ্ছ্বাস যেমন লক্ষণীয়, নবীনচন্দ্রের তেমনি লক্ষণীয় স্বদেশপ্রীতির ঐকান্তিকতার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রীতির বা বিশ্বমানবতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া পাওয়া যায়—প্রথমতঃ পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে জাতীকে প্রকৃত ধর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায়, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক কুসংস্কার বা অনাচার দূর করার চেষ্টায়, তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের সাহায্যে জাতির স্বাধীনতা কামনাকে উদ্দীপিত করার মধ্যে।

জাতিকে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে জাত্যাভিমান জাগ্রত করতে চেষ্টা করা, সমাজের কুসংস্কার দূর করে জাতিকে ভিতরে বাইরে সবল করার চেষ্টা করা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে সব বীর সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কীর্তিকাহিনী জাতির চোখের সামনে তুলে ধরা—অবশ্যই নতুন ও মুক্তজীবনের কামনাকেই সূচিত করে। এখানেই গিরিশচন্দ্রের রোমান্টিকতা।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে রোমান্টিক আবেগ নানা মুখে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারীলালের আধ্যাত্মিক আকুতি ও কল্পনা কুশলতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসে আরো গভীর ও ব্যাপক হয়েছে—ভূমার অপরূপ-অনির্বচনীয় স্বরূপে অবস্থান করার আবেগ আরো ঐকান্তিক হয়েছে, রূপে রূপে অপরূপকে সাক্ষাৎকার করার আকুলতা বেড়েছে—অখণ্ড জীবনের কামনা, বাধাবন্ধহীন মুক্তির পিপাসা তীব্রতর হয়েছে, সমগ্র জগতকে—বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতিকে—এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার লীলাবিলাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার তথা ব্রহ্মবিহারের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে এই ব্রহ্মবিহার—জগতের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির ঊর্ধ্বে, অনন্তের আনন্দকে স্থাপনা করে জাগতিক দ্বন্দ্ব সংক্ষোভ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বা থাকার চেষ্টা—আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস রয়েছে ; অন্যদিকে, জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করার ফলে এবং নতুন যুগের চিন্তার ও চাহিদার চাপে—এক কথায় জীবনের দায়েই, সমাজ সমস্যার, জীবন-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হয়েছে, সামাজিক মুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়েছে—ব্যক্তি মুক্তির সম্ভাবনাকে সামাজিক মুক্তির অবকাশেই ধারণা করতে হয়েছে। সব কিছুই ব্রহ্মতন্ত্রের অধীন, সুতরাং ব্রহ্মবিহারেই জীবনের চরম সার্থকতা—এ কথা বললে আপাততঃ এ কথা মনে হতে পারে যে এই ধারণা পলায়নী মনোবৃত্তি-কে'ই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি জীবপ্রকৃতি এবং সমাজপ্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ব'লে, রবীন্দ্রদর্শনে

'পলায়নী মনোবৃত্তি' সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় সমাজ সংসার উপেক্ষা ক'রে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় ব'লে, ব্রহ্মের সঙ্গে সমাজ সংসারও সমান গুরুত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

তা'ই ব'লে, অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, বস্তুবাদীর কাছে সমাজ-সংসারের যে পরিচয় বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাছেও তা' পাওয়া যাবে। মানুষের সমস্যাকে—সমাজের সমস্যাকে বস্তুবাদীরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, এবং যতখানি অতিপ্রাকৃত-নিরপেক্ষ ক'রে দেখেন, সেই দৃষ্টি-কোণ বা ততখানি অতিপ্রাকৃত নিরপেক্ষতা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে না। বস্তুবাদীরা যেখানে মানুষের আচরণে শুধু জৈবিক, মনোজৈবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তির প্রেরণা স্বীকার করে ক্ষান্ত থাকবেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সামাজিক ও জৈবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা ছাড়াও আধ্যাত্মিক প্রেরণা স্বীকার করবেন। খাঁটি রিয়েলিষ্টের দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মৌলিক পার্থক্য এখানেই এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ "রোমাণ্টিক"। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সমস্যাকে অথবা সমাজ-সমস্যাকে, সমাজসাপেক্ষ করে না দেখে আধ্যাত্মিক—প্রকৃতি-সাপেক্ষ করে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার প্রেরণার বা মুক্তিলীলার পরিপ্রেক্ষণীতে দেখতে চান। এই সংস্কারের প্রাবল্য যাঁর মধ্যে থাকে, তাঁর "ইগো"তে, লুকাসের চিন্তা অনুসরণ ক'রে বলা চলে—Reality-principle অপেক্ষা "id"-এর প্রভাব বেশী হবেই, বস্তুকে স্বরূপে না দেখে ভাবানুরঞ্জিত ক'রে প্রকাশ করতে তিনি প্রবণান্বিত হবেনই।

এই ধরণের ভাবপ্রসক্তির স্বাভাবিক পরিণাম—subjectiveness-এর প্রাধান্য-রূপের বাস্তবিকতা অপেক্ষা ভাবের সংকেতনার দিকে ঝোঁক—বাস্তবানুগামিতার পরিবর্তে কল্পনাগামিতা এবং সমাজসত্তার চেয়ে ব্যক্তি-সত্তার প্রাধান্যকে বড় করে দেখা বা দেখানো। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয়তা-মানবতা বিশ্বমানবতার আবেগ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এ কথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ও সমষ্টির মুক্তির মধ্যেই আদর্শ সমাজের

প্রাণকেন্দ্রটি কল্পনা করেছেন, এক কথায় রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন মুক্তির আদর্শকেই জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথের মানসে এবং দৃষ্টিতে স্বভাবগত ভাবালুতা থাকায়, তাঁর সৃষ্টিতে—শিল্পের ভাবে ও রূপে রোমান্টিকতার মায়া জড়িয়ে আছে। জীবন সমস্যার উপস্থাপনায় ও সমাধানে বাস্তব পরিকল্পনা না ক'রে তিনি রোমান্টিক-সুলভ কল্পনা করেছেন। শুধু যে কবিতা ও কাব্য রচনাতেই 'সাবজেকটিভিটি'র মাত্রা বেশী হয়েছে তা নয়, গল্প-উপন্যাস নাটক প্রভৃতির মত শিল্পের ক্ষেত্রেও, যেখানে শিল্পীকে অধিক মাত্রায় বিষয়নিষ্ঠ থাকতে হয়, সেখানেও আত্মানুরঞ্জনের মাত্রা—ভাবাদর্শের প্রভাব—লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মনের কেন্দ্রবিন্দুটি যে পরাদর্শনে গঠিত, তারই প্রভাবে বা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিবিড়, বাস্তবিকতার সংস্কার গড়ে উঠতে পারেনি। এবং তা' পারেনি ব'লেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যাকে বলে "clean break which Romanticism" তা' কোনকালেই সম্ভব হয়নি। বিংশশতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ পর্যন্ত এসেও, তাঁর প্রকৃতি বদলায়নি।

*নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকাররাও, "ন্যাশনাল রোমান্টিসজমে"র ভরা জোয়ারের সময়েই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। জাতির চোখে তখন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নঘোর। অন্তরে বাইরে জাতি মুক্তি চাইছে ঐকান্তিক আবেগে। আত্ম-শক্তিকে ও প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্য জাতি তখন দিশেহারার মত পথ খুঁজছে। একদিকে প্রাচীন ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার এবং প্রতীচ্যের কাছ থেকে নতুন-করে পাওয়া মানবতার ও বিশ্বমানবতার প্রেরণা, অন্যদিকে জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণশক্তির এবং জাতীয়তা-বাদের উত্তেজনা! একদিকে জাতীয়তার কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণ, অন্যদিকে বিশ্বমানবতার বা বিশ্বপ্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তির আকর্ষণ—এই দুই শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতির চিত্ত আন্দোলিত। জাতি হিসাবে মাথা

য়ে দাঁড়াতে হ'লে জাতিকে অবশ্যই কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে, সমাজে উদার বধিবিধান চালু করতে হবে—জাতিকে দেহে মনে স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত য়ে উঠতে হবে—এক কথায় আবার "মানুষ" হতে হবে। এই কারণে াতির লুপ্ত "মনুষ্যত্ব"কে উদ্ধার করার জন্য—সর্বসংকীর্ণতামুক্ত মানবতার দ্বোধনের জন্য মুক্তিকামীরা তখন চেষ্টিত। নাট্যকারেরাও রসরূপ সৃষ্টির পথে াতির এই মুক্তি প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছেন। হাস্যরসের, করুণরসের, ররসের, যে রসের ছাঁচই তিনি গ্রহণ করুন, সকলেরই মধ্যে কিন্তু বেশী কম াতীয় জীবনের সমালোচনার উদ্দেশ্যটি এবং সমালোচনার দ্বারা সমাজের র্বলতা দূর করার ইচ্ছা ও জাতির আত্মসংবিদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যক্ত য়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য রচনা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় ্যকার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুগের দাবী মেটাতেই তাঁর প্রকাশ ক্তিকে প্রয়োগ করেছেন। কোথাও জাতির বা ব্যক্তির দুর্বলতার উপর স্যের রশ্মি নিক্ষেপ করেছেন সংশোধনের অভিপ্রায়ে, কোথাও বা জাতির তীত মহিমাকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেষ্টা করেছেন, জাতির ন-প্রাণে আলো ও তাপ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয়তাবাদী রামান্টিকতার মধ্যে যে 'সহজ ইতিহাস-স্মরণ-প্রবণতা' (Historical introspective tendency) থাকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাতেও সেই প্রবণতা রামাত্রায় পাওয়া যায়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাবাই, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, হল বিজয় প্রভৃতি নাটক রচনার মূলে আর যে প্রেরণাই থাক, এইগুলি তঃ জাতীয়তাবাদী রোমান্টিক আবেগের প্রেরণাতেই রচিত। জাতীয়তা-ধজনিত উদ্দীপনার তাগিদেই নাট্যকারের মন সেই অতীত যুগে ফিরে গেছে ক নির্বাচন করেছে সেই জীবন যেখানে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনা, ণ রক্ষার চেয়ে মান রক্ষার আবেগ ঐকান্তিকতর এবং ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জ স্বার্থের স্বীকৃতি। জাগ্রত চেতনা জাগ্রতকেই খুঁজে নিয়েছে, উদ্দীপিত

প্রাণ উদ্দীপ্তকেইআশ্রয় করতে চেষ্টা করেছে এবং দূরাভিসারী দূরাভিযাত্রীকেই নিজের মুখপাত্র করতে উৎসুক হয়েছে। কথায় বলে 'যার যেমন মন তেমনি ধন'। প্রত্যেক নির্বাচনের মূলেই "আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ" থাকে; এ ক্ষেত্রেও আছে এবং সেই আন্তর হেতু কি তা' আগেই বলেছি। এহ আন্তর হেতুর প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয়চেতনায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করার প্রেরণা—জাতির শৌর্যবীর্যকে উদ্বোধিত ক'রে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে জাতিকে প্রস্তুত করে তোলার আবেগ। বলা বাহুল্য, এই আবেগটির মূলে স্বাভাবতই 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি' গণনা আছে। জাতীয়তা-চেতনার স্বভাবেই এই আত্মপরায়ণতার সংবীর্ণতাটুকু আছে; কারণ ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা যে দেয়, "যোগ্যতমের উদবর্তন"-নীতি মেনে যাকে চলতে হয়, তার স্বভাবে স্বার্থপরায়ণতা এবং আনুষঙ্গিক মনোভাব অর্থাৎ ঈর্ষা, আক্রোশ, হিংসা প্রভৃতি একটু মিশে থাববেই। 'প্রবৃত্তিরেষো ভূতানাম্'। জাতীয়তা জাতির প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির মতোই সে স্বার্থপারায়ণ। তার প্ররোচনা শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, অপর জাতিকে কোণ-ঠাসা করা, স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে জাত্যভিমানকে সবলের উপরে সম্মানের আসন দেওয়া—বিজিগীষাকে ও শৌর্যকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সকলের উপরে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দিক থেকে দেখলে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমিকতার বেশ একটু বিরোধ আছে। বিশ্বমানবতার প্রেরণা এর ঠিক বিপরীত। বিশ্বমানবতা প্ররোচনা দেয়—জাতির গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আপন ক'রে নিতে—জাত্যাভিমানের উপরে মনুষ্যত্বের অভিমানকে স্থাপনা করতে, বিজিগীষাকে দমন করতে, প্রতিযোগিতা বন্ধ করে, সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে—এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে আনন্দোজ্জ্বল মুক্ত মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্বমানবতাবোধে

সুন্দর একটি সমন্বয় ঘটেছে। এ কথা সত্য যে জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় তিনি স্বজাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা উচ্চকণ্ঠে দাবী করেছেন এবং সে দাবীর সুরে মাঝে মাঝে অন্য জাতির প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার আমেজও ফুটে উঠেছে, কিন্তু এই সংকীর্ণতার আমেজটুকু কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বমানবত্বের মহনীয় ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে, নাট্যকার বিশ্বমানবতার ধ্রুব আদর্শকে এত প্রোজ্জ্বল রূপে ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর হাতে জাতীয়তাবাদ কখনই সংকীর্ণ জাতিবিদ্বেষে পর্যবসতি হয়ে যায়নি। মহত্তর ভাবাদর্শের আকর্ষণের ফলে, পাঠকের বা দর্শকের চিত্ত কখনই সম্প্রসারণশীলতা হারিয়ে ফেলে না—জাতি-বিদ্বেষে সংকুচিত হয়ে যায় না। তবে, ভাবাদর্শের এই প্রাধান্যের ফলে নাটকের সর্বাঙ্গে লক্ষণীয়রূপে রোমান্টিকতা সাঞ্চারিত হয়েছে—চরিত্রগুলি যত না। জীবনধর্মকে অনুসরণ করেছে তার চেয়ে বেশী অনুসরণ করেছে ভাবের আদর্শকে। যদিও সাহিত্যে ভাবই রূপ হয়ে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ চরিত্রমাত্রেই ব্যক্তিত্বকে তথা বিশেষ বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করে, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভাব যেখানে আবেশে পরিণত হয়, চরিত্র যেখানে "reality Principle"-এর সীমা লঙ্ঘন করে যায়, সেখানে ভাবাতিরেক-দোষ তাকে স্পর্শ করে এবং বাস্তব পরিবেশ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর্থাৎ নিজের বশে না থেকে—পবিস্থিতির সঙ্গে স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগে যুক্ত না থেকে, চরিত্র স্রষ্টার ভাবাবেশের তাগিদে আচরণ করে—চরিত্র "রোমান্টিক" হ'য়ে ওঠে। ভাবাবেশের আতিশয্য থেকেই অবাস্তব পরিস্থিতির ও চরিত্রের পরিকল্পনা জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এই আবেশ সঞ্চারিত হয়েছ সৃষ্টির প্রকৃতিকে রোমান্টিক করে তোলে। **দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনা শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও রোমান্টিক।** এই প্রসঙ্গেই **আকৃতিগত রোমান্টিকতা** সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রকৃতিগত রোমান্টিকতার স্বরূপকে যেমন "রিয়েলিজম্"-এর বিপরিত কোটিতে স্থাপনা করে দেখানোর চেষ্টা

হয়েছে—আকৃতিগত রোমাণ্টিকতাকেও তেমনি ক্লাসিসিজিমের বিপরীতবর্মী বলা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—ক্লাসিকাল রীতি বলতে বুঝায় সেই 'রীতি' যা' "ঐক্য"-বিধির প্রাচীন সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ স্থান-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং ঘটনা-ঐক্য মেনে যেভাবে গ্রীসে নাটক রচনা হ'য়েছিল, সেইভাবে ঐক্য-বিধি মেনে চলতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ এই রীতিতে লেখা নাটকের বৃত্তে কোন উপধারা বা প্রাসঙ্গিক বৃত্ত (sub-plot) থাকে না।—কয়েকটি অপরিহার্য চরিত্রের সাহায্যে একটিমাত্র এবং একদিন-নিবর্ত্য কার্যকে (action) নাট্যকার অনন্যমনা হয়ে উপস্থাপিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাগুলি একটিমাত্র স্থানে ঘটানোর দিকে এর ঝোঁক ঐকান্তিক। তৃতীয়তঃ বার ঘণ্টার বা চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপ্তির মধ্যে সব ঘটনাকে ঠেসেঠুসে ধরানো—এর অন্যতঃ বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। এই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা যে রচনায় পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় "'ক্লাসিকাল"-ধর্মী। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে—কর্ণেই-রাসিনের নাটকে এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম পাওয়া যায় ব'লে তাদের "ক্লাসিকাল" ব'লেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এবং এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের নাট্যকারদের—মার্লো, শেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটকে একাধিক উপবৃত্ত সমন্বিত বৃত্ত অর্থাৎ বৃত্তের আকৃতিগত রোমাণ্টিকতা থাকায় তাদের বলা হয়—রোমাণ্টিক। ঐ ধরনের রচনারীতি পাংক্তেয় বা রুচিসম্মত হয়ে যাওয়ায়, আকৃতিগত রোমাণ্টিকতা আজ আর কোন নিন্দার কথা নয়। আজ আমরা বহু দেশ-কাল-পাত্র—পাত্রী সমন্বিত নাটক (orchestration of life) দেখতে এত অভ্যস্ত যে ক্লাসিকাল-ধর্মী কোন নাটক দেখে আমাদের মন ভরতে চায় না। রোমাণ্টিক রীতিই আজ সাধারণ বা সর্বজনগ্রাহ্য রীতি এবং যেখানে সবই রোমাণ্টিক সেখানে, বলা চলে, রোমাণ্টিক ব'লে কিছু নেই। ক্লাসিকাল গঠনের নাটক থেকে নতুন নাটককে রোমাণ্টিক ব'লে পৃথক করবার প্রয়োজন আজ আর

তেমন অপরিহার্য নয় এবং নয় ব'লেই-নাটক-বিচারে আকৃতিগত অর্থাৎ গঠনগত রোমান্টিকতার উল্লেখ আজ নিষ্প্রয়োজন। উল্লেখের প্রয়োজন হবে সেইদিন যেদিন আবার ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটক লেখার রীতি নতুন ক'রে দেখা দেবে। পরে যাই হোক এখানে রোমান্টিক গঠন সম্পর্কে বিশেষ করে যা জানবার আছে তা বলা হ'ল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির—বিশেষ ক'রে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির গঠন যে রোমান্টিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরোমান্টিক এ বিষয়ে বেশী ব্যাখ্যা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সকলেই জানেন, **অধিকারীক বৃত্তের** সঙ্গে একাধিক **প্রাসঙ্গিক বৃত্ত** সংযুক্ত হওয়ার ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক "many actions of many men"-এর জটিল ও বিরাট সমারোহপূর্ণ উপস্থাপনায় পরিণত হয়েছে। শুধু যে প্রধান কাহিনীর কার্যেই ক্রমপরিণতি দেখানো হয়েছে তা নয়, অপ্রধান কাহিনীর কার্যকেও ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে উপসংহারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কথা স্বীকার্য বটে—বহুর-সংযোগে একের যে জটিল অস্তিত্ব, তাকে দৃশ্য করতে হ'লে, বহু দেশকালের ও পাত্রপাত্রীর সংযোগ উপেক্ষিত কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে নাটকে "বহু" কে উপস্থাপিত করার বিশেষ উপায় এবং মাত্রা আছে। কাকে দৃশ্য করতে হবে, কাকে অদৃশ্য রাখতে হবে—সে সম্বন্ধে নাট্যকারের অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ ঘটনার বা পরিস্থিতির ভেতর থেকে, সমর্থকে নির্বাচন করে নেওয়ার এবং অসমর্থকে পরিহার করার শক্তি যাঁর নাই, তাঁর হাতে নাটক অনেকক্ষেত্রে দৃশ্যাকারে উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনাকে দৃশ্য করে তোলার নাটকীয় সংহতির ও একাগ্রতার স্থূল উপন্যাসের বিস্তারধর্মিতার প্রকাশ পায়। আপাততঃ মনে হতে পারে নাটকের মূল উদ্দেশ্য জীবনের রূপকে দৃশ্যাকারে ব্যক্ত করা এবং সেই হিসাবে সব কিছুকে দৃশ্য করতে পারলেই তো নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করা হয়, কিন্তু তা যে হয় না এবং হয় না নাটকের ঐ দৃশ্যধর্মিতার জন্যই এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। অভিনয়কালের

পরিমাণ এবং দর্শকের গ্রহণশক্তির পরিধি বা ফোকাস দ্বারা নাটকের আয়তন বা গঠন সীমাবদ্ধ বলে, নাট্যকারকে সংহত ভাবে বৃত্ত রচনা করতে হয়—রসকেন্দ্র থেকে সরে আছে যে ঘটনা, সে ঘটনাকে বাদ দিতে হয় বা অন্য কৌশল প্রয়োগ করে বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অবশ্য, দর্শকের গ্রহিষ্ণুতা তথা সহিষ্ণুতা অভিনয়কালের পরিমাণ বা প্রথা দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সুতরাং বিস্তারধর্মিতা থাকলেই যে নাটক নিন্দনীয় হবে এমন কোন কথা হ'তে পারে না! সে যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের এবং তদানীন্তন নাট্যকারদের নাটকের গঠনে বিস্তারধর্মিতা একটু বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায় এবং পাওয়া যায় এই কারণেই যে তখন অভিনয় চলত চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে। এই দীর্ঘ সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই তখনকার নাট্যকাররা আবশ্যককে সর্বতোভাবে পরিহার করবার জন্য তেমন কোন তাগিদ বা চাপ বোধ করেননি। তিন বা আড়াই ঘণ্টার বাঁধা-সময়ের চাপ থাকিলে অবশ্যই তাঁরা বৃত্তকে সম্প্রসারিত না ক'রে সংহত করতেন—অনেক কিছু কাটছাঁট দিয়ে যাদের না-দিলে নয় শুধু তাদেরই উপস্থাপনা করতেন।—এত বেশী ক'রে "Orchestration of life" দেখাবার অথবা "art of gradual development" অবলম্বন করার সুযোগ পেতেন না। অন্বয়-ব্যাতিরেক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অর্থাৎ এক থাকলে অন্য থাকবেই—এমন বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখাতে গেলে, মূল কার্যের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে ঘটবেই। শেক্‌সপীয়রের নাটকের আদর্শে আমাদের নাটকের গঠন পরিকল্পিত বলে, এবং দেশীয় নাটকের—বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের মেজাজের সঙ্গে ঐ আদর্শের কোন বিরোধ ঘটেনি বলে, গোড়া থেকেই আমাদের নাটকে—বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটকে concentration-এর পরিবর্তে orchestration-এর ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই ঝোঁক কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং যেখানে কোন রস সুনিষ্পন্ন হয়নি অর্থাৎ বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের উপস্থানার ফলে বিশেষ একটি

"ভাব" একাগ্র এবং সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি, সেখানে নাটকের চেয়ে উপন্যাসের বা রোমান্সের ধর্মই বেশী ক'রে ব্যক্ত হয়েছে। তবে, এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলা দরকার এবং সে কথাটা এই যে, ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটকের সংহত রূপের আবেদন একাগ্র ও তীব্রতর বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক-ধর্মী বৃত্তের মধ্যে, বহু সম্পর্ক যুক্ত জীবনের জটিলতাকে যে পরিমাণে স্থান করে দেওয়া যায় তথা ব্যক্ত করা যায় ক্লাসিকাল-ধর্মী নাটকের বৃত্তে তা করা যায় না। 'আধুনিক রুচি' জীবনসম্পর্কের বিচিত্র ও জটিল রূপের উপস্থাপনা আস্বাদন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিচিত্রের সমবায়ে যে সেই 'ঐক্য'ই আজ সে কামনা করে, অতএব বিস্তৃত পটভূমিকায় জীবন সংগ্রামের রূপ উপস্থাপনা করবার চেষ্টা যেখানে আছে, তাকে, অনাটক ব'লে উপেক্ষা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বাংলা নাটকের বিস্তারধর্মিতা দেখে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁদের প্রথমেই ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—নাটকের 'আদর্শ রূপ' বলে কোস কিছু সুনির্ধারিত ছাঁচ আছে কি না। ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক রীতির মধ্যে কোনটিকে আমরা খাঁটি রূপ ব'লে মেনে নেব এবং রোমাণ্টিক ধর্মী গঠনকে স্বীকার করে নিলে, বিস্তাররোধকল্পে তিন-ঘণ্টা-নিষ্পাদ্য অভিনয়েব সর্ত ছাড়া আর কোন সর্ত আরোপ করা উচিত কি না। এই সব প্রশ্নের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের নাট্য রচনার রূপকল্প সম্বন্ধে সচেতন থাকলে উন্নাসিকতার মাত্রা অবশ্যই কমে যাবে।

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক নাটক ও মেবার-পতন

সাহিত্য-শিল্পের স্বতন্ত্র এলেকার চতুঃসীমা নির্দেশ করতে গিয়ে, সাহিত্য-দার্শনিকেরা, অনেক আগেই, সাহিত্যের যে সীমান্তে ইতিহাস রয়েছে সেই সীমানার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। আকর্ষণ করার হেতু এই যে ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনী-মূলক

কাব্যের এমন একটা আপাত সাদৃশ্য আছে যা' দেখে অনেকেই মনে করতে পারেন যে ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে, উভয়কে পৃথক করা চলে না। আপাত সাদৃশ্য রয়েছে এখানেই যেখানে উভয়েই জীবনের ঘটনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে—দর্শন-বিজ্ঞানের মতো সাধারণ সিদ্ধান্তের বা তত্ত্বের অবতারণা করে না। এই কারণে দর্শন বিজ্ঞানকে যে অর্থে 'শাস্ত্র' বলা চলে, ইতিহাসকে সেই অর্থে পুরোপুরি শাস্ত্র বলা চলে না, যদিও দর্শন-বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসেরও মুখ্য উদ্দেশ্য—জ্ঞানপ্রচার করা। জ্ঞানপ্রচারে ঐক্য থাকলেও, যেখানে দর্শন-বিজ্ঞান যোগায় তত্ত্ব-জ্ঞান (universal) সেখানে ইতিহাস যোগায় বিশেষ ব্যক্তির ও ঘটনার বিবরণ তথা অতীতের জ্ঞান—'particular'কে। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের যেটুকু সাদৃশ্য তা' এখানেই—ঐ 'বিশেষ'কে প্রকাশ করাতেই—জীবন্ত মানুষের জীবনদ্বন্দ্বের—জীবনযাপনের—সুখদুঃখময় নানাবস্থার অনুলেখনে "Concrete living"এর রূপ প্রকাশ করাতে।

কিন্তু এই আপাতসাদৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে—মৌলিক পার্থক্যটুকু। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যেখানে বিশেষের বিবরণ দেওয়া—যা ঘটে গেছে তার যথাযথ বিবরণ বা জ্ঞান প্রচার করা—কাব্যের উদ্দেশ্য, সেখানে বিশেষকে অবলম্বন করে অর্থাৎ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে, যা ঘটেছে শুধু তাকেই নয়, যা ঘটতে পারে অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণের সম্ভাব্য রূপটিকে ব্যক্ত করা—ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্ত সম্ভাবনা দেখানোর চেষ্টা করা—জীবনের ঘটনা নিয়ে একটা বৃত্ত (complete whole) তৈরী করা—রসরূপ সৃষ্টি করা। এক কথায় জীবনকে 'Idealize' করা, বিশেষ একটি ভাবের ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করা। এই কারণেই "art is more philosophical than history."

বাস্তবিকই, জীবনকে উপাদান ক'রে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে, উপাদানকে স্বরূপে উপাদেয় ক'রে তুলতে হবে—এ কথাটা সব সময়েই মনে রাখতে

হবে। রূপমাত্রেই শিল্প নয়, শিল্প হচ্ছে রসরূপ—যে রসনীয় হয়েছে—যে রূপের সংযোগে বিশেষ কোন স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। উপাদান পুরাণ থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বা ইতিহাস থেকেই নির্বাচন করা হোক অথবা সমসাময়িক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করা হোক। বড় কথা এবং আসল কথা—উপাদানকে উপাদেয় রসরূপ দেওয়া—উপাদানের সাহায্যে বিশেষ কোন 'ভাব'কে ব্যক্ত করা। উপাদান নিমিত্ত-মাত্র। ব্যক্তি-রূপ, সে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক যাই হোক না কেন, ভাবের অঙ্গ' না হওয়া পর্যন্ত, আর যাই হোক শিল্প-সুন্দর নয়। কবি-মানসের প্রবণতা অনুসারে এবং সামাজিক বাসনার চাহিদা অনুসারে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়ের কোন একটি বিষয় নির্বাচিত হ'তে পারে, কিন্তু বিষয় নির্বাচনেই তো সৃষ্টির শেষ নয়। অর্থপূর্ণ বিষয়নির্বাচন অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুর সামাজিক চাহিদা আছে—সমাজের মূল্যবোধকে যা' পরিপোষণ করে, তা নির্বাচন করা অবশ্যই প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে কৃতিত্বের কথা—মূল্যবান বিষয়কে চিত্তাকর্ষক রসরূপে পরিণত করা। শিল্পীর দক্ষতা নির্ভর করে চিত্তাকর্ষ রসরূপ সৃষ্টি করার উপরেই। পৌরাণিক কাহিনীর অথবা ঐতিহাসিক কাহিনীর কৌতূহল মূল্য যতই থাক, অর্থাৎ সামাজিকের প্রত্ন কৌতুহল বা ধর্মোদ্দীপনা মেটাবার উপযোগিতা তাদের যতই থাক, যতই তারা পুরাণের বা ইতিহাসের আনুগত্য রক্ষা করুক, যে পর্যন্ত না তারা "রস-রূপ" লাভ করে, সে পর্যন্ত তারা শিল্পের মর্যাদাই পায় না। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান সমালোচক গট হোল্ড এফ্রায়েম লেসিঙ যা বলেছেন তা' উদ্ধৃত করা যেতে পারে—Now, Aristotle has long ago decided how far the tragic poet need regard historical accuracy, not further than it resembles a well-constaucted fable where with he can combine his intention. He dcse not make use of an event because it really happened, but because

it happened in such a manner as he will scarcoly be able to invent more fitly for his present purepose. If he finds this fitness in a true case, then then true case is welcome; but to search through history books does not reward his labour ....."(No, 19) ..In short, tragedy is not history in dialogue. History is for tragedy nothing but a store-house of names wherewith we are used to associate certain characters. If the poet finds in history circumstances that are convenient for the adornment or individualizing of his subject; well let him use them" (No. 24). আসল কথা, ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য দৃশ্যাকারে ইতিহাস রচনা নয়, উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির রূপের মাধ্যমে জীবন-ভাষ্য রচনা করা। নাট্যকারের কাছে ইতিহাস রসসৃষ্টির উপাদান বা উপায় বিশেষ; তার লক্ষ্য—রসসৃষ্টি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তির বিচিত্র ঘটনাময় জীবন থেকে ট্র্যাজেডির বা কমেডির বিশেষ একটি রস-মূর্তিকে উদ্ধার করা। ঈশপের কাহিনী এবং নাটকের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে লেসিঙ যা বলেছেন—তা আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করবে; তিনি বলেছেন—ঈশপের নীতিমূলক কাহিনী—"intends to bring a general morrl axiom before our contemplation we are satisfied if this intention is fulfilled and it is the same to us whether this is so by means of a complete action that is in itself a rounded whole or no. The poet may conclude wherever he wills as soon as he sees his goal. It does not concern him what interest we may take in the persons througtgh whom he works out his intention; he does not want to

interest but to instruct ; he has to do with our reason not with our heart—this latter my or my not be satis fied so long as the other is illumined. অন্যপক্ষে নাটক—"makes no claim upon a single definite aolom flowing out of its story. It aims at passions which the course and events of its fable arouse and treat, or it aims at the pleasure accorded by a true and vivid delinertion of characters and habits.—যদিও—"Both nequire a certain integrity of action. a certain hanmonious end which we do not miss in the moral tale because our attention is solely directed to the general axiom of whose especial application the story affords such an obvious instance". (No 35) । লেসিঙের আলোচনার সারমর্ম এই যে ইতিহাস ঘটনার যথাযথ বিবৃতিমাত্র ; ঘটনার সুষ্ঠু বিন্যাসের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত অর্থাৎ "a complete action that is in itself a rounded whole" রচনা করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। নীতিমূলক কাহিনীতে বৃত্ত রচনার চেষ্টা থাকে বটে, কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্য—সাধারণ নীতি-সূত্র প্রচার করা—"general moral axiom" প্রচার ক'রে নীতিশিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ চরিত্র বা রসসৃষ্টি নীতিপ্রচারেরই উপায়মাত্র, সুতরাং গৌণ। নীতিকথাটিকে লোকের মনে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধরিয়ে দিতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ, সে সন্তুষ্ট। নাটক নীতিমূলক-কাহিনী থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। ব্যক্তিজীবনের একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত-রচনা করায় সে ইতিহাস থেকে হয় পৃথক এবং নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য মুখ্য না থাকায় নীতিমূলক কাহিনী থেকে হয় ভিন্ন। নাটককে এমন একটি বৃত্ত-রচনা করতে হয় যাকে ইংরেজিতে বলা চলে—"a complete action that is in itself a rounded whole" এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জীবন্তরূপ রূপ বা

জীবনালেখ্য সৃষ্টি করা তথা দর্শক-পাঠকের মনে রসের উদ্রেক করা—এক কথায় রূপ ও রস সৃষ্টি করা। এই রূপ-মূল্য এবং রস-মূল্যই সাহিত্য শিল্পের আসল মূল্য। এই মূল্যে যা যত মূল্যবান তা' তত সার্থক সৃষ্টি। রূপের মাধ্যমে রসসৃষ্টি—এক কথায় যাকে বলা হয় রস 'রস-রূপ বা রমণীয় রূপ সৃষ্টি—এই মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে যে যত দূরে সরে যান, শিল্প-এলেকা থেকে তিনি তত দূরে সরে যেতে থাকেন। প্রতিপাদ্য কোন তত্ত্ব (Idea) বা নীতি যেখানে রূপকে গুণীভূত করে ফেলে, সেখানে সৃষ্টি বিশুদ্ধ শিল্পের উচ্চ স্তর থেকে নেমে 'নীতিমূলক কাহিনী'র স্তরে এসে দাঁড়ায়। আবার যেখানে রূপ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত গড়ে উঠে না—রচনা এলোমেলো ঘটনাসমাবেশ—অর্থাৎ অন্বয়বিহীন রূপকল্পনায় পর্যবসিত হয়, সেখানেও বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের মান থাকে না।

শিল্পের আত্মার রস এবং রসের মূল্যেরই উপর তার আত্মিক মহিমা নির্ভর করে বটে; কিন্তু 'রূপ' যেহেতু রসের আশ্রয়, রূপের সুষমা ও সার্থকতার মধ্যেই সৃষ্টির উৎকর্ষ নিহিত থাকে। সমন্বয় গুণের উৎকর্ষে শিল্পের সমগ্র রূপটি সুষমা মণ্ডিত হয় এবং অর্থ (significance) প্রকাশের সত্যতায় প্রত্যেকটি রূপ সার্থক হয়ে উঠে। প্রথমটি আসে বিভিন্ন অংশের অঙ্গাঙ্গিযোগের ফলে, দ্বিতীয়টি দেখা দেয়— bjectificcation বা concaretization, characterisation বা individualization-এর চমৎকারিত্বের ফলে—প্রত্যেকটি রূপের পূর্ণ বিকাশের বা সৌন্দর্যের ফলে।

তবে, রসরূপ তৈরী করা শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও বিষয়ের বা উপাদানের প্রকৃতি দ্বারা শিল্পীর কল্পনাশক্তি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে না। পৌরাণিক বিষয় বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে যখন শিল্পীকে কাজ করতে হয়, তখন যেমন রসসৃষ্টির দিকে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তেমনি সচেতন থাকতে হয় উপযুক্ত পরিবেশ ও চরিত্র পরিকল্পনা বিষয়ে। একদিকে যুগ-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার দায়িত্ব থাকে, অন্যদিকে থাকে পুরাণ কথিত বা ইতিহাস

প্রথিত চরিত্রের বহুশ্রুত বৈশিষ্ট্য গতি ও পরিণতির প্রতি অনুগত থাকার দায়িত্ব। পৌরাণিক নাটকে যেমন আমরা পৌরাণিক যুগের পরিমণ্ডল এবং চরিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা করি, ঐতিহাসিক নাটকেও তেমনি আমরা যুগ-পরিমণ্ডল এবং চরিত্রের যুগোচিত আচরণ প্রত্যাশা করে থাকি। এই প্রত্যাশা পূরণ করার দায়িত্ব নাট্যকারকে গ্রহণ করতে হয় এবং হয় রসনিষ্পত্তির খাতিরেই। আস্বাদনে বা উপলব্ধিতে যা বাধা সৃষ্টি করে, শিল্পী তাকে পরিহার করেন। শিল্পীকে প্রথার বা সাধারণের অভিজ্ঞতার অনুবর্তন করতে হয় এই কারণেই অর্থাৎ অবাধ রসনিষ্পত্তির জন্যই। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের মনে মোটামুটি একটা ধারণা থাকেই। নাট্যকার যদি তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন ধারণা আমদানী করতে চেষ্টা করেন, তখন সাধারণের সংস্কারের সঙ্গে নাট্যকারের সৃষ্ট রূপের বিরোধ ঘটে। নাট্যকারের সৃষ্ট রূপ দর্শক-পাঠকের বাস্তবতাবোধে তথা ঔচিত্যবোধে ধাক্কা দেয় এবং রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ঘটনাকে ও চরিত্রকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা নাট্যকারের আছে—এ কথা সত্য বটে কিন্তু এ কথাও সত্য, সব কিছুকে বিপরীত কল্পনা করার অধিকার নাট্যকারের নেই। রসসৃষ্টি যাঁকে করতে হবে তাঁকে লোকভাবের অনুবর্তন করতেই হবে। ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকার যদি ইতিহাসের বিবরণ না মেনে চলেন গোড়াতেই তিনি দর্শকের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি মাথায় তুলে নেন এবং অবাধ রসনিষ্পত্তির পথকেও বন্ধুর করে তোলেন। এই কারণেই, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিকত্বের এবং ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিকত্বের পরিমাণ কত কি আছে না আছে তা যাচাই করতে যাওয়ার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। অন্য কারণেও ঐতিহাসিকত্ব যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন-কথা যেখানে প্রকাশ্য বিষয়, সেখানে প্রকাশের যথাযথ বিচার করতে হ'লে ঐতিহাসিকত্বের হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন একবার উঠবেই।

সাহিত্য কল্পনাময় সৃষ্টি সত্ত্বেও, যেমন তার রূপকল্পের বাস্তবতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠে থাকে অর্থাৎ কল্পিত রূপের সঙ্গে লৌকিক রূপের সাদৃশ্য যাচাই করে দেখার ইচ্ছা জেগে থাকে, তেমনি ঐতিহাসিক নাটক, স্বরূপতঃ রসরূপ হওয়া সত্ত্বেও, তার রূপের বিচার করবার সময়ে, সমালোচকরা রূপের রসোদ্দীপকতা বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকতা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে থাকেন। ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনা বা ব্যক্তি সামান্য ঘটনা বা ব্যক্তি বটে, কি বিশেষতঃ তারা ঐতিহাসিক তথ্য। তাদের যাথাযথ বিচারে ঐতিহাসিকত্ব আছে কি নেই এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। বাস্তবতার বিচার যেমন রূপ ' How fer true to life—এই প্রশ্নটিরই বিচার, তেমনি ঐতিহাসিকতার বিচার রূপ অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্র How far true to history—এই প্রশ্নটিরই বিচার।

'মেবার-পতন' নাটকখানিতে রাজপুত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়কে, , চিরোন্নতশির মেবারের স্বাধীনতারক্ষাকল্পে প্রাণপণ সংগ্রাম এবং জাতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য মেবারের শোচনীয় পতন—উপস্থাপিত করেছে। মেবার রাজস্থানের রাজ্যমালার মধ্যমণি। মেবার রাণা রাজপুত কুল-তিলক। মেবার শুধু একটি নাম নয়, 'মেবার' একটি প্রতীক—মরণপণ প্রতিরোধ-শক্তির ও ঐকান্তিক স্বাধীনতাকামনার প্রতীক। বাপ্পার সময় (৪৮ সম্বত) থেকে আরম্ভ করে অমর সিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা স্বীকার (১৬১৩) পর্যন্ত মেবারের ইতিহাস পরম বিস্ময়কর বীরত্বের ও জলন্ত জাত্যাভিমানের ইতিহাস। অমর সিংহ, রাণা লক্ষ্মণ সিংহ, ভীম সিংহ, পদ্মিণী, চণ্ড, রাণা কুম্ভ, রাণা সঙ্গ, সংগ্রাম সিংহ, প্রতাপ সিংহ, অমর সিংহ প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের স্মরণীয় বীরত্বের ও আত্মত্যাগের মহিমায় মেবার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, তা'তে বীরত্ব, জাত্যাভিমান মৃত্যুপণ-সংগ্রাম প্রভৃতি গুণগুলি 'মেবার' নামের সার্থক হয়ে উঠেছিল। পাঠান মোগলের বার বার আক্রমণে হিন্দু ভারতের শৌর্যবীর্য ক্রমে ক্রমে যখন নিস্তেজ ও পর্যুদস্ত হয়ে

যাচ্ছিল, রাজস্থানের রাজ্যগুলি একে একে যখন মোগলের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হচ্ছিল, তখন একমাত্র মেবারই হিন্দু-ভারতের প্রাণেরশিখাটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। প্রাণ দিয়ে মান বাঁচাতে—মৃত্যুপণে স্বাধীনতা রক্ষা করতে মেবার ছিল কৃতসংকল্প—ছিল সুদীক্ষিত। রাজা প্রজা সকলের মন-প্রাণ এক সুরে বাঁধা। প্রাণ বিসর্জ্জনে বিস্ময়কর তাঁদের প্রতিস্পর্ধা। দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্ দীন খিলজির (১৩০৩ খৃঃ) অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার বা গুজরাটের বাহাদুর শাহের নিষ্ঠুর আক্রমণ (১৫৩৭-খৃঃ) মেবারের প্রাণশক্তিকে আঘাত করেছিল সত্য, কিন্তু নষ্ট করতে পারেনি। আকবর চিতোর অধিকার করে নিষ্ঠুরতম হত্যালীলায় জিঘাংসু আলা-উদ্দীনকেও হার মানিয়েছিলেন--- "No such horrors were perpetrated by the brutal 'Ala-ud-din' (কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া—৯৯ পৃঃ), উদয় সিংহকে চিতোর ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন—সবই সত্য, কিন্তু একথাও তো অবিস্মরণীয় যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহের অতুলনীয় তেজস্বীতা ও স্বদেশ-প্রেমের আগুনকে কিছুতেই আকবর নির্বাপিত করতে পারেননি। উদয়পুর, কমলমীর, চৌন্দ, ধর্ম্মমতী, গোগুণ্ডা একে একে সব দুর্গই প্রতাপের হস্তচ্যুত হয়েছিল, প্রতাপ প্রান্তরে প্রান্তরে, অরণ্যে অরণ্যে আশ্রয় অন্বেষণ করে ফিরে-ছিলেন, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। আকবর সমস্ত রাজপুতবংশ কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতাপকে তিনি কিনতে পারেননি। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করেছিল, প্রতাপ সে হাটে যাননি এবং যাননি বলেই দুর্বার প্রাণশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে, চিতোর দুর্গ ছাড়া, মেবারের প্রায় সমস্ত স্থানই অধিকার করেছিলেন। প্রতাপের এই অতুলনীয় শৌর্য্যবীর্য্যের কীর্ত্তি দীপ্তি মেবারের গৌরব-মুকুট মণ্ডিত। মেবার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৌর্য্যবীর্য্যেরই নামান্তর। স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমেরই অপর নাম 'মেবার'।

এমন যে মেবার, সেই মেবারেরই পতন ঘটেছিল প্রতাপসিংহের পুত্র অমর

সিংহের রাজত্বকালে। মৃত্যুকালে প্রতাপ নাকি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন "আমার প্রাণোপম পুত্র অমর বি·।সিতার বশীভূত হইবে, মেবারের দুরবস্থা তাহার স্মরণ থাকিবে না। অন্তিমকালে আমি এই যে কুটীরে অবস্থান করিতেছি এ-স্থানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিনির্মিত হইবে। ক্রমাগত পঞ্চবিংশতিবর্ষ কঠোর ব্রতে ব্রতী থাকিয়া আমি যে সমস্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিলাম অমর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার বোধ হইতেছে আত্মসুখের জন্য অমর চির স্বাধীনতা গৌরবে জলাঞ্জলি দিবে, (রাজস্থান) এবং সর্দ্দারগণ প্রতাপের সম্মুখে শপথও করেছিলেন—'মহারাজ! বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনের শপথ করিয়া বলিতেছি, একজনমাত্র রাজপুত জীবিত থাকিতে মেবারভূমি তুর্কির হস্তগত হইবে না; যতদিন আমরা জীবিত থাকিব, কুমার অমর সিংহ কখনই ততদিন আপনার আদেশ লঙ্ঘনে সমর্থ হইবেন না। মিবারের পূর্ব স্বাধীনতা যতদিন পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার না হয়, শপথ করিয়া বলিতেছি ততদিন এই সকল কুটীরে বাস করিয়াই আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিব, বিলাসিতা ও সুখসম্ভোগে আমরা বঞ্চিত থাকিব। (রাজস্থান) সর্দ্দারদের এই প্রতিজ্ঞা-বচন শুনে প্রতাপ কিছুটা স্বস্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন—"আমা হইতে চিতোর উদ্ধার না; জন্মভূমিকে যবন কবল হইতে উদ্ধার করা আমার পুত্র অমর সিংহেরও সাধ্য নহে।"

যবন কবল হ'তে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে অমরসিংহ পারেননি—এ ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু বিলাসিতার বা ভীরুতার জন্যই পারেননি একথা সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। যবনরা কিভাবে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্রয়োগ করে ভারতের প্রায় সমস্তটাই কবলিত করতে চেষ্টা করছিল প্রতাপ নিজেই তা' বুঝেছিলেন। রাজপুতদের মধ্যে তিনি একাই মাথা উঁচু রেখেছিলেন এবং তা' রাখতে তাঁকে সব কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর বাইরের শত্রু মোগল, ভিতরের শত্রু মোগলপদানত রাজপুতরা

মোগলরা না করলেও, মোগলদাস রাজপুতরাই তাঁর উচ্চ শিরকে মোগলের কাছে অবনত করে দিতে চেষ্টা করবে। মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট অধিকারের মধ্যে, ছোট্ট একটি দ্বীপের মত যোঝাযুঝি করে মাথা উঁচু করে থাকা, মেবারের পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হবে না। হিন্দুর দুর্মতিতেই শেষ হিন্দুর দুর্গতি ঘটবে। মেবারের পতনে রাজপুতবংশের শেষ দীপশিখাটি নিভে যাবে। হিন্দুর প্রতিরোধ শক্তির শেষ সংগ্রামের অবসান ঘটবে।

যাঁর পরাজয়ে মেবারের তথা সমস্ত রাজপুতের পতন সম্পূর্ণ হয়েছিল তিনি প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ। তিনি ১৫৯৭ খৃঃ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে টড-রচিত রাজস্থানে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

পিতৃসিংহাসনে আরোহণের পর অমরসিংহ নূতন নূতন নিয়ম, নূতন নূতন প্রথা ও নূতন নূতন কর ধার্য করলেন এবং সামন্তদের নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি দান করে রাজ্যকে বিলক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তুললেন। বহুদিন পর্যন্ত শান্তির ক্রোড়ে থেকে অমর আলস্যের বশীভূত হলেন। পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ বিস্মৃত হলেন। পেশোলাতীরবর্তী পর্ণকুটীরগুলি ভেঙ্গে ফেলে, 'অমরমহল' নামে একটি বিলাসভবন নির্মাণ করালেন এবং চাটুকার পারিষদ-বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই প্রাসাদে নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করতে লাগলেন। যেখানে ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতি দিল্লীশ্বরের অনুগত সেখানে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হ'লে যতখানি সামরিক প্রস্তুতি বা অনুশীলন ও সতর্ক দৃষ্টি অত্যাবশ্যক, অমরসিংহের তা কিছুই ছিল না। অচিরেই তাঁর সুখনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। মেবারের দর্পচূর্ণ করবার জন্য জাহাঙ্গীর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন।

অমর সিংহের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী ভর করলেন। তিনি বিলাস সম্ভোগ পরিত্যাগ করে অনর্থকর যুদ্ধবিভ্রাটে লিপ্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। এক একবার যশোলিপ্সা মনে না জাগছিল তা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই

বিলাসিতার মোহিনী ছায়া এসে তাঁকে আবৃত করছিল। চাটুকারেরা বার বার নিষেধ করতে লাগল; তাঁদের যুক্তি—সেনাবল নেই, অর্থবল নেই, সহায়-সম্বল নেই—ভারতের সমস্ত নরপতি মোগল সম্রাটের অনুবল—এমত অবস্থায় সন্ধিস্থাপনই বিধেয়। রাণাও যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন—সন্ধি স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন।

কিন্তু মেবারের যে সর্দ্দারগণ প্রতাপের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন! তারা চিন্তানলে সন্তপ্ত হ'তে লাগলেন। সামন্ত শিরোমণি চন্দাবৎকে পুরোবর্ত্তী করে তাঁহারা অমর মহলে উপস্থিত হলেন। চন্দাবৎ রাজাকে বললেন—"মহারাজ, প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র আপনি; এই সঙ্কট কালে নিশ্চিন্ত থাকা কি আপনার শোভা পায়? পবিত্র কুলগৌরব নষ্ট হবে বীরকেশরীর পুত্র হয়ে কিরূপে তা প্রত্যক্ষ করবেন? প্রচণ্ড মোগল শত্রু যখন আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান আপনি তখন হীন চাটুকারদলে পরিবেষ্টিত হয়ে কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চিন্ত রয়েছেন? যবনের হাতে মেবার রাজ্য ছারখার হবে, পবিত্র রাজপুতকুলললনার জীবন কলঙ্কিত হবে—কোন্ প্রাণে আপনি তা' সহ্য করবেন? পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র কীর্তি যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারবেন, তবে পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনার রাজ্যে ধিক, ঐশ্বর্য্যে ধিক্, কুলগৌরবে ধিক্।' সর্দারের এত তেজস্বিনী বক্তৃতাও রাণার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। সর্দ্দার অস্থির উত্তেজনায় শিলাখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে, সভাগৃহের ভিত্তিস্থিত মুকুরে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করলেন। মুকুরখানি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। অমরসিংহের দক্ষিণ বাহু ধারণ করে চন্দাবৎ সর্দ্দার সিংহাসন থেকে তাঁকে নামিয়ে আনলেন এবং সর্দ্দারদের সম্বোধন করে বললেন—'সর্দ্দারগণ। প্রতাপের পুত্রকে কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করতে এখনই যুদ্ধযাত্রা কর।'

চন্দাবতের আচরণে রাণা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁকে অপমানকারী, রাজদ্রোহী

প্রভৃতি নানা কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। চন্দাবৎ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। সর্দ্দারগণ পরম সন্তুষ্ট। রাণাকে নিয়ে সদলবলে তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করলেন। জগন্নাথদেবের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়েই রাণা নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ বুঝতে পারলেন এবং চন্দ্রাবৎকৃষ্ণের শত শত প্রশংসাবাদ করতে লাগলেন। দেবীরক্ষেত্রের ঘোরযুদ্ধে (১৬০৮ খৃঃ) প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়লাভ করে সগৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসলেন। জাহাঙ্গীর পরাজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিরুৎসাহ হননি। এক বছর পরেই ১৬০৯ খৃঃ (১৬৬৬ অব্দের ফাল্গুন মাসে) তিনি সেনাপতি আবদুল্লার অধীনে মেবারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। রণপুর নামক গিরিপথে তুমুল যুদ্ধ হল এবং এবারেও মোগলবাহিনী পরাজিত হল।) এই যুদ্ধে দেবগড়ের দুদো সঙ্গাবৎ, নারায়ণদাস, সূর্যমল্ল, ঐশকর্ম্ম, পূর্ণমল্ল রাঠোর হরিদাস, সত্রিপতি ঝালা ভূপৎ, কহিরদাস কচ্ছবাহ, বৈদলার চৌহান কেশব দাস, মুকুন্দদাস রাঠোর ও জয়মলোট প্রভৃতি বীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন।

দুই দুইবার পরাজিত হওয়ার পরে জাহাঙ্গীর মেবারকে জয় করবার জন্ত নূতন কৌশল অবলম্বন করলেন। রাজপুত-কুলাঙ্গার সাগরজীকে সম্রাট্ চিতোরের ধ্বংসাবশেষের উপর রাণা নাম দিয়ে অভিষেক করলেন। চিতোরের ধ্বংসরাশির মধ্যে একদল মোগল সেনা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে নূতন রাণা রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর যে উদ্দেশ্যে সাগরজীকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। মেবারবাসীরা অমরসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করে সাগরের নিকট উপস্থিত হল না। বরং তার নাম শোনামাত্র সকলে ঘৃণায় মুখভঙ্গী করত। এইভাবে সাত বৎসর অতীত হ'ল। স্বজাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষবিষ পান করে তাঁহার দেহন জর্জ্জরিত। "চিন্তার বিষদংশনে তিনি প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে শান্তিসুখ নাই, হৃদয়মন অধীর হইয়া উঠে। এক একবার তিনি সমুচ্চ গগনভেদী অট্টালিকার ছাদে উত্থিত হইতেন, চিতোরের গৌরবস্তম্ভ দেখিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের

কথা স্মরণ হইতে অমনি নিঃসংজ্ঞের ন্যায় বসিয়া পড়িতেন, চারিদিক শূন্যময় বলিয়া বোধ হইত, জগৎসংসার তাঁহার নিকট ভীষণ নরককূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিয়া পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেন। চিন্তার বিভীষিকায় প্রপীড়িত হইয়া সাগরজী ক্রমে ক্রমে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রিকালে একাকী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিনি চিন্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন সহসা এক ভীমকায় ভৈরবমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল ; গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিয়া উঠিল—নরাধম ! রাজপুত-কুলাঙ্গার ! শীঘ্র এ পাপরাজ্য হইতে প্রস্থান কর। নতবা তোর মঙ্গলের আশা নেই।" (রাজস্থান—বসুমতী কার্য্যালয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)।

ভৈরবের ভৈরবমূর্ত্তি দেখেই হোক অথবা যে কারণেই হোক, সাগরজী আর চিতোরে থাকতে পারলেন না ; ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে আহ্বান করে তিনি চিতোরের রাজ্যভার তাঁহাকে অর্পণ করলেন এবং বিজন স্কন্দপর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। শৈলশৃঙ্গেও সাগরজী শান্তি পেলেন না। পুনরায় তিনি দিল্লীশ্বরের কাছে উপস্থিত হলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের তিরস্কারবাক্যে তিনি আরও মর্ম্মাহত হলেন এবং সভাস্থলেই বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করে আত্মহত্যা তথা প্রায়শ্চিত্ত করলেন।* (এই সাগরজীরই কুলাঙ্গার পুত্র মহাবৎ খাঁ ছিলেন জাহাঙ্গীরের সুপ্রসিদ্ধ দুঃসাহসী সেনাপতি।)

চিতোর নগরী ফিরে পেয়ে অমরসিংহ আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। তখন মেবারের প্রায় আশিটি দুর্গ ও নগর তাঁর অধিকারে। পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্গম দুর্গের উপরে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি চিতোরের প্রনষ্ট সৌন্দর্য্যের পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন। প্রতাপসিংহের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতেও দেরী হল না। সম্রাট জাহাঙ্গীর আবার মেবারের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। সংবাদ পেয়ে অমরসিংহও সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হ'ল সেনাদলের হিরোল চালনার (সম্মুখভাগ রক্ষণ) ক্ষমতা নিয়ে। শাক্তবৎ ও চন্দাবৎ—দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল। শত্রু সৈন্য আসছে অথচ দুই দলের মধ্যে মহাকলহ—মহাসমস্যাই বটে। সমস্যা সমাধান করতে অমরসিংহ বললেন—"সর্বাগ্রে যে দল অন্তলাদুর্গে প্রবেশ করতে পারবে, হিরোল রক্ষার ভার সেই দলেরই হস্তে অর্পিত হবে।" সুন্দরভাবে সমস্যার সমাধান ঘটল—চন্দ্রবৎগণ অন্তলা দুর্গ জয় করে হিরোল চালনার গৌরব অর্জ্জন করলেন। অমরসিংহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাবল্লীর দ্বারস্বরূপ 'ক্ষেমনর' নামক গিরিপথে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করলেন (১৬১১ খৃঃ)। এই যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র 'পরভেজ' ছিলেন সেনানী। রাজপুতদের দুর্ব্বার আক্রমণের মুখে মোগল সৈন্য পলায়ন করতে বাধ্য হ'ল। পরভেজও অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন। জাহাঙ্গীরের ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। এবার তিনি পরভেজের পুত্রকে সেনানী পদে বরণ করলেন এবং মহাবীর মহাব্বৎ খাঁকেও তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। এ যুদ্ধেও সম্রাট বাহিনী পরাজিত হল। এমনি করে প্রতাপপুত্র অমরসিংহ সপ্তদশবার মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন।

কিন্তু জাহাঙ্গীর মেবারের দর্প চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। পুনরায় তিনি সমরায়োজন করলেন এবং অন্যতম পুত্র খুররমকে (পরে শাজাহান) মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন (১৬১৩ সাল)। বীরত্বে, সাহসে ও বিক্রমে খুররম ছিলেন সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁর দুধর্ষ আক্রমণ—মেবারের কাছে একা মহা সমস্যা রূপেই দেখা দিল।

"কোষাগার অর্থশূন্য, দুর্গ, সৈন্যশূন্য, অস্ত্রাগার অস্ত্রশূন্য!" তবু মেবারের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জীবন থাকতে মেবারভূমি যবনের হাতে তুলে দেবেন না। সকলে দলে দলে এসে অমরসিংহের কাছে উপস্থিত হলেন। ক্ষমতানুসারে অর্থ সংগ্রহ করে রাজকোষে পাঠাতে লাগলেন। বীরাঙ্গনারা নিজ নিজ বসনভূষণ বিক্রয় করলেন। বণিকরা উদ্বৃত্ত অর্থরাশি

অধিকাংশই রাজকোষে দান করলেন। দেখতে দেখতে রাজকোষ অর্থে পূর্ণ হয়ে উঠল। যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হ'ল। রাণা অমরসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু 'যে বিজয়বৈজয়ন্তী বহুকাল পর্য্যন্ত গিহলোট রাজগণের মস্তকোপরি বিরাজ করিত, বীরকিশরী বাপ্পার বংশধর ভিন্ন আর কেহ কখন যে বিজয় কেতন মস্তকোপরি সমুচ্ছ্রিত করিতে সমর্থ হন নাই, আজ জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান খুরমের সম্মুখে তাহা অনবত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনীতে এই পতনের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায়—"রাণাও অধীনতা স্বীকারে সম্মত আছেন।·· ···রাণা হতাশ হইয়া শুভকর্ণ ও হরিদাস ঝালা নামক দুইটি সর্দ্দারকে খুরমের নিকট প্রেরণ করেন।* সর্দ্দারদ্বয়ের মুখেই প্রকাশ পায় রাণা বৃদ্ধ, স্বয়ং আমার নিকট থাকিতে পারিবেন না, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন. তাঁহার পুত্র কর্ণ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন করিবেন·· ···পুত্রের নিকটও বলিয়া পাঠাইলাম, রাণা সম্মানের পাত্র, কোন প্রকারে যেন তাঁহার সম্মানের ত্রুটি না হয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই যেন সকল বন্দোবস্ত করা হয়।" এই প্রথম মেবারের উচ্চ শির মোগলের পায়ে অবনত হ'ল।

টেড বর্ণিত এই কাহিনীকে ভিত্তি করেই নাট্যকার মেবার পতন নাটকের "বৃত্ত" রচনা করেছেন। এই কাহিনীতে যে ঐতিহাসিক তথ্য বা মর্ম্ম (spirit of history) প্রকাশ পেয়েছে তা' এই যে (ক) অমরসিংহ প্রতাপের অন্তিম মুহূর্ত্তের আদেশ এবং বংশগৌরবের মহিমা রক্ষা করতে ইতস্তত: করলেও অটলপ্রতিজ্ঞ সর্দ্দারদের স্বদেশপ্রীতির ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় শেষ পর্য্যন্ত মোগল শক্তির বিরুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (খ) একাধিকবার তিনি মোগল শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন এবং প্রতাপসিংহের পুত্রের উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। (গ) সগরসিংহকে চিতোরের রাণার পদে অধিষ্ঠিত করে এবং মেবারে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কৌশল

প্রয়োগে জাহাঙ্গীর সিদ্ধকাম হননি। সগরসিংহ মেবারবাসীর কাছে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাননি। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। (ঘ) মোগল সম্রাট্ মেবারের যত বড় শত্রু ছিলেন, মেবারের তার চেয়েও বড় শত্রু ছিল সেই সব রাজপুত বংশ যাহারা আগেই মোগলের কাছে মস্তক ও বংশ গৌরব দুটোই বিক্রয় করেছিল; এমনকি কন্যা দান করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই সব প্রসাদলোভী ধর্ম-ত্যাগীর দল যাহারা রাজপুত অভিমানকে—হিন্দু অভিমানকে—সমূলে বিনাশ করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। গজসিংহ, মহাব্বৎ খাঁ প্রভৃতি তাহাদেরই প্রতিনিধি। গজসিংহ মাড়বারের অধিপতি এবং জাতিতে হিন্দু হয়েও পাঁতিতে মুসলমান আর মহাব্বৎ খাঁ ছিল (টডের মতে)—সগরসিংহের ধর্মত্যাগী সন্তান। জাতিতে রাজপুত হয়েও ধর্মে মুসলমান। (ঙ) শেষ সংগ্রামে মেবারের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মাহুত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোক—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে—যথাসাধ্য অর্থ ও শ্রম দান করেছিল।

এই মূল তথ্য সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ইতিহাসে নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া যায়—মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন-কৃত "হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া" (১৮৮৯ খৃঃ) গ্রন্থে পাওয়া যায়—"Mahavat Khan, when first sent on that service, had gained a victory over the Rana, but was unable to do anything decisive from the strength of the country into which he, as usual, retreated. The same fortune attended Abdullah Khan afterwards appointed to succeed Mohavat; but Prince Khurram who was sent with an army of 20,000 men, evinced so much spirit in his attack on the Rajput troops······that the hana was at last induced to suc for peace, and his offer being readily accepted, he

waited on Shahjahan in person, made offerings in token of submission, and sent his son to accompany the prince to Delhi ... ." এখানে দেখা যাচ্ছে—প্রথমবার মহাবৎ খাঁ দ্বিতীয় বার আব্দুল্লা খাঁ এবং তৃতীয় বার খুর্‌রম (শাহ্‌জাহান) মেবার আক্রমণের অধিনায়ক ছিলেন এবং খুর্‌রমের কাছেই রাণা পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া"র মোগল পর্বে এ-বিষয়ে যে-বিবরণ লেখা আছে তার সার কথা এই:—"Before his accession Jahangir had been deputed by his father to complete the conquest of Mewar, but had proceeded no farther than Fathpur Sikri. Early in his reign he sent his son Parviz with a large force commanded by Asaf Khan and accompained by Raja Jagannath of Amber or Jaipur. Their plan was to instal, as Rana, Sagar, an uncle of the real chief Amar Singh and thus create internal feuds. Amar Singh, who had succeeded his father in 1597 had devoted himself to internal reforms, but had to some extent lost the martial vigour which had marked the rulers of Chitor. *Spurred by his nobles he roused himself, and though the forces sent against him were able to occupy several places and left Sagar in possession of Chitor, they were withdrawn when Khasrau rebelled... ...Jahangir on his return from Kabul to Agra despatched a new force under Mahavat Khan...... After a year a fresh commander, Abdullah Khan who like Mahavat Khan had risen from the lowest rank, was appointed and had more success......... The Punjabi

Raja Basu who had replaced Abdullah Khan in the Mewar Compaign had not been successful in it···Jahangir now falt that he could leave the capital and be nearer the control of the campaign in Mewar··· The Khan Azam ·····had been transferred to Mewar, and at his request Jahangir also deputed his own son Khurram, Raja Basu having died······This arrangement was not congenial to Khurram······Jahangir···removed Khan Azam from the Command····· Relieved of the presence of one whom he believed to be his enemy···Khurram pressed on the occupation of Mewar, establishing posts in a number of places······And though losses were severe···the injury to the defenders were greater. The families of many Rajput nobles were captured, and the fortitude of Rana himself······was gradually sapped. *He sent overtures to Khurram offering to recognise Mughal supremacy, but begging that he might be excused attendance at Court owiug to his age······It was decided that Coitor should over again be fortified. but no matrimonial alliance was enforced······" (পৃঃ ১১১) এই বৃত্তান্ত থেকেও জানা যায়—(ক) মেবার একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিল (খ) পরভেজ, মহাবৎ খাঁ আবদুল্লা খাঁ রাজা বসু, খুররম প্রভৃতির অধীনে বার বার অভিযান চালনা করা হয়েছিল (গ) অমরসিংহ আমাত্য বা সর্দ্দারদের প্ররোচনাতেই যুদ্ধ করতে আবৃত্ত হয়েছিলেন। (ঘ) খুরমের হস্তে রাণা পরাজিত হয়েছিলেন এবং সম্মানজনক শর্তে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। (ঙ) মেবার আক্রমণে

অন্যান্য রাজপুত বংশের রাজাদের কেউ কেউ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকতেন। (চ) গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীর প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সাগরসিংহকে চিতোরের রাণা পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

সুতরাং বলা যেতে পারে—'মেবার পতন' নাটকে ইতিহাসের মূল কাটামো বা মর্ম্ম প্রায় ঠিকই আছে। সামন্তপতি চন্দাবৎ-এর স্থলে শালম্বাপতি গোবিন্দসিংহ "একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া" মারলে এবং রাণাকে হাত ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলে, অথবা সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন কর্মচারীদের নাম একটু এদিক-ওদিক হলে, অথবা টড-অনুসরণে মহাবৎ খাঁকে সাগরসিংহের পুত্র বলে এবং গোবিন্দ-সিংহের জামাতা ব'লে কল্পনা করলেইতিহাসের মর্ম্মে তেমন মারাত্মক আঘাত লাগে না। অবশ্য গোবিন্দ সিংহের কন্যা 'কল্যাণী', অমরসিংহের কন্যা 'মানসী' এবং সাগরসিংহের কন্যা 'সত্যবতী' অস্তিত্বের দিক থেকে আপত্তিকর না হলেও এবং ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্বময় হলেও বাস্তব চরিত্র হিসাবে লঘু হয়ে পড়ায়, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের প্রত্যাশিত বাস্তবতাকে তথা গুরুত্বকে আপত্তিকর মাত্রায় হ্রাস করে দিয়েছে। কল্যাণীকে পতিব্রতা করা মানসীকে বিশ্বপ্রেমে-আত্মহারা করা এবং সত্যবতীকে স্বদেশপ্রেমে সর্বস্বত্যাগী করার স্বাধীনতা নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু স্বাধীনতা যেখানে অসংযমে পরিণত হয় সেখানেই ক্ষতিকর, ব্যক্তি সৃষ্টি করতে নিছক ভাবের প্রতীক সৃষ্টি করলে—অর্থাৎ দেশকাল নিরপেক্ষ ও মাতৃহীন চরিত্র সৃষ্টি করলে সৃষ্টির সামগ্রিক ঔচিত্য ব্যাহত হয়। তাই বলে কল্পনামাত্রই দোষের নয়—বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। গোবিন্দসিংহের মত জাত্যাভিমানী চরিত্র, যিনি স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাড়িয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ করেছেন—তিনি যদি মেবারের পতনে আগে মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে মহাবতের শিবিরে উপস্থিত হন এবং রাজপুত-কুলাঙ্গার কোন গজসিংহের

গুলিতে নিহত হন তাহা হলে ইতিহাসের মর্ম্ম আহত না হয়ে, বেশী করেই প্রকাশিত হয়। তেমনি প্রকাশিত হয় যখন রাণা অমরসিংহ মহাবৎ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং যে মহাবৎ খাঁযের দল মেবার ধ্বংস করেছে তাঁর হাতে তরবারি তুলে দিয়ে বলেন—"এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—'দেখো যেন তার অপমান না হয়।' আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হয়ে যাক।" এবং শেষ পর্য্যন্ত মহাবৎ খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই দুটি ঘটনা ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করেনি, বরং ইতিহাসের মর্ম্মটিকে উদ্ঘাটিতই করেছে—ইতিহাস যাহা' আভাষে বলেছে, নাট্যকার তাহা' উচ্চ ভাষায় বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মেবারের যুদ্ধ মোগলেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ বটে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে, মেবারের যুদ্ধ রাজপুতের বিরুদ্ধে রাজপুতদেরই যুদ্ধ—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁরই যুদ্ধ। খুর্‌রম-চালিত বিশ হাজার সৈন্যের অভিযান, মেবারের পতনের শেষ নিমিত্ত কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ হইল মোগল পদানত রাজপুত রাজাদের কুটিল চক্রান্ত, মহাবৎখাঁর মত মহাবীর যোদ্ধার উদ্ধত আক্রমণ। এই তো ইতিহাসের মর্ম্ম বা আত্মা। নাট্যকার এই মর্ম্মকেই ব্যক্ত করেছেন—ইতিহাসের সূক্ষ্ম দেহটিকে প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই "সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে সম্রাটকে পত্র লিখেছেন; তাই শাহজাদা খুর্‌রম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন"—এই কল্পনা এবং গোবিন্দসিংহের এবং অমরসিংহের শেষ আচরণ ইতিহাসের প্রতিকূল কল্পনা হয়নি তবে, তিন সিংহের তিন কন্যা ভাবাবেগে এবং আচরণে আর একটু সংযত হলে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধি তথা বাস্তবতার গুরুত্ব যে আর বৃদ্ধি পেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বৃত্ত-পরিকল্পনা

মেবার-পতন নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে যে-প্রেরণা কাজ করেছিল, সে-সম্বন্ধে আগেই সামান্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে দুই একটা কথা বলে নিতে চাই। জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হলেও, এই নাটকের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—মেবার-পতন উপলক্ষ্য করে জাতীয় দুর্বলতার এবং পরাধীনতার মূল কারণ বিশ্লেষণ করা—জাতিকে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত করা,—জাতির ক্ষুদ্রতা বদ্ধতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ—প্রাণহীন আচরণে কঙ্কাল উপাসনা প্রভৃতি মনুষ্যত্ববিরোধী দোষগুলির—অর্থাৎ পতনের কারণগুলির উপর আলোকপাত করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির কাছে পুনরুজ্জীবনের ও প্রকৃত মুক্তির পথ—"হতাশাময় বর্তমান" থেকে মুক্তির উপরে নির্দ্দেশ করা। মেবার-পতনের নাট্যকার একাধারে মেবারের মত একটা মহাজাতির পতনের কারণ এবং উত্থানের উপায় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয় চেতনার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জাতির অসহিষ্ণুতা যখন মুক্তির উপায় হিসাবে বিজাতি বিদ্বেষের ও হিংসার সহজ পথ খুঁজে নেওয়ার দিকে ঝুঁকেছিল—আত্মশুদ্ধির দুঃসাধ্য সাধনার প্রকৃত পথে না এগিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার চেষ্টা করছিল, তখন নাট্যকার এবং সমসাময়িক বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জাতির কাছে আত্ম-সমালোচনার এবং আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁহারা বলতে চেয়েছিলেন—"জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়··জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ·········নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে ········· স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে ধরে চিরজীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না।" তাঁহারা বলতে চেয়েছিলেন যে কোন

জাতির পতন হঠাৎ এবং একদিনে হয় না, জাতির পতন আরম্ভ হয় সেদিন থেকেই, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলে. যেদিন থেকে সে স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারিয়ে ফেলে, জাতির জীবন-স্রোত বদ্ধ হয়ে যায় এবং সেই বদ্ধজলার নীচে স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি কীট বংশ বিস্তার করতে থাকে—ধর্মের আসনে প্রাণহীন আচারের কঙ্কাল তথা পাপকে বসিয়ে পূজা করে। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন—যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষেই যায়——যখন জাতি নির্জীব হয়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হয়ে উঠে আর—বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।"—এই দোষ থেকে জাতিকে মুক্ত না কর'লে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করা অসম্ভব। যেখানে ব্যক্তির মন সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্দ্ধে উঠে, জাতীয়-চেতনায় উদার আকাশে এক হ'তে পারে না, ধর্মীয় আচার-বিচারকে মনুষ্যত্বের উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় না সেখানে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সঙ্কল্প শূন্যে সৌধ নির্মাণেরই সমান। যেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, সেখানে সেই অধম জাতিকে রক্ষা করবে কে? যেখানে একজন বিধর্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না, যেখানে ধর্ম ও জাতিকে এক ক'রে দেখা হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক জাতি গঠন—তা জাতীয় সংহতি হবে কি করে? ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না—হবেও না। এই মহাব্যাধির প্রতিকারকল্পে এরা যে-বিধান দিয়েছিলেন—তাহা আমূল —আরোগ্য বিধান—নবধর্মের বিধান—বিশ্বপ্রেমের বিধান—বিশ্বমানবতা বোধের বিধান—তার সারমর্ম আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। "মনুষ্যত্ব জাগলে আর তাহাদের নিজের কিছুই করতে হবে না। ঈশ্বরের কোন অজ্ঞের নিয়মে তাহাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে।" যেদিন 'এ জাতি আবার মানুষ হবে'—যেদিন "তাহারা এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে, যেদিন তারা স্ব

উচিত কর্ত্তব্য বিবেচনা করবে নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কাহারও প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কাহারও ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তাহারা যুগত্তীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্মকে বরণ করবে।” সেদিন পরাধীনতার নগপাশ আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে, উজ্জল ভবিষ্যৎ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এইদিক থেকে হিসাব করে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের প্রয়োজন ইহারা এত বেশী করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মনুষ্যত্বকেই ধর্মের আসনে বসিয়ে পূজা দিতে বিধান দিয়েছিলেন। এমন কি আপাত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করতেও ইতস্ততঃ করেননি। যে স্বাধীনতালাভের ব্যাকুলতায় এত কথা, জাতীয় চেতনা উদ্দীপিত করার এত প্রয়াস, সেই বহুকাম্য স্বাধীনতা বা জাতীয়ত্বকে পর্য্যন্ত ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হননি—বলতে চেয়েছিলেন “যেমন স্বার্থের চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিধান হয়ে যাক। দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।” এই নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ব-চর্চ্চার এই আবেগ। জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কতখানি সঙ্গত বা অসঙ্গত সে বিচারে এখানে প্রবেশ করে লাভ নেই, এখানে এটাই লক্ষণীয় যে তখন মনুষ্যত্বের মহত্তর আদর্শকেই শরণ্য বলে—মুক্তির যথার্থ উপায় হিসাবে, গ্রহণ করবার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তাঁদের শেষ আবেদন—“স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক, আবার তোরা মানুষ হ”। তাঁদের কাছে মুক্তির বা স্বাধীনতা লাভের সমস্যা শেষ পর্যন্ত ‘মানুষ হওয়ার’ সমস্যা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল—তাঁহারা মনে করেছিলেন ‘মানুষ’ হলেই—‘শত্রু মিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে দিয়ে”—মানুষ হতে পারলেই, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এই ধারণাগুলি নাট্যকারের মনে ছিল এবং প্রকাশ পাওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল। ‘মেবার-পতন’ কাহিনীটিকে তিনি উপযুক্ত

'মাধ্যম' বা বিষয় (Objective Co-relative) বলে মনে করেছিলেন এবং নির্বাচন করেছিলেন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে একাধিক উপবৃত্তসমন্বিত বৃত্তের পরিকল্পনা করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল একাধারে মেবারের পতনের কারণ এবং পুনরুত্থানের উপায় নির্দেশ করা; আর এ কথাও বলেছি যে পতনের কারণ নাট্যকারের মতে—ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ, জাতিবিদ্বেষ—ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ (হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ) এক কথায় "মানুষ হওয়া"। একদিকে মনুষ্যত্বহীন হ'য়েই যেমন বহু রাজপুত মোগলের দাস হয়ে, বংশমানের বিনিময়ে, স্বাধীনতার বিনিময়ে, প্রাণটুকু রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে মনুষ্যত্বহীনতার জন্যই, ধর্মান্ধতার জন্যই মেবার তার বীর সন্তানদের অনেককে জাতিচ্যুত ক'রে ঘৃণা ও অবজ্ঞা দিয়ে শত্রুপক্ষে ঠেলে দিয়েছিল—ধর্মত্যাগীকে জাতিচ্যুত করে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। নাট্যকারের ধারণা—এই দোষেই রাজপুত জাতির পতন ঘটেছিল—"যখন একটা জাতি যায় সে নিজের দোষে যায়" এবং "যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা সে জাতিকে ঈশ্বর রক্ষা করতে পারেন না, মানুষ তো ছার"—যখন "ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, আর কে রক্ষা করে? নাট্যকারের মতে মনুষ্যত্বহীনতাই সব কিছুর মূল কারণ, জাতি "মানুষ" হ'লেই আবার তার উত্থান ঘটবে এবং স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড়, জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব আরো বড়। মোগলপদানত রাজপুতের মনুষ্যত্বহীনতা দেখানোর জন্য নাট্যকার সগর সিংহ, গজসিংহপ্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, ধর্মত্যাগী রাজপুতের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করেছেন মহাবৎখাঁকে—এবং তাকে দিয়ে "হিন্দুর… জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে" মেবার আক্রমণ করিয়েছেন, 'ভাইয়ে ভাইয়ে' যুদ্ধের—'ধর্মে ধর্মে' যুদ্ধের কল্পনাকার্যে পরিণত করেছেন। যে প্রতিপাদ্যকে তিনি এদের আলম্বন করে উপস্থাপিত করেছেন তা' রাণার মুখেই ব্যক্ত হয়েছে—"ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ আর শক্তসিং

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ আর গজসিংকে।”……যখন জাত নির্জ্জীব হ’য়ে পড়ে, যখন ব্যাধি প্রবল হ’য়ে ওঠে, আর এই রকম “বিভীষণ” তার ঘরে ঘরে জন্মায়”। এদের মধ্যে গজসিংহ একনম্বরের বিভীষণ—তার হৃদয়ে একটি তারও উঁচু সুরে বাঁধা নেই। মহাবৎ খাঁ এবং সগরসিংহ স্বার্থের নির্মোকে আবৃত হ’লেও তাদের হৃদয়ে উচ্চ প্রবৃত্তির দু’একটি তার উঁচু সুরে বাঁধা আছে—হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে জাতি-অভিমানের ফল্গুধারা প্রবাহিত রয়েছে। মহাবৎ খাঁর মধ্যে জাতি-অভিমান একেবারে মরে নি, রাজপুতের গৌরবে সে গৌরব অনুভব করে, গৌরব করে বলে—“আমি ধর্মে মুসলমান হলেও আমি জাতিতে এই রাজপুত”। মহাবৎ খাঁকে দিয়ে নাট্যকার এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মত্যাগী মহাবৎকে নাট্যকার ক্ষমা করতে পারেন নি এবং—অনেককে দিয়ে অনেক কড়া কথা শুনিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁকে দিয়েই তিনি নতুন জাতিবোধের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-চেতনার ধারণা প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন, হিন্দুর সংকীর্ণ ধর্মভিত্তিক জাতি-চেতনার অর্থাৎ অনুদার সমাজবিধির সমালোচনা করেছেন। ধর্মত্যাগীকে যতদুর অপদস্থ করতে হয় বা ভৎ’সনা করা দরকার নাট্যকার তা’ করেছেন, কিন্তু ধর্মত্যাগীকে বা বিধর্মীকে যারা বিজাতী ব’লে ঘৃণা করে এবং উপেক্ষার আঘাতে জাতীয় শত্রু ক’রে তোলে তাদের তিনি সমালোচনা করেছেন—মহাবতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়েছেন। একাধারে পতনের কারণ এবং উত্থানের উপায় নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল বলেই মহাবৎখাঁ সম্বন্ধে নাট্যকারের দোমনাভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং ইতিহাস সম্মত উপসংহার যেখানে হওয়ার কথা সেখানে না হ’য়ে, অমর সিংহ ও মহাবতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, বাকযুদ্ধে অসি-আস্ফালনে এবং শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক ক্ষমা প্রার্থনায় হয়েছে। মেবারের হিন্দু ও মুসলমান জাতি-অভিমানে আবার এক হয়েছে—আবার মানুষ হ’তে চেয়েছে। এই উপসংহার দেখে সহজেই মনে হ’তে পারে যে—নাটকের root-

action অমরসিংহ-মহাবৎ খাঁর বিবাদ পরিহার করা তথা বিশ্বপ্রেমে বা মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং মেবার পতন নাটকের root-idea হয়ে দাঁড়িয়েছে—"স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ ॥" এই 'root-idea' এবং 'root-action'-কে প্রতিপাদিত করার জন্ত নাট্যকার দু'টি পক্ষের বা শিবিরের অধীনে ঘটনা সাজিয়ে বৃত্ত রচনা করেছেন এবং পক্ষের বা শিবিরের মধ্যে এক বা একাধিকা উপবৃত্ত কল্পনা করেছেন। পক্ষ দুটি এখানে মোগল সাম্রাজ্য ও মেবার; মোগলের প্রতিনিধি সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং মেবারের প্রতিনিধি রাণা অমরসিংহ। মোগল পক্ষে আছে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষগণ আর আছে—রাজপুত কুলাঙ্গার গজসিংহ ও সগরসিংহ এবং সগরসিংহের পুত্র মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। অন্যদিকে মেবারের পক্ষে আছে—গোবিন্দ সিংহ, সগর সিংহের কন্যা সত্যবতী, শঙ্কর, জয়সিংহ, কেশব প্রভৃতি রাজপুত সামন্তরা। আগেই বলেছি, জাতির ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা দেখানোর জন্য নাট্যকার রাজপুতদের একাংশকে মোগলের দাস রূপে উপস্থাপিত করেছেন, একাংশকে ভীরু ও সন্ধিকামী করেছেন এবং একাংশকে অটল প্রতিজ্ঞ দেশৈকপ্রাণ করে গড়েছেন! মেবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ও অন্তবিচ্ছেদের রূপটি তুলে ধরার জন্য নাট্যকার সগরসিংহের পরিবারটিকে বেছে নিয়েছেন। সগরসিংহ মোগলের কালে আত্মবিক্রয় করেছেন, তাঁর পুত্রটি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে—মহাবৎ খাঁ হ'য়ে মোগল সেনাপতি হয়েছে। অথচ সেই সগরসিংহেরই কন্যা সত্যবতী দেশের জন্য সন্ন্যাসিনী—চারণদের অধিনায়িকা। নাট্যকারে এই পরিবারটিকে মেবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেন নি। ষোলআনা-রাজপুত গোবিন্দ সিংহের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সংযুক্ত করে রেখেছেন, গোবিন্দ সিংহের কন্যা 'কল্যাণী'কে মহাবতের পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন। এই কল্পনা শুধু কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টির জন্যই করেছেন তা নয় এই কল্পনাদ্বারা নাটকের "root idea"—কে পরিপোষণ করেছেন। জাতি-ধর্মের সংকীর্ণতার

উচ্চে প্রেমের আসন, এই তত্ত্বটিকে কল্যাণীর স্বামীর জন্য আনন্দময় আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। হৃদয়ের মিলনকে জাতি-ধর্মের বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে যারা চায় তারা মনুষ্যত্ব-বিরোধী কাজ করে, হৃদয়ের সহজযোগে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হোক—সামাজিক মিলন ক্ষেত্র থেকে ধর্মের বাধা দূর হোক—এই বাণীটাই কল্যাণীর জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন—প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করতে—বিশ্বপ্রেমে পরিণত করতে, তথা জাতি-ধর্মের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচনা করতে। মনুষ্যত্বের বা বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পাঠ বা প্রচার করবার জন্য নাট্যকার উত্তরসাধিকাও সৃষ্টি করেছেন; সে মানসী—রাণা অমর সিংহের কন্যা। সে মনুষ্যত্বের ধ্যানে সমাহিতা, বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা। নাটকের ধ্রুবা গীতি মানসীকে নাট্যকার অমরসিংহের পরিবারের মধ্যেই বা রাজপুরীতেই আবদ্ধ করে রাখে নি! আদর্শগতপ্রাণা হ'য়েও মানসী—গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহকে ভালবেসেছে—অজ্ঞাতসারে প্রাণ দিয়েছে। এইভাবে নাট্যকার তিনটি সিংহ-পরিবার সম্বন্ধ-সূত্রে দিয়ে সংযুক্ত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি চরিত্রকে মূলকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ করেছেন। কল্যাণী শুধুমাত্র পতিপ্রেমের আদর্শই নয়, কল্যাণী মহাবৎ খাঁয়ের মেবার অভিযানের অন্যতম প্রেরণা হয়েছে। মানসী শুধু বিশ্বপ্রেমেরই চারণী নয়, মানসী নাটকের উপসংহারকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁর উন্মুক্ত তরবারির মধ্যে উপস্থিত হ'য়ে, বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে উভয়ের আক্রোশ প্রশমিত করেছে—ধর্মে পৃথক হয়েও জাতিতে যারা এক—সেই মুসলমান মহাবৎকেও হিন্দু অমরসিংকে "আলিঙ্গনাবদ্ধ"করেছে। মানসীর কণ্ঠেই নাট্যকার শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন—জাতীয় পরাধীনতা-শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা—"আবার মানুষ হওয়া।"

যে মূল ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য এরূপ বৃত্ত পরিকল্পিত হয়েছে তা সবিস্তারেই বলা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে এই কারণেই মেবার

পতন ব্যাপারটির উপসংহার যেখানে প্রত্যাশিত ছিল সেখানে না হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হয়েছে এবং তার জন্ম ইতিহাসকেও একটু বেঁকিয়ে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ মোগলের কাছে অমরসিংহের আত্মসমর্পণে নাটকের উপসংহার না ঘটিয়ে, পতনের পরিশিষ্ট রচনা করে উত্থানের উপায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে—মহাবৎ খাঁর সঙ্গে অমর সিংহের সাক্ষাৎকার ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের উদ্যম এবং শেষপর্যন্ত উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা দেখানো হয়েছে। এই পরিশিষ্ট পরিকল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা তথা রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হয়েছে কি না তা' অবশ্য বিচার্য বিষয়। এখানে শুধু বৃত্তের একাগ্রতা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে—রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে রসবিচার অধ্যায়ে। বৃত্তের একাগ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে সেখানেই যেখানে root-idea বা premise হয় সুস্পষ্ট এবং উপযুক্ত root-action-এ নাটকের উপসংহার (লসনের মতে—climax) ঘটে। সুতরাং একাগ্রতা আছে কি নেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে, প্রথমেই স্থির করতে হবে নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্যটি। এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি তা' নাটকের নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে, নাটকের মধ্যেও পাত্রপাত্রীদের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সিদ্ধান্তবাক্যের আকারে,বললে বলতে হবে—যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা—ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যে জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থে মগ্ন, সেই জাতির পতন অনিবার্য। এই প্রতিপাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই যে স্বাধীন রাজপুত জাতির শেষ প্রতিনিধি মেবার, রাজপুত রাজাদের ক্ষুদ্রতা ও অন্তর্বিরোধের ফলেই—মনুষ্যত্বহীনতার জন্যই, মোগলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে তথা মাথা নত করতে, স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। রাজপুত রাজাদের মনুষ্যত্বহীনতা ও অন্তর্বিরোধের ফলে, রাজপুত জাতির স্বাধীনতা এবং তার শেষ প্রতিনিধি মেবারের প্রতিরোধ শক্তি ও স্বাধীনতা-গর্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই ঐতিহাসিক সত্যকে ব্যক্ত করাই নাটকের উদ্দেশ্য বটে কিন্তু অমর সিংহের পরাজয় ও মোগল-অধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মেবার

পতন ব্যাপারটি শেষ না হওয়ায় অর্থাৎ কার্যকে আরও খানিকটা টেনে নিয়ে যাওয়ায়—দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেওয়ার অপমান (মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা) বরণ করতে অমরসিংহের অসম্মতি, পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনবাসে যাওয়ার সঙ্কল্প—মহাবৎ খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, মেবারের সঙ্গে সঙ্গে মেবারের রাণাকে শেষ করতে আহ্বান জানানো—শেষপর্যন্ত শোকে ক্ষোভে মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এবং মানসীর অনুপ্রেরণায় উভয়েরই (মহাবৎ-অমরসিংহ) অস্ত্রত্যাগ ও ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি ব্যাপারে নাটকের উপসংহার ঘটায়, এবং বিশেষ ক'রে নতুন একটা ভাবের দিকে লক্ষণীয় ঝোঁক পড়ায়—যে দেশপ্রীতির অভাবের জন্য রাজপুত জাতির তথা মেবারের পতন সেই দেশপ্রেম জাতিপ্রেমকে ডুবিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রেম বা মনুষ্যত্বকে ভজনা করার জন্য আবেদন করায় ("স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক আবাব তোরা মানুষ হ") এ কথা অবশ্যই মনে হতে পারে যে বৃত্তের একাগ্রতা ব্যাহত হয়েছে, নাট্যকার তাঁর মূলভাগ বা প্রতিপাদ্য থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, মূলভাবের সুরের সঙ্গে অন্যভাবের সুর মিশলেও মূলভাব আচ্ছন্ন হয়নি এবং বৃত্তের একাগ্রতাও নষ্ট হয়ে যায় নি। "স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক আবার তোরা মানুষ হ" বা "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"—মেবার পতন জনিত মহাশোকের সান্ত্বনা বাক্য মাত্র। সান্ত্বনায় শোকের উপশম হয়, শোকের কারণ নষ্ট হয় না ; এখানেও তা হয়নি। মানসীর সান্ত্বনা বাক্যে অমরসিংহ-মহাবৎ খাঁ 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হয়েছে বটে, কিন্তু যে মেবারের শব স্কন্ধে করে শোকক্ষিপ্ত অমরসিংহ মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তাঁদের আলিঙ্গনের ফলে সেই শব পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে নি। মেবার তার হারানো স্বাধীনতা ফিরে পায় নি বা ভাইয়ে ভাইয়ে যেখানে বিবাদ সে জাতিকে কে রক্ষা করে?—এ প্রশ্নের গুরুত্বও নষ্ট হয়ে যায় নি বরং এই কথাটাই বেশী করে মনে হয় এই 'আলিঙ্গন' যুদ্ধের আগে হলে মেবারের এই শোচনীয় পতন ঘটত না। মেবারের

শবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উভয়ের ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ের অপরাধকেই বড় করে তোলে।

এই সম্পর্কেই আর একটা কথা—মেবার পতন, বৃত্তেরপরিণতি সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। আগে একাধিকবার বলেছি, মেবার-পতনের, প্রত্যাশিত উপসংহার বা root-action মেবারের পরাজয়ে—অমরসিংহের আত্মসমর্পণে সন্ধিপ্রস্তাবে (সন্ধি যত সম্মানজনক হোক, সোনার শিকলের মতই বন্ধন মাত্র) কিন্তু এই নাটকে মেবার-পতনে বৃত্তের পরিণতি সেখানে হয় নি, কারণ বৃত্তের পরিকল্পনা সে ভাবে করা হয় নি। মেবার-পতনের বৃত্তে মহাবৎখাঁই মেবার-পতনের প্রধান নিমিত্ত কারণ। মেবারকে ধ্বংস ক'রেছে—মেবারের প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট করেছে মহাবৎখাঁই—ক্রম এসে শুধু উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ করেছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের পরিণতিই—মেবার-পতন। তাই তো দেখা যায় (পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে)—মেবার পতনের পরেই যুদ্ধক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে অমরসিংহ "মহাবৎখাঁ—গজসিংহ" বলে বার বার চীৎকার করেছিলেন তাঁদের ডেকেছিলেন পরাজিত মেবারের রাণাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য—যারা মেবারকে ধ্বংস করেছে তাদেরই হাতে মরবার জন্য। মেবারের শেষ বীর গোবিন্দসিংহও এই একই কারণে মহাবৎখাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, "রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে, দেখবার আগে মরতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন তার হাতেই যে জামাই হয়েও পুত্রহন্তা—দেশের সন্তান হয়েও যে পরের গোলাম (নিজের) ধর্মের হয়েও যে মুসলমান—রাজার ভাই হয়েও যে তার শত্রু।" গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু কামনা চরিতার্থ হয়েছে। অমরসিংহও মৃত্যু চান—দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্মান নেওয়া,—এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল। নাট্যকার এই অপমানের অপমৃত্যু থেকে অমরসিংহকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন—ফর্মান নেওয়ার আগেই রাজভার ত্যাগ করিয়েছেন বটে কিন্তু সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে—"wounded spirit who can bear"

—রাণাও ডেকে পাঠিয়েছেন মহাবৎখাঁকে—সম্পূর্ণ ধ্বংসকার্যকে সম্পূর্ণ করতে, মেবারের সঙ্গে মেবারের রানাকেও শেষ করতে। এই পরিকল্পনা মেবার-পতন-বৃত্তেরই অতিস্বাভাবিক পরিণতি—সম্ভাব্য উপসংহার (Resolution)। অতএব এই পরিশিষ্ট কল্পনায় বৃত্তের একাগ্রতা, ব্যাহত হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হয় নি। অর্থাৎ মানসীর দার্শনিক উচ্ছ্বাসের ধাক্কায় নাটক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় নি।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—নাটকের মূল কার্য ধারার অর্থাৎ রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে, সামাজিক ও দার্শনিক-তত্ত্ব-বাহী উপধারা জুড়ে দিয়ে নাট্যকার একদিকে যেমন বৃত্তের জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নাটকের ভাব বা মনন মূল্য বৃদ্ধি করেছেন; কিন্তু তত্ত্বকে বহন করার জন্য যে সব পাত্রপাত্রী নির্বাচন বা নির্মাণ করেছেন তাদের অতিরোমান্টিক অবাস্তব আচরণে বৃত্তের গুরুত্ব হানি ঘটেছে। যদিও বৃত্ত পরিকল্পনা আসলে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, ঘটনাকে নানা সন্ধিতে বা পর্বে গুছিয়ে একটা কার্যকে উপস্থাপিত করা—আদি-মধ্য অন্ত যুক্ত একটা ঘটনা—বৃত্ত বা কাহিনী তৈরী করা, তবু এ কথাও মনে রাখতে হবে যেন তেন প্রকারেণ একটা কাহিনী গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, বৃত্তের সামগ্রিক গুরুত্ব প্রত্যেকটি পরিস্থিতির, পাত্রপাত্রীর প্রতিটি আচরণের ঔচিত্যের উপর নির্ভর করে এবং উপবৃত্তের দুর্বলতায় প্রধান গুরুত্ব হ্রাস পায়, পারিপার্শ্বিক লঘুতা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের উপর ছায়া ফেলে—গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। ভাবের বা তত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব যতই থাক, অনুচিত চরিত্রের মুখে তা' ছোট মুখে বড় কথা'রই মতো হেয় হয়ে পড়ে। ভাবকে সুন্দর প্রতিরূপে ব্যক্ত করায় কল্পনাশক্তি মহিমা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু যে পরিকল্পনাশক্তির বলে রূপদক্ষ জীবন্তরূপ সৃষ্টি করেন, সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নাটকের বৃত্ত-পরিকল্পনায় নাট্যকার অনবদ্য নির্মাণকৌশল দেখাতে পারেন নি—ঐতিহাসিক নাটকে যে পরিমাণ বাস্তবিকতার মায়া থাকা উচিত সেই পরিমাণ

মায়া (illusion of reality) সৃষ্টি করতে পারেন নি। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বুঝতে পারা যাবে।

ঘটনাবিন্যাস বিশ্লেষণ :

নাটকের মূল কার্য—মেবারের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী কর্তৃক উপর্যুপরি আক্রমণ, মেবারের প্রতিরোধ এবং শেষ যুদ্ধে মেবারের পতন ও পতনের প্রতিক্রিয়া। মূলকার্য যেখানে মেবারের পতন, সেখানে নাটকের আরম্ভ (exposition) অবশ্যই আক্রমণের সূচনা দিয়েই হবে এবং নাটকের উপসংহার ঘটবে মেবার পতনের প্রতিক্রিয়ায়। এই মূল কার্য্যধারাটিকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করে নিয়েছেন। **প্রথম অঙ্কের** উপস্থাপিত কার্য :—(ক) মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে (খ) রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা—যুদ্ধে অনিচ্ছা (গ) সন্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের প্রতিক্রিয়া (ঘ) গোবিন্দ সিংহের প্ররোচনায় রাণার যুদ্ধযাত্রা ও মেবার যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়গর্বে উদয়পুরে প্রবেশ। **দ্বিতীয় অঙ্কের কার্য :**—(ক) মেবার আক্রমণ করার জন্য নূতন মোগল সৈন্য এসেছে (খ) রাণার নৈরাশ্য ও যুদ্ধে অনিচ্ছা—সন্ধির সংকল্প (গ) সত্যবতীর দেশভক্তির উদ্দীপনায় রাণার সঙ্কল্প পরিবর্তিত—রাণার যুদ্ধপ্রস্তুতি। (ঘ) মোগল সেনার পরাজয় (ঙ) পরাজয়ের পরে, আবার সাহাজাদা পরভেজের অধীনে মেবারে সৈন্য প্রেরণ। **তৃতীয় অঙ্কের কার্য :**—(ক) সামন্তদের বিজয়োল্লাস (খ) চিতোর দুর্গ অধিকার (বাহুবলে নয়, সগর সিংহের দানে) (গ) মহাবৎখাঁর রাজপুত জাতি উচ্ছেদ করার, হিন্দুত্ব ধ্বংস করার সঙ্কল্প (ঘ) পরভেজের পরাজয়ে জাহাঙ্গীরের উত্তেজনা (ঙ) আত্মহত্যা করে সগর সিংহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান। **চতুর্থ অঙ্কের কার্য :**—(ক) মহাবৎ খাঁ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছেন নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছেন। (খ) প্রতিশোধের জন্য অমর সিংহের ও গোবিন্দ সিংহের শেষ সঙ্কল্প (গ) অন্যান্য সামন্তদের নিষেধ সত্ত্বেও রাণার যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে পরাজয়।

পঞ্চম অঙ্কের কার্য ঃ—(ক) পরাজিত অমরসিংহের উন্মত্তকল্প প্রতিক্রিয়া মৃত্যুবরণের ঐকান্তিক আকুলতা (খ) স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে গোবিন্দসিংহও মরতে চান এবং চান বলেই মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানান (গ) দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের 'ফমান' নিতে হবে ব'লে রাণা পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন (ঘ) রাণা অমরসিংহ মহাবৎ খাঁকে ডেকে পাঠান এবং মেবারের সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ করবার জন্য অনুরোধ করেন—অনুরোধ রক্ষা না করায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন—(ঙ) মানসী এসে দু'জনকে নিরস্ত করে এবং উভয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হয়। নাটকের মূল কার্য এইটুকুই। বলা বাহুল্য, শুধু এই কার্য উপস্থাপনা করার জন্য যে বৃত্ত আবশ্যক তার খুব একটা বড় জটিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু নাট্যকার মূল কার্যের সমান্তরালে একাধিক উপধারা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে নাটকের কাহিনীতে অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে 'কল্যাণী'কে, দেশপ্রেমের মহিমা দেখাতে 'সত্যবতী'কে এবং প্রেমের, বিশ্বপ্রেমের ও সেবাধর্মের মহিমা প্রচার করতে 'মানসী'কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থাপনা করতে গিয়ে নাট্যকার কল্যাণীকে গোবিন্দসিংহের কন্যারূপে এবং মহাবৎ খাঁর পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন, সত্যবতীকে সগরসিংহের কন্যারূপে এবং মানসীকে অমরসিংহের কন্যারূপে এবং অজয়সিংহের প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করেছেন। এইভাবে নাটকের বৃত্তটির মধ্যে একাধিক উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে। 'কল্যাণী-মহাবৎ খাঁ, 'মানসী-অজয়' সত্যবতী ও সগরসিংহকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত রচিত হয়েছে ; এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তের কার্য উপস্থাপিত করতে এক একটি অঙ্কের মধ্যে, একাধিক দৃশ্য কল্পনা করতে হয়েছে। প্রথম অঙ্কে রয়েছে ৮ দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে— ৭ দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে— ৫ দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে—৬ দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে—

৮ম দৃশ্য ; মোট ৩৪ দৃশ্যেনাট্যকারসমস্তকার্যটিউপস্থাপিতকরেছেন। কল্যাণী মহাবৎ খাঁকে এখনও স্বামী ব'লে মনে মনে পূজা করে ; পিতৃগৃহে থাকলেও, এমন একদিন আসে যেদিন সে পিতা বুঝে না, জাতি বুঝে না, ধর্ম বুঝে না, পতিকেই সে একমাত্র ধর্ম ব'লে বুঝে , পতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে ঘরের আশ্রয় ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়ে। মহাবতের সঙ্গে তার পথেই দেখা হয়, কিন্তু মিলন হয় না। ভ্রাতার মৃতদেহ ও দেশবাসীর রক্তস্রোত মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানসীর প্রেরণায় সে তার ব্যর্থ প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করে সুখী হতে চেষ্টা করে।—এই সব ঘটনা নিয়ে কল্যাণী-উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে। মানসী-অজয় উপবৃত্ত গড়ে উঠেছে নিম্নলিখিত ঘটনা নিয়ে :—মানসী রাজকন্যা। গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়কে সে ভালবাসে, ভালবাসতে চায় সে প্রত্যেক মানুষকে। সমবেদনায় তার অন্তর পূর্ণ। সে বিবাহ করতে চায় না—বিবাহের চেয়েও মহৎ কাজকরতেচায়। অতিথিশালা খুলে দীন দুঃখীকে সেবা করে। যুদ্ধে যেতে চায়—আহতদের সেবা করতে। যুদ্ধে যায় এবং আহতদের সেবাও করে। অজয় তার আচরণে মুগ্ধ হয়—বিস্মিত হয়। কুষ্ঠাশ্রম খুলেছে কুষ্ঠরোগীকে সেবা করতে। পিতার সঙ্গে সে জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং পিতার মায়াবাদী ভ্রান্ত চিন্তা খণ্ডন করে। অজয়ের মৃত্যু মানসীর 'প্রেমভিখারিণী দুর্বলা রমণী' রূপটি ব্যক্ত করে দেয়—মানসীর শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনাছাপিয়েউঠে। কিন্তুএইঝড়ের পরে মানসী আবার তার কর্তব্য পথ বেছে নেয়—মনুষ্যের কল্যাণে সে জীবন উৎসর্গ করতে সঙ্কল্পকরে। 'সগরসিংহ-সত্যবতী-মহাবৎ'কেঘিরে যেউপবৃত্ত রচিত হয়েছে তাতে রয়েছে :—সগরসিংহ রাণাপ্রতাপেরভাইহওয়াসত্ত্বেও মোগলদাস হয়ে আগ্রায় আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর দৌহিত্র অরুণ—সত্যবতীর পুত্র। তিনি নামেই রাজপুত ও হিন্দু ; যুদ্ধ তার কাছে আতঙ্ক ; হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্দেশ্যেই সম্রাট

তাঁকে রাণা পদে অভিষিক্ত করে চিতোরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কালক্রমে সগরসিংহের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। সত্যবতীর ভৎ'সনায় তাঁর চোখ ফোটে, যাকে তিনি চিনতে পারেন। চিতোর দুর্গ ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হন—মহাবতের সঙ্গে দেখা করেন, পুত্রকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আহ্বান করেন। জাহাঙ্গীরের সামনে গিয়ে তিনি নির্ভীক চিত্তে সত্য ভাষণ করেন এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করেন।

এই সব প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটনাকে স্থান দিতে নাট্যকারকে অনেকখানি অবকাশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। দৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই কে কতখানি স্থান নিয়েছেন পরিষ্কার বুঝা যাবে।

***প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য**—(১) গোবিন্দসিংহের কুটিরে, গোবিন্দসিংহ অজয় সিংহের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে প্রধান কার্যধারার বীজস্থাপনা করা হয়েছে—জানানো হয়েছে—মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করতে এসেছে (২) রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা (৩) রাণা অমরসিংহ বিলাসী ও আরামপ্রিয়, যুদ্ধবিমুখ হয়েছেন। এই দৃশ্যেই 'কল্যাণী'কে দেখানো হয়েছে—বটে, কিন্তু কল্যাণী তার শেষ উক্তির মতোই অস্ফুট। কল্যাণীর কান্নার অর্থ গোবিন্দ-সিংহ বুঝতে পারেননি; দর্শকরাও পারেন না। "যদি জানতে বাবা! যদি বুঝতে!"—শুধু এইটুকুই বুঝায় যে কল্যাণী ভয়ে কাঁদেনি, কেঁদেছে অন্য কোন কারণে। কল্যাণী যে মহাবৎখাঁর পত্নী তা' আমরা জানিনে এবং জানিনে ব'লেই 'কারণ'টি বুঝতে পারিনে, অবশ্য কল্যাণী সম্বন্ধে একটু কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের পথ।

এই দৃশ্যে চারণী সত্যবতীকে প্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছে। এবং তার চরিত্রের বীজটিও স্থাপনা করা হয়েছে। সত্যবতীকে রাজসভায় নেওয়ার আগেই দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে।

*[চরিত্রটি চূড়ান্ত রোমান্টিক—এক কথায় দেশপ্রেমের মূর্ত আবেগ। একদিন সকালে 'মেবার মেবার' বলে চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর মেবার এসে—গ্রামে উপত্যকায় মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছে। এর অধিক পরিচয় কেউ জানে না, নিজেও সে কোন পরিচয় দেয়নি; অতএব দর্শকের কৌতূহলও অমার্জনীয়। তাই অজয় বা অমরসিংহ কেউ তাকে চেনে না]

তৃতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের রাজসভা। (মন্ত্রণা সভা বলাই ঠিক) যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাণার যুক্তি—জয়সিংহ-কেশব-কৃষ্ণদাস-শঙ্কর প্রমুখ সামন্তদের সেই যুক্তি খণ্ডন। গোবিন্দসিংহের উদ্দীপনাময় ভাষণ। তা' সত্ত্বেও রাণার সন্ধিস্থাপনের সঙ্কল্প—সন্ধিপ্রস্তাব জানাতে মোগল দূতকে আহ্বান। সেই মুহূর্তে 'বেগে সত্যবতীর প্রবেশ' সন্ধিপ্রস্তাবে বাধা সৃষ্টি—সত্যবতীর অনমনীয় সঙ্কল্পে শেষ পর্যন্ত রাণার যুদ্ধযাত্রা। (আধিকারিক বৃত্তের কার্য)।

চতুর্থ দৃশ্য—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ।

সেনাপতি মহাবৎ খাঁ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল্লার কথোপকথনের ভিতর দিয়ে একদিকে প্রথম যুদ্ধের সেনাপতি হেদায়েৎ আলি খাঁর ভীরু প্রকৃতিটি অন্যদিকে মহাবৎ খাঁর পরিচয় ও প্রকৃতি সূচিত করা হয়েছে। মহাবৎ খাঁকে উপস্থাপিত বা প্রকাশিত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

পঞ্চম দৃশ্য—মোগল শিবির। শিবির প্রান্তে খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ ও অধীনস্থ কর্মচারী হুসেনের আলাপ-আলোচনা। যুদ্ধ আসন্ন এই সংবাদটুকু দেওয়ার জন্য এবং হেদায়েৎকে দিয়ে লঘু পরিহাস সৃষ্টি করবার জন্যই দৃশ্যটি পরিকল্পিত।

ষষ্ঠ দৃশ্য—উদয়সাগরের তীর। মানসী-অজয় উপবৃত্তের ভিত্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। 'মানসী' অজয়কে ভালবাসে শুধু—অজয়কেই নয়, মানসী ভালবাসে মানুষকেই—তার উদার হৃদয়ের মধ্যে সে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করতে চায়। মনে প্রাণে সে যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু যুদ্ধ যদি অনিবার্যই হয়,

হত্যালীলা। সে যদি বন্ধ নাই করতে পারে, তাহলে সে আহতদের শুশ্রূষা করতে তো পারে। সেবাব্রত সে গ্রহণ করে।

আধিকারিক বৃত্ত স্পর্শ করে থাকলেও এই দৃশ্যটির একাংশে আছে অজয়-মানসী উপবৃত্তের কার্য, অন্য অংশে আছে—অমরসিংহের পারিবারিক বৃত্তের ব্যাপার—বিশেষ ক'রে রাণী-চরিত্রের বীজস্থাপনা।

সপ্তম দৃশ্য—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। শিবিরাভ্যন্তরে হেদাযেৎ হুসেনের কথোপকথন। সেনাপতি হেদাযেৎকে দিযে হাস্যরস সৃষ্টির এবং মোঘল শক্তির পরাজযের সংবাদ দেওযার চেষ্টা। [সেনাপতিকে এত লঘু বা ভাঁড়ে পরিণত করায়, ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে যুদ্ধের যতখানি গুরুত্ব প্রত্যাশিত তা পাওযা যায না।]

দৃশ্যান্তর—যুদ্ধক্ষেত্র। সেবাব্রতচারিণী মানসী অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে—আহতদের শুশ্রূষা করবার জন্য, হত্যালীলার মধ্যে অমৃতবর্তিকার মত। এখানে অজয এসেছে 'সসৈন্যে' এবং মানসীর মুখে অপূর্ব 'জ্যোতি' দেখে বিস্মিত হযেছে।

[ভাবের নিরপেক্ষ প্রকাশ হিসাবে—মানসী সত্যই "একটা সৌন্দর্য। একটা গরিমা। একটা বিস্ময।" কিন্তু মানসীর এই আচরণ কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট—অতি অবাস্তব কল্পনা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের মতো রাজকন্যার যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষা করতে যাওযা, বিশেষতঃ এই যুদ্ধে—অতিশাযী ভাবালুতারই নিদর্শন]

অষ্টম দৃশ্য—উদয়পুরের রাজপথ। গীতসহ বিজয শোভাযাত্রা।

* [প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অঙ্কের কার্য শেষ।]

* **দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য**—"আগ্রায রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ" সগরসিংহ ও অরুণসিংহের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে—আধিকারিক

বৃত্তের সঙ্গে অপরিহার্য যোগেযুক্ত সগরসিংহের উপস্থাপনা করা হয়েছে—তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সত্যবতীর বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে—হিন্দুসমাজের গোঁড়ামীর ও সঙ্কীর্ণতার সমালোচনা করা হয়েছে। মূল কার্যের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে এই—মেবারযুদ্ধের পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর সগরসিংহকে রাণার পদে অভিষিক্ত করে মেবারে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছেন। [সগরসিংহের আত্মবিস্মৃত হিন্দুর দৃষ্টান্ত করতে গিয়ে নাট্যকার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এখানে বাল্মীকির বা রামায়ণের নাম না শুনলেও মহাবৎকে ভর্ৎসনা করার সময় (৩য়-৪র্থ দৃশ্য) ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির নাম ও ধর্মের মূলতত্ত্ব গড় গড় করে বলে গেছেন। এই সমস্যার সমাধান করতে বলা যেতে পারে—সন্ন্যাস নেওয়ার পরেই ও সব নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন; তা না বললে বলতে হবে এই যে অরুণের সঙ্গে যে কথোপকথন তা "পরিহাসবিজল্পিত"।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য—উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর। মানসী অজয়ের আলাপ-আলোচনা—মানসীর বিশ্বপ্রেমের আবেগে অজয়ের হতাশা—রাণীর প্রবেশে উভয়ের প্রেমালাপে বাধা—রাণীর আদেশে মানসীর প্রস্থান—অজয়ের উপর রাণীর নিষেধাজ্ঞা—অজয়ের প্রস্থান। রাণার প্রবেশ—মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা বলতে রাণীকে নির্দেশ—রাণীর প্রস্থান। এই পর্যন্ত মানসীর ব্যাপার অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটনা।

শেষাংশে অধিকারিক বৃত্তের কার্যঃ—রাণার মায়াবাদী ভাবুকতা দিয়ে সূচনা—গোবিন্দসিংহের প্রবেশ ও নতুন আক্রমণের সংবাদ জ্ঞাপন। রাণার হতাশা ও দৈন্য—সত্যবতীর রাণার যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা—রাণাকে মৃত্যুপণে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রেরণা ও আত্মপরিচয় দান—সত্যবতীর আত্মোৎসর্গ দেখে রাণার উদ্দীপনা—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশদান।

* [অজয়ের সঙ্গে এক হয়ে আমরাও মানসী সম্বন্ধে বলতে পারি—"তুমি

এ জগতের নও, তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। কিন্তু যে মানসী রাত্রিকালে যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষা করতে গিয়েছে, যে ম'ার সঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারে কথাকাটাকাটি করতে লজ্জিত হয়নি, সে রাণীর আদেশ পাওয়ামাত্রই বিনা কথায় প্রস্থান করবে—একটু অপ্রত্যাশিতই বটে, মানসীকে নিয়ে শুধু অজয়ই ভাবে গদগদ হয়নি, রাণা অমরসিংহও বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন "ও কোথা থেকে এসেছে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না", "স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে মর্তে নেমে এসেছে" --"অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশ প্রকাশ" করবারই মতো কথা। তারপর রাজ-অন্তঃপুরে সত্যবতীর প্রবেশ যদিও বা সমর্থন করা যায়, গোবিন্দসিংহের প্রবেশ সম্বন্ধে আপত্তি না উঠে পারে না। গোবিন্দসিংহ যত বৃদ্ধই হোন আর যত একপরিবারভুক্তই হোন, রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন না।]

তৃতীয় দৃশ্য—মেবারে সায়েদ আবদুল্লার শিবির। আবদুল্লা, হুসেন ও হেদায়েতের লঘু কথোপকথন। রাজপুতরা আক্রমণ করেছে—এই সংবাদটুকু দিয়েই দৃশ্যটি শেষ এবং ঐ সংবাদটুকুর ক্ষীণ সূত্রে দৃশ্যটি নাটকের মূল কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

চতুর্থ দৃশ্য—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। সগরসিংহের প্রতিক্রিয়া—অন্তর্বিক্ষোভ—আত্মধিক্কার। উন্নত মস্তিষ্কের যবনিকার উপরে ভীমসিংহ জয়মল প্রতাপ-সিংহ প্রভৃতির মূর্তি দর্শন—চিতোরদুর্গ পরিত্যাগের সংকল্প। (পরিস্থিতির গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে সগরসিংহের রসিকতাবাতকে ব্যাহত হয়েছে।)

পঞ্চম দৃশ্য—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। মানসী ও কল্যাণীর কথোপকথনে প্রকাশ—মানসী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন ক'রে পরকে সুখী করে প্রকৃত সুখ পেতে চেষ্টা করেছে—অজয়কে সে ভালবাসে—অজয়কে বড়ই দেখতে ইচ্ছে করে।

এই দৃশ্যেই, আগ্রাবাসিনী এক ছবি ওয়ালাকে প্রবেশ করিয়ে মহাবৎ খাঁর

ছবির সাহায্যে কল্যাণীর প্রেমাগ্নিতে ইন্ধন যোগানোর আয়োজন করা হয়েছে এবং মানসীর মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারের সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে। মানসী বলেছেন—"যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান" আর "প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই। প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না।" শুধু ইহা বলেই মানসী ক্ষান্ত হন নি—প্রেমতত্ত্বমূলক একটি গানও করেছেন।

গানের শেষে প্রবেশ করেছেন—রাণী। সাধারণ নারীর মতই তিনি কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু মানসী পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করে রাখতে অনিচ্ছুক: তাঁহার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়। মানসীর কথা শুনে রাণীর ঠিকই মনে হয়—মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? মানসীর আচরণ নিয়ে রাণা ও রাণীর মধ্যে আলোচনা চলে, রাণী মন্তব্য করতে বাধ্য হন—'মানসীর এ ক্ষেপামি পৈত্রিক।'

ষষ্ঠ দৃশ্য—গোবিন্দ সিংহের গৃহের অন্তঃপুর। দৃশ্যটির মুখ্য উদ্দেশ্য—কল্যাণীকে স্বামীর জন্য মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বামীর জন্য—পিতার সঙ্গে কল্যাণীর বিরোধ, পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে পতি সন্দর্শনে যাত্রা। আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে এর যোগ অতি সামান্যই। ঘটনার মাঝখানে—গোবিন্দ সিংহ ও অজয় সিংহের কথোপকথনের সাহায্যে মূল ঘটনার অগ্রগতি ঘটানো হয়েছে—অর্থাৎ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে, সেনাপতি শাহজাদা পরভেজ, সৈন্য—প্রায় লক্ষ। বাকী সমস্তটাই কল্যাণীর পতিপ্রেমের উচ্ছ্বাসে ভর্তি। এখানে মানসীর দিক্ষার ফল ফলেছে। কল্যাণী ও অজয় প্রেমের পূজারী হয়ে উঠেছে। কল্যাণীর কাছে—"যার পতিভক্তি সর্ব্বকালে সর্ব্ব-অবস্থায় বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ—সেই সাধ্বী স্ত্রী।" কল্যাণীর দৃপ্ত ঘোষণা—"আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি

না, ধর্ম্ম বুঝি না, আমার ধর্ম্ম পতি,'......... মহাবৎ খাঁ হিন্দু হৌন, মুসলমান হৌন নাস্তিক হৌন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তাঁহার সঙ্গে এর জন্য যদি নরকে যেতে হয় তাই আমি যেতে প্রস্তুত।" অজয়ও কল্যাণীর আবেগ সমর্থন করে—তার কাছেও—যেখানে প্রেমের পুণ্যলোক সেখানেই স্বর্গ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের কাছে একমাত্র ধর্ম্ম—দেশ। যে অন্তরে দেশের শত্রু তাঁহার গৃহে তাহার স্থান নেই। কল্যাণীকে তিনি বহিষ্কৃত করেন। অজয় স্বেচ্ছায় ভগিনীর জন্য গৃহত্যাগ করে তাহার সঙ্গী হয়।

[এই বহিষ্কার ব্যাপারটিকে নাট্যকার পরবর্তী দৃশ্যে আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কল্যাণীকে বিতাড়িত করা হয়েছে—এই সংবাদ শুনে মহাবৎ খাঁ গোবিন্দ সিংহের মুসলমানবিদ্বেষ চূর্ণ করতে ও মেবার ধ্বংস করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।]

সপ্তম দৃশ্য—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। প্রথমাংশে সগর সিংহ ও অরুণ সিংহের কথোপকথন—অরুণের অতীত স্মৃতিসম্ভোগ প্রবণতা দেখে সগর সিংহ আতঙ্কিত—অরুণ যত বড় হচ্ছে তত মায়ের আকার ধারণ করছে। অরুণকে তিনি আগ্রায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু অরুণ চিতোর ছেড়ে যাবে না। কারণ, তাহার কাছে 'মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে দীনা জননীর কোলে বসে শাকান্ন খাওয়া ভাল। ...... পরের দত্ত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়েও নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটাও মিষ্টি।' শেষাংশে সত্যবতীর প্রবেশ। অরুণের কথা শুনে সত্যবতীর আনন্দ, পুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ—পিতাকে তীব্রতম ভৎর্সনা—ভৎর্সনার ফলে সগর সিংহের চৈতন্যোদয়—মাকে চিনতে পারা—দেশের সঙ্গে দুঃখদারিদ্র্য ও অনশন বেছে নেওয়া—সত্যবতী এক মুহূর্ত্তে পুত্র ও পিতাকে ফিরে পেয়ে মহা আনন্দিত।

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—উদয়পুরের সভাগৃহ। পরভেজের পরাজয়ে সামন্তদের উল্লাস। সভাকবি কিশোর দাসের 'বিজয়গীতি'। রাণার নৈরাশ্য

জনিত 'হিউমার'—সত্যবতীর প্রবেশ—দেশপ্রেমের ভাবাবেগে সে মুখর। তবে রাণার 'নিরানন্দ চাউনি', 'নিরস আনন' তাহার দৃষ্টি এড়ায় না—মেবারের গৌরবময় দিনে রাণাকে প্রাণ থেকে নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু রাণা মেবারের গৌরবময় দিনটিকে যাহারা গৌরব করছে তাহাদের গৌরবময় দিন বলে মেনে নিতে পারছেন না—যাহারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাহাদের তিনি ভুলতে পারছেন না। স্পষ্টভাষায় সত্যবতীকে বলেছেন—"প্রকৃত যুদ্ধজয় তাহারা করে না সত্যবতী, যাহারা নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে যুদ্ধ হতে ফেরে, আসল যুদ্ধ জয় করে তাহারা—যাহারা সেই যুদ্ধে মরে।"

রাণার সেই যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব বা বিষাদ খুবই অল্পকাল স্থায়ী। সত্যবতী শুভ সংবাদ—অর্থাৎ রাণা সগর সিংহ রাণার হস্তে চিতোর দুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন এই সংবাদ দিতেই রাণা উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে উঠেন এবং আদেশ দেন "দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—গ্রাম্য পথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর। কল্যাণী ও অজয়ের সঙ্গে পথে সগর সিংহের আকস্মিকভাবে দেখা ও পরিচয়। (সগর সিংহের মুখেই মহাবৎ খাঁ কল্যাণীর সংবাদ পান।)

তৃতীয় দৃশ্য—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। গজসিংহ ও দূতবেশী অরুণ সিংহের সংলাপের সাহায্যে গজসিংহের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গজসিংহের কাছে যাহা 'বিদ্রোহ', অরুণ সিংহের কাছে তাহা 'স্বাধীনতা রক্ষা করবার চেষ্টা'। অরুণকে এবং অমরকে মুখপাত্র করে নাট্যকার এখানে গজসিংহশ্রেণীর নীচমনা দেশদ্রোহীদের ভর্ৎসনা করেছেন। গজসিংহের পুত্র অমর সিংহও পিতার অন্যায় আচরণের (দূতকে বন্দী করা) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং অতি অপ্রিয় সত্য

বলে দিয়েছে—"মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বসবার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই"। রাজপুত রক্তেরই কথা বটে!

চতুর্থ দৃশ্য :—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। মহাবৎ খাঁ কল্যাণীর ঐকান্তিক প্রেমের প্রত্যাখ্যান করে অনুতপ্ত; কল্যাণীর কাছে এজন্য ক্ষমা চাইতেও প্রস্তুত। 'কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক, গজসিংহ সম্রাটের আমন্ত্রণ জানাতে প্রবেশ করে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বগ্রস্ত মহাবৎ খাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করে—মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন, মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হয়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

বহু যুক্তি দিয়ে গজসিংহ বুঝাতে তথা প্রেরোচিত করতে—মহাবৎ খাঁর মনটাকে মেবার-বিরোধী করতে চেষ্টা করে।

সন্ন্যাসী বেশে সগর সিংহ প্রবেশ করেন। মহাবৎ পিতার ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হন। পিতা ও পুত্রে দেশ-জাতি নিয়ে তীব্র কথা কাটাকাটি চলে। প্রসঙ্গত কল্যাণীর কথা উঠে এবং কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন এই কথা শুনে মহাবৎ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তীব্র সমালোচনা করে এবং হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষ চূর্ণ করবার জন্য, হিন্দুত্ব ধ্বংস করবার জন্য নূতন করে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। (মহাবতের স্মৃতিতে কল্যাণী এতখানি স্থান জুড়ে আছে—না দেখলে কে বুঝবে?)

[এই দৃশ্যে নাট্যকার একদিকে দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরেছেন, বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হওয়াকে ধিক্কার দিয়েছেন, হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, অন্যদিকে হিন্দু সমাজ-বিধানের গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতাকেও আক্রমণ করেছেন। নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য—'ইস্‌লাম ধর্ম্ম আর যাই হোক, তার এই মহত্ত্বটুকু আছে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের

বুকে করে আপনার করে নিতে পারে। আর হিন্দুধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী—শত তপস্যায় হিন্দু হতে পারে না।" এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটলে হিন্দুর উন্নতির আশা নেই, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাবের সম্ভাবনা নেই—জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিরও কোন আশা নেই।]

পঞ্চম দৃশ্য :—জাহাঙ্গীরের সভা।

প্রথমাংশে পরভেজের পরাজয় সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর ও হেদায়েৎ আলি খাঁর আলাপ-আলোচনা। (সম্রাটের সঙ্গে হেদায়েৎ আলির রসিকতা, বিশেষতঃ সভাগৃহে, অশোভন ও অনুচিত)। দ্বিতীয়াংশে জাহাঙ্গীর ও সগর সিংহের বাকদ্বন্দ্ব, এবং দেশপ্রেমকে স্বার্থের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করে সগর সিংহের আত্ম-বলিদান বা প্রায়শ্চিত্ত—ত্যাগের রাজ্যের নাগরিকত্ব লাভ। [সগর সিংহের উপরস্ত এখানেই শেষ হয়েছে।]

চতুর্থ অঙ্ক :—**প্রথম দৃশ্য**—উদয়সাগরের তীর। কাল জ্যোৎস্না রাত্রি। দৃশ্যটির বিভাব রোমান্টিক ভাবের বা মায়াবাদী চিন্তারই উপযুক্ত এবং রাণা অমর সিংহের মানসিক অবস্থাও মায়াবাদী চিন্তার উপযুক্ত জন্মভূমি। তাঁহার কাছে-অর্থাৎ যিনি সংসারকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরতে পারছেন না, যাঁহার মনের গভীরে নৈরাশ্য বাসা বেঁধে আছে — অবশ্যই 'সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা' বলেই মনে হবে। সংসার ত্যাগ করবার বাসনা খুবই স্বাভাবিক। মানসী আসতেই, উভয়ের মধ্যে গভীর দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। মায়াবাদীরা সংসারকে যত হেয় দৃষ্টিতে দেখে, মানসী 'সংসারকে অত খারাপ' ভাবতে পারে না। সংসার তাহার কাছে 'মনোহর মায়া'। বহিঃপ্রকৃতি সুন্দর বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিবর্ত্তন তো সেখানেই থেমে থাকেনি। একদিকে রয়েছে বহিঃপ্রকৃতি, অন্যদিকে আছে 'মানুষের চিন্তাজগত'—চিত্তলোক বা মনের জগত। প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি, মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্য আছে। তবে একথাও ঠিক যে মানুষের লোভ আছে, ঈর্ষা আছে, দ্বেষ আছে, মানসিক ব্যাধি আছে। এখানেই মানুষ বড় দুঃখী, বড় দীন। মানসীর আবেদন—

"মানুষ বড় দুঃখী, তাহার দুঃখ মোচন করতে হবে। সংসার বড় দীন, তাহাকে টেনে তুলতে হবে।" মানসী প্রস্থান করে বটে কিন্তু রাণার সৌন্দর্যাবেগ বা মোহ কিছুতেই কাটতেই চায় না। তাঁর বোধ হয় অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য অনুভব করে। তিনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন—সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে থাকা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখাই বটে। রাণীর অতিবাস্তব সাংসারিক কথার ধাক্কায় তাঁহার মোহ ভেঙ্গে যায়—'দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির কর্কশ-ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। প্রথমাংশে মানসীর বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কথান্তর হয় এবং আলাপের শেষাংশে, রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে মোড় ঘুরে যায়। দৃশ্যটির সমাপ্তি হয়—অজয়ের বিরহে মানসীর কাতরোক্তিতে ও গানে। (মানসীর উক্তিতে এই কথাই প্রক্যাশিত হয়েছে যে মানসীর মধ্যে রক্তমাংসের মানুষও একজন আছে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—মেবারে মহাবৎ খাঁর শিবির।

এই দৃশ্যের উদ্দেশ্য—(ক) মহাবৎ খাঁর সেনাপতিত্বেই মেবার অভিযান হয়েছে, এই ঘটনাটি উপস্থাপিত করা। (খ) হিন্দুই হিন্দুর বড় শত্রু—স্বজাতির উপর পীড়ন করে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তাহার আর কিছুতে নয় এবং (গ) আসলে "এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্মে ধর্মে"। পরোক্ষতঃ সমাজের সমালোচনা করা।

তৃতীয় দৃশ্য :—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ। প্রথমাংশে—রাণা ও সত্যবতীর কথোপকথন—মহাবৎ খাঁ ও গজ সিংহ যুদ্ধে এসেছেন শুনে রাণার প্রতিক্রিয়া—অনিবার্য্য পরিণতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনাকে প্রলাপ দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। যে মূল কারণে মেবারের পতন, সেই কারণ সক্রিয় হয়েছে—ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই শুরু হয়েছে ; এখানেই তো আসল যুদ্ধের আরম্ভ। গজ সিংহ না আসলে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে না, সেও এসেছে। রাণার

উক্তির ভিতর দিয়ে জাতীয় দুর্ব্বলতার ক্ষত স্থানটি অনাবৃত করতে চেষ্টা করেছেন (ক) "ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করবে তাহার নিজের সন্তান ... বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না।" (খ) "যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়... বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।" দ্বিতীয়াংশে—গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে রাণার দুর্নিবার আগ্রহ—মেবারের জন্য প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প।

তৃতীয়াংশে—রাণীর সঙ্গে রাণার প্রলাপ-বচন। (রাণীর কোন পরিবর্ত্তন নেই—তাঁহার ধারণা "সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল।" এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে রাণীর লঘু আচরণ অনুচিত।) শেষাংশে মানসীর মুখে ধিক্কার বচন উচ্চারিত হয়েছে—"হারে অধম জাত। তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে।"

চতুর্থ দৃশ্য :—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ।

প্রথমাংশে সত্যবতী-অরুণ গ্রামবাসীদের ডাকবার জন্য গ্রামপরিক্রমায় বেরিয়েছে। (পল্লীর শাসকরা বা সর্দ্দাররা কোথায়?)

দ্বিতীয়াংশে গ্রামবাসীদের অসাড় ঔদাসীন্য—কোনরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা।

শেষাংশে শত্রুর প্রতিরোধ করতে অজয়-কল্যাণীর গ্রামবাসীদের আহ্বান—গ্রামবাসীদের পলায়ন—যুদ্ধে অজয়ের প্রাণদান। যাহার আদেশে এই হত্যা, গৃহদাহ, সেই সেনাপতি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সৈনিকদের সঙ্গে কল্যাণীর গমন।

পঞ্চম দৃশ্য :—উদয়পুরের রাজসভা।

মেবারের অগণিত লোকক্ষয় হয়েছে—সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। সামন্তদের কেহ কেহ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন কিন্তু রাণাও

গোবিন্দ সিংহ অটল। রাণা যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারেন না; গোবিন্দ সিংহ প্রাণ দেবেন তবু মান দেবেন না।

ষষ্ঠ দৃশ্য—মহাবৎ খাঁর শিবির।

প্রথমাংশে মহাবৎ খাঁ ও গজ সিংহের কথোপকথন। রাণা অমর সিংহের বীরত্বে, রাজপুত জাতির শৌর্য্যবীর্য্যে মহাবৎ খাঁ গর্ব্ব অনুভব করছেন; ধর্ম্মে মুসলমান হলেও জাতিতে তিনি রাজপুত। তিনি সেই রাজপুতদেরই একজন যাহাদের নির্ভীকতার ও স্বদেশপ্রাণতার কোন তুলনা নেই। এ-আবহাওয়ায় গজ সিংহের মত পতিত রাজপুতের বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়—সে প্রস্থান করে স্বস্তি পায়।

দ্বিতীয়াংশে সৈন্য চতুষ্টয়ের সঙ্গে কল্যাণীর প্রবেশ এবং স্বামী-সাক্ষাৎকার। যে সঙ্কল্প ও আদর্শ নিয়ে কল্যাণী পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছিলেন, সেই আদর্শে অবিচলিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁহার আরাধ্য দেবতার আসনে তিনি দেখেন একজন ঘাতককে, একজন মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিস্বার্থ সর্ব্বস্ব গর্বী মহাবৎ খাঁকে। তাঁহার মোহ ভেঙ্গে যায়। অজয়ের মৃত্যু এবং স্বদেশের রক্তের ঢেউ উভয়ের মিলনের মধ্যে সমুদ্র-ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

কল্যাণী 'এক ক্ষেপে স্বামী আর ভাই' দুই হারিয়ে ভাগ্যকে ধিক্কার দেন— এবং 'নির্ম্মম দেশদ্রোহী রক্তপিপাসু জল্লাদ'—নীচ হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের ... দু'মুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের'—অভিশাপ দিয়ে প্রস্থান করে।

*[কল্যাণীর আচরণের সাহায্যে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন— (ক) নির্ব্বিচার আত্মোৎসর্গ—অর্থাৎ দোষগুণ বিচার নিরপেক্ষ ভালবাসা কথার কথা (খ) ধর্ম্মত্যাগ করলেই ব্যক্তি পতিত হয় না; প্রকৃত পাতিত্য ঘটে তখনই যখন ব্যক্তি হৃদয় হারিয়ে ফেলে—ব্যক্তিগত অভিমান চরিতার্থ করবার জন্য মনুষ্যত্বকে বলি দেয়—অন্যায় নিষ্ঠুর কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আসল পাতিত্য চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের হীনতা। কল্যাণী স্বামীর সঙ্গে নরকে যেতে

প্রস্তুত থেকেও, মহাবতের সঙ্গে মিলতে পারেননি এই কারণেই—মহাবৎ খাঁর পাতিত্যই মিলনের আসল বাধা।]

পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য :—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর।

(ক) মানসী একাকী, গান গেয়ে মনের খেদ প্রকাশ করছেন—'কত ভালবাসি তার—বলা হোলো না।'

(খ) উদ্‌ভ্রান্ত রাণার প্রবেশ। রাণার মূর্ত্তি ও প্রলাপের সাহায্যে মেবারের পতন ও তাহার শোচনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমগ্র মেবারের আর্ত্তনাদ অমর সিংহের প্রলাপোক্তি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

*[উদ্‌ভ্রান্ত উক্তির ভিতর দিয়ে যুদ্ধের রূপ, তার ভীষণতা পরাজয়ের আর্ত্তনাদ, মেবারের শোচনায় অবস্থা অতি দক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ণনাকে প্রত্যক্ষের স্থলাভিষিক্ত করতে পারা অবশ্যই শক্তিমত্তার নিদর্শন। তবে রাণার আচরণে দুই একস্থলে বেশ বাড়াবাড়ি আছে। আর রাণীর আচরণ—যদিও সামান্য—দেশ-কাল-পাত্র নিরক্ষেপ।

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য :—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ। দুইজন পরিচারিকার কথোপকথনের সাহায্যে অজয়ের মৃতদেহ গোবিন্দ সিংহের বাড়ীতে আনা হয়েছে—এই তথ্যটি জানানো হয়েছে এবং মানসীর আক্ষেপোক্তির তথা স্বীকারোক্তির সাহায্যে দেখানো হয়েছে—মানসী মুখ ফুটে না বললেও, অজয়কে সে ভালবেসেছে। দৃশ্যটিকে তৃতীয় দৃশ্যের প্রস্তুতি বলা চলে।

তৃতীয় দৃশ্য :—গোবিন্দ সিংহের গৃহাঙ্গন। অজয়ের মৃত্যুতে গোবিন্দ সিংহের শোক—সত্যবতীর সান্ত্বনা প্রদান, কল্যাণীর আগমনে গোবিন্দ সিংহের প্রতিক্রিয়া, কল্যাণীর আত্মধিক্কার, গোবিন্দ সিংহের অনুতাপ, মাতৃহীনা অভাগিনী কন্যাকে বক্ষে গ্রহণ। শেষাংশে আলুলায়িত কেশা স্রস্তবসনা মানসীর প্রবেশ, অজয়কে স্বামী বলে সম্বোধন, সকলের সম্মুখে ঘোষণা—

"অজয় সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেহ জানতে পারেনি—আমি নিজেও জানতে পারিনি।" মানসীর শোক প্রকাশ, কল্যাণীর মূর্চ্ছা। গোবিন্দ সিংহের শোকের মাত্রা পূর্ণ। পুত্র, কন্যা, মেবার সব হারিয়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য :—মেবারের পর্ব্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। গজ সিংহ ও মহাবৎ খাঁর কথোপকথনে গজ সিংহের নীচতা এবং মহাবতের রাজপুত অভিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মধ্বজীদের উপর আক্রোশ ব্যক্ত হয়েছে।

মহাবৎ খাঁ জানিয়েছেন "আমি মোগল সৈন্য নিয়ে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ করতে চাই না।" এখানেই গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ। গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। তাঁহাকে বধ না করা পর্য্যন্ত উদয়পুর দুর্গে তিনি মোগলকে প্রবেশ করতে দেবেন না, তিনি মরতে চান। তাঁহার দৃপ্ত ঘোষণা "আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে আমি মরতে চাই। রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখবার আগে আমি মরতে চাই ......" মহাবৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করলে, গজসিংহ এসে গোবিন্দ সিংহকে গুলি করল। মেবারের শেষ প্রতিরোধ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। [গোবিন্দ সিংহের উপধারার এখানে উপসংহার হল।]

পঞ্চম দৃশ্য :—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ। দুর্গরক্ষক রাজপুত সৈনিক ও পুরবাসীর কথোপকথনের সাহায্যে—'শাহ্‌জাদা খুর্‌রম্‌ এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত শাহজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগল দূত ফিরে গেলে রাণা—আজ প্রত্যুষে উঠে ঘোড়ায় চড়ে শাহ্‌জাদার শিবিরের দিকে গেলেন।" —এই সংবাদটুকু জ্ঞাপন করা হয়েছে। শেষাংশে রাণা অমর সিংহ মোগল কুকুর গজ সিংহকে পদাঘাত করে অতিথি সৎকার করেছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য :—মেবারের গিরিপথ। সত্যবতী ও তাঁহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ। • পতিত মেবারের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির জন্য গানের ভিতর দিয়ে আর্ত্তনাদ করছেন। হেদায়েৎ বিদ্রোহের গান গাইতে দেবে না—সত্যবতী ও অরুণ 'আইন অমান্য' করে গান গাহিতে থাকেন। হেদায়েৎ সত্যবতীকে বন্দী করতে গেলে অরুণ বাধা দেন। সৈন্যরা অরুণকে আক্রমণ করে, অরুণ বীরের মত যুদ্ধ করেন। এমন সময় প্রবেশ করেন মহাবৎ। ভাই-বোনের মধ্যে নানা অভিমানের দ্বন্দ্ব চলে। মহাবৎ স্বীকার করেন যে তিনি পাপ করেছেন, নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছেন এবং পৈশাচিক উল্লাসে তার ধূমরাশি দেখছেন। তবে মুসলমান হওয়া—বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্ম গ্রহণ করা কোন পাপ কাজ—একথা মহাবৎ স্বীকার করেন না। আর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ যদি পাপও হয় মহাবৎ জিজ্ঞাসা করেন—"সে পাপ কি এত ভয়ানক যে সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে ? ... আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ করে দিতে পারে ? সমাজ সম্পর্কের উপরে হৃদয় সম্পর্ক জয়ী হয়। সত্যবতী মহাবৎকে—ছোট ভাই মহীপৎকে—ভাই বলে গ্রহণ করেন।

কিন্তু হেদায়েৎ 'আইন অমান্যকারিণী'কে বন্দী করতে উদ্যত। মহাবৎ বাধা দিলে হেদায়েৎ মহাবৎকে সেনাপতি বলে স্বীকারই করে না। শাহজাহান এসে হেদায়েৎকে শান্ত করেন, বুঝিয়ে দেন গানটি বিদ্রোহের গান নয়, গানটি "হতাশাময় গভীর দুঃখের গান"। অস্বাভাবিক উদারতাবশে শাহজাহান ঘোষণা করেন, মোগল সম্রাট্ কখন কোন সঙ্গত ন্যায়োচিত ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। ইহার জন্য যদি তাঁহার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়—দিবেন।' শুধু এইটুকু বলেই শাহ্জাহান ক্ষান্ত হন না; তিনি নিজে গানে যোগ দেন এবং হেদায়েৎকে পর্য্যন্ত যোগ দিতে আদেশ করেন।

[সত্যবতীর মুখে—"মোগলের জয় হোক ...মোগলের সঙ্গে আর আমাদের

বিবাদ নাই ...” এই সংলাপ দেওয়া ঠিক হয়নি। সত্যবতী 'আইন অমান্য করে জেলে যাবেন, কিন্তু প্রাণ থাকতেও কথা বলবেন না। হেদায়েৎ আলিকে 'রাজপুরুষ' বলে বেশ চেনা যায় বটে কিন্তু শাহ্‌জাহানের মতিগতি এক কথায় "অদ্ভুত"। 'মোগল' সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও শাহ্‌জাহান ভারতবর্ষের সন্তানদের মায়ের নাম গাইতে উৎসাহিত করবেন এবং চারণীদের সঙ্গে গানে যোগ দেবেন ইহা রোমাঞ্চকর কল্পনাই বটে। মায়ের নাম গানে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই করুন আর মুসলমান শাহ্‌জাহানকে উদার প্রতিপন্ন করার জন্য তথা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই করুন, এই কল্পনা আপত্তিকর মাত্রায় অনুচিত। [আর একটা কথাও বক্তব্য—হিন্দু ও মুসলমান সমস্যার যত সহজ সমাধান এখানে করা হয়েছে, সমাধান তত সহজ নয়। জাতি-পরিচয়ে ও সমাজ সম্পর্কে ধর্মের যে প্রভাব বা প্রতিপত্তি রয়েছে তাহা মুখের কথায় বা নিছক ভাবাবেগে তিরোহিত হতে পারে না।

জাতিধর্ম নিরপেক্ষ হৃদয়ধর্মের প্রশস্তি যতই করা হোক্, ধর্মনিরপেক্ষ জাতি তৈরি করতে হলে ধর্ম বিধি থেকে সমাজ বিধিকে পৃথক্ করে যেরূপ বিধি-ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা প্রবর্তিত না-হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ে জাতি বা সমাজ-গঠনের সঙ্কল্প দিবা স্বপ্নের স্তরেই থেকে যাবে।* এখনও রাষ্ট্রনায়করা রোমান্টিক সমাধানের অধিক কিছু করতে পারেননি।]

সপ্তম দৃশ্য :—উদয় সাগরের তীর। মানসী দেখতে পেয়েছেন জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে কর্তব্যপথ বহু দূরে প্রসারিত। দুঃখকে তিনি বশীভূত করেছেন—দুঃখকে বিপরিণত করে মনুষ্য-কল্যাণের আবেগে রূপান্তরিত করেছেন। কল্যাণীকেও দুঃখকে কল্যাণব্রতে উর্দ্ধায়িত করে সুখী হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সত্যবতী প্রবেশ করে ঘটনাকে মূল কার্যধারায় ফিরিয়ে এনেছেন। মানসী ও সত্যবতীর সংলাপে জানানো হয়েছে—শাহ্‌জাদা চান যে রাণা দুর্গের

বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফরমান নেন এবং প্রতাপ সিংহের পুত্রের পক্ষে তাহা মৃত্যুর অধিক। তাই রাণা পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বসবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন। সত্যবতী বলেন 'আজ মেবারের পতন হল মানসী।' মানসী বলেন পতন বহুদিন পূর্ব্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র মানসী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন কবে এবং কেন পতন হয়েছে। * [এখানেই মানসীকে মুখপাত্র করে নাট্যকার প্রাণভরে নিজের কথা বলে নিয়েছেন। নাট্যকারের মতে জাতির পতন আরম্ভ হয় সেদিন "থেকেই যেদিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে, যেদিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে।" জাতীয় জীবনস্রোত বদ্ধ হয়ে গেলেই বদ্ধ জলার মত জাতির দেহেও নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃবিরোধ, বিজাতি বিদ্বেষ জন্মে। ধর্ম্ম হারিয়ে কোন জাতি বড় হতে পারে না। নৈতিক বল যাহার নেই তাহার পতন হবেই। ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা না করলে জাতীয় মুক্তি কোনকালেই হবে না। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতিয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। এ জাতি আবার মানুষ হবে—"যেদিন তাহারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে, যে-দিন তাহাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যেদিন তাহারা যাহা উচিত কর্ত্তব্য বিবেচনা কার্য্যে নির্ভয়ে তাই করেও যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারও ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। সেদিন তাহারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিবে এবং ধর্ম্মকে বরণ করবে। সেই নবধর্ম্ম ভালবাসা আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপর আর তাহাদের—নিজের কিছু করতে হবে না। "জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয়, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।

অষ্টম দৃশ্য—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। (মেবার-পতনের শোক প্রকাশের উপযুক্ত বিভাব)। রাণা অমর সিংহ আর্ত্তনাদ করছেন—"আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হল ওঃ।" এমন সময় প্রবেশ করেন—মহাবৎ খাঁ। কারণ, রাণা একবার তাঁহার সাক্ষাৎ চেয়েছেন। চেয়েছেন এই কথাই বলতে—"তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয়নি, তার সঙ্গে মেবারের রাণাকেও শেষ কর।" মহাবৎ অস্বীকার করলে রাণা তাঁহাকে 'ভীরু…ম্লেচ্ছ…কুলাঙ্গার' বলে ভর্ৎসনা তথা যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করেন। উত্তেজিত মহাবৎ অগত্যা তরবারি নিষ্কাসিত

এই উদ্যত তরবারির সামনে এসে দাঁড়ান মানসী। তাঁহার মুখে এক কথা—শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা আবার মানুষ হওয়া। উভয়েই মানসীর বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনে শান্ত হন। চারণীদের গানে উভয়েই চোখ খুলে যায়। একে অন্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং 'আলিঙ্গনাবদ্ধ' হন। এখানেই বৃত্তের উপসংহার—রীতিমত রোমান্টিক উপসংহার!

এই বৃত্ত-পরিকল্পনা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে—বৃত্তটি রোমান্সধর্মী অর্থাৎ বহু লোকের বহু কাজকে বৃত্তে দৃশ্য করাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এক একটি অঙ্কে পাঁচ-সাতটি আবার কোন কোনটিতে আটটি দৃশ্য যোজনা করতে হয়েছে। সুতরাং বৃত্তে নাটকীয় সংহতির স্থলে উপন্যাসের বিস্তৃতি দেখা দিয়েছে এবং ঘটনার অগ্রসরণে (progression) উপন্যাসের slow বা 'gradual development'—প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বৃত্ত-রচনা যেহেতু ঘটনাবলীর বিন্যাস, বৃত্ত-বিচারে অবশ্যই ঘটনা-বিন্যাসের দোষগুণের কথা বলা দরকার। দৃশ্য-কল্পনার বিবরণ দিতে গিয়ে আমি ঘটনা-বিন্যাসের দোষত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং অনুচিত ঘটনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

অঙ্গী-রসবিচার ও জাতি-বিচার

বৃত্ত-পরিকল্পনার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি তত্ত্বগত একটি প্রশ্ন-উত্থাপন করেছি এবং সেই প্রশ্নটি এই যে নাটকে যে-বৃত্ত রচনা করা হয়েছে তাহাতে প্রতিপাদ্য (premise) অতিরিক্ত কিছু ব্যক্ত হয়েছে কিনা —মূল প্রতিপাদ্য থেকে দৃষ্টি সরে গেছে কি না এবং তাহার ফলে নাটকের রস নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে কি না ? এই প্রশ্নটির আংশিক উত্তর সেখানেই দিয়েছি ; এখানে আলোচনা করছি রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হয়েছে কি না ? নাট্যকার ট্র্যাজেডি লিখতে কমেডি লিখে ফেলেছেন কি না অথবা নাটকখানি মেলোড্রামা শ্রেণীর হেয় নাটকে পরিণত হয়েছে কি না ?

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রত্যেক বড় সৃষ্টির মধ্যেই বড় 'ভাব' (idea) প্রতিপাদ্য হিসাবে থাকে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে শুধু 'ভাব' (concept or idea) থাকলেই বড় রস-সাহিত্য হয় না ; ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য যে রূপকল্পনা করা হয় তাহাকে রসাত্মক করে তুলতে হয় এবং তবেই তাহা রস-রূপে পরিণত হয়। রূপকে রসাত্মক করে তোলার অর্থ রূপকে ভাবের (আবেগের) বাহনে পরিণত করা—অর্থাৎ রূপের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ 'ভাব'কে এবং নানা ভাবের ভিতর থেকে একটি বিশেষ ভাবকে প্রধান ও স্থায়ী করে তুলতে পারা। এই স্থায়িভাবের ভিত্তিতেই রচনাকে নানা রসে ভাগ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-—রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত ইত্যাদি রসের নির্দ্ধারণ ভাবের ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রে ভাব-সংবেদনার (sensations) ভিত্তিতে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে তাহার এক মেরুতে রয়েছে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি, অর্থাৎ তীব্র বেদনাত্মক পরিণামের 'রচনা', অন্য মেরুতে আছে—লঘু বা স্থূল কমেডি বা 'প্রহসন'। পরিভাষার কচকচি বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি-কমেডি শ্রেণীর বিভাগের ধারণা করতে গেলে, বেদনা বা আনন্দ সংবেদনার ভিত্তিতেই করতে

হবে। সেইভাবে করাও হয়েছে। যে রচনার ঘটনা বেদনাজনক অর্থাৎ যাহা' 'arousing pity and fear'তাহা ট্র্যাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত,আর যাহার ঘটনা আনন্দজনক বা হাস্যজনক তাই কমেডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানেই প্রশ্ন উঠে থাকে—বেদনা-পরিণাম রচনামাত্রকেই আমরা 'ট্র্যাজেডি' পদবাচ্য করতে পারি কি না? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের পরিপাটি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ এখানে নেই,তবু অতি সংক্ষেপে এবং সিদ্ধান্তের আকারে বলে নেওয়া দরকার—'প্যাথেটিক' ও 'ট্র্যাজিকে'র মধ্যে সীমারেখা টানার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে সীমারেখা সুস্পষ্ট বা অবিসংবাদিত হয়নি। গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যত ট্র্যাজেডি লেখা হয়েছে, তাদের বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এই বিষয়টি স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হবে যে, প্রত্যেক ট্র্যাজেডি লেখক তার নায়কের জন্য 'pity' জাগানোর এবং নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় যে "unmerited suffering"—এই ধারণা জাগানোর চেষ্টা করেছেন। যে বিশেষ বিশেষ বোধের সঙ্গে যুক্ত থেকে বেদনা ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হয়, সেই বোধের সম্পূর্ণ তালিকা এখনও তৈরি হয়নি বটে, কিন্তু যাহা' হয়েছে তাহা থেকে জানা যায় যে ট্র্যাজেডি মূলতঃ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও তার বেদনার দৃশ্য—এক কথায়, করুণ রসাত্মক রচনা। অবশ্য করুণরসাত্মক একটি আক্ষেপ বা বিলাপকে ট্র্যাজেডি বলতে হবে, একথা বলছিনে কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয় ও দুর্নিবার শক্তির প্রভাবে অথবা পরিবেশের সঙ্গে যুঝাপড়া করতে গিয়ে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের জীবন শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের আবর্তে তলিয়ে যায় এবং সেই বিপর্যয় আমাদের মনে শোচনার উদ্রেক করে সেখানে আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-বোধই জাগে। করুণ রসাত্মক মাত্রই ট্র্যাজেডি—এ সিদ্ধান্ত যদিও বা না করা যায়, ট্র্যাডেডি মাত্রই যে করুণ রসাত্মক এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেবার-পতন নাটকের অঙ্গীরস বা জাতি

বিচার করতে চেষ্টা করা যাক! নাটকখানি সার্থক ট্র্যাজেডি হয়েছে কি হয়নি বা মেলোড্রামা হয়েছে কি না, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে, চেষ্টা না করেও, যে কথাটা আপাতদৃষ্টিতে এবং নাটকের নাম দেখেই বলা যায় সে এই যে নাটকখানি লঘু আমোদ ও প্রমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি—ট্র্যাজেডির ছাঁচে ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে—মেবার-পতনের মত একটি বেদনাদায়ক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এবার আপাতদৃষ্টির স্তর অতিক্রম করে—নাটকের স্থায়িভাব (dominant impression) বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, ট্র্যাজেডির ছাঁচে ঘটনা ঢালাই করলেও নাট্যকার ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন কি না, অর্থাৎ ট্র্যাজেডি সংবেদনার জন্য যে ধরনের বোধ ও যে পরিমাণ বেদনা জাগা দরকার তাহা এখানে জেগেছে কি না, অন্য কোন অগন্তুক বিরোধী ভাব এসে রসনায় বাধা সৃষ্টি করেছে কি না! প্রথমত বোধের কথাই বলা যাক। মেবার-পতন নাটকের ঘটনা যে শোচনীয় এবং ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঘটনা একথা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রশ্ন—কাহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ঘটনা? অমর সিংহের না মেবারের? নাট্যকারের উত্তর যদি নামকরণের মধ্যেই নিহিত থেকে থাকে তবে তিনি বলতে চান—মেবারের পতন বা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ঘটনা। অর্থাৎ শৌর্য্য-বীর্য্য-স্বাধীনতার বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী যে মেবার, সেই মেবারের ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থাপনা করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু মেবার তো একটি দেশ বা জাতির সঙ্কেতমাত্র। দেশ বা জাতির ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় দেশবাসীরই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে। যেহেতু ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিই দেশের প্রতিনিধি, কোন দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে তাহার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টিরই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে। অমর সিংহের পরাজয়ই মেবারের শোচনীয় পতনের কারণ। অমর সিংহ তাই নিমিত্তমাত্র। তাঁহার পতন বা পরাজয় আমাদের কাছে ট্র্যাজিক সংবেদনা জাগায় এই কারণেই যে তাঁহার

পরাজয়েই অপরাজেয় মেবার পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে—তাঁহার হাতে রাণা প্রতাপের মেবার মোগলের দাসত্ব স্বীকার করেছে চিরোন্নত শির অবনত করেছে। সুতরাং অমর সিংহের নায়কোচিত যোগ্যতা আছে কি না এ প্রশ্নের বিচারের চেয়েও বড় কাজ, মেবারের পতনে অমর সিংহের ভূমিকা কি, অমর সিংহের ট্র্যাজেডি অথবা মেবারের ট্র্যাজেডি দেখানো নাট্যকারের কি উদ্দেশ্য ?—এইসব প্রশ্ন সম্যকভাবে বিচার করে দেখা। আমি মনে করি—এই নাটকে মেবার একটি জীবন্ত ব্যক্তি-সত্তায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যক্তির আসন কীর্ত্তি-খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত। সে অপরাজেয় ও চিরস্বাধীন। শৌর্য্যে-বীর্য্যে সে অতুলনীয়। বহু রাণার জ্বলন্ত দেশপ্রীতি দিয়ে—বিশেষতঃ রাণা প্রতাপের প্রতাপ ও বীর্য্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে। সকলের শির যেখানে অবনত, তাঁহার শির সেখানে উন্নত। এ হেন মেবারকে দুর্নিবার শক্তি নিয়ে মোগল সম্রাট পরিবেষ্টন করেছেন তাঁহার স্বাধীন ও উন্নত শিরকে অবনত করবার জন্য। আক্রমণকারী মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মেবার ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত ও হীনবল। বড় দুর্ব্বলতা তার অন্তর্বিরোধ—মোগলপদানত রাজপুতদের এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণকারী মেবারবাসীদের চক্রান্ত ও ঈর্ষা। অমর সিংহ যেন মেবারের যুদ্ধক্লান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সত্তারই প্রতিনিধি। এই সত্তাটিতে সঙ্কল্পের শৈথিল্য পরিস্ফুট। অন্যপক্ষে গোবিন্দ সিংহ মেবারের অটুট সঙ্কল্পের প্রতিনিধি। সঙ্কট মুহূর্ত্তে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বে মেবারেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্ত হয়েছে এবং গোবিন্দ সিংহের জয়ে মেবারের স্বাধীনতচেতা অপরাজেয় সত্তারই জয় হয়েছে। কিন্তু অমর সিংহ ও গোবিন্দ সিংহকে এক কথায় মেবারকে, আগুন সংগ্রাম করতে হয়েছে—বাইরে মোগলের বিরুদ্ধে এবং ভিতরে স্বজাতিদ্রোহী রাজপুতদের সঙ্গে। এই দ্বন্দ্বই মেবারের প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেই মেবার হীনবল হয়েছে বেশী। মেবারের ব্যক্তিত্বই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সগর সিংহ,

মহাবৎ খাঁ, গজ সিংহ মেবারের জাতি-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুশিবিরে যোগ দিয়েছেন। ভিতরকার এই দুর্ব্বলতা নিয়ে শুধু দেশপ্রীতি সম্বল করে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মেবার বাইরের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে—তার স্বাধীনতা ও অপরাজেয়ত্বের খ্যাতি রক্ষা করবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু শোচনা ব্যাপার এই যে মেবারকে তার চিরোন্নতশির মোগলের কাছে অবনত করতে হয়েছে—বহুবীরত্বের ঐতিহ্যে মণ্ডিত রক্ত পতাকাকে তার দুর্গচূড়া থেকে নামিয়ে নিতে হয়েছে—মেবার সৌভাগ্যের শিখরদেশ থেকে দুর্ভাগ্যের গভীর গহ্বরে পতিত হয়েছে। এইদিক থেকে দেখলে মেবার-পতন কোন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি নয়, স্বাধীনতাসর্ব্বস্ব একটা জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ট্র্যাজেডি—যে জাতি সব কিছুর উর্ধ্বে দেশের স্বাধীনতাকে স্থান দিয়েছে, কোনরূপ সুখ ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে এবং শত বিপাকেও স্বাধীনতা বিক্রয় করেনি, প্রাণের চেয়ে মানকে যে জাতি বড় বলে মেনে এসেছে, তেমন একটি জাতির স্বাধীনতা হারানোর ট্র্যাজেডি।

এই নাটকের সার্ব্বজনীন আবেদনের কেন্দ্র এখানেই। যে-পরিমাণে মেবার চিরোন্নতশির স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতীক হয়ে উঠেছে, সেই পরিমাণেই মেবার-পতনের বেদনা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজনের চিত্তকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। একটা স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হারানোর আর্ত্তনাদ ও অন্তর্দাহের মধ্যে "terrible suffering" রূপ যে-পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে, সেই পরিমাণেই নাটকের আবেদন সার্ব্বজনীন হয়েছে।

অমর সিংহ এই বিরাট অতীত ঐতিহ্য সম্পন্ন মেবারের রাণা বা অধিনায়ক। তাঁহার আচরণেই মেবারের আচরণ, দ্বিধায় মেবারের দ্বিধা, সঙ্কল্পে মেবারের সঙ্কল্প, জয়ে মেবারের জয় এবং পরাজয়েই মেবারের পরাজয়। অমর সিংহ মেবারের প্রতিভূ এবং তাতেই নাটকে তাহার ঔপচারিক নায়কত্ব। অমর সিংহের ট্র্যাজেডি এই যে তাঁহাকেই মেবার-পতনের নিমিত্ত

হতে হয়েছে। তাঁহার হাতেই মেবারের—প্রতাপের মেবারের—পতন ঘটেছে। তাঁহার দুর্ভাগ্য—তাঁহার শাসনাধিকারেই জাতীয় জীবনের এমন এক মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছে যাহাতে জাতির বহুকালসঞ্চিত কীর্ত্তি ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। নিয়তির মত এক অনিবার্য্য পরিণতির বিরুদ্ধে নিঃসহায় তথা নিষ্ফল সংগ্রাম করে ধনে-প্রাণে-মানে নিঃস্ব হতে হয়েছে। মরণের অধিক যে-পরাধীনতা সেই পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে।

অমর সিংহ-যে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তাহা মোগল-সাম্রাজ্যের বিরাট ও সংহত সামরিক শক্তি। এই শক্তি একদিকে পুষ্ট হয়েছে সমগ্র সাম্রাজ্যের ধনবল ও জনবল দ্বারা, অন্যদিকে পুষ্ট হয়েছে মোগলপদানত রাজপুতদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা দ্বারা। সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্যে নিঃসহায় অভিমন্যুর নিরুপায় সংগ্রামের মতই বিরাট মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে অমর সিংহের সংগ্রাম—অনিবার্য্য নিয়তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামের মতই শোচনীয়। অমর সিংহের মধ্যে বিলাসপ্রবণতা, সংগ্রামে বিমুখতা এবং সন্ধির মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সব মনোবৃত্তি কখনই জয়ী হতে পারেনি এবং পারেনি বলেই প্রতিবারেই অমর সিংহ প্রতাপ সিংহের পুত্রের ন্যায় বীর্য্যবত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। একাধিকবার মোগলের বিরাট বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং তিনি যে ভীরু বা সমরকাতর নন তার প্রমাণ দিয়েছেন। শৌর্য্য-বীর্য্যের নানা প্রমাণ থাকতেই অমর সিংহের ক্ষণিক দ্বিধা বা যুদ্ধ বিমুখতা তাঁহার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে উঠেনি। বিনা যুদ্ধে তিনি যদি বশ্যতা স্বীকার করতেন বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতেন তবেই আমরা তাঁহাকে অযোগ্য বলতে পারতাম। বলতে পারতাম—অমরসিংহের ভীরুতার জন্যই মেবারের পতন ঘটেছে এবং অযোগ্যের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শোচনা জাগতে পারে না। কিন্তু অমর সিংহকে সেই হিসাবে অযোগ্য বলা চলে না। তাঁহার মধ্যে যে দ্বিধা দেখা যায় তাহা নিছক কাপুরুষের মৃত্যুভয় নয়, অনিবার্য্য

সর্বনাশের সম্মুখে নিরুপায় ব্যর্থ প্রয়াসের যে দ্বিধা এ সেই দ্বিধা। এই দ্বিধাকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বলা যেতে পারে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য'। কার্য্যকালে এই দৌর্ব্বল্য তিনি ত্যাগ করেছেন: বার বার যুদ্ধে গেছেন, মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং একাধিকবার যুদ্ধে জয়লাভও করেছেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি সেখানেই যেখানে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করতে তিনি সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেও মেবারের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে মোগলের অসংখ্য সেনার প্রচণ্ড শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। তাঁহার শৌর্য্যের অভাবে মেবারের পতন ঘটেনি, মেবারের পতন ঘটেছে এমন কয়েকটি শক্তির চাপে যাহার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেননি। মেবার-পতনে তিনি অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করেছেন। তাঁহার বক্ষ থেকে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠেছে—"আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হল। ওঃ!" মেবারের আকাশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাকে ভৎর্সনা করেছে, মেবার পাহাড়ের লজ্জিত মুখ তাঁহাকে কশাঘাত করেছে, মেবারের কুলদেবতারা রোষ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়েছেন—মৃত দেশমাতার শব স্কন্ধে করে তিনি উন্মত্তের মত হাহাকার করেছেন। বিজয়ী মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে মৃত্যুবরণ করতে ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন। তাঁহার অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ অবশ্যই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মেবারের রাণা জানু পেতে মোগল সম্রাটের ফরমান গ্রহণ করবেন—এ যেমন মেবারের মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, রাণা প্রতাপের পুত্র হয়ে অমর সিংহ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধির কাছে মস্তক অবনত করবেন, সেও কম মর্ম্মান্তিক ব্যাপার নয়। যদিও অমর সিংহের ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্য্যয় এখানে গৌণ, মেবারের পতনই মুখ্য, তবু অমর সিংহের ভাগ্যের সহিত মেবারের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে অমর সিংহের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয় না ঘটা পর্য্যন্ত মেবারের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হতে পারেনি। মেবার একটি দেশ বা জাতি হিসাবে—বিদেহী

(abstract), অমর সিংহই তাহার প্রতিনিধি বা শরীরী অভিব্যক্তি। সুতরাং এই নাটকের অশরীরী নায়ক মেবার (spirit of Mewar) বটে, কিন্তু শরীরী নায়ক—অমর সিংহ।

... ...

আগেই বলেছি ট্র্যাজেডির রসাদর্শে নাটকখানি লেখা। এখন প্রশ্ন—আদর্শটি যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছি কি না? বাহ্যতঃ যে রসেরই আদর্শ ফুটে উঠুক, আদর্শকে মর্ম্মতঃ ব্যক্ত করতে পারাই বড় কথা। অর্থাৎ, শুধু রূপে ট্র্যাজেডিকল্প হওয়াই যথেষ্ট নয়, রসে ট্র্যাজেডি হয়েছে কি না সেইটিই বড় বিচার্য্য। প্রধানতঃ দুই কারণে ট্র্যাজেডি রসাদর্শ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। (১) ভাবশবলতা, অর্থাৎ নানাভাবের সংমিশ্রণে স্থায়িভাবের গুণীভাব (২) ঘটনা ও চরিত্রের অসম্ভবতা ও কৃত্রিমতা, অর্থাৎ মেলোড্রামাসুলভ অবাস্তবতার লঘুতা। অন্যভাবের সংমিশ্রণে স্থায়িভাব গুণীভূত হলে অথবা তিরোহিত হলে সংবেদন যেমন ব্যাহত অথবা অন্যরূপ হয়ে যায়, তেমনি আবার ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তবতা না থাকলে উপস্থাপ্য বিষয়ের অর্থও গুরুত্ব হ্রাস পায়, বিষয়টি হেয় বা তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায় এবং রসনিষ্পত্তি যথেষ্ট মাত্রায় ঘটে না। এই নাটকের শেষ অংশে নূতন একটি ভাবকে অধিক মাত্রায় মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভাব-শবলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—একথা ঠিক, কিন্তু নূতন ভাবটি স্থায়িভাবে সামান্য মাত্রায় আচ্ছন্ন করলেও, সম্পূর্ণ তিরোহিত করেনি একথাও অস্বীকার করা চলে না।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে নাটকের শেষ দিকে নাট্যকার পতনের বেদনা সঞ্চার করার চেয়ে পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার দিকেই একটু বেশী ঝুঁকে পড়েছেন, জাতিপ্রীতির উপরে মানবতা প্রীতির উচ্চতর আদর্শের মহিমাকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন এবং মহাবৎ খাঁ ও অমর সিংহ এই দুই মেবারী-বাসীকেই মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে অনুতপ্তও 'আলিঙ্গনাবদ্ধ'

করেছেন। ফলে মেবার-পতন জনিত বেদনা অবাধে ব্যক্ত বা সঞ্চারিত হতে পারেনি।* মনে রাখা দরকার—দেশ ও জাতি প্রেমের গৌরব অধিক বলেই তো মেবারের পতন শোচনীয়। জাতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের গৌরব যে-অনুপাতে ক্ষুন্ন করা হবে, সেই অনুপাতেই মেবার-পতনের শোচনীয়ত্ব কমে যাবে। জাতিপ্রেমের বা দেশপ্রেমের ভাব-বন্ধকে নিরপেক্ষ মর্য্যাদা না দিলে পরাধীনতার বেদনাকে কিছুতেই তীব্রসংবাদী করে তোলা যাবে না। নাটকের শেষাংশে নাট্যকারের মুখপাত্র 'মানসী' মনুষ্যত্বের মহিমাকে বড় করতে গিয়ে যেভাবে 'স্বজন-দেশ' ডুবিয়ে দিয়েছেন, তাহাতে দর্শক পাঠকের মনে শোচনার ও মনুষ্যত্ব-প্রীতির আবেগের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব না এসে যায় না এবং মেবার পতনজনিত শোচনার বেগও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন আবেগের স্তিমিত হওয়া এক কথা, তিরোহিত বা মারাত্মক মাত্রায় আচ্ছন্ন হওয়া ভিন্ন কথা। মানসীর মনুষ্যত্বপ্রেমের উচ্ছ্বাস মেবার-পতনের শোকাবেগকে স্তিমিত করেছে বটে, কিন্তু তিরোহিত করতে পারেনি। গোবিন্দ সিংহের এবং অমর সিংহের অন্তর্দাহ ও আর্তনাদ এবং শোকক্লিষ্টচিত্তের উদ্‌ভ্রান্ত আচরণে মেবার-পতনজনিত শোচনা যথেষ্টমাত্রায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এমনকি মহাবৎ খাঁ অমর সিংহের পারস্পরিক ক্ষমা প্রার্থনায় এবং আলিঙ্গনে মনুষ্যত্বপ্রীতির জয় সূচিত হলেও এবং হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের উর্ধ্বে উঠে একজাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প সঙ্কেতিত হলেও, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কমেডির আবহাওয়া চোখে পড়লেও মেবার-পতনের অপূরণীয় ক্ষতির বেদনা অবিরাম বাজতেই থাকে এবং থাকে বলেই নাটকটির পরিণাম বেদনাত্মক। অতএব পরিণামের দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে, নাটকখানিকে বেদনাত্মকই—অর্থাৎ ট্র্যাজেডিই বলতে হবে।

এবার অন্য একটি প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। স্বীকার করা যাক—নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস করা হয়েছে ট্র্যাজেডির আদর্শেই (pattern)

এবং নাটকখানির উপসংহারও বেদনাত্মক হয়েছে ; কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঘটনা প্রকৃতিতে এবং চরিত্রের আচরণে ট্র্যাজেডির গুরুগাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে কি না, যে-মনোভাব (attitude) নিয়ে বিশিষ্ট রসিকরা ট্র্যাজেডিকে গ্রহণ করে থাকেন সেই মনোভাব এখানে থাকে কি না। আরও স্পষ্ট করে এবং নাটক-বিচারের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়—নাটকখানি ট্র্যাজেডির গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য হারিয়ে মেলোড্রামার মত রোমাঞ্চকর-ঘটনাসর্ব্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে কি না ? এই প্রশ্নটির আলোচনা করার সময় প্রথমতঃ এঃ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঔচিত্য ও বাস্তবতা—নাটকের প্রাণ-স্বরূপ হলেও ঔচিত্যবোধ ও বাস্তবতাবোধ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ তথা আপেপিং—যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদেরও পরিবর্তন ঘটে। বলা বাহুল্য, অতীতে এবং রোমান্টিক যুগে যে-সমস্ত নাটকাদি লেখা হয়েছে, সেই সকল নাটকের ঘটনা ও চরিত্রকে আজকের 'logic and reality'-র মান দিয়ে বিচার করলে অনেক অসঙ্গতি বেরিয়ে পড়বে—বহু ক্ষেত্রেই "মেলোড্রামাটিক" মনে হবে। এলিজাবেথের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলেই দেখা যাবে যে ঘটনার ও চরিত্রের আচরণগত ঔচিত্য তথা বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। তাই সমালোচকরা 'রোমান্টিক' আখ্যা দিয়ে এদের স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থান করে দিয়ে থাকেন এবং কোন কোন বিষয়ে 'লাইসেন্স' দিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। আমি বলতে চাই—ইয়োরোপীয়, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি'কে যে-সব সুযোগ-সুবিধা-দেওয়া হয়ে থাক আমাদের রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলিকে সেই সব হতে বঞ্চিত করা ঠিক কাজ হবে না। অবশ্য এই বলে কেউ যেন মনে না করেন—স্বদেশের কুকুরকেও ঠাকুর বলতে হবে—বাংলা ভাষায় সব মেলোড্রামাকেই ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান দিতে হবে, আমি সেই কথাই বলছি আমি বলছি এই যে রোমান্টিক নাটকে ঘটনার চমৎকারিত্বের এবং ভাবোচ্ছ্বাসের দিকে যেটুকু বেশী ঝোঁক

থাকে তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের রোমান্টিক নাটকগুলির বিচার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখা দরকার কোন কোন ঘটনায় বা চরিত্রের আচরণে মেলোড্রামা-সুলভ কৃত্রিমতা ও রোমাঞ্চকতা থাকলেই নাটককে মেলোড্রামা আখ্যা দেওয়া অশাস্ত্রীয় কাজ। মেবার-পতন নাটকের একাধিক চরিত্রে মেলোড্রামাটিক আতিশয্য (গ্রাম্য প্রয়োগে-আধিখ্যেতা) আছে এবং তাহা ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব-গাম্ভীর্য্যের পক্ষে অপকর্ষকও বটে, কিন্তু মেলোড্রামা বলার আগে বিচার করতে হবে সেই দোষ-ত্রুটি এত মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে কি না যাতে বলা যেতে পারে—বিষয়-বস্তুর গুরুত্বকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়ে, সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টিতে, লঘু ও নিরর্থক ঘটনা চমৎকারে পরিণত করেছে। ঘটনা-চমৎকারেই নাটকের আবেদন শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের জ্ঞানে-অনুভবে-বাসনায় নাটকখানি কোনরূপ স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করে না। আগেই বলা হয়েছে যে রচনাটি 'মেবার-পতন' রূপ ঐতিহাসিক ঘটনার (হিন্দু-অভিমানের কাছে অবশ্যই শোচনীয় ঘটনা) রোমান্টিক উপস্থাপনা এবং একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে একাধিক চরিত্রের আচরণে মেলোড্রামা-সুলভ এমন উচ্ছ্বাস ও অনৌচিত্য বা অবাস্তবতা রয়েছে যাহাতে আধুনিক রুচি—অর্থাৎ অবাস্তবতা-অসহিষ্ণু সমালোচক নাটকখানির উপস্থাপনাকে 'রোমান্টিক' না বলে মেলোড্রামাটিক বলতেই বেশী ঝোঁক দিতে পারেন। পারেন বলিয়া এ-বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি একথাও উপেক্ষণীয় নয় যে উপস্থাপনায় মেলোড্রামার [illegible] প্রকাশ পাওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টির মেলোড্রামায় পর্য্যবসিত হওয়া এক অপ[illegible] নয়। যতখানি গুরুত্ব থাকলে নাটকের ট্র্যাজেডি-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, পরি[illegible]খানি গুরুত্ব যদি থাকে তাহা হলে নাটককে মেলোড্রামা না বলে ট্র্যাজেডি বলাই যুক্তিযুক্ত।

দেখা যাক এই গুরুত্ব আছে কি না। বলা বাহুল্য, এই গুরুত্বের বিচার শুধু

মস্তিষ্কের নৈয়ায়িক বুদ্ধির উপরে নয়, হৃদয়ের গ্রহণশক্তির উপরেও নির্ভর করে। লঘু-গুরু-বোধ ও অনুভবের সংযোগে তৈরি একটি মানসিক অবস্থা বিশেষ। গৃহীত বিষয় যেখানে বিষয়ীর জ্ঞান-অনুভব-বাসনাত্মক মানস সত্তার আবেদন দ্বারা এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যাহা বিষয়ীর চেতনাবন্ধকে তীব্রভাবে উত্তেজিত করে তোলে, সেই অবস্থাতেই বিষয়ী বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ (serious) বলে স্বীকার করে থাকে। 'গ্রাহ্য বিষয় এবং গ্রহীতা বিষয়ী', উভয়ের প্রকৃতির দ্বারা বোধসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মেবার-পতন নাটকের বিষয়-বস্তুর প্রকৃতি (রাজপুত জাতির বা হিন্দুশক্তির আত্মরক্ষার সংগ্রাম—বা সঙ্কট—অর্থাৎ একটা জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরাজয়) উচ্চ গ্রামীণ ভাবাদর্শে-অনুপ্রাণিত পাত্র-পাত্রীদের আচরণে, জীবনের তীব্র-গভীর আবেগের প্রকাশ, সূক্ষ্ম অনুভূতির অভিব্যক্তি এবং মহত্তম আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাকুলতা—সামাজিকের চেতনা-বন্ধে ও বেদনাবন্ধে গুরুত্ব-বোধক আবেদনই সৃষ্টি করে থাকে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদন [(Pleasure-Value + Influence Value), (Beauty Value + Social Utility)] শুধু কাহিনী কৌতূহলের সঙ্কীর্ণ সীমাতে পৌঁছেই শেষ হয়ে যায় না—চেতনাকে ও বেদনাকে যথেষ্টমাত্রায় নাড়া দেয়। নাটকের শেষ বিচার যে আদালতে হয় সেই অভিনয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অভিনয়ে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদনের যে-মাত্রা ধরা পড়েছে এবং এখনও পড়ে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই করা উচিত—নাটকখানির উপস্থাপনা অতি-রোমান্টিক—হলেও নাটকখানিকে 'মেলোড্রামা' বলা চলে না। উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির পংক্তিতে এর কোন স্থান নেই একথা যত সত্য, তত সত্য এই কথাটিও যে ট্র্যাজেডির গণ্ডীর বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার বা একেবারে অপাংক্তেয় করার মতও নয়।

নাটকের অঙ্গী-রসবিচার এখানেই শেষ।

যাই হোক এই সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল যে মেবার-পতন নাটকের 'অঙ্গী-রস, করুণ বা 'ট্র্যাজিক' এবং দেশরতিকে আশ্রয় করেই ধর্ম্মাঘাতজনিত এবং শোকাকুত করুণ নিষ্পন্ন হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে কৃত সঙ্কল্প হয়েই অমর সিংহ ও গোবিন্দ সিংহ শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আবর্ত্তে তলিয়ে গেছেন, দেশপ্রাণা সত্যবতীর স্বপ্নের ঘোর ভেঙে গেছে, জীবনবীণার তার ছিঁড়ে গেছে, পরাধীন মেবারের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে ভগ্নপ্রাণে সত্যবতী আর্ত্ত-নাদ করেছেন। জীবনব্যাপী দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে সগর সিংহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে দেশপ্রীতির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এমনকি জাতিতে রাজপুত হলেও যে ধর্ম্মে মুসলমান সেই মহাবৎ খাঁ শেষ পর্য্যন্ত দেশপ্রীতির, জাতিপ্রাতির প্রেরণা-তেই, অনুতাপ প্রকাশ করেছে, স্বীকার করছে—নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া,পৈশাচিক উল্লাসে তাহার উত্থিত ধূমরাশি দেখা—মহাপাপ এবং সেই মহাপাপ সে করেছে। তার মধ্যে অবদমিত দেশরতি ও জাতিপ্রীতির সঙ্গে অন্যান্য প্রবৃত্তির বা অভিমানের দ্বন্দ্ব ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত্য দেশরতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। মোট কথা, দেশরতি বা জাতিপ্রীতিই এই নাটকের মূল ভাব এবং উল্লিখিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য এই ভাবটির সদ্ভাবের এবং অভাবের মাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অমর সিংহের সঙ্গে দেশরতির সদ্ভাব আছে বটে, কিন্তু পরিস্থিতি চেতনা ও অন্যান্য চিন্তাও আছে, অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার চেতনাও কম প্রবল নয়। ফলে তাঁহার আচরণে দেশরতির নিরপেক্ষ, ঐকান্তিক এবং অবাধ প্রকাশ পাওয়া যায় না; বাস্তব পরিস্থিতি চেতনা এসে বারে বারে দেশরতির অবাধ স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিয়েছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত দেশরতিই প্রাধান্য লাভ করেছে।

গোবিন্দ সিংহ দেশরতির নিরপেক্ষ ও ঐকান্তিক অভিব্যক্তি। পুত্র-কন্যা

স্বার্থ, প্রাণ সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁহার দেশ। দেশরতির ঐকান্তিক ও উন্মত্তপ্রায় আবেগ দিয়েই গোবিন্দ সিংহের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত গঠিত। কোন ভয়ঙ্কর বাস্তব পরিস্থিতি এসে তাঁহার আবেগকে স্তিমিত করতে পারে নাই। অনিবার্য্য মৃত্যু সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েও তাঁহার চিত্তে দ্বিধা জাগাতে পারে নাই। সত্যবতী গোবিন্দ সিংহেরই ভিন্ন মূর্ত্তি, চারণী-মূর্ত্তি, সঞ্চারিণী মূর্ত্তিমতী 'দেশরতি'। সত্যবতীর কাছেও পিতা নেই, পুত্র নেই, ভ্রাতা নেই, আছে শুধু 'দেশ'। পিতা তখনই পিতা, যখন পিতা দেশভক্ত, পুত্র তখনই পুত্র, যখন সে দেশকে ভালবাসে, ভ্রাতা তখনই ভ্রাতা, যখন দেশের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে। দেশের গৌরবই তাহার প্রাণ এবং দেশের গৌরবহানিতেই তাহার মহতী বিনষ্টি। সগর সিংহের চরিত্রে দেশরতিরই অভাবাত্মক প্রকৃতিটি ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশরতিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সাধনা দ্বারা অবদমিত করার ফলে সগর সিংহের মধ্যে দেশরতি অসৎকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সগর সিংহ বিকৃত জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু যাহা সৎ তাহার অভাব, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভাব সম্ভব নয় এবং তাহা নয় বলেই অবস্থাচক্রে একদিন দেশরতি মুক্ত হল—আপন গতিবেগে স্বার্থের সব সঞ্চয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রাণ দেওয়ার শক্তি হারিয়ে প্রাণের ভয়েই যিনি সঙ্কুচিত হয়েছিলেন, প্রাণের বিনিময়ে মান বিক্রয় করে-ছিলেন, নিজের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েই তিনি মায়ের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরলেন বটে, কিন্তু যাকে বলে গোড়া পচে যাওয়া তেমন কিছু হয়নি। গোড়া পচে গিয়েছিল গজ সিংহের। গজ সিংহ দেশরতির অভাবের নিদর্শন—অতি-কোটিক নিদর্শন—হাস্যোদ্দীপক বিকৃতি। মহৎ কাম্য এবং মহামূল্য দেশপ্রীতির বিপরীত ভাবকে হাস্যাস্পদ করার জন্যই গজ সিংহের সৃষ্টি। কিন্তু মহাবৎ খাঁ দেশরতির অভাবের নিদর্শন হলেও, চরিত্রে সগরসিংহ বা গজসিংহের চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র এবং শতগুণে জটিল। এই জটিলতার কারণ তাঁহার বিশেষ

পরিস্থিতি—তাঁহার দ্বিধাবিভক্ত সত্তাটি। মহাবৎ জাতিতে রাজপুত, কিন্তু ধর্মে মুসলমান। অতএব, যে যুগে ধর্ম ও জাতি এক, এবং ধর্মত্যাগের অর্থই জাতি-চ্যুতি সেই যুগের মহাবৎ খাঁর জীবনে সঙ্কট অনিবার্য্য একদিকে বিবেকসম্মত ধর্ম ত্যাগ করলে বিবেক বিসর্জন দিতে হয়, অন্যদিকে জাতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হলে জাত্যভিমানে আঘাত লাগে, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের বিরুদ্ধে নিজের হৃদয়েরই বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব করতে হয়, আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। মহাবৎ অবস্থাচক্রে এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছে যাহা মোগল সম্রাটের ধর্ম এবং যে-ধর্ম গ্রহণ করায় সে রাজপুত বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার হারিয়ে মোগল সম্রাটের সেবা করতে বাধ্য হয়েছে এবং মোগল বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হয়ে স্বদেশ মেবারেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। দেশরতি বা জাতিপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে এমন কাজ করতে হয়েছে যাহা উৎকট দেশদ্রোহিতারই পরিচায়ক, যাহা মহাবৎ খাঁর নিজেরই ভাষায়—নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দেওয়া। স্বজাতির সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুব্ধ হয়ে গর্ব্বী মহাবৎ অভিমান চরিতার্থ করতে অথবা স্বজাতিকে চরম শিক্ষা দিতে যাহা করেছে তাহাকে দেশদ্রোহিতার নিদর্শন, অর্থাৎ দেশরতির অভাবের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ঘর পরিষ্কার করতে ঘরে আগুন দেওয়া যে-ধরনের বিকার, মহাবতের আচরণেও তেমনি বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবতের বিকৃতি সমীক্ষণ করে একথা বলা যায় যে ধর্ম ও জাত্যভিমানের সামঞ্জস্য ঘটতে পারেনি বলেই জাতিপ্রীতির আবেগ অবদমিত হয়েছে এবং হতে হতে জাতিরই বিরুদ্ধে 'আক্রোশ'-ভাববন্ধে পরিণত হয়েছে এবং মারাত্মক নিষ্ঠুর আক্রমণের রূপে সেই আক্রোশ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাইরের সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণের অন্তরালে রয়েছে সেই রাজপুতটি যে কল্যাণীকে গ্রহণ করতে চায় সঙ্গিনী রূপে, সত্যবতীর হৃদয়ের স্নেহ পেতে চায় ছোট ভাই মহীপৎ রূপে, মেবারের রাণা অমর সিংহকে যে ভাই বলে গর্ব্ব

বোধ করে আলিঙ্গন করতে চায় এবং যে মনেপ্রাণে মেবারের রাণার জয় কামনা করে। অথচ তাঁহার ট্রাজেডি, সকলেই বাইরে থেকে মহাবৎ খাঁকে, দেখে তাকে ঘৃণা করে বিধর্ম্মী ও দেশদ্রোহী বলে; কিন্তু ভিতরকার ঐ রাজপুতটিকে কেহই দেখে না, কেহই ভালবাসে না—ভালবাসতে পারে না। কেহ তলিয়ে দেখতে চায় না যে মহাবৎ যে আজ শত্রুশিবিরে সে শুধু মহাবতেরই একার দোষ নয়, যে বাহু রাজপুত সৈন্যের বাহুর সঙ্গে যুক্ত হলে মেবারের কোনদিনই পতন হত না সেই বাহুকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করে দূরে ঠেলে দিয়েছে মেবার নিজেই।

যাইহোক মহাবৎ শত্রুশিবিরে যোগ দিয়ে আক্রোশবশে নিজের ঘরে নিজের হাতে আগুন দিয়েছে—এ পাপের জন্য সে অবশ্যই দায়ী। এবং পাপ বা অন্যায় বলে স্বীকারও করেছে সে। অমর সিংহের কাছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও সে করেছে। কিন্তু মেবারও কম অপরাধী নয়। মেবারের পক্ষ থেকে অমর সিংহ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মেবারের ট্র্যাজেডি এই যে অমর সিংহ-মহাবতের ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে শ্মশানে এসে পতিত মেবারের শবের পাশে দাঁড়িয়ে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে মেবারের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে, যে জীবনগুলি ট্র্যাজেডির আবর্ত্তে তলিয়ে গেছে বা আবর্ত্তিত হতে হতে, সংঘাতে সংঘাতে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তাহাদের তালিকায় মহাবতের নাম অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে অমর সিংহ গোবিন্দ সিংহের জীবনে বিপর্য্যয় ঘটেছে তাহা যতখানি 'ট্র্যাজিক' পদবাচ্য, সত্যবতীর এবং মহাবতের মনস্তাপ ততখানি 'ট্র্যাজিক'-পরিণতি লাভ করেনি। মহাবতের চরিত্র বা প্রকৃতির সব দিক্ যতখানি পরিস্ফুট হলে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ তীব্রতর ও শোচনীয় আকারে ব্যক্ত হতে পারত তাহা এখানে হয়নি এবং হয়নি বলেই মহাবতের জীবনের ট্র্যাজেডি অনেকটা অনুমানগম্য হয়ে আছে। যে-ধরনের বিপত্তি ঘটলে পরিণামকে যথার্থ ট্র্যাজিক বলা যায়

...ত্যা' ঠিক ঘটেনি। তবে তাই বলে তাঁহাকে কমেডির আলম্বনও বলা চলে ... তাঁহাকে 'সুখী ব্যক্তি' বলে গণ্য করা যায় না। বৃত্তিসমূহের যে-সামঞ্জস্যে ...র' উদয় হয় সে-সামঞ্জস্য তাহার চরিত্রে ঘটেনি। যেমন ঘটেনি ...ণীর এবং মানসীর জীবনে।

কল্যাণীর জীবনে প্রেমের দাবি খুবই ঐকান্তিক কিন্তু সেই দাবি অপূর্ণই ...য়ে গেছে অর্থাৎ কল্যাণীর জীবন তাহার আসল অর্থই হারিয়ে ফেলেছে। ...ও মানসীর প্রেরণায়, মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে কল্যাণী ব্যর্থ প্রেমকে পূর্ণ করতে চেয়েছেন, উচ্চতর ভাবের ভূমিতে সার্থকতালাভের চেষ্টা ...রেছেন, তবু তাহার জীবনকে কিছুতেই সুখী জীবন বলা না। একথা ...তেই বলা চলে না কল্যাণীর জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ, সমস্ত দুঃখ ...ের শেষে নিরুদ্বেগ আনন্দের বা সন্তোষের জীবনে পরিণত হয়েছে। মানসী ...ম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়। যদিও মানসীর জীবনে উচ্চতর ভাবরতির আধিক্য বা প্রাধান্য রয়েছে, যদিও মানসী পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে বেশী ...সুখ অনুভব করেছেন এবং যদিও তিনি দেখছেন—তাঁহার কর্তব্যপথ জীবনের ...দ্র সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত, অর্থাৎ যদিও মানসী মহত্তর ...ভাবের দাবি মেটানোর মধ্যে "আপনাকে" অর্থাৎ জীবনের সার্থকতা খুঁজে ...পেতে সচেষ্ট, তবু শত মুখের কথা বা ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় ব্যথার ...কথা ভুলেন নাই। অজয়ের মৃতদেহের পাশে "দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও ...দীন" যে-মানসীকে, আমরা দেখেছি; তাঁহার যে শোকান্মত্ত—"প্রেম-ভিখারিণী ...বর্ণা রমণীর" রূপ আমরা দেখেছি, তাতে ব্যর্থ প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত করিয়ে ...চাবার চেষ্টা দেখলেও মানসীকে কেউ প্রকৃত সুখী বলে মনে করতে পারবে না। সেবা-সুখের যত হাসিই তাঁহার মুখে ফুটে থাক, ক্ষয়ক্ষতির বেদনা থেকে ...র, বিষাদের ছায়ায় তাঁহার জীবন আচ্ছন্ন।

প্রাধান্য থাকার ফলে যদিও মানসীকে আমরা

বিশ্বপ্রেম-রসের অবলম্বন বলে গণ্য করতে প্রবণায়িত হই, কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে ট্র্যাজেডি-কমেডির দুই কোটির কোন একটিতে মানসী-চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কমেডির চেয়ে ট্র্যাজেডির কোটিকেই বেছে নেওয়ার ঝোঁক স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। ঐ

এখানেই রস ও চরিত্র আলোচনার উপসংহার করা যাক। অন্যান্য রস এবং চরিত্র সম্বন্ধে গঠন-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যেটুকু বলা হয়েছে, আশা করি তাই থেকেই কৌতূহলী পাঠকের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে।

(সমাপ্ত)